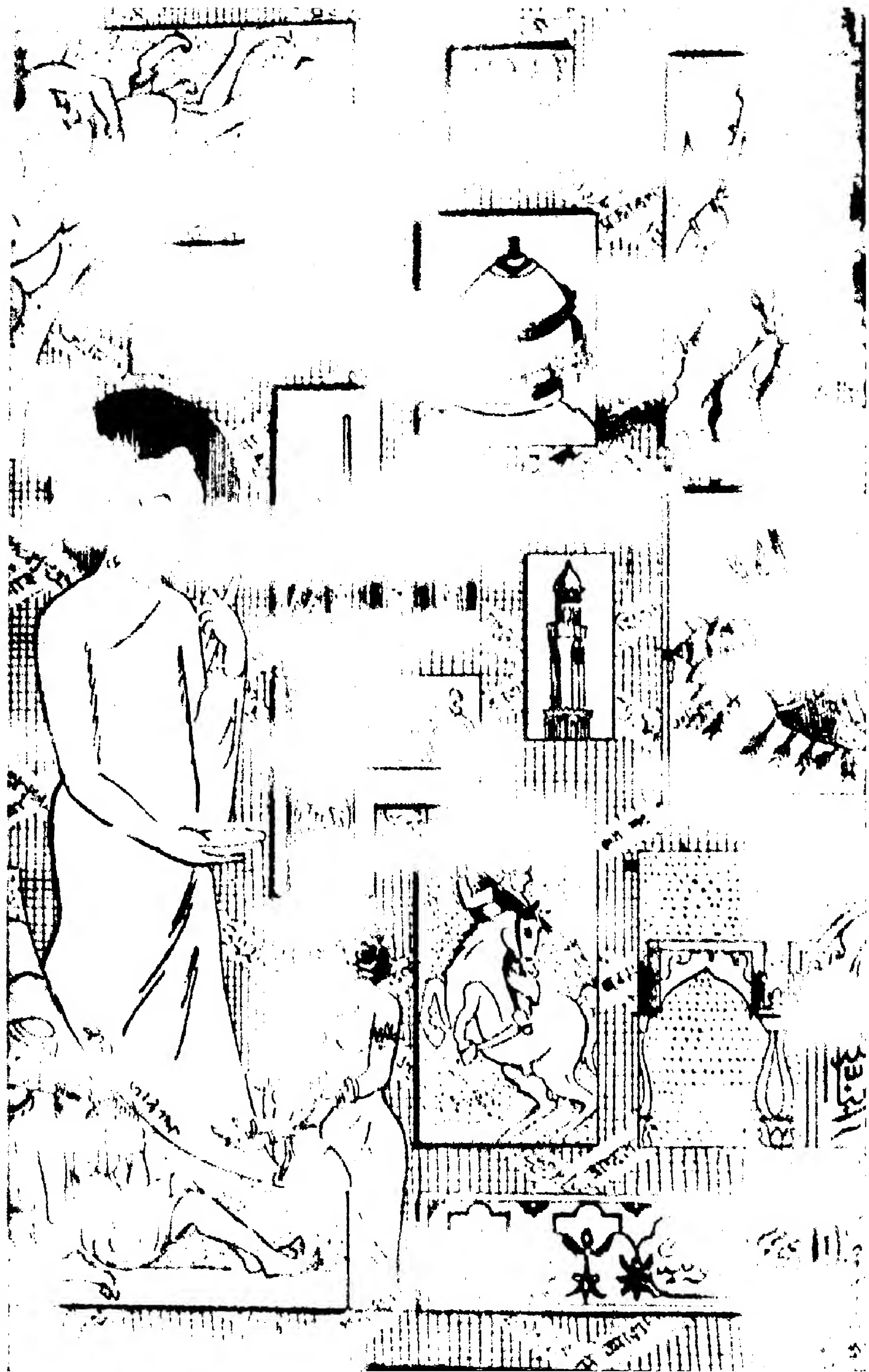
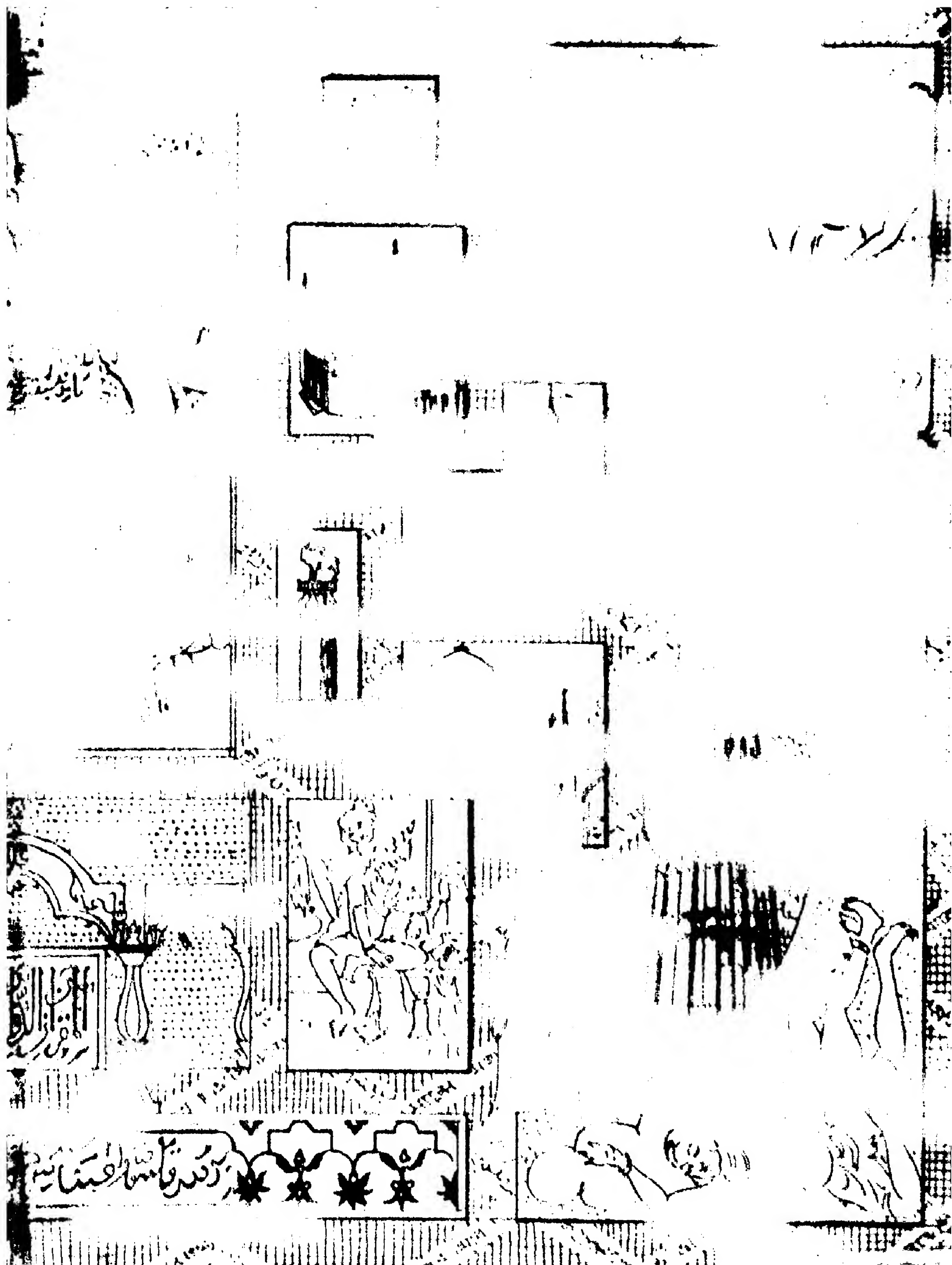


ଜା-ଓଓଓ ଓଓଓଓ ଅମରକା ଆଶା

ନାରାୟଣ ସାମଲ





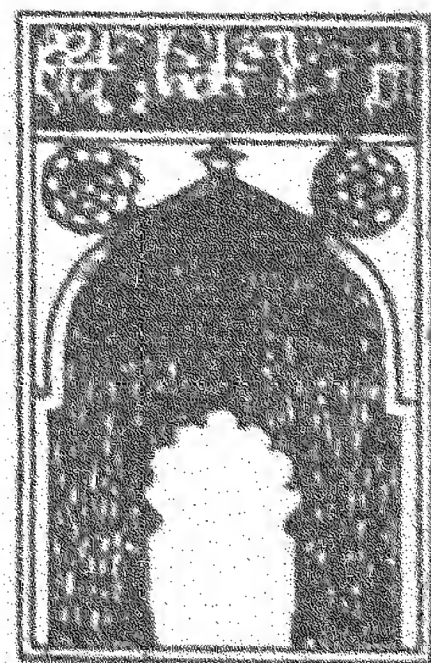


କା-ଅପାର ପତ୍ନୀ

নারায়ণ সাগর

- অপরাধা আশ্রা

pathaggonet



ভারতী বুক স্টল

৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রকাশক : শ্রীঅশোককুমার বারিক
৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

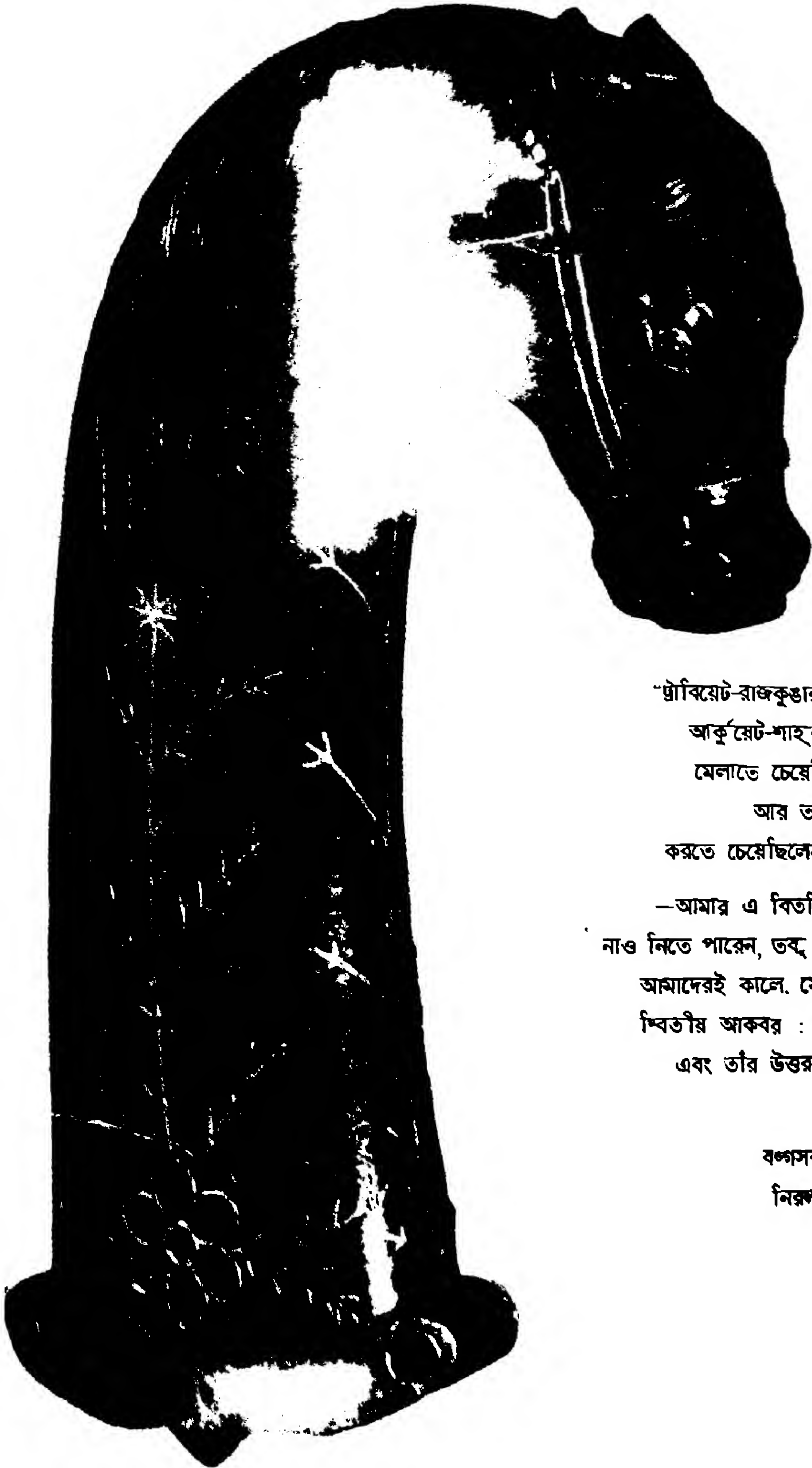
প্রথম প্রকাশ : গ্রাবণ, ১০৮৯
: আগস্ট, ১৯৮২

দ্বিতীয় সংস্করণ : গ্রাবণ, ১০৯২
: আগস্ট, ১৯৮৫

© শ্রীতীর্থকেশব মনিয়াল

প্রচ্ছদ শিল্পী : বাসেন্দ্র চৌধুরী

মুদ্রক : শ্রীঅশোককুমার বারিক
অক্ষয় প্রিন্টার্স
৭বি, সীতাবাস ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৯



“ট্রাবিয়েট-রাজকুণ্ডারীর মেহদীরাজিত হাতে
আকুয়েট-শাহজাদার সমশেরবন্দ হাত
মেলাতে চেয়েছিলেন জানান উদ্দীন ;
আর তাঁর আরক্ত কাজ মসপ্পন্ন
করতে চেয়েছিলেন উস্তাদ ইশা আফান্দ”

—আমার এ বিতর্কিত ‘খিসিস’ যদি মেনে
নাও নিতে পারেন, তবে নিশ্চয় স্বীকার করবেন—
আমাদেরই কালে সে কাজে কৃতী হয়েছিলেন
ম্বিতীয় আকবর : কাজী নজরুল ইসলাম ;
এবং তাঁর উত্তরসূরী, ম্বিতীয় আফান্দ :
সৈয়দ মজতবা আলী।

বঙ্গসরস্বতীর সেই দুই প্রসাত
নিরলস সেবকের যুগ্মমুখিত্তে
এ-গ্রন্থ অর্থা হিসাবে
উৎসর্গ করে
বন্দ ইসলাম।
খৃস্ট হাবিষ।

বঙ্গসরস্বতী

কৈফিয়ৎ

বইটা লেখার পর, বিশ্বাস করুন, বেশ বাগিয়ে অকুণ্ঠভাবে একটা 'বৈকুণ্ঠমান' নামকরণ করেছিলুম :

"ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যের আদিম উৎপত্তি ও ইতিহাস এবং জা-জবাব দেহলী, ফতেপুর-সিক্রি, সেকেন্দ্রা তথা অপরাধা-আগ্রা-বিধৃত সীমিত ভূখণ্ডে ভারতবর্ষের রাজধানীতে তাহার জন্ম, বিকাশ ও বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত সরল প্রকরণ।"

পড়ে, পাণ্ডুলিপি প্রথম পাঠিকা বললেন, নামটা দাঁড়া হয়েছে, তবে 'ওর-নাম-কি বইয়ের নাম কিছু ছাঁটকাট করেই রাখতে হয়।' প্রকাশক মশাই ছিলেন পাশেই, লাফিয়ে ওঠেন তিনি : ঠিক ঐ কথাই বলতে যাচ্ছিলুম, কিছুটা সংক্ষেপ করা দরকার। অতঃপর লেখককে কিস্কুল বরবাদ করে শূভানুধ্যায়ীরা সেনশর বোর্ড-এর ভূমিকায় নামলেন কাঁচি হাতে। শূরু হল বস্ত্র-হরণ পর্ব ! ছাঁটতে ছাঁটতে অবশিষ্ট রইল শূরু, চোলী আর ঘাগরা ! উপায় কী ? 'বাজারমে গুজরা হু, খরিদদার নেহী হু !' নাগা না-করা পর্যন্ত পণ্য হিসাবে আমার দিল-কা-কলিজাকে ওরা বাজারে ঠাই দেবে না। সুতরাং : ওয়া ! দিল-ই-মন ! ব্ খুদা সপদ-মং ! হে আমার হৃদয়-রানী, তোমাকে খুদার আমানতে সোপদ করলুমি। এখন কৌরবসভায় তোমার বস্ত্র জোগানোর দায় লজ্জাহারী মধুসূদনের !

নামকরণের কৈফিয়ৎ তো দাখিল করা গেল, এবার কৃতজ্ঞতা স্বীকারের প্রসঙ্গে আসি। এ-গ্রন্থ রচনার জন্য আমি সবচেয়ে বেশি ঋণী সেইসব অচেনা, অজানা পণ্ডিতদের কাছে যারা অজ্ঞতা দেখে বা না-দেখে আমাকে প্রকাশকের মাধ্যমে অহৈতুকী ধন্যবাদ জানিয়েছেন। শূনে আনন্দ পেয়েছি, আমার সে-গ্রন্থখানি তাঁদের রসোপলব্ধিতে কিঞ্চিৎ সাহায্য করেছে। মনে হল, প্রতি বছর যতজন ভ্রমণ-পাগল বাঙালী অজ্ঞতা দেখতে যান, তার দশ-বিশগুণ যান দিল্লী-আগ্রা দেখতে। অবশ্য গাইড-বই যথেষ্ট আছে, পি-এইচ-ডি ডিগ্রির প্রত্যাশায় লেখা ঢাউস ঢাউস বইও আছে ইংরাজী ভাষায় : ফাগুসন, হ্যাভেল, পার্সি ব্রাউনের গ্রন্থও আছে—কিন্তু বাঙালার কই ? বাঙালার ভ্রমণ-কাহিনী যা আছে তার অধিকাংশই কল্পিত নায়ক-নায়িকার রোমান্স স্থাপত্যশিল্পের রসোপলব্ধির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। একমাত্র মজ্জতবা আলী-সাহেবের একটি অতিক্ষুদ্র প্রবন্ধ ('দিল্লী-স্থাপত্য'—চতুঃপাণি) প্রকৃত জ্ঞানাজনশলাকার ভূমিকা নিতে পারে। এ-গ্রন্থে কল্পিত রোমান্স নেই, কিছু আঁক-জোক আছে, হিসাবের কচ-কাঁচ আছে। ফলে এ-গ্রন্থ স্থানে স্থানে দুঃপাঠ্য মনে হতে পারে। 'বড়াভাই' সৈয়দ মজ্জতবা আলী-সাহেবের ভাষাতেই 'ডিটো' দিয়ে যাই : "লেখাটিতে কিঞ্চিৎ মাস্টারি-মাস্টারি ভাব থেকে যাবে বলে গণিজনকে অগ্রে থেকেই হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, তাঁরা যেন এটি না পড়েন।" এবং অগ্রজ সাহিত্যিক বন-ফুলের পরামর্শমতো বলি, "যাঁরা দলবেঁধে ফুচকো খেতে অভ্যস্ত" তাঁদের রসনার্জিত দার আমার নেই।

"কোনো-কালে যে ব্যক্তি গান শোনেনি সে যদি হঠাৎ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শূনে উম্বাহ হরে নৃত্য না করে তা হলে চট করে তাকে বেরসিক বলা অন্যায়। বাঙালাদেশে এখানে-ওখানে ছিটে-ফোটা স্থাপত্য আছে বটে, কিন্তু একই জায়গায় যথেষ্ট পরিমাণে নেই বলে স্থাপত্যের যে ক্রম-বিকাশ এবং সামগ্রিক রূপ তার ক্রম বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, তার সম্পূর্ণ অভাব। বিচ্ছিন্নভাবে যে বিশেষ একটি মন্দির, মসজিদ বা সমাধি রসসৃষ্টি করতে পারে না, তা নয়। তাই তুলনা দিয়ে বলতে পারি, জগতের কোনো সাহিত্যের সঙ্গে যদি আপনার কিছুমাত্র পরিচয় না থাকে, তবে সাধারণতঃ ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, উটকো একখানা ফরাসী উপন্যাসের রস আপনি গ্রহণ করতে পারবেন না। রসবোধের জন্য ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ-জ্ঞান অপরিহার্য কি না এ প্রশ্ন নন্দনশাস্ত্রের অন্যতম কঠিন প্রশ্ন। সে গোলকধাঁধার ভিতর একবার ঢুকলে আর দিল্লী বাবার পথ পাবেন না,—আর 'দিল্লী দূর অস্ত' তো বটেই।" (মজ্জতবা আলী, দিল্লী-স্থাপত্য)

আলী-সাহেবের ঐ স্বেচ্ছিক সাথে আরও যোগ করি, শব্দ লা-জবাব দেহলী নয়, এ-বিচারে 'অপরূপা-আগ্রা'ও 'হনুজ দূর অমৃত'।

বিশেষ কারণে—গুণীজন সহজেই বুঝবেন—নামকরণ থেকে শুরু করে গ্রন্থের সর্বত্র আমি সংস্কৃত তৎতৎ শব্দের সঙ্গে সজ্ঞানে আরবী-ফার্সী-উর্দু শব্দের মিশেল দিয়েছি। নজরুল ও আলী-সাহেবের প্রয়াণের পর ঐ জাতের শব্দের ব্যবহার বাঙলাভাষায় কমে এসেছে। ফলে পাঠকের স্বেচ্ছিক হবে মনে করে এ-গ্রন্থে ব্যবহৃত ঐ জাতের কিছু অপ্রচলিত শব্দের বঙ্গার্ধ দাখিল করেছি। আমি আরবী-ফার্সী'র কোনটাই জানি না, ফলে ভুলটুকুটি হতেই পারে। গুণীজন মার্জনা করে এদিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে পরবর্তী সংস্করণে আমি নিজেও কিছু মার্জনা করতে পারি। 'মার্জনা'-র অপর অর্থ।

এ-গ্রন্থের সাত-নম্বর পৃষ্ঠায় একটা মারাত্মক ভ্রান্তি রয়ে গেছে। শেরশাহ্ শুর ও অন্যান্য আফগান-পাঠান সুলতানের রাজত্বকাল বোলো বছর, 1540-1556 (1554 নয়) এবং জালালউদ্দীন আকবরের শাসনকাল ঊনপঞ্চাশ বছর, 1556 (1554 নয়) থেকে 1605। এটি মদ্রাকর-প্রমাদ নয় : আমি পাণ্ডুলিপি মিলিয়ে দেখেছি। ভুলটা একান্ত আমারই। দয়া করে সংশোধন করে নবেন। এ-ভাষায় কৈফিয়ৎ দেবার একটি বিশেষ হেতু আছে। শেরশাহ্ শুরের মতো আলিওয়াল খানের মক্কার বানিয়ে দেবার ক্ষমতা আমার নেই ; কিন্তু, প্রেসের প্রভাত যশ, স্বপন দে, ভাস্কর্য স্বেচ্ছিক এবং শব্দানুযায়ী তপন বারিক, স্বেচ্ছিক সরকার, শীতল ঘোষ ও অরুণ রায় প্রভৃতি স্বেচ্ছিক যত্ন নিয়ে প্রুফ দেখেছে, তারপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিবর্তে কৃতঘ্নের মতো এটিকে 'মদ্রাকর-প্রমাদ' বলায় আমার আর্পিত [বর্তমান সংস্করণে সংশোধন করা হয়েছে]।

ইতিহাসের নিরিখে এ-গ্রন্থ শেষ ইংরেজী-উর্দু ছিল 1857 খ্রীষ্টাব্দে। কেন তাজমহলে ছেদ চেনেছি তার কৈফিয়ৎ গ্রন্থেই দিয়েছি। ঊরুগজীব ও তাঁর উত্তরসূরীদের কীর্তিকাহিনী নিয়ে গ্রন্থের কলেবর তথা মূল্য বৃদ্ধি করলে ইংরাজী অলঙ্কারশাস্ত্রে যাবে 'bathos' বলে সেই ভুলে রচনাটিকে ভ্রান্ত করা যেত—তার চেয়ে নাগা থাকাই বাঞ্ছনীয়। অবশ্য শেষ মদ্রাকর-প্রমাদে কবি মিত্রবাহাদুরশাহ্ জাফর, যিনি বলতে পেরেছিলেন—

“উম্মেদরাজ মাংগকে লায়ে থে চারদিন,
দো আরজুমে কট গ্যারে, দো ইন্তেজারমে ॥”

(খুদার কাছে মাত্র চারদিনের মেয়াদ নিয়ে দুনিয়াদারী করতে এসেছিলুম, তার দুটো দিন কেটে গেল আকাঙ্ক্ষায়, বাকি দুটো অপেক্ষায় ॥)

—তাকে নিয়েও এ-গ্রন্থের বর্নিকাপাত করা চলত। দঃখ এই—শেষ ভারতীয় ভারতসম্রাটের মৃত্যু হয়েছিল বর্মামূলকে, বন্দীদশায়। স্বাধীন ভারত তাঁর কোন স্মৃতিচিহ্ন বানাবার প্রয়োজন বোধ করেনি লা-জবাব দেহলীতে ; দেখানো কী ? কৈফিয়তে তাই বরং উপহার দিয়ে যাই সঙ্কট-কবির একটি আর্থেরি-শের :

“ইংনা হায় বদনসীব প্রফর দফন কা লিয়ে
দো-পজ জবানি হি না মিলি কুয়েইয়ারমে ॥”

(জাফরের চোরে হঠাৎপা আর কে আছে : মরবার পর স্বদেশের দঃগজ জমিও মিলবে না তাঁর কবরের জন্য।)

‘তাজমহল-প্রসঙ্গ’ একটি কৈফিয়ৎ দেবার আছে।

‘চীন-জারত’ লঙ্ঘার্চ গ্রন্থ (রচনা : 1977) চীনের মহাকাব্য লঃ স্বেচ্ছিক-এর একটি কবিতার উদ্ধৃতি দিয়েছিলুম : ‘আমাদের নির্বাপিত মহান প্রাচীর’

"ঐজানিয়ারদের ঐ মহান কীর্তি মানচিত্রে পর্যন্ত দাগ ফেলেছে।
 সারা পৃথিবীতে এমন মানুষ নেই যে কিছুমাত্র লেখাপড়া শিখেছে,
 অথচ চীনের প্রাচীরের নাম শোনেন।
 সত্যি কথা বলতে অবশ্য ওটা অসংখ্য দাস ও বন্দীর মৃত্যুর হেতু—
 আর হুগদের ওটা কোনকালেই ঠেকাতে পারেনি।
 এখন ওটা পুরাতত্ত্বের নিদর্শন ছাড়া আর কিছু নয়।
 হয়তো ধূলায় মিশিয়ে যেতে ওর কিছুটা দেরী হবে,
 কারণ ওটাকে জিইয়ে রাখতে আমরা বন্ধপরি কর।
 আমার সবসময় মনে হয় ওটা আমাকে ঘিরে রেখেছে।
 মহান প্রাচীরটা।
 পুরানো-ইটের মাঝে মাঝে মেরামতির কেরামতি।
 ঐ মহান প্রাচীরকে টিকিয়ে রাখার জন্য নতুন নতুন ইটের জোড়াতালি
 দেবার এ-ব্যবস্থা বন্ধ হবে কবে?
 হে চীনের মহিমময় বিশাল প্রাচীর!
 তোমার মৃত্যু হলে যে বাঁচি!"

উদ্ভূতিটা শুনিয়ে আমি লিখেছিলাম : "সারা ভারতবর্ষ বুঝতে পারে এমন ভাষায়
 কোনও ভারতীয় দিক্‌পাল কবি লেখেননি :

"সত্যি কথা বলতে কি ওটা অসংখ্য বন্দী
 আর মেহনতী বান্দার বণ্টনার সাক্ষী!
 আর সম্রাটের বিস্মৃতিকে ওটা কোনকালেই ঠেকাতে পারেনি।
 এখন ওটা পুরাতত্ত্বের নিদর্শন ছাড়া আর কিছু নয়।
 হয়তো ধূলায় মিশিয়ে যেতে ওর কিছুটা দেরী হবে,
 কারণ ওটাকে জিইয়ে রাখতে আমরা বন্ধপরি কর।
 আমার সবসময় মনে হয়—ঐ পাশাগভার আমার বুকে চেপে বসে আছে।
 ওটা দেখলেই আমার মনে পড়ে—গদিতে চড়ে বসেই
 আলমগীর কেমন করে ভুলে গেল শাহজাহাঁকে—যে তাকে
 জন্ম দিয়েছে, পালন করেছে, ময়ূর-সিংহাসন বানিয়ে দিয়েছে।
 ঐ মহান ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখার এই জোড়াতালি-ব্যবস্থা বন্ধ হবে কবে?
 হে ভারতের মহিমময় তাজমহল!
 তোমার মৃত্যু হলে যে বাঁচি!"

তখন জানতুম না, এখন জেনেছি, এই ভারত-ভূখণ্ডেও এমন কবি জন্মগ্রহণ করেছেন
 যিনি ভিন্ন চোখে তাজকে দেখেছেন—অনেকটা লুপ্ত-এর মতো। গ্রন্থ রচনাকালে শাহীর
 লুপ্তিয়ানভীর এই শায়েরীটি আমার নজরে পড়েনি। তাই কৈফিয়তে সেটা আখেরী-দাখিল
 করি :

"মেরে মেহবুব কাহি' ওর মিলা কর্ মদুসে
 বজ্রমে শাহীয়ে গরীবৌ কা গুজর কা মানে?
 সব্ৎ যিস্ রাহ্ পো হয় সংবতে শাহী কে নিশা
 উস্‌পে উল্‌ফৎ-ভরী রহৌকা সফর কা মানে?
 মেরে মেহবুব, ইন্‌খিভ তো মদুস্‌হু হোগী
 জিন্‌কি সমাই নে বজ্রী হয় ইয়ে শক্‌লেক্সমীল
 ইন্‌কে প্যারৌকে মকাবির রহে ও-নামে নমুদ
 আক্‌তক্‌ উনপে জ্বালাই না কিসিনে কন্দীল।
 ইয়ে চামনদার, ইয়ে যম্‌না-কা-কিনারা, ইয়ে মহল্
 ইয়ে মুনকশ, দর-এ-দিওয়ার, ইয়ে মেহ্‌রাব, ইয়ে তাক্
 এক শাহেনশাহ্-নে দৌলৎকা সাহারা লেকর
 হাম্‌ গরীবৌকী মদুস্‌হুকা উড়য়া হয় মজাক্।
 মেরে মেহবুব, কাহি' ওর মিলাকর মদুসে ॥"

“হে প্রেয়সী আমার, তাজমহল নয়, আর কোথাও আমার সঙ্গে দেখা কর। ঐশ্বর্যের এই পরিবেশে আমাদের মতো গরীবের দেখা করার কী মানে? যে স্থান বাদশাহ্‌র চরণচিহ্ননা, সেখানে দুই সামান্য প্রেমিকের সাক্ষাতের কোন অর্থ হয়? বন্ধু, ভেবে দেখ যে হতভাগা মজদুরেরা এই স্মৃতিসৌধ গোঁথে তুলেছে, তারাও তো ভালবাসতো? যারা নিখুঁত কারু-কার্কে সস্ত্রাটের প্রেমকে দিয়েছে ঐশ্বর্যের মর্যাদা, তাদেরও তো স্ত্রী ছিল, প্রেমিকা ছিল—তাদের কবরগুলি কোথায়? কেউ জানে না! সেখানে দিনান্তে আজ কেউ চিরাগ জ্বালে না। কিস্মতির অতলে তলিয়ে গেছে তাদের প্রেমের চিহ্ন। সম্পদ তাদের ছিল না, মানছি, তাই পাথর দিয়ে তারা কোনও শাস্বত প্রমাণ রেখে যেতে পারেনি—কিন্তু প্রেমে তারা তো বাদশাহ্‌র চেয়ে এক তিল কম ছিল না? আমার তো মনে হয়—এই যে বিশাল বাগিচা, যমুনার তীর, আকাশচুম্বী মহল, এই কারুকৃতি, গম্বুজ, মর্মরের বাতায়ন, দৌলতের দার্ট দিয়ে এসব তৈরী করে শাহেনশাহ্‌ শুবর আমাদের ব্যঙ্গাই করে গেছেন, উপহাস করে গেছেন! অপমানিত হয়েছে তোমার-আমার মতো সাধারণ মানুষের প্রেম। তাই বলি, হে আমার প্রেয়সী, তাজমহলে নয়, অন্য কোথাও আমার সঙ্গে মিলিত হয়ো।”

বাবুজান

৩০/৪/৮২

দ্বিতীয় সংস্করণের কৈফিয়ৎ

প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থে কিছু কিছু সংস্কার করা সম্ভব হল পাঠকদের সহযোগিতায়, তার মধ্যে কয়েক জনের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। প্রথমত পরমশ্রদ্ধেয় শ্রীউমাপ্রসাদ মুনোপাধ্যায়। ভ্রমণ সাহিত্যের অপ্রতিম্বন্দ্বী লেখক হিসাবে যাকে আমরা জানি, তিনি শিল্প-সংস্কৃতির একজন বিদগ্ধ পণ্ডিতও। দ্বিতীয়ত হাওড়া জিলার জুজারসাহা গ্রামের জনাব গ্রাহুল আজাদ পুরকারেং ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতির সম্বন্ধে আমার কয়েকটি ভ্রান্তি অপনোদন করেছেন। এছাড়া নোনা চন্দনপুকুর থেকে শ্রীননীগোপাল রায় একটি পরে প্রথম প্রকাশের কয়েকটি হিন্দি শব্দের বিশুদ্ধরূপ কী হওয়া উচিত তা আমাকে জানিয়েছিলেন। পেটেকাটা ব'-এর ব্যবহার ছাড়া তাঁর প্রায় সবগুলি পরামর্শই আমি মেনে নিয়েছি। কলকাতা-৮ থেকে শ্রীঅপূর্ব দত্ত তিনটি মদ্রাকর প্রমাদের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তবু এ-গ্রন্থে একটি বর্ণাশুদ্ধি আমার নজরে পড়ল এই কৈফিয়ৎ লিখবার সময় : ৭৪ পৃষ্ঠার প্রথম কলামের মাঝামাঝি “মশীকু”টা হবে “মসৌকু”। এ-জাতীয় গ্রন্থের শেষে একটি ‘নির্ঘণ্ট’ থাকা উচিত—এমন কথা কোন কোন বিদগ্ধ পণ্ডিত বলেছিলেন। এবার সে জন্য গ্রন্থশেষে একটি নির্ঘণ্টও যুক্ত করা গেল।

বাবুজান

১/৩/৮৫

বিষয়-সূচী

প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্য
ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যের পরিচয়
ঐ কালের ব্যাপ্তি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ বহির্ভাৱতে ইসলামী
স্থাপত্যের বিবর্তন

ইসলামের জন্ম ...
আদি-খালিফাদের যুগ ...
ওমায়্যদ যুগ ...
আব্বাসীদ বংশ ...
সেলজুক ও অটোমান তুর্কী ...

সুলতানী জমানা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥ দাস-বংশ

কুওতুল-ইসলাম মসজিদ
লৌহস্তম্ভ (কুৎব-চত্বর)
কুৎব মিনার
ইলদুৎমিসের সমাধি
মেহেরোলীর বাওলী
সুলতান ঘারী

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥ খিলজী-বংশ

কুওতুল মসজিদের সম্প্রসারণ ...
আলাই মিনার ও আলাউদ্দীনের সমাধি ...
আলাই দরওয়াজা ...
জামায়েৎখানা মসজিদ ...

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥ তুগলক-বংশ

তুগলকবাদ ও গিয়াস-এর সমাধি ...
মুহম্মদ তুগলক ...
আদিলাবাদ, জহান্পনাহ ...
ফিরোজশাহ তুগলক ...
ফিরোজশাহর সমাধি ...
খান-ই-জাহান তিলাঙ্গানীর মক্‌বারা ...

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥ সৈয়দ ও লোদীযুগ

অষ্টভূজকৃতি মক্‌বারা ...
সংক্রামণ-ধর্মী মক্‌বারা ...
চতুষ্কোণ মক্‌বারা ...

মুগল-এ-আজম

সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥ বাবর ও হুমায়ুন

জাহিরউদ্দীন বাবর ...
হুমায়ুন ...

অষ্টম পরিচ্ছেদ ॥ শেরশাহ শূর

১-৭ নবম পরিচ্ছেদ ॥ জালালউদ্দীন আকবর ১৫-১৪৫

৪ হুমায়ুন-মক্‌বারা ১০৮
৬ আগ্রা-কিল্লা ১১০
দিব্বী গেট ... ১১০
আকবরী ও জাহাঙ্গীরী মহল ১১৪
ফতেপুর-সিক্রি ... ১১৫
দেওয়ানখানা-ই-আম ১১৯
ইবাদৎখানা ... ১১৯
বাদশাহী হামাম, অনূপ-তালো, খোয়াবগাহ ১২২
আবদারখানা, পাঁচশী কোর্ট ... ১২২
দেওয়ান-ই-খাশ্ ১২০
হারাম সারাফ, পাঁচমহল ১২৪
সুনহারা-মকান ১২৪
তুর্কী-সুলতানা ... ১২৫
বোধবাসি-প্রাসাদ, বীরবল-প্রাসাদ ১২৫
জাম-ই-মসজিদ, ফতেপুর-সিক্রি ১৩০
শেখ সৈয়দ চিস্তির কবর ১৩১
বলদ-দরওয়াজা ... ১৩০
হিরণ-মিনার ... ১৩৬

দশম পরিচ্ছেদ ॥ জাহাঙ্গীর

আকবরের সমাধি, সেকেন্দ্রা ১৪৭
ইতমদউদ্দৌলা ... ১৫১
জাহাঙ্গীর ও নূরজাহাঁর সমাধি, লাহোর ১৫৪

একাদশ পরিচ্ছেদ ॥ শাহজাহাঁ

আগ্রা-কিল্লা, খাশমহল ... ১৬৫
ঐ, শীশমহল, মাসম্মান বর্জ ১৬৫
দেওয়ান-ই-খাশ্ ... ১৬৫
দেওয়ান-ই-আম ... ১৬৬
নাগিনা ও মতি মসজিদ ... ১৬৬

লাল-কিল্লা

১৬৭-১৭০

তাজমহল

১৭০-২০০

আজুর্মন্দ বানুর বিবাহিত জীবন ১৭৪

তাজ-পরিষ্করণাকার কে? ১৭৮

তাজমহলের প্ল্যান ১৮২

তাজের গম্বুজ ১৮৪

মিনারিকা চতুষ্টয় ... ১৮৬

সম্মুখদৃশ্যের গাণিতিক সূত্র ও ক্যালিগ্রাফি ১৮৮

তাজমহলের নান্দনিক ছন্দ ... ১৯১

তাজে হিন্দু শিল্পশাস্ত্রের প্রভাব ১৯২

তাজের বনিমূল, ও মথুরা রিফাইনারি ... ১৯৬

আনুষ্ঠানিক ১৯৮

নির্মাণ-যন্ত্র ও যান্ত্রিক ১৯৮

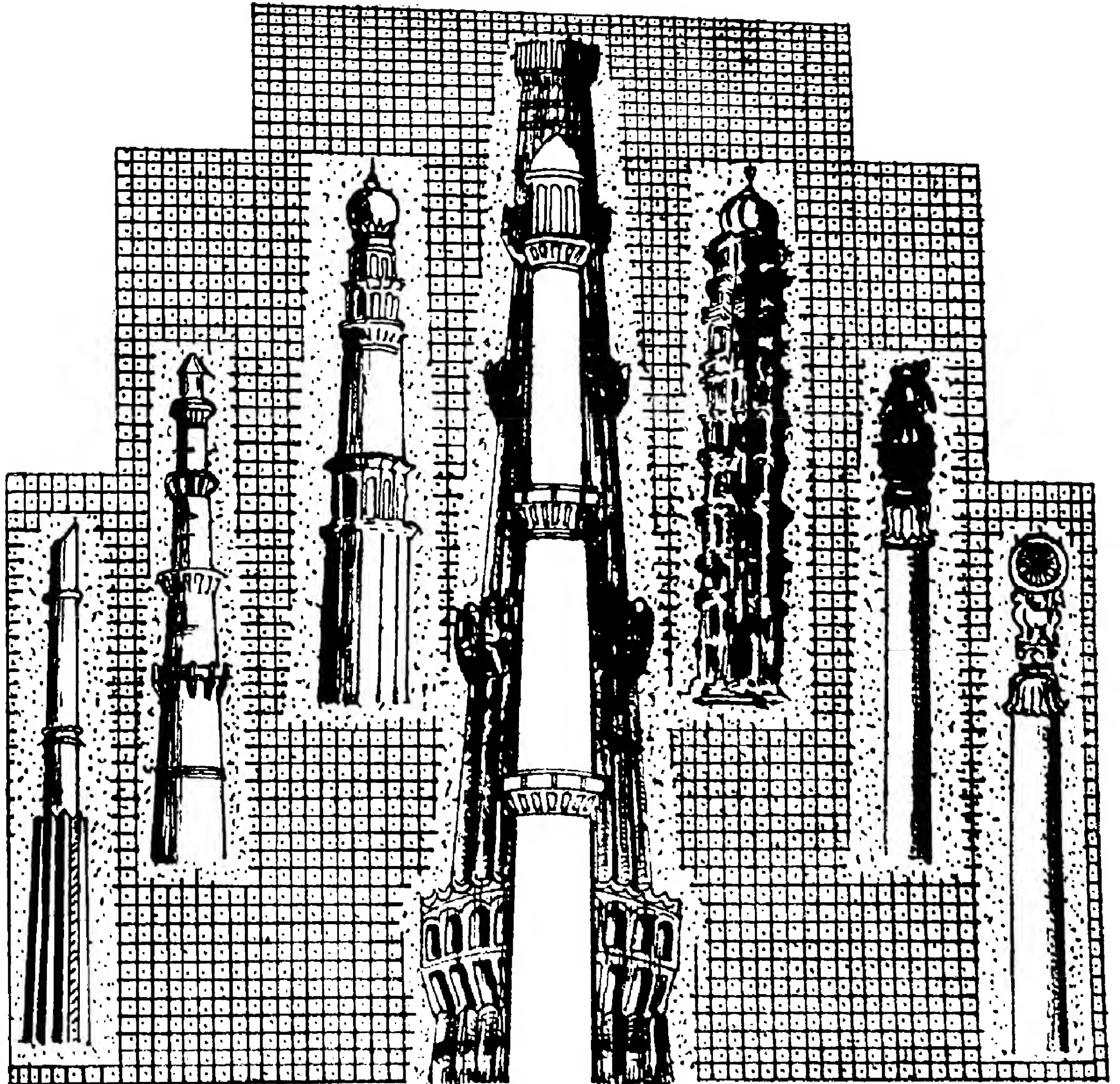
তাজের সামগ্রিক ভূমি-নকশা ২০০

চিত্রসূচী

চিত্র-সংখ্যা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
2.1	ভারত প্রবেশের পূর্বে ইসলাম-সাম্রাজ্য	৮
2.2	মক্কাস্থিত কাবা	৯
2.3	ডোম অব দ্য রক, জেরুসালেম	১২
2.4	দামাস্কাসের মসজিদ	১০
2.5	কায়রোর মসজিদ	১৪
3.1	কুৎব মিনার ও আলাই দরওয়াজা ...	১৯
3.2	বৃহত্তর দিল্লীর ভূমি-নকশা ও দ্রষ্টব্য	২০
3.3	কুওতুল মসজিদ ও কুৎব মিনার ...	২৭
3.4	কুওতুল মসজিদের সেকশন ...	২৮
3.5	হিন্দু-কবেলিঙ পদ্ধতি ...	২৯
3.6	প্রকৃত-খিলান (arch) ...	২৯
3.7	আইবক-কৃত খিলান ...	২৯
3.8	লৌহস্তম্ভ, কুৎব-চত্বর	৩১
3.9	গজনী মিনার ...	৩০
3.10	কুৎব কি হেলানো মিনার ? ...	৩৫
3.11A	নীলগির-স্থাপত্যে কোণের সাধারণ ছন্দ	৩৭
3.11B	তৃতীয় রামেসিস্-এর ঢালিকায় নকশা	৩৭
3.11C	গজনী মিনারের প্ল্যানিং-ছন্দ ...	৩৭
3.11D	কুৎব মিনারের প্ল্যানিং-ছন্দ ...	৩৮
3.11E	বেশর স্থাপত্যে প্ল্যানিং-ছন্দ ...	৩৮
3.11F	গুজরাটের মহেশ্বর মন্দিরে ঐ ...	৩৯
3.12	স্কুইণ্ড পদ্ধতির জ্যামিতিক ছন্দ ...	৩৯
3.13	ইল্-তুংমিসের সমাধি, কুৎব-চত্বর ...	৪০
3.14	কুৎবের স্ট্যালেকটাইট ও কুরাণ-স্বর্ণী	৪১
3.15	সুলতান ঘরী, দিল্লী ...	৪২
5.1	তুগলকবাদ দুর্গ ও গিয়াসের কবর	৫৪
5.2	গিয়াস-উদ্-দীনের মক্বারা ...	৫৫
5.3	ফিরোজশাহ কোটলার প্ল্যানিং ...	৫৭
5.4	ফিরোজশাহ কোটলা, বর্তমান অবস্থা	৫৮
5.5A	ফিরোজশাহ প্রাসাদের প্ল্যান ...	৬০
5.5B	ফিরোজশাহ প্রাসাদের সেকশন ...	৬০
5.6	খিড়কি মসজিদ, দিল্লী	৬১
6.1	মুবারকশাহ সৈয়দ-এর মক্বারা ...	৬৭
6.2	ঐ গরুড়াকলোকে	৬৭
6.3	সিকান্দার লোদী মক্বারা ...	৬৭

চিত্র-সংখ্যা	বিষয়	পৃষ্ঠা	চিত্র-সংখ্যা	বিষয়	পৃষ্ঠা
6.4	ঈশা খাঁর মক্‌বারা	৬৮	9.21	বুদলগদ্‌ দরওয়াজা, সম্মুখ দৃশ্য (বীররস)	১৩৪
6.5	আযম খাঁর মক্‌বারা	৬৮	9.22	ঐ —ভয়ানক রস	১৩৫
6.6	সংক্রামণধর্মী মক্‌বারা গ্র্যান্ড-মুগল-এর তিন পুরুষ মুগল-এ-আজম	৬৯ ৭১ ৭২	9.23	ঐ —ভিতর থেকে—শান্ত রস	১৩৬
7.1	বাবুরের আত্মজীবনীর একটি পৃষ্ঠা	৭৭	9.24	হিরণ-মিনার কি মক্‌বারা ?	১৩৯
7.2	মুগল-শৈলীতে ভীষ্মের শরশয্যা ...	৮০	9.25	আবদুর রহিম খান-ই-খানান-এর মক্‌বারা, বাস্তু-নক্‌শা ও সম্মুখদৃশ্য	১৪০
8.1	হাসানশাহ্‌ শূরের মক্‌বারা, সাসারাম	৮৯	9.26	আবদুল ফজল সম্রাটকে 'আকবরনামা'-র স্বিতীয় খণ্ড উৎসর্গ করছেন	১৪১
8.2	শেরশাহ্‌ শূরের মক্‌বারা, ঐ	৯০	10.1	আকবরের সমাধি, সেকেন্দ্রা (স্কেচ)	১৪৮
8.3	পুরানা কিল্লার ভূমি-নক্‌শা ...	৯১	10.2	ঐ প্রধান প্রবেশতোরণ, সম্মুখ দৃশ্য	১৫০
8.4	কিল্লা-ই-খুন্‌হা মস্‌জিদে নক্‌শা	৯২	10.3	ঐ বাস্তু-নক্‌শা, সেকশান ও সম্মুখ দৃশ্য ...	১৫১
8.5	শেরশাহ্‌ শূরের সম্ভাব্য আলোচনা ...	৯৫	10.4	ইতমদ্‌উদ্‌দৌলা, আগ্রা (আলোকচিত্র)	১৫২
9.1	শিশু আকবর ও জননীর পুনর্মিলন	৯৮	10.5	ঐ বাস্তু-নক্‌শা ...	১৫৩
9.2	আংকার হত্যা ও আযমের শাস্তি	১০৫	10.6	ঐ সম্মুখ দৃশ্য	১৫৪
9.3	হুমায়ূন-মক্‌বারা, নববস্তুর ছন্দ	১০৬	10.7	ঐ সিলিঙে জ্যামিতিক নক্‌শা	১৫৫
9.4	ঐ বাস্তু-নক্‌শার জ্যামিতি ...	১০৬	11.1	সম্রাট জাহাঙ্গীর পুত্র খুররমকে সোনা দিয়ে ওজন করাচ্ছেন ...	১৫৯
9.5	ঐ গরুড়াবলোকে	১০৭	11.2	হিন্দু স্থাপত্যে ইমারতের লিঙ্গভেদ, রেখ-পীড় মিথুনের ঘটাহুতি ...	১৬৪
9.6	ঐ সেকশানাল এলিভেশান ...	১০৮	11.3	আগ্রা-কিল্লার অলিন্দ থেকে তাজ	১৬৬
9.7	আগ্রা-কিল্লা, ভূমি-নক্‌শা ...	১০৯	11.4	লাল-কিল্লার ভূমি-নক্‌শা, বর্তমান অবস্থা ...	১৬৭
9.8	আকবরী দিল্লী-গেট, আগ্রা-কিল্লা	১১১	11.5	ঐ , ঐ , শাহ্‌জাহানী জমানায় ...	১৬৮
9.9	শাহ্‌জাহানী দিল্লী-গেট, লাল-কিল্লা ...	১১২	11.6	ঐ , ঐ , গরুড়াবলোকে ...	১৬৯
9.10	জাহাঙ্গীরী-মহল, আগ্রা-কিল্লা ...	১১৩	11.7	ঐ প্ল্যানিং-এ ব্যবহারিক বিন্যাস ...	১৭০
9.11	ফতেপুর-সিক্রি, সামূহিক ভূমি-নক্‌শা ...	১১৬	11.8	দেওয়ান-ই-খাশ্‌, লাল-কিল্লা ...	১৭১
9.12	ঐ প্রধান দর্শনীয় অংশের ঐ ...	১১৭	11.9	তাজমহলের বাস্তু-নক্‌শায় পঞ্চবৃত্তিক জ্যামিতির মৌলসূত্র ...	১৮৩
9.13	ঐ রাজপ্রাসাদের ভূমি-নক্‌শা ...	১১৮	11.10	তাজমহলের বাস্তু-নক্‌শা ...	১৮৩
9.14	খাম্বাহল (?) অথবা দৌলতখানা (?) ...	১২০	11.11	চন্ডীসেবা পঞ্চরত্ন দেউল, যবম্বীপ ...	১৮৩
9.15	খাম্বাহলের কেন্দ্রীয় স্তম্ভ ...	১২০	11.12	গম্বুজের ক্রমবিরতন	১৮৫
9.16	পাচিমহল বা বাদগীর, ফতেপুর-সিক্রি	১২৪	11.13	মিনার/মিনারিকার ক্রমবিরতন ...	১৮৭
9.17	সুনহারা মকান, ফতেপুর-সিক্রি	১২৫	11.14	তাজে trompe l'oeil পদ্ধতি ...	১৮৯
9.18	বীরকল প্রাসাদ, বাস্তু-নক্‌শা ও এলিভেশান	১২৭	11.15	তাজমহলের এলিভেশান ...	১৯০
9.18A	ঐ দৃষ্টান্তের বাস্তু-নক্‌শা	১২৭	11.16	পরিপ্রেক্ষিতে তাজমহল, দৃষ্টান্ত 5.97 মি	১৯১
9.18B	ঐ পরিপ্রেক্ষিতে সম্মুখদৃশ্য	১২৭	11.17	ঐ , দৃষ্টান্ত প্রবেশ তোরণের দৃষ্টান্ত	১৯২
9.19	জাম-ই-মস্‌জিদে হিন্দু-শৈলীতে কর্কশ	১৩১			
9.20	ঐ ভারবহনের ব্যবস্থাপনা	১৩২			

চিত্র-সংখ্যা	বিষয়	পৃষ্ঠা	চিত্র-সংখ্যা	বিষয়	পৃষ্ঠা
11.18	"আকাশজোড়া ইবানের আহবান", মোকাম-কুর্সি থেকে তাজ-ইবান	১৯৪	11.21	পরিদৃশ্যমান তাজের ভূমি-নকশা	১৯৯
11.19	তাজমহলের সন্দোখ-কক্ষ	১৯৫	11.22	তাজের মৌলিক ভূমি-নকশা	২০১
11.20	তাজ-সিলিঙে বর্ণিকাভাঙ্গা	১৯৭	11.23	ঈশা আফান্দর (?) ধ্যানে তাজমহলের সামগ্রিক ছন্দ	২০২



॥ অপ্রচলিত আরবী-ফার্সী-উর্দু শব্দ ॥

[বাঙলাভাষায় সচরাচর অপ্রচলিত কিছু আরবী-ফার্সী ও উর্দু শব্দ
এ-গ্রন্থে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তার তালিকা]

আব্-ওরা-আজদাদ্	পিতৃপুরুষ, পূর্বসূরী
আক'দ্ রুতব	কুস ভল্ট, সমকোণে-অবস্থিত খিলান-সমন্বিত আলিঙ্গ
অজ'ই-মুখাররার ...	মুখ্য তথ্য-অধিকারিক
আলা-ই-মুহ'লিখ ...	মারাত্মক অস্ত্র
ইফ'তারী ...	রোজা ভাঙার পর এক পাত্রে আহার
ইব'তিজাল ...	নীচ চক্রান্তপ্রসূত
ইবান ...	(উচ্চারণ iwan, ইওয়ান) মস্জিদে খিলান-সমন্বিত একটি অঙ্গ
কিব'লা ...	মিহ্রাবে অঙ্কিত মক্কার দিক-চিহ্ন
কুসি' ...	Plinth, ভিত বা পোতা
কুজর ...	Battlement, প্যারাপেট
খান্কা ...	মুসল্লীম দরবেশের সাধনস্থল বা আশ্রম
খিরান ...	বিশ্বাসঘাতকতা, ন্যস্ত দায়িত্বের অবহেলা করা অর্থে
খিলা ...	উপহার, বিবাহের সাজসজ্জা
চমন্ ...	ফুলের বাগান
জাস'সী ...	গদ্য-তর
জাহান ...	জগত (জাহান-আরা=জাহানারা=জগতের আলো)
জিল'ল'লা ...	প্রতিচ্ছায়া
জিয়াদা ...	মস্জিদ-সংলগ্ন আলিঙ্গ
তবীর-ই-হাজিক ...	বিচক্ষণ চিকিৎসক
তওয়া ...	অনুশোচনা
তালির-ইম'লী ...	জ্ঞানপিপাসু
দিদাবর ...	সমজদার, Connoisseur
দীন্ ...	ধর্ম
নহর-ই-বিহিস্ত ...	স্বর্গীয় স্রোতস্বিনী
নারিস ...	নারিসাস্ ফুল
মক'বারা ...	সমাধিসৌধ
মখ'সুর ...	মারাত্মকভাবে আহত
মিম'বার ...	মস্জিদে প্রার্থনাস্থলে রক্ষিত উচ্চবেদী, যেখান থেকে ইমাম খুদ'বা পাঠ করেন ও নামাজ পরিচালনা করেন।
মিহ'রাব্	মস্জিদ-ইবানে কুল'ঙ্গী-আকারে নির্মিত একটি আবশ্যিক অঙ্গ।
মু'বারকী	আশীর্বাদ, স্নেহের দান
মো' ...	মৃত্যু
মোহা ...	সকল
যাকিল ...	অসুর্ষস্পশ্যা কুমারী, virgin
যাখী ...	বিদ্রোহী, বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন
যাহার ...	কসন্তকাম
বে-ন'রী ...	অনিন্দ্য-সৌন্দর্য
শীরীন ...	পাক
সন্দোষ ...	শূন্যগর্ভ কবর-প্রতিম স্থাপত্য-অঙ্গ, cenotaph
সারা ...	প্রধান, প্রেক্ষ
হক'হাকিক	ন্যায় বিচার
হসীসীগ'ন	গদ্য-তথ্যক, যা-থেকে assassin শব্দের উৎপত্তি
হিজরে ...	বিরহ

ইন্দো-ইসলামী স্বাঘ্র

অজ্ঞতা দেখা বা দেখানোর তুলনায় দিল্লী-আগ্রা ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্য থেকে রস আহরণ করা কঠিন-তর। প্রথমতঃ অজ্ঞতার চিত্রসম্ভার দ্বি-মাত্রিক, স্থাপত্য-ভাস্কর্য দ্বি-মাত্রিক। প্রাচীর চিত্রের আপেক্ষিক দর্শকের অবস্থানের প্রশ্নটা অবান্তর ; অথচ স্থাপত্য-ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে সেটি সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দ্বি-মাত্রিক শিল্পসম্পদ ঘুরে-ফিরে দেখার। দর্শকের অবস্থানের উপর তার আবেদন নির্ভরশীল। দক্ষিণ তোরণদ্বারের ফোকরের ভিতর দিয়ে দেখা তাজমহল, আগ্রা-কিল্লার ঝরোকার মস্কিকোষের ছিদ্রপথে দেখা মমতাজমহল, বিমানগবাক্ষ থেকে নিচু-দিকে মূখ্য-করে-দেখা তাজ, আর ঐ মর্মর সৌধের কুর্সির উপর দাঁড়িয়ে উর্ধ্ব-মুখে-দেখা তাজমহলের আবেদনে আশ্মান-জমিন ফারাক। দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে স্থাপত্যের রসোপলব্ধি সম্পৃক্ত।

সঙ্গীত, কবিতা, নাটক, চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের মৌল উদ্দেশ্য একটাই—শিল্পস্রষ্টার অন্তরে সঞ্জাত একটি অনির্বচনীয় ‘আনন্দ’ চিন্ময় অথবা মৃন্ময় রূপে পরিবেশন করে শিল্পসমরদ্বারের মর্মমূলে অনুরূপ আনন্দের অনুরণন সৃজন। সেই ‘আনন্দ’-কেই ইংরাজিতে বলে ‘ইস্টেটিক ডিলাইট’। এই আনন্দ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য—যদিও ক্ষেত্রবিশেষে তা ইন্দ্রিয়া-তীত ভূমানন্দের দিশারী, যা উপলব্ধি করে প্রকৃত অধিকারী ‘ন বিভোতি কদাচন, ন বিভোতি কুতশ্চন’। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, উপরের ঐ তালিকায় আমরা শ্রবণেন্দ্রিয় থেকে নয়নেন্দ্রিয়ের দিকে বৃদ্ধিচ্ছি। মার্গ-সঙ্গীত শব্দমাত্র সূক্ষ্মবন্দ্য ধ্বনিবিন্যাস, কবিতা অর্থবহ শব্দসমষ্টি, নাটক ধ্বনিময় দর্শনযোগ্য শিল্প। শেষোক্ত তিনটি ধ্বনিহীন, শব্দমাত্র দৃষ্টিগ্রাহ্য। তবু প্রতিটি ক্ষেত্রেই দর্শনেন্দ্রিয়ের একটি আবশ্যিক ভূমিকা আছে, কোথাও সেটা প্রকট বাস্তব দুনিয়ায় ; কোথাও

প্রচ্ছন্ন—মনশ্চক্ষে। কবি যখন বলেন, ‘হে রুদ্র বৈশাখ, ধূলার ধূসর রুদ্ধ উষ্ঠান পিঙ্গল জটাজাল/তপঃক্লিষ্ট তপ্ত তনু—’ তখন যদি ঝরতাপদম্ব গৈরিককসনা বীরভূমের খোয়াই-এর রূপ—যা দেখে কবির অন্তর স্পন্দিত হয়েছিল—সেই রূপটি কাব্যপাঠরতের মনশ্চক্ষে ফুটে না ওঠে তবে তা সার্থক নয় ; তেমনি মার্গ-সঙ্গীতের ‘সারেগামা’র ছন্দ-বিন্যাস যদি মল্লারে শ্বেদ-মন্দিরিত গান্ধীর্ষ্য, বসন্ত-বাহারে হিন্দোলের নয়নগ্রাহ্য চিত্রটি ফুটিয়ে না তোলে তবে তাও অসার্থক। সঙ্গীত বা কাব্যের ঐ চিন্ময়রূপ যখন চিত্র-ভাস্কর্য-স্থাপত্যের মৃন্ময়রূপে মূর্ত হয়, তখন রসাম্বাদন অনেকটা সহজ হয়ে পড়ে। আপামর জনসাধারণ শেষোক্ত শিল্পচর্য থেকে অপেক্ষাকৃত অনায়াসে আনন্দরস আহরণে সক্ষম।

তবু ললিতকলার প্রতিটি ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়কে শিক্ষিত করে তোলার প্রয়োজন অনস্বীকার্য, না হলে পূর্ণ-রসাম্বাদন অসম্ভব। উপরের ঐ তালিকায়—সঙ্গীত-কবিতা-নাটক-চিত্রকলা-ভাস্কর্য-স্থাপত্যের ক্ষেত্রে সেই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাটো ‘বেশি-থেকে-কম’ এবং ‘কম-থেকে-বেশি’র বিন্যাসে সজ্জিত। এখানে অবশ্য তথ্য-কথিত ‘আধুনিক কবিতা’ অথবা ‘আধুনিক চিত্রকলা’র প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে বলা হচ্ছে। রসাম্বাদনের প্রয়োজনে ঐ ব্যাকরণ সম্বন্ধে জ্ঞান মার্গসঙ্গীত ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি, কবিতা ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম, নাটক ও চিত্রকলার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা তপ। অক্ষর-পরিচয়হীন নিতান্ত গ্রাম্য যানবাহনের পক্ষেও নাটক এবং চিত্রকলার ক্ষেত্রে আনন্দভাভ সম্ভব। মার্গসঙ্গীত ও রূপদী স্থাপত্যের ক্ষেত্রে ‘পূর্ণ’ রসাম্বাদন তখনই সম্ভব যখন ঐ ব্যাকরণটি আয়ত্তাধীন।

তা ‘পূর্ণ’ রসাম্বাদন নাই হ’ল সেটা বিশেষজ্ঞের

জানাই না-হয় মূলতুবী থাক, চোখ-কান কিছুটা তৈরী হলেই আমরা কিন্তু তা-থেকে বেশ কিছুটা আনন্দ আহরণ করতে পারি। মার্গসঙ্গীতের আসরে উপস্থিত সব প্রোতাই কিছু সারেগামা রপ্ত করে আসে না, কিন্তু তারা সেজন্য আসর ছেড়ে উঠেও যায় না, দিকি সমের মাথায় মাথা ঝাঁকায়। ভৈরো আর দরবারী কান্নাড়ার ফারাকটা হয়তো তারা ধরতে পারে না, কিন্তু অনুভূতির নিরিখে বলে দিতে পারে—প্রথমটা ভোর-কোয়ার গাইবার উপযুক্ত, দ্বিতীয়টা মধ্যরাত্রে। স্থাপত্যের ক্ষেত্রেই বা সেটা না হবে কেন? হয়! একটু ধীরে দিলেই আপনি-আমি সে ধরতাইটা ধরতে পারি। তারপর চোখ ক্রমশঃ তৈরী হবে। আর্কিটেকচারের ক্রাস না করেও আমরা বুঝে নিতে পারব, হুবহু অনুকরণের চেষ্টা সত্ত্বেও ঔরঙ্গজীবের তৈরী বিবি-কাম্বুজা তাজমহলের ধারে-কাছেও যেতে পারেনি; সমুদ্রজঙ্ঘের সুবৃহৎ সমাধিসৌধ হুমায়ূন-মক্‌বরার তুলনায় প্রহসনমাত্র। ‘কেন’ তা হয় তো এখনই বুঝিয়ে বলতে পারছি না, তবে এটুকু বলতে পারি : ছন্দপতন বেছেছে কেনে, ভাল বেছেছে গানে।

সঙ্গীত, কবিতা, নাটকের প্রসঙ্গ থাক, শুধুমাত্র ললিতকলার নয়নগ্রাহ্য অপর তিনটি বিভাগের মধ্যেই তুলনামূলক আলোচনাটা সীমিত করা যাক, অর্থাৎ চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য।

আগেই বলেছি, চিত্রকলা দ্বি-মাত্রিক, তাতে আছে শব্দ, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ; ভাস্কর্য-স্থাপত্য ত্রি-মাত্রিক, তাতে ‘কোণ বা গভীরতা’ যুক্ত হয়েছে। চিত্র শব্দ সামনের দিক থেকে দেখতে হয়, ভাস্কর্য-স্থাপত্য ঘুরে-ফিরে। ভাস্কর্য ঐ প্রকার তালিকার আছে মধ্যবর্তী স্থানে, সংক্রমণের অবস্থানে—যাকে বলে ‘ট্রানজিশন ফেজ’-এ। তাই তা দু’জাতের। কখনও দ্বি-মাত্রিক, কখনও বা ত্রি-মাত্রিক। প্রায় দ্বি-মাত্রিক হলে তাকে বালি-‘কাস-রিলিফ’ বা অর্ধাংকীর্ণ ভাস্কর্য। ক্যারাকপূরের ক্ষম্বীঘাটে মহাশয়জীর মূর্তিসৌধের চরণমূলে উৎকীর্ণ খ্রিস্টদুর্গ পালের ‘কাস-রিলিফ’ একটি সুন্দর উদাহরণ। রূপান্তরের পথের ধাপে—ত্রি-মাত্রিক হবার পথে আর একপল অগ্রসর হলে পাই অন্য একজাতের মূর্তি, বা তিন দিক থেকে দেখার উপযুক্ত। সচী-কুম্বেশ্বর-শঙ্করাচার্য-কোনকেশ্বর প্রায় যাবতীয় মূর্তি এই পর্যায়ের। তা মন্দিরমাত্র, তোরণমাত্র, অথবা কুম্ভাঙ্গনে অবস্থিত। সম্পূর্ণ ত্রি-মাত্রিক—ইংরাজিতে যাকে বলে ‘ফ্রি-স্ট্যান্ডিং’, তা পরিচয় করে ঘুরে-ফিরে দেখতে হয়। শহর কলকাতায় একজাতের মূর্তির সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণটি দেখতে পাবেন ভিক্টোরিয়া

মেমোরিয়ালের প্রাঙ্গণে, ভাস্কর J. H. Foley-কৃত আউটরামের অশ্বারূঢ় মূর্তিটিতে। পটনা শহরে দেবীপ্রসাদের গড়া সপ্ত শহীদের রূপায়ণে।

প্রসঙ্গত বালি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রায় দ্বি-মাত্রিক বা তিন দিক থেকে দেখার উপযুক্ত মূর্তি ফ্রি-স্ট্যান্ডিং রূপে উপস্থাপিত করায় রসভাস ঘটে, দেখতে পাই। যেমন ধরা যেতে পারে, কার্জন পার্কে সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত লোকমাতা রানী রাসমণির উপবিষ্ট মূর্তিটি। পিছন থেকে এ মূর্তি দেখার উপযুক্ত নয়, কিন্তু উপস্থাপনের চর্চাটিতে এই রসভাস ঘটেছে। যারা এ ধরনের মূর্তির স্থান নির্বাচন করেন তাঁদের যথেষ্ট শিল্পবোধ থাকলে এ-জাতীয় মূর্তি এমনভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায় যাতে দর্শকের পক্ষে পীড়াদায়ক অনুভূতিটা এড়ানো সম্ভব। যেমন ধরুন, মিকেলাঞ্জেলোর ‘পীতা’—সেটি রোমের সেন্ট পিতর গীর্জায় এমনভাবে রাখা আছে যে, দর্শক তার পিছন দিকে যেতে পারে না। আরও একটি সহজলভ্য উদাহরণ কলেজ-স্কোয়ারে বিদ্যাসাগর মশায়ের উপবিষ্ট অবস্থায় মূর্তিটি। জলে না নামলে স্বল্পলোকই তার পিছন দিকটা দেখতে পায়।

স্থাপত্য কিন্তু আবশ্যিকভাবে দ্বি-মাত্রিক। তা চারিদিক থেকেই দেখতে হয়। ফলে এর গঠন-চাতুর্য একটু অন্য প্রকারের। শিল্পীকে খেয়াল রাখতে হয়, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তা কেমন দেখাবে।

চিত্র-ভাস্কর্যের মতো স্থাপত্যেরও দু-দুটি মূল আবেদন : সূক্ষ্ম কারিগরী ও সামগ্রিক প্রতিবেদন। ইংরাজিতে যাকে বলতে পারি—‘ডিটেইল্‌স্’ এবং ‘ওভর-অল্‌ এফেক্ট’। চিত্রের ক্ষেত্রে কোথাও ‘ডিটেইল্‌স্’ বা সূক্ষ্ম কারিগরী প্রাধান্য পায়; যেমন মিনিয়চার পেণ্টিং, কিম্বা হীরাকাঁদ দাগার-এর অধিকাংশ জল-রঙের কাজে। কোথাও বা সামগ্রিক আবেদনটাই বড় কথা। ক্ষেত্র-বিশেষে এই দুই গুণ যখন মিতালী পাতায়, তখন তা হয় সোনায়ে সোহাগা। যেমন, অজন্তা সপ্তদশ বিহারে সারিপদন্তের পরীক্ষা অথবা সিংহল-অবদান, কিম্বা মিকেলাঞ্জেলোর ‘মিস্তিন-চ্যাপেল’ ম্যুরাল, অথবা হাটের কাছে এই কলকাতা শহরেই বি. বা. দী-বগে শিপিং কর্পোরেশন বিল্ডিংস্-এর একতলায় শ্রীশরীদন্দু সেনরায়ের আঁকা প্রকাণ্ড জলরঙের ম্যুরালে। স্থাপত্যের ক্ষেত্রেও তাই—কোথাও সূক্ষ্ম কারিগরীর প্রাধান্য, যেমন সোলিম চিস্তির কবর, ইংগদ-উদ্-দৌলার সমাধিমন্দির। কোথাও বা সামগ্রিক আবেদনটাই মূল্য, যথা দিল্লীতে হুমায়ূনের সমাধি, অথবা সাসারমে শেরশাহর। কোটিকে গুটিক হয়

সোনায়ে সোহাগা—এই দুই গুণের অপূর্ব সামঞ্জস্য—
নিঃসন্দেহে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ : আগ্রার তাজ-
মহল।

স্থাপত্যের ক্ষেত্রে ঐ দ্বিতীয় গুণটি কিন্তু আব-
শ্যিক। সামগ্রিক আবেদনটাই মূল্য। বিভিন্ন অঙ্গ-
প্রত্যঙ্গের মাপজোখ এবং পারস্পরিক সম্পর্ক—কলা-
শিল্পের ভাষায় যাকে বলে ‘রূপভেদ’ ও ‘প্রমাণ’ তা
নিখুঁত হওয়া চাই। সুক্ষ্ম কারিগরী একেবারে না
থাকলেও তা সার্থক স্থাপত্য নিদর্শন হতে পারে।
আকারে যে সুবৃহৎ হতেই হবে এমন কোনো সর্ত
নেই। যেমন, দিল্লীতে গিয়াসউদ্দীন তুগলকের
সমাধি। সেটি আকারে ছোট, অলঙ্করণ বর্জিত—
কিন্তু সার্থক স্থাপত্যকীর্তি। অথচ কম্পোজিশনে
ত্রুটি থাকলে, ইমারতের বিস্তার ও উচ্চতা, তার বিভিন্ন
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—গম্বুজ, মিনারিকা, ছত্রী, গুলদস্তা,
খিলান, কুর্সি প্রভৃতির বিন্যাস নিখুঁত না হলে,
ভারসাম্যচ্যুত হলে, তা কোনোক্রমেই সার্থক স্থাপত্য-
নিদর্শন হতে পারে না। এই প্রসঙ্গে মজতবা আলী-
সাহেব লিখেছেন, “এই সামঞ্জস্য যখন সর্বাঙ্গসুন্দর
হয়, তখনই স্থাপত্য সার্থক। এবং স্থাপত্যের এই
অনিন্দ্য সামঞ্জস্য যদি কাব্যে কিম্বা উপন্যাসে পাওয়া
যায়, তবে বলা হয়, কাব্যখানিতে ‘আরকিটেক্টনিকাল’
মহিমা আছে—মহাভারতে আছে, ফাউস্টে আছে এবং
উয়োর অ্যান্ড পীসে আছে ; জ্যাক্স ক্রিস্তফ্ উত্তম উপ-
ন্যাস কিন্তু এ গুণটি সেখানে অনুপস্থিত। লিরিক বা
গীতিকাব্যে যদিও কম্পোজিশন থাকে—তা সে যতই
কম হ’ক না কেন—তাতে আরকিটেক্টনিকাল বৈশিষ্ট্য
থাকে না। ‘আধেক ঘুমে নয়ন চুমে’ গানটি সার্থক
এবং এই নীতির প্রকৃষ্টতম উদাহরণ।”

আলিসাহেব ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এটুকু ইঙ্গিত দিয়েই
ক্ষান্ত হয়েছেন ; আমাদের সেটা আর একটু গভীরভাবে
বুঝে নিতে হবে।

উল্লিখিত গানে কবি একাধিক চিত্রকল্পের সাহায্যে
তার অন্তরের ভাবটি প্রকাশ করেছেন—সেখানে অর্ধ-
নিমগ্নার নয়নে যে স্বপ্ন জাগে তার অনেকগুলি চিত্র-
কল্পের কথা বলা হয়েছে। বনের ছায়া সেখানে কবির
মনের সাথী, পথের ধারে আসন পেতে সেখানে পিছন
ফিরে তাকিয়ে দেখার কোনো বাসনা কবির নেই, তবু
চৈত্রদিনের তপ্ত বেলায় সুন্দর স্মরণপটে স্মৃতির
ঘরীচিকা জাগে, মধুক শাখায় কপোত-কুঞ্জে কবির
নীরব ভাষনা বিজন বেদনায় ভাসতে থাকে। এ
‘কম্পোজিশন’ দানা বেঁধে ওঠেনি—‘নিশ্বাস’ ঘেঁষের
মতো ভেসে ভেসে চলে গেছে, পরংকালীন ‘কিউমিউ-

লাসে’র মতো স্তবকে স্তবকে, স্তূপে স্তূপে সঞ্চিত
হয়ে আরকিটেক্টনিকাল মহিমায় দৃঢ়তা পাননি।

ঐ যে সামঞ্জস্য-বিধানের কথা বলা হল, স্থাপত্যের
ক্ষেত্রে, তার একটি প্রধান গুণ : সরলতা এবং সংযম।
এ-কথা অবশ্য আধুনিক-বিশেষণ-বর্জিত কাব্য ও চিত্র-
শিল্পের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। আড়ম্বর বেশি
হলে, জটিল হলে, কিম্বা অলঙ্কারের আধিক্য হলে,
আমাদের চোখ পীড়িত হয়। ইলভুৎমিসের সমাধি-
সৌধের অভ্যন্তরে—আমরা পরে দেখব—অলঙ্কারের
আধিক্য কিছুটা রসভাস ঘটিয়েছে ; সেটা শিল্পীরা
নিজেরাই অনুভব করেছিলেন, কারণ পর-
বর্তীকালের ইমারতে অলঙ্করণের এই আধিক্য
পুনরায় সংঘটিত হয়নি। এই সরলতা গুণটিকে বিচার
করতে হবে দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, নির্মাণকারীর
দৃষ্টিভঙ্গিতে নয়। জিনিসটা একটু ব্যাখ্যা করা যেতে
পারে : দর্শকের কাছে হুমায়ূন-মকবারার প্ল্যানিং
জটিলতর, কিন্তু বাস্তবে স্থপতিবিদের কাছে তাজ-
মহলের প্ল্যানিং জটিলতর। অথচ প্ল্যান বা ভূমি-
নকশায় তাজমহলের মূলে আছে মাত্র পাঁচটি বস্তু—
কেন্দ্রস্থলে একটি এবং ঈশান-নৈঋত-অগ্নি-বায়ু কোণে
চারটি ; অপরপক্ষে হুমায়ূনের সমাধিতে ভূমি-নকশা
বানাতে নকশা-নিষ্পেক্ষ কাজ শুরুর করতে হয়েছে
নয়টি বস্তু থেকে। তাহলে তাজমহল কি-করে জটিল-
তর হয় ? জবাব : তাজমহলের ঐ পাঁচটি বস্তু থেকে
যে খোঁচ-খাঁজ বার করা হয়েছে তার জ্যামিতিক হিসাব
আরও জটিল। পরবর্তী একটি অধ্যায়ে বিষয়টা বোঝা-
বার চেষ্টা করব। অবশ্য সেটা ঠিকমতো প্রাধান্য
করবার একটিই পথ—ঐ নকশায় সাহায্যে জ্যামিতির
‘ইন্সট্রুমেন্ট বক্স’ নিয়ে তাজমহল ও হুমায়ূন-মকবারার
প্ল্যানদুটি আঁকার চেষ্টা করা। তবুটা বুঝে নেবার আর
কোনও সহজ ‘রয়্যাল রোড’ নেই !

সে মাই হোক, পূর্বে যে বলা হয়েছে—‘অজন্তার
চিত্র শ্বি-মাত্রিক, দিল্লী-আগ্রার স্থাপত্য দ্বি-মাত্রিক’,
সেখানে ‘মাত্রা’ শব্দটিকে আরও ব্যাপক অর্থে নেওয়া
যায়। যেন, অজন্তার চিত্রসম্ভারকে শ্বি-মাত্রিক একনাই
বলিনি যে, তাতে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থই শব্দ আছে, কে
নেই ; সেগুলি শ্বি-মাত্রিক একনাই যে, আমাদের প্রশ্ন
মাত্র দুটি মাত্রার সীমিত : প্রাচীরচিত্রের বিষয়বস্তু কী,
এবং সেটা কতটা উৎকর্ষে। অজন্তার ক্ষেত্রে শিল্প-
দর্শনের আবশ্যিক তৃতীয়মাত্রার প্রশ্নটা : ‘কে গড়ে-
ছেন’ শিল্পীসত্তার পরিচয়, অনুপস্থিত। সহস্রাব্দ-
কালের চিত্রপ্রশ্নের বেদীসম্মুখে অজন্তা চিরনির্বাক,
বিরাত নিরুত্তর ; ঐ অবিদ্য প্রশ্নটির একটিই জবাব :

কোনো অজ্ঞাত বৌদ্ধ প্রমাণ।

অপরপক্ষে দিল্লী-আত্ম-ফটো-পদ-সিক্রিতে, অর্থাৎ যে ক্ষুদ্র ভূখণ্ড দীর্ঘ অর্ধ-সহস্রক ভারতবর্ষের রাজ-ধানী হিসাবে ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যকে জন্ম দিয়ে লালন-পালন করেছে, সেখানে প্রতিটি শিল্পসম্পদকে তোল করতে হবে 'কে গড়েছেন' এই প্রশ্নটির বাট-খারার। কুব্ব-মিনার থেকে সফরজন্তের সমাধিসৌধ, প্রতিটি স্থাপত্য-নিদর্শনে তদানীন্তন দিল্লীশ্বরের কাঙ্ক্ষিত চরিত্রটুকুই শব্দ নয়, সমকালীন ভারতবাসীর হাসি-অশ্রু-স্বপ্ন-রঙ মিশে আছে। কান পাতলে শুনতে পাবেন সেই দেওয়ান-ই-আমের সম্মুখস্থ নক্করখানা থেকে উচ্চকণ্ঠ ঘোষকের : 'হোশিয়ার !' ইমান-ইনসাফের মালিক আত্ম-তালার জিল্জদ্দার আবির্ভাবের ঘোষণা ; তখ-ই-সুলেমান-আসান দীন দানিয়ার মালিক শাহ-এন-শাহর দৃপ্তকণ্ঠে উচ্চারিত ফরমান ; জাম-ই-মসজিদে মিনার-চড়ায় মগরিরের আইন-ওস্তে নামাজের দিগন্ত-অনুসারী আজান-ধ্বনি ; শিশু-মহালের আক'-ব্রতবে প্রতিধ্বনিত ইরানী-ইম্পাহানী অনিন্দ্য-নর্তকীর নুপুর-নিকপ অথবা সন্দোখ্ জিয়া দায় হশীশীরূপের হিস্-হিসানি।

দুর্ভাগ্য আমাদের, এ-ক্ষেত্রেও অজ্ঞতার অনবদ্য অব্যুত প্রাচীরচিত্রের মতো শিল্পীদল আছেন নেপথ্যে। কুব্ব-মিনারের 'ফাউন্ডেশন-ডিজাইন' কে করেছিলেন, তাজমহলের মূল পরিকল্পনাকার কোন হতভাগ্য অথবা বুলন্দ-দরওয়াজার আদি নিরামক কোন মূর্তিবিদ তা আমরা জানি না। তাদের মজুরিটি মিটিয়ে দিয়েই ইতিহাস বলেছে : তামাম্ শব্দ !

কী জানি, হয়তো সভাই কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয়নি তখন ! কী লাভ হত জানলে তাজমহলের মূল পরি-কল্পনাকারের পিতৃদত্ত নাম মহম্মদ ইশা আফান্দি কিনা। তাঁর জীবন বেভাবে কেটেছে, আজ আর তার পরিবর্তন তো কিছুতেই করতে পারব না। বরং তিনি 'তাজমহল-পরিকল্পনাকার' 'এ্যানন্' হিসাবে শাস্বত-কাল বিশ্ববন্দিত হয়ে থাকুন। 'হারিন' চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় : Doctors' fees are heavy, lawyers' fees are high/Artists are just supposed to entertain and die-এস ঐতিহ্যের ব্যতিক্রম এ'রা হবেন কেমন করে—ঐ কুব্ব-বুলন্দ-দরওয়াজা অথবা তাজ-মহলের পরিকল্পনাকার ?

ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্য : কাকে বলি ? সহজ উত্তর-ভারত ভূখণ্ডে সহস্রাব্দিকাল ধরে যে বৌদ্ধ-জৈন-ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের স্থাপত্য-শৈলী নির্মিত

হাচ্ছিল মুসলমানদের আগমনে তা অতি দ্রুত কয়েকটি বৈশ্ববিক পরিবর্তনে নবরূপ পরিগ্রহ করে। স্থানীয় স্থাপত্য-ঐতিহ্যে নবাগতদের চিন্তাভাবনা সংযুক্ত হয়ে এই যে নব রূপায়ণ, তাকেই বলি ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্য। সে যেন অর্থনারীশ্বর মূর্তি !

ইতিপূর্বে এদেশে ছিল মতুপ-ভোরণ-মতম্ব সমন্বিত দেবতাদের উপাসনাগৃহ, মন্দির, কিছুর বিহার, প্রাসাদ বা দুর্গ। সাধারণ, এমন কি অর্থবানদের গৃহও এমন মালমশলায় তৈরী হত যে, তার অস্তিত্ব অজ্ঞ খুঁজে পাওয়া ভার। এই পরিমন্ডলে আবির্ভূত হল আগন্তুকদের চিন্তাধারা, যার বিকাশ দেখা দিল শিধারায়। প্রথমতঃ মসজিদ, দ্বিতীয়তঃ মক্কারা এবং তৃতীয়তঃ, রাজসিক প্রয়োজনে—ইমারৎ, কিল্লা, মিনার, দরওয়াজা প্রভৃতি।

"সেযুগে হিন্দুর জীবনে শেষ কথা ছিল ভক্তি। সূর্যমুখী ফুলের মতো তার সমস্ত কর্ম, চিন্তা, ধ্যান, ধারণা, সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে ভগবানের নামে উর্ধ্ব-মুখীন। ঐহিক সম্পর্কে তারা যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়নি। যখন কা তব কান্তা, কস্মেত পুত্র, তখন প্রেম দিয়ে আর হবে কী ? মায়াময়মিদম্ অখিলং বিশ্বম্। কাজেই পিতাকে হতে হয়েছে পরমং তপঃ, স্বামীকে হতে হয়েছে পতিদেবতা, স্ত্রীকে হতে হয়েছে সহ-ধর্মিণী। নারী যে সহমতা হয়েছে তার কতটা প্রেমের আকর্ষণে আর কতটা পুণ্যলোভবশে তা বলা শক্ত। স্বয়ম্বরা যারা হয়েছেন, তাঁরা প্রেমে পড়ে নয়। সংযুক্ত পৃথবীরাজের গলায় মালা দিয়েছিলেন তাঁর খ্যাতি ও বৈভবের জন্য, যেমন একালের তরুণীরা অ'ংটি পরিয়ে দেন আই. সি. এস.-এর অঙ্গুলিতে।

"মুসলমানেরাই আনল ভিন্ন জীবনাদর্শ। বৈরাগ্য-সাধনে মূক্তি যে তাদের নয়। তারা পরকালকে খোড়াই পরোয়া করল ; ইহকালকে করল সর্বস্ব। তারা জীবনকে করল ভোগ, কাঁদলো, কাঁদলো এবং ভালো-বাসলো। তারা নারীর জন্য করল লুণ্ঠন, প্রেমের জন্য করল অপহরণ এবং প্রিয়জনের জন্য হনন্ ও বহু অপকর্ম সাধন। বলা বাহুল্য, এর সবগুলি সমর্থন-যোগ্য নয়। কিন্তু প্রেম কি কারও সমর্থনের অপেক্ষা রাখে ? যেনে চলে নীতির অনুশাসন ? অহল্যা করেছে সমাজের বা শাস্ত্রের সমর্থনের অপেক্ষা ? মহাভারতের অজ্ঞান করেছে ? বৃন্দাবনের কান্দু করেছে ? করেছে রিজিয়া বেগম, মেরী ওয়ালেস্কা বা দেডী হ্যামিলটন ?

"মুসলমানেরা প্রিয়তম-প্রিয়তমার স্মৃতিকে করতে চেয়েছে কালজয়ী। রাখতে চেয়েছে স্মারকচিহ্ন। তাই

সৌধ গড়েছে পিতার, পতির, পত্নীর, এমন কি উপ-পত্নীর সমাধিতে। হিন্দুরা উপস্বী, তারা দিয়েছে বেদ ও উপনিষদ। মুসলমানেরা শিল্পী, তারা দিয়েছে তাজ ও রঙমহাল। হিন্দুরা সাধক, তারা দিয়েছে দর্শন। মুসলমানেরা গদ্যী, তারা দিয়েছে সংগীত। হিন্দুর গর্ব মেধার, মুসলমানের গৌরব হৃদয়ের। এই দুই নিয়েই ছিল ভারতবর্ষের অতীত ; এই দুই নিয়েই হবে তার ভবিষ্যৎ।”

ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যের মূলে প্রবেশ করতে হলে বাষাবরের এই বহুপাঠিত বিশ্লেষণটি বিচার করে দেখা যেতে পারে। বাষাবরের রচনামূলকী অসাধারণ, বেধকারি আভাও ‘দৃষ্টিপাতের’ সমতুল্য ভাষা-মাধুর্য অন্য কোনো রম্যরচনার সৃষ্টি হয়নি। এমন কি বিমান দূর্ঘটনার ‘অকালমৃত্যু’ না হওয়া সত্ত্বেও স্বয়ং ‘বাষাবর’ তার ‘দৃষ্টিপাতকে’ অতিক্রম করতে পারেন নি। কিন্তু ইন্দো-ইসলামী সংস্কৃতির বিষয়ে এই বহুল-উদ্ধৃত অনুচ্ছেদটি থেকে আমাদের যে বস্তুমূল ধারণা হয়েছে সেটা থেকে সংস্করমুক্ত হওয়ার প্রয়োজন।

প্রথম অনুচ্ছেদটি পড়ে মনে হয় প্রাক-মুসলমান যুগে হিন্দু নর ও নারীর মধ্যে পারস্পরিক প্রেম ছিল না, তাদের সমস্ত ক্রিয়াকর্ম ছিল ভগবানের নামে উৎসর্গীকৃত। ঐ অনুচ্ছেদেই তা অস্বীকার করে বলা হয়েছে সংযুক্ত থেকে একালের তরুণীরা বিবাহ করেছে খ্যাতি ও বৈভবের মোহে। খ্যাতি ও বৈভবের দিকে নিবন্ধদৃষ্টি লজ্জাকুলকে সূর্যমুখী ফুলের মতো ঈশ্বরমুখীন বলা চলে না। আবার এই পুণ্যলোভ বশবর্তী অথবা খ্যাতি-বৈভবের আকর্ষণে পড়া হিন্দু নরনারীর প্রসঙ্গে পরবর্তী অনুচ্ছেদে বলা হল, অহল্যা সমাজ ও শাস্ত্রকে অস্বীকার করে অবৈধ প্রেমে পড়েছে। ‘প্রেম দিয়ে আর কী হবে’ বাদের চিন্তাধারা তাদের ভিতর থেকেই লেখক বেছে নিয়েছেন অজ্ঞানকে, বৃন্দাবনের কানকে। শব্দের ব্যঙ্গারে, রচনামূলকী মাধুর্যে আমরা সাময়িকভাবে খেয়াল করতে ভুলে যাই—লেখকের ‘র্যানডম্ সিলেকশন’—অহল্যা, রিজিয়া আর মেরী ওয়ালেস্কা তিনটি বিভিন্ন ধর্মকে প্রতি-নির্ধিত করছে! এদের নাম একই নিঃস্বাসে উচ্চারণের একটিই অর্থ—প্রেম কোন দেশে, কোনো যুগে সমাজ ও ধর্মের অনুশাসন মেনে চলেনি। আর সেটাই সত্য।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হল, ‘মুসলমানেরা পরলোককে খোড়াই পরোয়া করল’। আর সেটাই তাদের জীবনাদর্শ। ইসলামী স্থাপত্য কিন্তু সে-কথা বলে

না। যুগে যুগে তবু-তবুই উঠে বসবার সুযোগ পেরেই মুসলমান সুলতান/জাহাঙ্গীর/মহারাজ দল সর্বপ্রথমে বা গড়েছে তা পত্নী বা উপপত্নীর স্মৃতিসৌধ নর, আবাশিকভাবে—জাম-ই-মসজিদ। আর বাষাবরের ঐ তুলনামূলক আলোচনার সবচেয়ে বড় যে কথাটা উপেক্ষিত তা হচ্ছে ঐ : জাম-ই! (জনজয় জন)

হিন্দুধর্মে—অস্বীকার করে লাভ নেই, সাক্ষর স্থান অনেক নিচে। বর্ণাশ্রম ধর্মের যে ব্যাখ্যাই করুন, অচ্ছদ্দের ‘হরিজন’ নামে ভূষিত করে অথবা দরিদ্র নারায়ণের সেবা-র জিগির তুলে ঐ সাক্ষর অভ্যন্তর বৌদ্ধিকতা দিয়ে আভ্যন্তর ধ্যান-ধারণার মেনে নেওয়া কঠিন। ইসলামের মূল বক্তব্য সম্বন্ধীয় মতো সাক্ষ। তাদের একসাথে নামাজ, এক পাতে ইচ্ছারী, এমন কি মৃত্যুর পরেও এক কাতে শরনের ব্যবস্থা। স্থাপত্যের নিরিখে মন্দির ও মসজিদ-এর স্যারি-এ এটাই হল মৌল প্রভেদ। সে প্রসঙ্গে এখনই আসব। কিন্তু তার আগে বলে যাই—বাষাবরের এই শেষ পংক্তির বিষয়েও আমি একমত নই : ‘হিন্দুর গর্ব মেধার, মুসলমানের গৌরব হৃদয়ের’।

মধ্যযুগে আরবে, তুর্কিস্থানে, সিরিয়ার এক বিশেষ করে বৃহত্তর পারস্যে দর্শন, গণিত, জ্যোতিষ, শারীরবিজ্ঞান, রসায়ন প্রভৃতির যে মৌলিক চর্চা হয়েছে, তাতে তাদের মেধার অভাব ছিল বলে মনে হয় না। অপরপক্ষে ভারতবর্ষের ইতিহাসে দীর্ঘস্থায়ী সুলতানী ও মুল্লু জমানার সিংহাসনের লোভে কেষ্ট কাণ্ড ঘটেছে—যা ইতিপূর্বে দেখিনি মোর্ষ, গুপ্ত, চালুকা রাজবংশের ইতিহাসে, তাতে ‘মুসলমানের গৌরব হৃদয়ের’ এ-কথার্টাই বা মেনে নিতে পারছি কই? আত্মকেন্দ্রিক চিন্তাধারায় যেখানে পিতৃহত্যা-ভ্রাতৃহত্যা—অতি প্রিয়জনকে অন্ধ করে দেওয়া নৈমিত্তিক ঘটনা সেখানে ‘হৃদয়’ নিয়ে গর্ব করার অবকাশ অল্প।

বাষাবরের মূল বক্তব্যটা অবশ্য নিশ্চয় মেনে নেব—হিন্দু-ভারত ইহলোকে স্মৃতিচিহ্ন রেখে যাকর কোনো চেষ্টাই করেনি। মরদেহ ভস্মীভূত হয়ে সবার পর স্মৃতিসৌধ গড়ে ডোলার কথা তাঁদের কম্পনাতেই আসত না। মোর্ষসম্রাটদের আমল থেকে গুপ্তযুগ অতিক্রম করে পৃথ্বীরাজ চৌহান পর্যন্ত কোনো হিন্দু রাজ্য নির্মাণ করাননি নিজের, প্রিয়জনের বা প্রিয়জনের জন্য কোনো পাষাণ স্মৃতিসৌধ। রাজগুহ পুণ্ডলমায় দল গড়েননি পিতার স্মৃতিতে কোনো ইতম-উত-দৌল, অথবা কিংড স্বামীর স্মরণে কোনো হৃদয়-কা-মক্কা। মন্দির তাঁরা গড়েছেন—কিন্তু তার নামের সঙ্গে নিজ নামটুকু পর্যন্ত যোগ করেননি।

আহিওল, কাদামী, ডুবনেশ্বর, খাজুরাহোর অসংখ্য মন্দিরের নাম শুনে বোঝা যাবে না কোন মন্দিরটি কোন নৃপতির অধীনস্থকল্যে নির্মিত। বৌদ্ধরা গড়েছেন চৈত-বিহার, সঙ্ঘারাম : শঙ্করাচার্য স্থাপন করেছেন মঠ নৈবাড়িক উদাসীনভ.য়. সমস্তই জগৎ হিতায়। এমন কি নতুন গ্রন্থ লিখে, দর্শনের নতুন সূত্র আবিষ্কার করে তা মূনি-ঋষিদের নামে চালাতে চেয়েছেন, স্বনামে নয়।

হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন উপাসনাগৃহ একান্তভাবে আত্ম-কেন্দ্রিক। তার গর্ভগৃহ অম্বকারাচ্ছন্ন, রহস্যঘন—প্রকৃত অধিকারীর জন্য অপারিসর ‘অন্তরালের’ আরো-জন। আপামর ভক্তসাধারণ সমবেত হয় মূলমন্দিরের সংলগ্ন জগমোহনে, মন্ডপে বা মন্দির-চাতালে। ইসলামে ধর্মচরণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়, গণ-মানসের। তাই মসজিদ পরিকল্পনার ছন্দটা অন্য জাতের :

মসজিদ স্থাপত্য তিন দিক থেকে দেখার। অনেকটা পূর্বে উল্লিখিত কলেজ স্কোরারের বিদ্যা-সাক্ষরের মূর্তির মতো। ভারতবর্ষে মসজিদ আবশ্যিক-ভাবে পূর্বমুখী। তার হেতু নামাজ পড়তে হয় মক্কার দিকে মুখ করে, পশ্চিমদিকে ফিরে। এজন্য মসজিদের পশ্চিমদিকের দেওয়ালে ঠিক মধ্যস্থলে থাকে কুন্দুগির মতো একটি খিলান—ইসলামী ঐতিহ্যে তার নাম ‘মিহরাব’ ; তার পাশেই, সচরাচর উত্তরে, থাকে ইমামের আসন : ‘মিন্বর’। মিহরাবের গায়ে একটি চিহ্ন থাকে—মক্কার দিক নির্দেশ করে, তাকে বলে—‘কিব্লা’। মসজিদের বৃন্দাবনিক পরিকল্পনা মক্কাস্থিত উপাসনাগৃহ ‘কাবা’-র অনুসরণে। পশ্চিমদিকস্থ মূল উপাসনা-গৃহ বা ‘ইবান’-এর সামনে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, যার ফার্সি প্রতিশব্দ ‘শেহান্’ বা থেকে আমাদের বাঙলায় ‘শহরের মেঝে’ কথাটা এসেছে। শেহানের কেন্দ্রস্থলে একটি চৌকি, হস্তপদাদি প্রসঙ্গনের, অর্থাৎ অজ্ঞুর প্রয়োজনে। প্রাঙ্গণের বাকি তিন দিকে স্তম্ভশোভিত অলিন্দ বা মিল্লান। পূর্বপ্রান্তে মূল প্রবেশদ্বার। উত্তরে এবং দক্ষিণে দ্বার থাকতে পারে, আবার নাও পারে : থাকলে একটি হবে অপরিষ্কৃত দর্পণ-প্রতিবিম্ব : স্থাপত্যের পরিভাষায় যাকে বলে, একটি অপরিষ্কৃত ‘জলব’। মসজিদে প্রায় আবশ্যিক অঙ্গ হিসাবে থাকে অজান দেওয়ার উপযুক্ত সূউচ্চ কোন স্থাপত্য-অঙ্গ। ইমারৎ সংলগ্ন হলে তাকে বলে মিনারট বা মিনারিকা, বিচ্ছিন্ন হলে : মিনার।

ইসলামী স্থাপত্যের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য : মক্কারা বা সমাধিসৌধ। একাত্তর পরিকল্পনা যামানরই করেছে প্রাক-মুসলিম অরতে ছিল না। মসজিদের

প্ল্যানিং-এ স্থপতিবিদকে নানান রকম বিধিনিষেধ মোেন চলতে হয়, মক্কারার প্ল্যান ছকার সময় তার স্বাচ্ছন্দ্য অপেক্ষাকৃতভাবে বেশি। মক্কারা কেন দিকে মুখ করবে, বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্র, অষ্টভুজ কী আকারের হবে তা নির্ধারণ করেন স্থপতিবিদ। তাতে গম্বুজ, মিনারিকা, গুলদস্তা, ছতী থাকবে কি থাকবে না তার কোনো শাস্ত্যসম্মত বিধিনিষেধ নেই। নিয়মের বাধাবাধি শব্দ এইটুকু :

মৃতদেহ থাকবে মাটির গভীরে। সেটিকে বলব : কবর। প্লিন্থের আনুভূমিকে, অথবা আরও উচ্চত্রে বানাতে হবে ‘সন্দোখ্’। সেটি দেখতে ঠিক কবরের মতো ; কিন্তু বাস্তবে শূন্যগর্ভ। তার অবস্থান ঠিক কবরের উপরে। ‘সন্দোখ্’-এর ইংরাজী প্রতিশব্দ হিসাবে ‘সেনোটোফ’ কথাটা চলতে পারে। রেড-রোডের উত্তর প্রান্তে কলকাতা গয়দানে যে ‘সেনোটোফ’টা আছে, আমরা জানি, তার নিচে প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধে হত সৈনিকদের মৃতদেহ কবরস্থ নেই। ‘সেনোটোফ’ বা ‘সন্দোখ্’-এর বাঙলা প্রতিশব্দ আমার জানা নেই। এ-গ্রন্থে আমরা ‘সন্দোখ্’ শব্দটাই তাই ব্যবহার করব। মক্কারায় আর একটি শাস্ত্রীয় নির্দেশ আছে—মৃতদেহ কাফিনে চিৎ হয়ে শোবে না, থাকবে পাশ ফিরে। আর কাফিনটা কবরে এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে অন্তিম শয়ানে শায়িত দেহটা পশ্চিমদিকে ফিরে থাকে। সচরাচর মৃতদেহের মাথা থাকে উত্তর-দিকে এবং সে শোয় ডান পাশ ফিরে। প্ল্যানিং-এর প্রয়োজনে, নির্দিষ্ট ভূমির আকৃতি অনুসারে যদি স্থপতিবিদ মৃতদেহকে দক্ষিণদিকে মাথা করে শোয়াতে বাধ্য হন, তখন পরিকল্পনাকার মৃতদেহকে বাম পাশ ফিরে শুইয়ে দেন।

তৃতীয়তঃ রাজসিক প্রয়োজনে ইসলামের আবি-র্ভাবের পর নির্মিত হল নতুন জাতের ‘সেকুলার’ ইমারৎ—প্রাসাদ, কিল্লা, দরওয়াজা (তোরণ), সরাই (পান্থশালা), মায়খানা (আসবাগার), মিনার, দেওয়ান-ই-আম (প্রকাশ্য দরবার), দেওয়ান-ই-খাশ্ (অপ্রকাশ্য দরবার), হামাম (স্নানাগার), খোয়াব-গাহ্ (শয়নকক্ষ), রুস্তমহল, পিলখানা, আস্তাবল প্রভৃতি।

ইসলাম-ইসলামী স্থাপত্যে কালের ব্যাপ্তি : গজনির মাহমুদের ভারত আক্রমণের পর, কুৎবউদ্দীন আইবকের দাসবংশ প্রতিষ্ঠা থেকে তথাকথিত সিপাহী-নিদ্রোহ-তক্ষ্ প্রায় ছয় সাড়ে-ছয় শত বৎসর এই শৈলীর জীবনকাল। তার পূর্বেও সিন্ধু অঞ্চলে ইসলামী স্থাপত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়, এবং ইংরেজ আমলেও

ইয়তো কিছু কিছু নির্মিত হয়েছে, কিন্তু ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যের জন্ম ও বিকাশের সময় হিসাবে এই অর্ধসহস্রাব্দিকেই মোটামুটিভাবে চিহ্নিত করা যায়। এ-গ্রন্থে আমরা শুধু ভারতের রাজধানীতে ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যের বিবর্তনটুকু পর্যালোচনা করছি, তার বাহিরে বিভিন্ন আঞ্চলিক স্থাপত্য নিজস্ব গৌরবে মণ্ডিত হয়ে রূপায়িত হয়েছে—পঞ্জাব, বঙ্গদেশ, গুজরাট, জৌনপুর, মালোয়া, গুলবর্গা, বিজাপুর, বিদর, গেলকুন্ড, খান্দেশ, কাস্মীর প্রভৃতি স্থানে আঞ্চলিক শৈলীর সংমিশ্রণে তা নব নব রূপে বিকশিত হয়েছে—সে-সব কথা আমরা এ-গ্রন্থে আলো-

চনা করছি না ; কারণ আমাদের মূল লক্ষ্য ভারতের রাজধানীর সীমিত চৌহদ্দি—দিল্লী-আগ্রা-সেকেন্দ্রা ও ফতেপুর-সিক্রিতে পরিসীমিত। আমাদের মূল লক্ষ্য : ঐ আঞ্চলিক স্থাপত্যের নিরীখে রাজধানীর ইতিহাস-টুকু বুঝে নেওয়া।

সে যাই হোক, এই অর্ধসহস্রকের ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যকে কালের হিসাবে দুটি মূলভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে—সুলতানী যুগ ও মঙ্গল যুগ—সুলতানী-জমানা ও মঙ্গল-এ-আজম। বিভিন্ন রাজবংশের এবং সম্রাটের শাসনকালের নিরীখে তা আরও স্ফুটনরূপে বিভক্ত করে আলোচনা চলতে পারে :

সুলতানী যুগ 320 বৎসর [1206 — 1526]

১। দাসবংশ	1206 — 1290 = 84 বৎসর
২। খিলজি বংশ	1290 — 1320 = 30 "
৩। তুগলক-বংশ	1320 — 1413 = 93 "
৪। সৈয়দ/লোদী বংশ	1414 — 1526 = 112 "

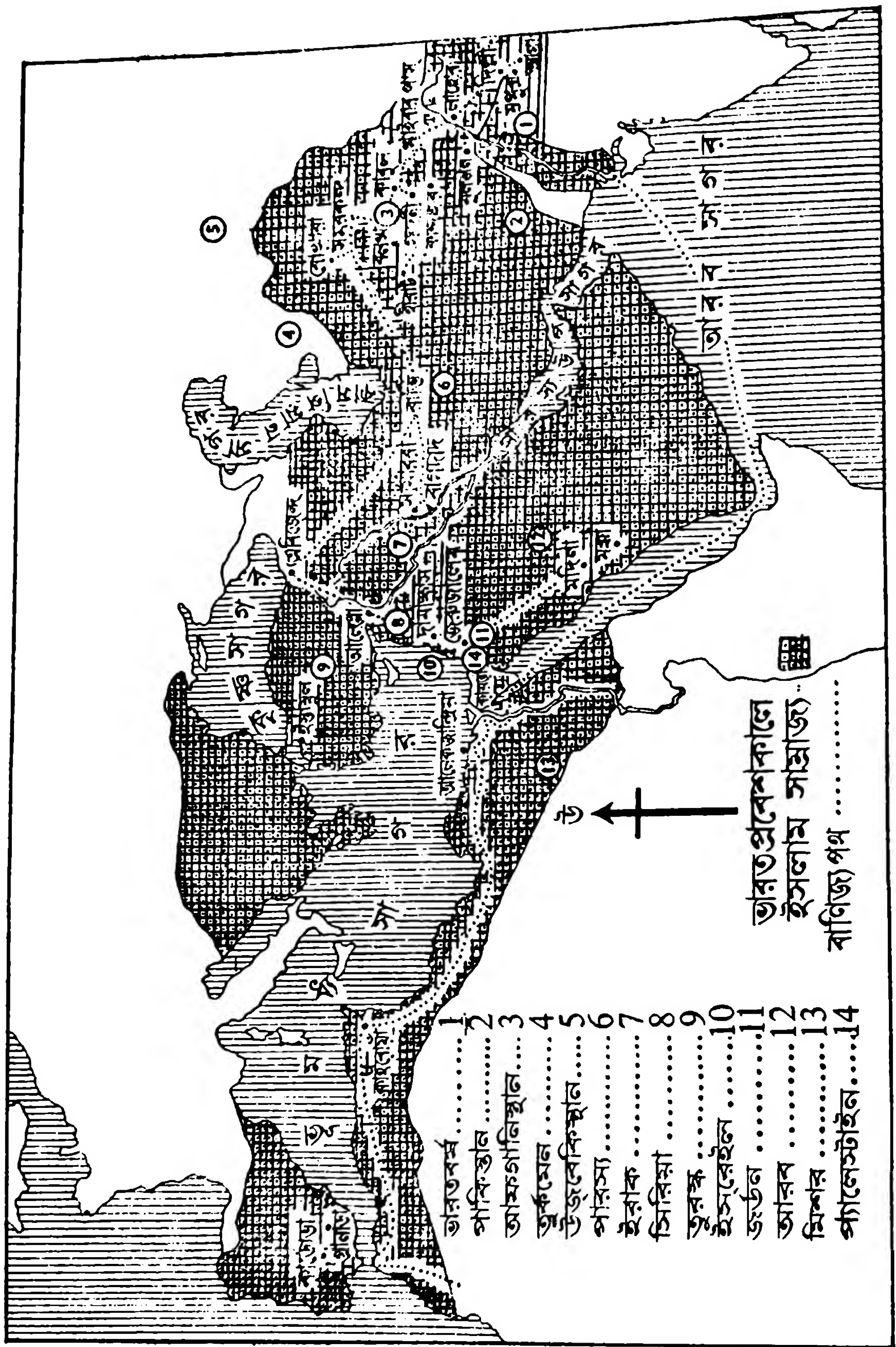
মঙ্গল যুগ 331 বৎসর [1526 — 1857]

১। জাহাঙ্গিরউদ্দীন বাবর	1526 — 1530 = 4 "
২। মহম্মদ হুমায়ুন	1530 — 1539 = 9 "
		পুনরায় — 1554
[শেরশাহ শূর ও অন্যান্য আফগান-পাঠান সুলতান]	1540 — 1556 = 16 "
৩। জালালউদ্দীন আকবর	1556 — 1605 = 49 "
৪। নূরউদ্দীন মহম্মদ জাহাঙ্গীর	1605 — 1627 = 22 "
৫। খুররম শিহারউদ্দীন শাহজাহাঁ	1627 — 1658 = 31 "
৬। মহীউদ্দীন মহম্মদ ঔরঙ্গজেব	1658 — 1707 = 49 "
৭। পরবর্তী মঙ্গলসম্রাটবৃন্দ (37)	1707 — 1857 = 150 "

কিন্তু ঐ তালিকা তো ইতিহাসের কালের বিভাগ। স্থাপত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে বোধহয় শ্রেণীবিন্যাস আর একভাবেও হতে পারত—রাজধানীর অবস্থানসূচক :

স্থান	নাম	প্রতিষ্ঠাতা	স্মারিক (আনুমানিক)
দিল্লী	কুৎব-চমর	.. কুৎবউদ্দীন আইবক	.. 1210 — 1295
ঐ	সিরি	.. আল্লাউদ্দীন খিলজী	.. 1296 — 1319
ঐ	তুগলকাবাদ	.. গিয়াসউদ্দীন তুগলক	.. 1320 — 1325
ঐ	জহানপনাহ	.. মহম্মদ বিন তুগলক	.. 1325 — 1353
ঐ	ফিরোজাবাদ	.. ফিরোজশাহ তুগলক	.. 1354 — 1460
আগ্রা	সিকান্দ্রা	.. সিকান্দার লোদী	.. 1460 — 1530
ঐ	আগ্রা কিল্লা	.. আকবর	.. 1530 — 1569
সিক্রি	ফতেপুর-সিক্রি	.. ঐ	.. 1569 — 1583
দিল্লী, লাহোর, } আগ্রা আকবর, জাহাঙ্গীর, } শাহজাহাঁ	.. 1584 — 1637
দিল্লী	শাহজাহানাবাদ (লালকিল্লা)	.. শাহজাহাঁ ও পরবর্তী মঙ্গল	.. 1638 — 1857

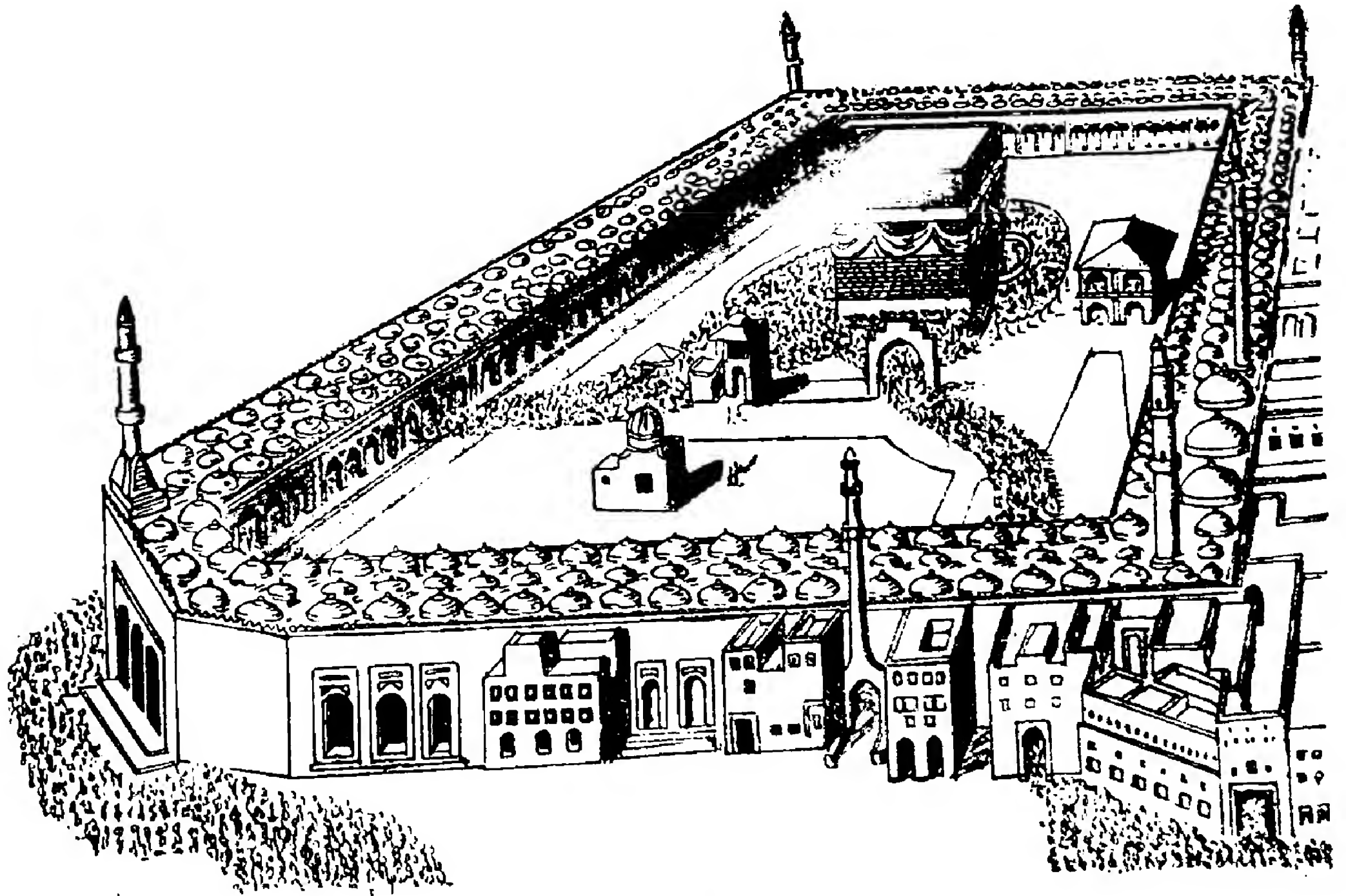
□



চিত্র-2.1 ভারত প্রবেশের পথে ইসলাম-সাম্রাজ্য।

દાદા-ફૂલો શાળ

દાદા-ફૂલો શાળ



ચિત્ર-2.2 મકાનનું કાવા.

ইসলামের জন্মভূমি আরবের ইতিহাস

‘ইন্দো-ইসলামী’ স্থাপত্যের জন্মদহৃত আপাত-দৃষ্টিতে ষোল্লদশ শতাব্দীর প্রথমপাদ। কিন্তু সংখ্যার দীপাকালীর পশ্চাতে সকালবেলাকার সলতে পাকানোর প্রসঙ্গটা একেবারে বাদ দেওয়া চলে না। নবাগতরা যে ভাবধারা নিয়ে এল তার জন্ম ও বিকাশের কথাটা—যার ক্ষেত্র বহির্ভারতে, তার একটা চন্দ্রক-আলোচনা বোধহয় অপরিহার্য। তাই ‘ইন্দো-ইসলামী’ স্বন্দ-সম্মানে হয়তো প্রথমেই কিছুটা পক্ষপাতিত্ব করতে হবে। তার হেতু—স্কুলযুগ থেকেই প্রথমোক্তের সঙ্গে আমরা ক্রমবর্ধিত পরিচিত, তা ধর্মে হিন্দুই হই, অথবা মুসলমানই হই। তার সঙ্গে স্বচক্ষে বা বইয়ের পাতায় দেখা অসংখ্য ছবিতে প্রাক-ইসলামী ভারতীয় স্থাপত্যের সঙ্গে আমরা মোটামুটি পরিচিত ; কিন্তু প্রাক-ভারতীয় ইসলামী স্থাপত্যের বিষয়ে আমরা খুব কমই খবর রাখি। ভারহৃত-বদ্বগয়া-সাঁচী, মথুরা-সারনাথ-নালন্দা, কলিঙ্গ-খাজুরাহো-মহাকলীপুরম আমাদের অপরিচিত নয়, যেমন অজানা জেরুসালেম, বাগদাদ, দামাস্কাস, কাইরোয়া বা কার্দো-ভার স্থাপত্য-কীর্তি। খলিফা মোয়াইয়া, আবদল-মালেক, অথবা অল্-ওয়ালিদদের নাম আমরা শুনিনি, যদিও তাঁদের স্থাপত্য-কীর্তি শেরশাহ, আকবর বা শাহজাহার জুলনায় অর্কিণ্ডকর নয়। অথচ শেষোক্ত নামগুলি শুনলেই মনে পড়ে ছাত্রজীবনে ইতিহাস বইয়ের পৃষ্ঠায় মার্জিনে-লেখা তিনটি ‘V’ এবং একটি ‘I’! তাই জন্মদহৃত থেকে ভারতপ্রবেশের কাল পর্যন্ত ইসলাম কী-ভাবে বাহুবিস্তার করেছে, কী তাদের জীবন-দর্শন, জীবনযাত্রার পদ্ধতি এবং বহির্ভারতে কী-জাতের স্থাপত্য-কীর্তি তারা গড়েছে সেটা সংক্ষেপে জেনে নেওয়া ভালো। শুধুমাত্র সাল-শতাব্দীতে সময়কালটা ঠিকমতো মনে দাগ কাটে না বলে মাঝে মাঝে ট্যাকেট-বন্দনী যোগে ভারতীয় ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য সমকালীন ঘটনার নির্দেশ রেখে যাওয়া গেল।

মানব সভ্যতার আদি যুগের ইতিহাসে ইসলামের জন্মভূমি আরবের কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল না—ছিল তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। পশ্চিমে নীল নদের উপত্যকায়, উত্তর-পূর্বে দাই নদীর অববাহিকায়, উত্তর-পশ্চিমে ভূমধ্য-সাগরের উপকূলে। ইসলাম যখন দিগ্বিজয়ে বার হল তখন তারা সম্মুখীন হল সেই সব সহস্রাব্দীর ঐতিহাসিক সংস্কৃতির : মেসোপটেমিয়া, পারস্য, সিরিয়া, মিশর, জর্ডিয়া, তুর্কিস্থান প্রভৃতির। ইসলাম তাদের জীবনদর্শনে তথা স্থাপত্যে বৈশ্ববিক পরিবর্তন আনল দু-তিন শ’ বছরের ভিতর। সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত ঐসব সমৃদ্ধিশালী অগ্রসর দেশগুলি আরবের ভৌগোলিক অস্তিত্বটা হয়তো জানতো, কিন্তু সে বিষয়ে তারা কোনো কৌতূহল দেখায়নি। ওরা শুধু জানতো—আরব মরুভূমির এখানে-ওখানে মরুদ্যান ঘিরে বাস করে কিছু যাযাবর বেদুইন ; তাদের মধ্যে লড়াই-কাজিয়া লেগেই আছে এবং সে স্বন্দের মূলে নেই কোনো রাজ্যবিস্তারের স্পৃহা অথবা ধর্মপ্রচারের বাসনা—নিতান্ত কোনো মরুদ্যানের পানীয় উৎসের অধিকার, অথবা দাই-বিঘা শস্যশ্যামল ভূখণ্ড। অথচ মাত্র এক শতাব্দীর ভিতরেই সেই যাযাবর বেদুইনের দল পরস্পরের বিভেদ-স্বন্দ ভুলে এককাটা হল—বেরিয়ে পড়ল মরুভূমির সীমান্ত ছেড়ে দিকে-বিদিকে। জয় করে গেল প্রতিটি রাজ্য অপ্রতিহত গতিতে। 732 খ্রীষ্টাব্দে—মাত্র একশ বছরের ভিতরেই তাদের সাম্রাজ্য পশ্চিমে পর্তুগাল ও পূর্বে ভারত সীমান্তে পৌঁছে গেল—রোমান সাম্রাজ্যও কখনো এতটা বিস্তার লাভ করেনি। এই অবিশাস্য সাফল্যের মূলে আছে একটি মাত্র শব্দ : ইসলাম।

ইসলামের জন্ম : আরবের জনৈক বণিক আবদুল্লাহর তনয় মহম্মদের জন্ম 570 খ্রীষ্টাব্দে, মক্কা নগরীতে। মক্কা তখন ছিল ভারত মহাসাগর থেকে ভূমধ্যসাগরের দিকে যাবার পথে একটি প্রখ্যাত

মরুপাশ্ব-নগরী। সেখানে অবস্থিত ছিল বহু প্রাচীন যুগের একটি উপাসনাগৃহ : কাবা। 'কাবা' (Kaaba) শব্দটা এসেছে গ্রীক শব্দ Kubos থেকে ; যার অর্থ 'ঘনক' এবং যা-থেকে জন্ম নিয়েছে ঘনকের ইংরাজী প্রতিশব্দ cube। কুরাণমতে আব্রাহাম-তনয় ইস্মাইল এই কাবাটি তৈরী করিয়েছিলেন ঈশ্বরের মর্ত্যাবাস হিসাবে। সে যাই হোক, কাবা ছিল প্রাক-ইসলামী যুগে আরব বেদুইনদের পবিত্র উপাসনাগৃহ।

মহম্মদের বয়স যখন চম্পিশ তখন থেকে তিনি ধর্মপ্রচার শুরু করেন। নিজেকে তিনি ঈশ্বর অথবা ঈশ্বরের অবতারও বলেননি ; বলেছেন ঈশ্বর তাঁকে দূতরূপে নির্বাচন করেছেন মাত্র। হজরৎ মহম্মদের বক্তব্য : ঈশ্বর এক, তিনি আল্লা ; মানব মাত্রেই কর্তব্য তাঁর শরণ নেওয়া ; অন্যায় অসত্য, পাপাচরণ থেকে বিরত হয়ে আল্লাহর উপাসনা করা। অনতি-কালের ভিতরেই—যীশুর ক্ষেত্রে যেমন হয়েছিল, মহম্মদ মক্কার ধনশালী শাসকবর্গের বিরাগভাজন হয়ে পড়েন। বাধ্য হয়ে মক্কা ত্যাগ করেন তিনি। আবদুবকর এবং ও কয়েকজন অনুচরসহ উত্তরদিকে যাত্রা করেন। সময়টা 622 খ্রীষ্টাব্দ। এইটিই ইসলামী পঞ্জিকার আদিবিন্দু—'হিজরা সাল' [ভারতবর্ষে তখন থানেশ্বরে হর্ষ, গোড়ের শশাঙ্ক রাজ্যশাসন করছেন]। প্রায় পাঁচশ' কিলোমিটার উত্তরে এসে ওরা উপনীত হলেন এক অখ্যাত মরুপাশ্ব নগরীতে : যাত্রিব। ঠিক যে স্থানটিতে তাঁর পথপ্রান্ত উর্টি অস্তিম শয়ানে শুয়ে পড়েছিল সেই স্থানটিতেই মহম্মদ গড়ে তুললেন একটি উপাসনা-আগার। সস্তুর হাত লম্বা, ষাট হাত চওড়া একটি আয়তক্ষেত্রকে ঘিরে ফেলা হল অনূচ্চ প্রাচীর দিয়ে—রোদে-শুকানো কাঁচা-ইটের গাঁথনি, মরুভূমির দূরন্ত বালুঝাঁটকার হাত থেকে আত্মরক্ষার্থে। পাঁচিল-ঘেরা এই চারকোণা জমির দক্ষিণদিকে—যেদিকে মক্কার কাবাকে ছেড়ে আসা হয়েছে—সেদিকে, সবার আগে গড়ে তোলা হল একটি কক্ষ। তাল-খেজুরের গুঁড়িতে খেজুর-পাতায় ছাওয়া একটি কুটির। এটি ইসলাম-স্থাপত্যের আদিমতম ইবান (উচ্চারণ ইওয়ান, iwan)। তার দক্ষিণদিক, অর্থাৎ ইবানের বাহিরের দিক অলঙ্করণ-বর্জিত। ভিতর দিকে তৈরী করা হল বড়-জাতের কুলিঙ্গর মতো একটি খিলান—ইসলামী ঐতিহ্যের প্রথম 'মিহ্রাব'। তার গ'য়ে একটি তাঁর-চিহ্ন—মক্কার দিক-নির্দেশক : প্রথম 'কিব্লা'।

এই পরিকল্পনাই মসজিদ গঠনের মূল ছন্দ। মরুপাশ্বনগরী 'যাত্রিব'-এর বর্তমান নাম 'মদিনা'।

বহির্ভাৱতে ইসলামী স্থাপত্যের বিবর্তন

সেখানে আছে পরগম্বরের মরদেহ, সেই 632 খ্রীষ্টাব্দ থেকে। পূর্ব বৎসর হিউয়েন-ত্সাও ভ্রমতে এসেছেন।।

মদিনার এই আদিমতম মসজিদ পরবর্তী খলিফাদের রাজত্বকালে সম্প্রসারিত ও পুনর্নির্মিত হয়ে সম্পূর্ণ নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে—কিন্তু তার পরি-কল্পনার মৌল বিন্যাস আছে অপরিবর্তিত ; আর পূর্বাঙ্গ থেকে প্রাগজ্যোতিষপূরে সেই মৌল ছন্দটি মেনেই সহস্রাব্দীকাল ধরে লক্ষ লক্ষ মসজিদ নির্মিত হয়েছে, মক্কার কাবার অনুসরণে নয়। মাক্কানে চতুষ্কোণ বাঁধানো চত্বর বা 'শেহান' ; আরতক্ষেত্রের যে-প্রান্ত মক্কার দিকে পড়ছে [ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে পশ্চিমে] সেদিকে 'মিহ্রাব' ; তাতে 'কিবলার' চিহ্ন। মিহ্রাবের পাশে একটি উচ্চবেদী—'মিস্বের', যেখানে দাঁড়িয়ে 'ইমাম' খুৎবা পাঠ করেন। শেহানের বাকি তিন দিকে যাত্রীদের জন্য 'লিয়ান' বা অলিন্দ, কেন্দ্র-স্থলে অজুর্ জলাধার। এ ছাড়া 'আজান'-এর জন্য একটি মিনার বা মিনারিকা।

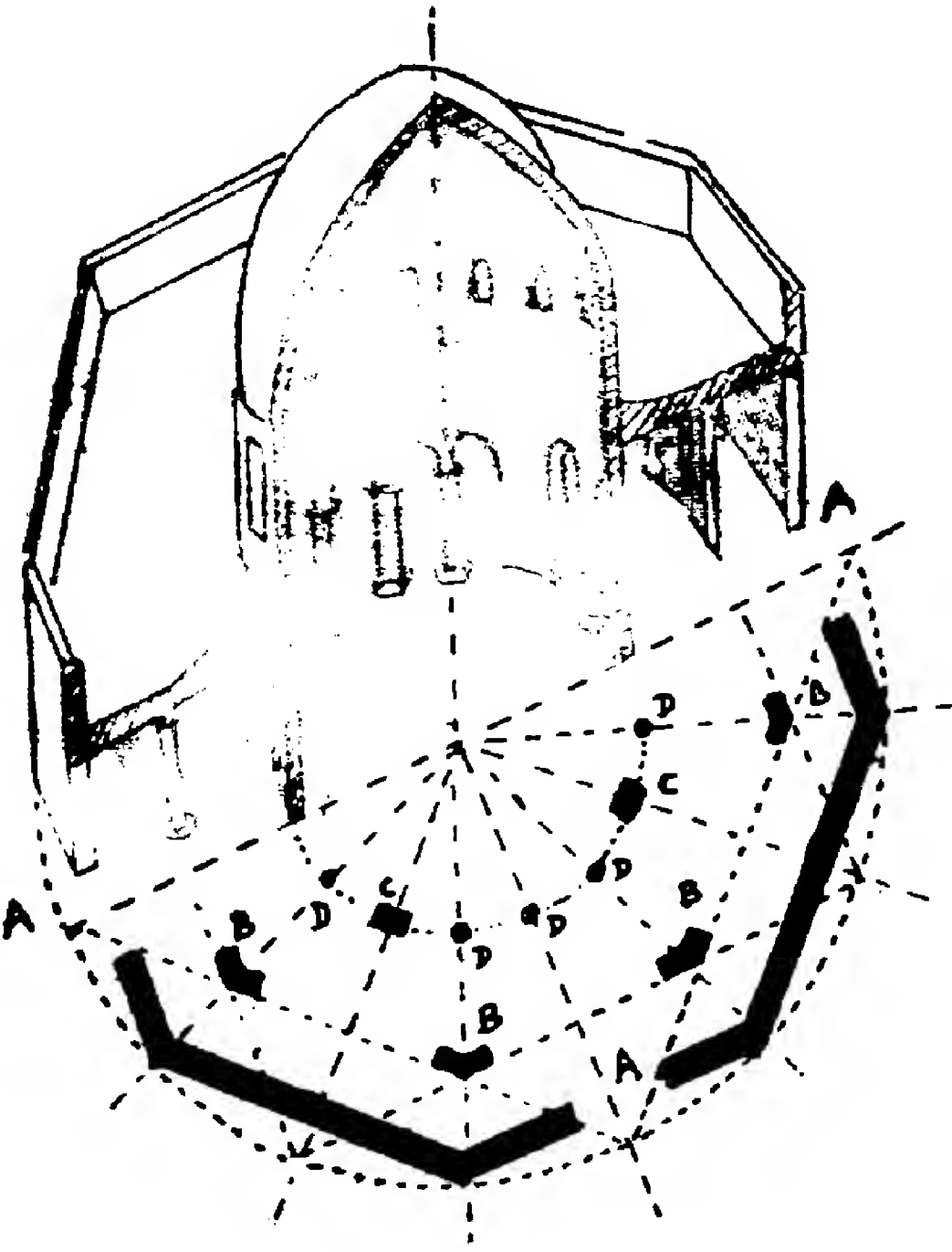
মক্কার 'কাবা' কিন্তু এ ছন্দ মেনে চলেনি। সেখানে মূল আকর্ষণ 'কাবা' আছে প্রাঙ্গণের কেন্দ্রস্থলে। প্রবেশ ভোরণটিও ঠিক মাক্কানে নয়। ইসলাম-ধর্মে মদিনা-মসজিদের চেয়ে মক্কার কাবার স্থান উচ্চ সন্দেহ নেই ; কিন্তু ইসলামী স্থাপত্যে মদিনা-মসজিদেরই গুরুত্ব বেশি। বোধকরি তার হেতু : মদিনাই মুসলীয় ধর্মের প্রথম মসজিদ—কাবার দিকে মুখ ফেরানো, যা স্বয়ং পরগম্বর কর্তৃক নির্মিত। মক্কার কাবা তো তার পূর্বযুগ থেকেই ছিল (চিত্র—2.2)।

আদি-খলিফাদের যুগ : হজরত মহম্মদের দেহান্তে তাঁর চারজন অনুচর ইসলামের নেতৃত্ব দেন। তাঁদের বলা হয়, প্রাচীনপন্থী আদি-খলিফা। তাঁরা হলেন যথাক্রমে, আবু বকর, ওমর, ওসমান ও আলী। চারজনেই বিচক্ষণ ব্রহ্মকুশলী। মহম্মদ তাঁর জীবিত-কালেই (630) মক্কা দখল করেছিলেন। চার-খলিফার যুগে একে একে পদানত হল ইরাক (637), সিরিয়া (640), মিশর (641) এবং পারস্য (650)। চার-খলিফার যুগ শেষ হল 661 খ্রীষ্টাব্দে। ততদিনে ভূমধ্যসাগরের প্রান্তে আফ্রিকায় অবস্থিত টিউনিশিয়া থেকে ভারতসীমান্তে বঙ্গ উপত্যকা পর্যন্ত ইসলাম বিস্তৃত সাম্রাজ্য বিস্তার করে ফেলেছে (চিত্র—2.1)।

পরগম্বরের দেহাবসানের অনতিকাল পরেই তাঁর বাণীগর্ভি আরবী ভাষায় সংকলন করা হয়। দীর্ঘ বিশ বছর ধরে পরগম্বরের মাধ্যমে প্রেরিত ঈশ্বরের

নানান নির্দেশ-ফরজ-তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমানের আমলে সংকলিত হয়েছিল সেইটিই ইসলামের পবিত্র কুরাণ-গ্রন্থ। আরবী ভাষায় কুরাণ অর্থ : আবৃত্তি।

অতীত সময়ে ইসলামের এই অভূতপূর্ব রাজ্য বিস্তারের মূলে-আমর মনে হয়েছে-আছে তিনটি ছেতু। প্রথম কথা : ধর্মের সারল্য। ধর্মের মূলনীতি মরুপাশ্চাত্যের সারল বেদুইনদের বুদ্ধিসীমাকে অতিক্রম করেনি। ইসলাম বলতে চেয়েছে : ঈশ্বর এক।



চিত্র-2.3 ওমরের মসজিদ (ডোম অব দ্য রক) [জেরুসালেম]।

তিনি সন্ন্যাসী ; এবং নূর মহম্মদ তাঁরই প্রেরিত পুরুষ। সহজ সরল কথা। প্রপদতী সোপানদের হাজার দেব-দেবী এবং তাদের হারেক রকম আচার-উপচারের জটিলতা নেই ; বাইবেলটাইন খ্রীষ্টানদের মতো ধর্মবিষয়ে সুক্কর কচকচ নেই। দ্বিতীয় কথা : দ্রাব্যের বনি-বদ। ইসলাম বলতে চেয়েছে-ঈশ্বরের দৃষ্টিতে প্রতিটি মুসলমান সমান প্রিয়। শ্রেণী, ভাষা, অর্থ-নৈতিক বা সামাজিক পদবর্ণাদির কোনো ক্ষরক নেই। অচ্ছত নেই, হারিজান নেই, ইমান-সোদার দল যে আশ্রয় নেকনজরে আছেন এমন ইঙ্গিত নেই। এই দ্রাব্য ও সাম্য সামাজিক বাহিনীর জীবনযাত্রার সাঙ্গ সেন এক-

সূরে বাধা। তৃতীয় কথা : ইসলাম বলল-স্বর্গজাভের সবচেয়ে সহজ পথ ইসলাম-ধর্মের প্রচারের জন্য যুদ্ধ-ক্ষেত্রে প্রাণ দেওয়া। ফলে পাশ্চাত্য রাজন্যবর্গের বেতনভুক সেনাদলের পক্ষে এই ধর্মীয় বাহিনীকে প্রতিহত করা সম্ভবপর হল না। যে বাহিনীর প্রতিটি সৈনিক 'সুইসাইড স্কায়াডে' নাম লেখাতে চায় তা অজেয় না হলেও দুর্জয়।

নূতন নূতন দেশের সাধারণ মানুষ এই ক্রম-অগ্রসর বাহিনীকে উদ্ধারকারী বলে ধরে নিল। যে রাজ্যের ঐতিহ্য যত প্রাচীন সে রাজ্যের মানুষ ততবেশি নিপীড়িত। শাসক ও শোষিতের সম্পর্কটা ততই দীর্ঘ, ততই তিক্ত। ইসলাম তাই দেশ, কাল, ভাষা, জাতির গন্ডি অতিক্রম করে দুই-তিন শতকের ভিতরেই সর্বাঙ্গীর্ণ ভূখণ্ডে আপন আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হল।

ওমায়্যদ যুগ : পরবর্তী রাজবংশ ওমায়্যদ। তাঁরা 661 থেকে 750 খ্রীষ্টাব্দ, প্রায় নব্বই বছর ইসলাম জগতের নেতৃত্ব দেন। ধীরে, অতি ধীরে ইসলামী সমাজের মধ্যে কিন্তু বিবর্তন ধারার কাজ শুরু হয়েছে। বংশের দ্বিতীয় খলিফা আবদল মালিক (685-705)-এর জীবন ঠিক হজরত মহম্মদ বা তাঁর অনূচর-চতুষ্টয়ের জীবনের সঙ্গে ঐক্যবান রচনা করে না। সময়ের ব্যবধান অল্প-কিন্তু বোধ-করি যথেষ্ট! লেলিন থেকে বেজনেভে সংক্রামণের যে সময়ের ব্যবধান সেটুকুই। আবদল মালিক জেরু-সালেমে অনেকগুলি মোকাম বানালেন। প্রাসাদ, প্রমোদ-ভবন, শিকার-ভবন, ইত্যাদি। এবং মরিয়্যা পর্বতচূড়ায় 'কুববেৎএস-সক্কারাহ' মসজিদ-ইংরাজীতে 'ডোম অব দ্য রক'।

খলিফা আবদল মালিক লক্ষ্য করলেন, সিরিয়া বিজয়ের অর্ধশতাব্দী অতিক্রম করার পরেও স্থানীয় মুসলমানেরা বছর বছর মক্কা ও মদিনায় দৌড়ায় তীর্থ করতে। দেশ-বিদেশের মানুষের মূলে আকর্ষণ রাজধানী নয়, ঐ মক্কা ও মদিনা। ফলে মক্কা ও মদিনার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে-'টুরিস্ট' সব যুগেই, সব দেশেই লক্ষ্য। ফলে আরবের সঙ্গে টেকা দিতে হলে রাজধানীতে একটা ভালো জাতের ধর্মীয় আকর্ষণ চাই। কিন্তু তাঁর রাজধানী দামাস্কাসের কোনও ঐসসার্মিক ঐতিহ্য নেই। খলিফা দূনিয়ার মালিক, কিন্তু 'দীন'-এর দাস। শরিয়তী নির্দেশ মেনে না চলে মসজিদ-নির্মাণ হবে পণ্ডপ্রম। তাই বুদ্ধিমান খলিফা রাজধানীর পরিবর্তে নয়া-মসজিদটি বানাতে

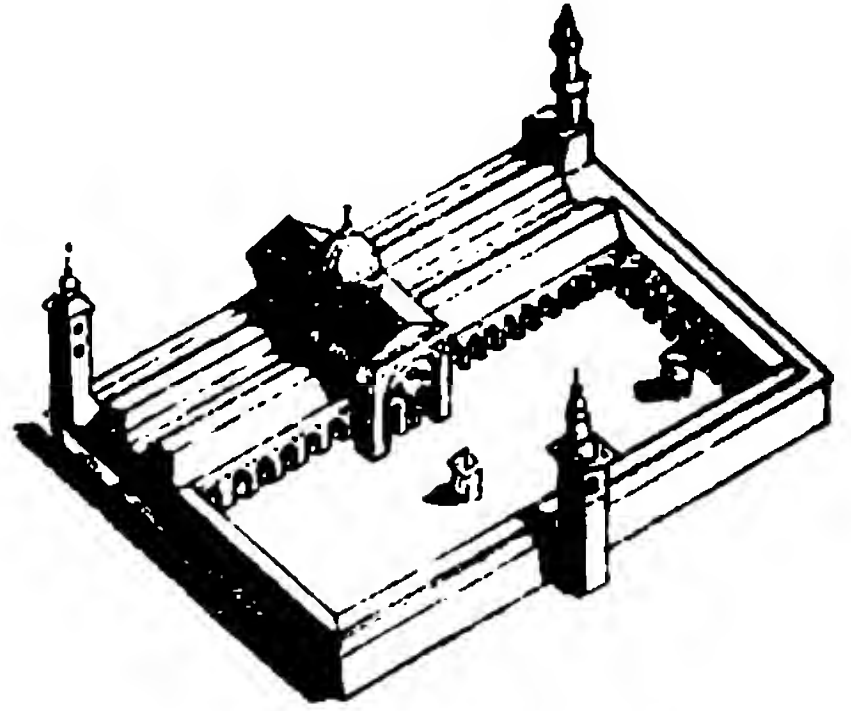
চাইলেন সামান্য কিছু দক্ষিণে : 'জেরুসালেম'-এ। এ উপাসনাগার যুগে যুগে এভাবে সংস্কৃত হয়েছে যে, আদিম অবস্থায় এর কী রূপ ছিল তা অনুমান-নির্ভর। এটিকে কিন্তু আমাদের একটু খুঁটিয়ে দেখতে হবে, কারণ দিল্লীর সুলতানেরা এই স্থাপত্য-কীর্তি থেকে অনেকগুলি অনুপ্রেরণা আমদানী করেছেন এদেশে। কুৎবউদ্দীন আইবকের তৈরী আদিম-তম কুওওতুল মসজিদের 'মাখসুদরাহ্' এই মসজিদের অনুসরণে। এ-ছাড়া সৈয়দ-লোদী যুগ থেকে শের-শাহ্ পার হয়ে আকবর-জমানা পর্যন্ত এই মসজিদের আটকোণা প্ল্যানিং অনুসৃত হয়েছে।

স্থান-নির্বাচন নিখুঁত। জেরুসালেম যেন তিন-মাথার মোড়। পশ্চিমে কায়রো ও আলেকজেন্দ্রিয়া, দক্ষিণ-পূর্বে মক্কা-মদিনা, এবং অল্প উত্তরে ইসলাম জগতের তদানীন্তন রাজধানী দামাস্কাস। জেরুসালেমের ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। মরিয়্য পর্বত চূড়ার ঐ বিশেষ স্থানটি নানাকারণে মুসলীম তীর্থ। ওল্ড-টেম্পলেমেন্ট মতে সলোমন (951 খ্রীষ্টপূর্ব) এখানেই তাঁর বিখ্যাত উপাসনাগারটি নির্মাণ করেছিলেন, যা দেখে যীশু বলেন, 'এ মন্দিরের একখানা পাথরও থাকবে না।' বাস্তবে বিধর্মীদের আক্রমণে প্রথম শতাব্দীতে সলোমনের মন্দির বিধ্বস্ত হয়েছিল। তাছাড়া কিংবদন্তী বলে, এই মরিয়্য পর্বতচূড়া থেকেই হজরৎ মহম্মদ তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সশরীরে সপ্তমসর্গে আরোহণ করেছিলেন। নিঃসন্দেহে স্থান-নির্বাচন সুযুক্তিপূর্ণ।

মূল ইমারতটি আটকোণা (চিত্র-2.3)। তার তিন দিকে তিনটি প্রবেশদ্বার (A); কিব্লার দিকে রুদ্ধ প্রাচীর। ইমারতের ভিতর বাহিঃস্থ অষ্টভুজের আটটি কোণার বিপরীতে আটটি স্তম্ভ (B)। তার ভিতরে আর একটি বৃত্তের বরাবরে চার কোণায় চারটি প্রায়স্তম্ভ (Pier—C চিহ্নিত) এবং তার ফাঁকে ফাঁকে তিনটি করে স্তম্ভ (D)। গোলাকারে সাজানো এই C ও D-চিহ্নিত স্তম্ভের উপর দেওয়াল গেথে গম্বুজটি বসানো। বর্তমানে গম্বুজ একটা নয়, দুটো—যাকে বলে 'ডাবল-ডোম' : তার মাঝখানে ফাঁক, যাতে মেরু-মতির প্রয়োজনে মানুষ ঢুকতে পারে। আরও লক্ষণীয়, বাহিরের প্রাচীরের সঙ্গে গম্বুজকে যুক্ত করে যে ছাদ তার ঢাল বাহিরের দিকে।

আবদুল মালিকের পরবর্তী খলিফা অল-ওয়ালিদ (705-715) আর এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। জেরুসালেম নয়, দামাস্কাসেই একটি মসজিদ বানাতে হবে। মসজিদ নির্মাণ পূণ্যকাজ : তা-ছাড়া রাজ-

ধানীতে একটি উপযুক্ত জাম-ই-মসজিদ না থাকলে চলে? গড়ে উঠল বিখ্যাত দামাস্কাসের মসজিদ (চিত্র-2.4)। তার মাপ 156 মিটার x 100 মিটার। ঐতিহাসিক ফিশোল' বলেছেন, তৈমুরজানের সৈন্যদল এ মসজিদে আগুন ধরায়। তাতে সেটি প্রায় সম্পূর্ণ-রূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পরবর্তী যুগের কোনো খলিফা সেটি পুনর্নির্মাণ করেন। সুতরাং এ-ক্ষেত্রেও আদিম রূপ কী ছিল তা অনুমাননির্ভর। বর্তমান শতাব্দীর প্রথমদিকে একজন পর্যটকের আঁকা স্কেচের অনুসরণে বর্তমান অবস্থাটা দেখাবার চেষ্টা করছি। কিন্তু গম্বুজ বানতে সিদ্ধহস্ত ইসলামী স্থপতি ক্রমাগত দো-চালা বানিয়ে গেছেন, এটা মানতে মন চায় না। আর একজন পণ্ডিত কলছেন, 'গত শতাব্দীতেও এই মসজিদ এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের কবলে পড়ে।



চিত্র-2.4 দামাস্কাসের মসজিদ।

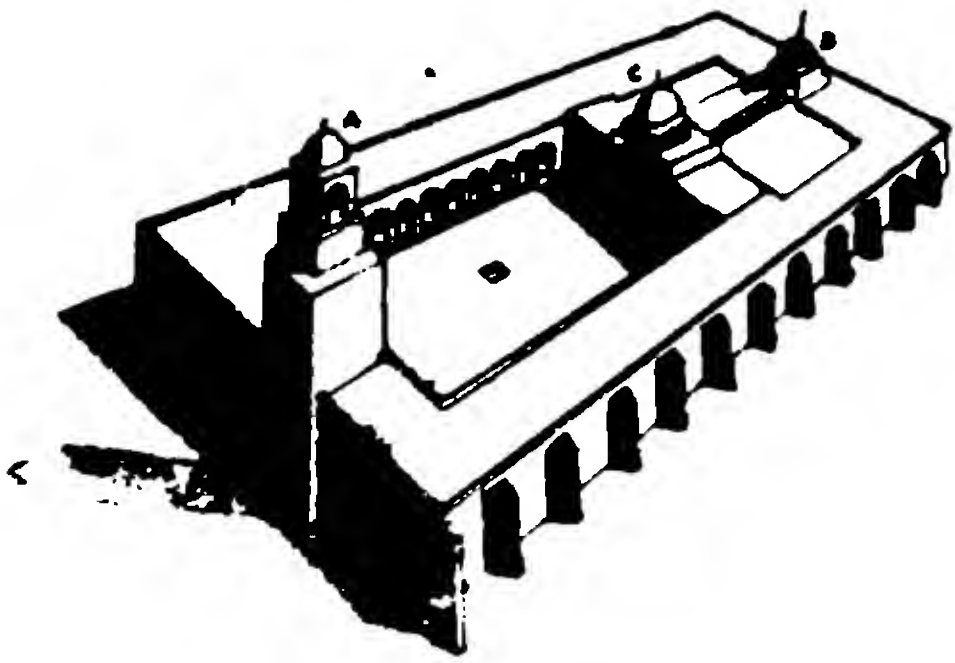
তবে কি ধরে নেব, নিতান্ত হাল-আমলের সিরিয়ান এঞ্জিনিয়ার রাফ্টার-পার্লিন সহযোগে সম্ভার কিস্তি মাং করতে চেয়েছেন?

স্কেচে দেখছি, তিনটি মিনারিকা তিন জাতের। এমনটিও আমাদের প্রত্যাশার বাইরে। কেন্দ্রস্থ মিনারিকার খান্দানীবদন যেমনই হোক, দু-পাশের দুটি হওয়া উচিত ছিল—ইসলামী ঐতিহ্যে একে অপরের 'জবাব'।

খলিফা এবং তাঁর সাক্ষপালাদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার প্রভেদটা যে ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে একথা আগেই বলেছি। সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শটা জীবন-যাত্রার আর পাঁচটা ক্ষেত্র ছেড়ে ক্রমশঃ সীমিত হয়ে আসছে মসজিদের চৌহদ্দীতে। ক্লাস-বাসনের অনুসঙ্গ হিসাবেই হয়তো, এই যুগে সম্মিলিত করেছিল আরবী প্রেমের কবিতা। উমর-ইব্ন আবী রাবিয়ার প্রেমের কবিতা সুবিখ্যাত, যদিও সে-আমলের

মোস্তাদেব মতে সেগুজি আল্‌লার দুনিয়ার সবচেয়ে বৃদ্ধ পাপ! মক্কা ও মদিনা সমেত সমস্ত আরব সাম্রাজ্যে নৃত্য-গীত ও কম্বোর বিকাশ ঘটে।

ইতিহাস বলেছে, ওমায়্যিদের বংশের শেষ খলিফা মারওয়ানের আমলে—অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি—একটা কলহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। একপক্ষে হজরত মহম্মদের জাযাতা অলৌকিক বংশধরেরা, এবং মহম্মদের বংশোদ্ভূত আব্বাস বংশীররা অপরপক্ষে ওমায়্যিরা বংশী-ররা। অর্থাৎ কারবালার প্রান্তরের সেই ‘বিবাদ সিংহ’। [ইতোমধ্যে মহম্মদ বিন্ কাসেমের সিংহ অভিযান (712) সমাপ্ত]। এই সাম্প্রদায়িক বিরোধে অধিকাংশ ওমায়্যিদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নিহত হলেন—শুদ্ধমাত্র একজন প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেলেন স্পেন-অঞ্চলে।



চিত্র-2.5 কারবোরাহ মসজিদ।

সেখানে কার্ভোজ নগরটিকে (চিত্র-2.1) রাজধানী করে তাঁর কল দীর্ঘ অড়াই শতাব্দী রাজত্ব করে। কার্ভোজাটে অষ্ট-অপর্ব একটি মসজিদও নির্মিত হয়। কিন্তু বে-চেষ্টা তার প্রভাব জরুরে ইন্দো-ইসলামী সংসদকে প্রভাবান্বিত করেন, তাই তার কথা অন্তরে রেখে যাই। অপরপক্ষে বিজয়ী আব্বাসিদের 750 খ্রীস্টাব্দ থেকে আরব, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, তুরস্ক ও ইরানে রাজত্ব করে।

আব্বাসীয় বংশ : খলিফা মনসুর (754-775) ম-মস্কাস থেকে রাজধানী সিরিয়ার অনবাস টুরাফ। নতুন করে পছন্দ করতেন মক্কা-বাগদাদ। গোজরকৃষ্টি শহর প্রায় অড়াই কিলোমিটার কাল তার কেন্দ্রস্থ প্রচীর বেষ্টিত অঞ্চল। প্রতিবা ও প্রচীর ঘোঁড়ট নগরীর কেন্দ্রস্থল কিল্লা, বড়ক জির সারি সারি দোকান, টমার, কলসখানা, দফতর, হাসান, সজটখানা।

কেন্দ্রস্থলে সবুজ-গন্ধজওয়ালা প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ। রোদে-শুকানো ইটের ঠৈরী সে প্রাসাদের আঙ্গ চিহ্নাচ নেই।

মনসুরের পরবর্তী খলিফা অবশ্য আমাদের অপরিচিত নন ; তিনি আরব্য-রজনীখ্যাত হারুণ-অল-রসিদ (786-809)। তিনি নাকি ছদ্মনেশে রাতেই বাগদাদ দেখতে বের হতেন। বাগদাদ তখন সেন পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু। প্রথম যুগে বৃত্তাকার শহরের কেন্দ্রস্থল ক্ষুদ্রতর বৃত্তের ধারে ধারে—কনোট-সার্কাসের ভাবায় ‘ইনার-সার্কলে’—স্থান দেওয়া হত বিশিষ্ট বিদেশী বণিকদের। কিন্তু ক্রমশঃ নিরাপত্তার প্রয়োজনে শহরকে ঢেলে সাজাতে হল। বিদেশী বণিকদের পাখশালাগুদালি অপসারিত হল বৃহত্তর বৃত্তের বাহিরের দিকে। রথচক্রের নেমিতে গাঁথা স্পোকের মতো এক-এক রাজপথে এক-এক জাতির দোকান—আর্মেনিয়ার কার্পেট, সিরিয়ার কাচের পানপাত্র, দামাস্কাসের রেশম, হিন্দুস্থান থেকে আমদানীকরা হাতীর দাঁত, কপূর, চন্দনকাঠ, দারুচিনি-এলাচ-জব্বা এমন কি গুড়ারের খজা পর্যন্ত। পথের বাঁকে বাঁকে জুড়ার আচ্ছা। সেখানে রাতারাতি আমীর আর ফকির কিস্মতের হাত-ফিরি করে। তারই ফাঁকে ফাঁকে সরাইখানা, হরেক-কিসিমের সিরাজী, আর নৃত্যগীতের আসরে খাপসদর সাধী। খলিফারা আসরফি আর দামাস্কাসী ছোরা রাজ্যের বেঁধে যেখানে জ্বারেত হয় দেশবিদেশের বণিক, আসব পরিবেশন-কারিগর কানে কানে বলে,

সফর তোরি সুরে দেখনে কো আতি হায় সাকি,
গুরানী পানে কো তো মায়খানা ঔর ভি হায় !
পহলে তো শেখনে আকে দেখা ইখর-উখর
কির সব কুখাকির দাখিল-ই-মায়খানা হো গয়ে।*

এই আমলেই—নবম শতাব্দীতে, আফ্রিকার উত্তরে জিউনিসিয়াতে গড়ে উঠেছিল আর একটি সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্যকেন্দ্র। ভূমধ্যসাগরের উপর দিয়ে যে-সব বাণিজ্য-যাত্রী পাল তুলে হিন্দুস্থান আর স্পেনের মধ্যে যাতা-য়াত করে তারা দৃ-দৃষ্ট জিরিয়ে নেয় কারবোরাহ নগরে (চিত্র 2.1)। এখানে সে মসজিদটি গড়ে তোলা হল

* হোমের রপের মাদরা ইরোসে গিরে ফিরে আসি সাকি।
আসবগার তো লগরে ছড়ানো পড়ে আচ্ছ কত লত,
হে, এখানট আসে ঐ লেখ পাগাড়াই মূল ঢাকি
কুপসারে কল আসব গরবাবে ময়না করিবা দত।

তার প্যান্থনিং-এ জেরুসালেম আর দাবাস্কাসের মসজিদের প্রভাব অনস্বীকার্য। এ-ক্ষেত্রে (চিত্র—2.5) মিহ্রাবের বিপরীতে অবস্থিত প্রধান তোরণটির উপরেই নির্মিত হল আজান-মিনারিকা (A)। প্রবেশ-তোরণটির অবস্থান কিন্তু কেন্দ্রীয় নয়। একপাশ ঘেঁষে। মিহ্রাবের উপরের গম্বুজটি অসমলক ফলের মতো পল-তোলা (B); যদিও তার সম্মুখস্থ ইবানের গম্বুজ ঐ জাতের অলঙ্করণ নেই (C)। এখানে দেখছি, ঐ B-চিহ্নিত গম্বুজে সেই আশ্চর্য পরীক্ষাটি করা হয়েছে—যা নিয়ে দেশে দেশে, যুগে যুগে স্থপতিবিদেরা ভেবেছেন : কী করে চতুষ্কোণ কক্ষের উপর গোলাকৃতি গম্বুজকে বসানো যায়। স্থাপত্যের এই চিরন্তন সমস্যাটি বারে বারে সমাধান করা হয়েছে, তা-সত্ত্বেও নতুন ক্ষেত্রে সে সমস্যা আবার নতুন করে সমাধান করতে হয়েছে। ভারতবর্ষে ইসলামী স্থাপত্যে এই সমস্যা—চতুষ্কোণ কক্ষের উপর গোলাকৃতি গম্বুজ বানানোর কায়দাটা, ঠরোদশ শতাব্দী থেকে নানাভাবে সমাধান করা হয়েছে। ইলতুং-মিসের সমাধিসৌধে ‘স্কুইণ্ড’-পদ্ধতিতে হিন্দু কারিগরেরা যেভাবে সে সমস্যার সমাধান করলেন তা একটা আবিষ্কারই। কারণ স্থানীয় কারিগর, যারা হিন্দু অথবা সদ্য ধর্মান্তরিত মুসলমান, তারা এমন জিনিস জ্ঞানত না। কী-ভাবে এই সমাধান করা গেল সে-সব কথা পরে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে; আপাতত শুধু উল্লেখ করে যাই—এই পদ্ধতিটি কিন্তু ইসলাম আবিষ্কার করেনি, অনুকরণ করেছে মাত্র। বাইজেন্ট-রায় স্থাপত্য থেকে। তারাও মূল আবিষ্কারক নয়—এর আদি জনক ইরানের ‘সাসানিয়ান’রা। পারস্যের ফিরোজাবাদে চতুষ্কোণ কক্ষের চারপ্রান্তে ‘স্কুইণ্ড’-পদ্ধতিতে গড়া খিলানের উপর গোলাকৃতি গম্বুজ গড়া হয়েছিল তৃতীয় শতাব্দীতে। আশ্চর্যের কথা, তার কিছুটা আয়ত্ত টিকে আছে। ইলতুংমিসের ঠরোদশ শতাব্দীতে গড়া প্রথম ভারতীয় গম্বুজটি নিশ্চিত।

আর একটি প্রশ্ন : সামনের দিকে A-চিহ্নিত মিনারিকাটি এমন এক-পাশে করে বানানো হল কেন? ইসলামী স্থাপত্যের অস্কেলা-অঙ্গ প্রতিসাম্য বা Symmetry-কে এভাবে উপেক্ষা করা হল কী কারণে? একটাই সম্ভাব্য জবাব—ঠিক সম্মুখে নির্মিত হলে মিনারিকাটি মিহ্রাবের উপরে গম্বুজকে অড়াল করে রাখে। সমাধানটিকে খুব ভালো জাতের বলতে পারি না। একই সমস্যা ইন্দো-ইসলামী স্থপতি অনেক ভালোভাবে সমাধান করেছেন—আজা-মিনারি জাম-ই-

মসজিদে, দু-প্রান্তে দুটি মিনারিকা তুলে।

এই আব্বাসীদ-যুগে রাজধানী বগদাদের সামান্য উত্তরে টাইগ্রিস নদীতীরে সাকরর হয়ে পড়েছিল একটি অভ্যন্তর মসজিদ-জামা। সেখানকার কিছু স্থাপত্যকীর্তি আজও বর্তমান। এখানকার মসজিদে পের্টেট-অর্ডার যেখানকার স্থাপত্যের ইতিহাসে এক নতুন আবিষ্কার। মিনারিটি কিন্তু অতীতপূর্ব নয়। তাতে মেসোপটে-মিয়ার আদিম যুগের জিগ্‌মুরাৎ-এর ছাপ। এই যুগে মসলীর স্থাপত্যে একটি নতুন ধারার যুগ হল—অলঙ্করণ ব্যবহার। ইতিপূর্বে মসলীর স্থাপত্যের অলঙ্করণে পল্লপকী বা মনুষ্যমূর্তি খুব বেশি দেখা যেত না। কুরান-সারিসের একটি শ্লোকের এমন ব্যাখ্যা করা হয়েছিল যাতে মনে হয়—মুসলমান স্থাপত্যে জীবন্ত কোনো কিছু খোদিত বা অঙ্কিত করা গিহঁত কাজ। এই আব্বাসীদ-যুগেই দেখা গেল ব্যাপকভাবে এ-মতকে অস্বীকার করা হয়েছে। কুল-লতা-পাতার সঙ্গে মসজিদে, মক্কার এবং অন্যান্য স্থাপত্যকীর্তিতে খোদাই করা হয়েছে পল্লপকী এমন কি মনুষ্যমূর্তিও। এই অলঙ্করণ ছিল তিন জাতের—প্রথমতঃ, গ্রীক ও রোমান নকশার প্রাদুর্ভাব শক্তির বা পশ্চের কাজ। দ্বিতীয়তঃ, জ্যামিতিক নকশা—সচরাচর সরল-রেখার সমাহার, চতুর্ভুজ, ষড়ভুজ ও অষ্টভুজের অস্ফুট সূক্ষ্ম বিন্যাস। ভারতবর্ষ যার চরম পরিণতি মুগল জমিদার-কতেদর-সিঁরি এক ইতমৎ-উদ্‌দৌলার। তৃতীয়তঃ, পল্লপকীর উপর আঁকা (ফ্রেস্কো এবং টেম্পারা উভয় পদ্ধতিতেই) কুল-লতা-পাতার অসরল-রেখার আলিঙ্গন। এ-কাজও চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে কতেদর-সিঁরিতে, ইতমৎ-উদ্‌দৌলার এক শাহজাদা-জামাততে।

আব্বাসীদ বংশীয় হারুদ-অল-রাসিদ এবং তার পুত্র মামুন-এর আমলে বাগদাদ ও সামাররার জাম-চাঁ প্রভৃতিভাবে বিকশিত হয়। বাগদাদের House of Wisdom বা প্রজ্ঞা-সৌধে হুনাইন ইব্ন ইসহাৎ-এর তত্ত্বাবধানে প্রাচীন যুগের অনেক অনেক পণ্ডিতের রচনা আরবিক ভাষায় অনূদিত হল : অক্লিডিস, এ্যারিস্টটল, প্যালেস, ইউক্লিড, টলেমি, প্লেটো। আরবী দার্শনিক কিশি প্রায় আড়ম্বিহীতি রস্ব একই রচনা করলেন, কমান বিবরে : স্পর্শিত, কুসারন, অলটিয়, মণিত, জ্যোতিষ, পদার্থ, দর্শন প্রভৃতি। পারস্যের রায়ী বা রাতীর (বর্তমান তেহরান) অধি-কলী রাহজেল্ খারীর ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উপর প্রায় কেতলিটি রস্ব রচনা করেন—আরব, পারস্য ও

হিন্দুস্থানের ভেগদের বিভিন্ন পক্ষের সদস্যদের সম্মুখে। অষ্টম শতাব্দীতে এক যুগান্তকারী আবিষ্কারে এই জ্ঞানচর্চার হোমানিতে যেন নতুন সমিধ সংযুক্ত হল : কাগজের আবিষ্কার। শতাব্দী না ঘুরতেই সমরকন্দ, সামাররা, এবং বাগদাদে তৈরী হল কাগজ তৈরীর কারখানা—আব্বাসীদ-জগতের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে জ্ঞানচর্চার ফলশ্রুতি প্রসারিত হতে থাকে কাগজের বৃক্কে কালির আঁচে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারে, বাণিজ্যের সুবন্দোবস্তে প্রভূত উন্নতিসাধন করা সত্ত্বেও আব্বাসীদদের সাম্রাজ্য কী রাজনৈতিক, কী সামরিক, কোন দিক থেকেই পূর্ব-বর্তী ওমায়্যিদদের মতো দৃঢ়তা পায়নি। তার মূল হেতু—আব্বাসীদ খলিফার দল বংশানুক্রমিকভাবে একটি চারিত্রিক শিকার হয়েছিলেন : পূর্বযুগের ওমায়্যিদ আরব অমাত্যদের তাঁরা বিশ্বাসভাজন মনে করতে পারেননি—তাঁদের অনমনীয় দৃঢ়তার জন্য। পরিবর্তে খলিফার দল ক্রমাগত নির্ভর করে গেছেন অনারবী তুর্কীদের উপর। আরবীয় পণ্ডিতেরা প্রায় বাধ্য হয়েই ক্রমশঃ রাজ্যশাসন ও সেনাবাহিনীর দায়-দায়িত্ব ত্যাগ করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার দিকে ঝুঁকলেন। হিন্দুস্থানের ইতিহাসে সমান্তরাল ঘটনার কথা মনে পড়বে ঔরঙ্গজেবের হিন্দুবিদ্বেষের ফলাফলে। যে আকবরের সাম্রাজ্যে স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন মানসিংহ, চৌডরমল্ল, রাজা বীরবল, তাঁরই অধস্তন পুরুষ হিন্দুবিদ্বেষের বিশ্বাস্পকে মূলধন করে ধরিয়ে দিলেন মৃগল-সাম্রাজ্যের দৃঢ় বনিয়াদ। এ-ক্ষেত্রেও ঘটনা প্রায় একই খাতে বহেছে। হারুন-অল-রাসিদ স্বয়ং তাঁর বাহিনীর সৈন্যপত্যের দায়িত্ব দিলেন তুরস্কের এক নও-জোয়ান শিপাহ-সানাতকে, উপযুক্ত প্রবীণ আরবীয় সেনাপতিদের উপেক্ষা করে। তাঁর পুত্র নিজ দেহরক্ষীবাহিনী নির্বাচন করলেন শুধুমাত্র তুর্কী সৈন্য থেকে। আরব-তুর্কী সম্পর্ক ক্রমশঃ এমন তিক্ত হয়ে পড়ল যে, খলিফা আরবী-সংস্কারগঠিত বাগদাদ ত্যাগ করে রাজধানী সিরিয়ে নিরে গেলেন সামাররায়। সেখানে নির্মিত হল এক প্রকমন্ড কিল্লা ও প্রাসাদ বাল্কুবারা প্রাসাদ, দেবোঁ বা এক কিলোমিটার! এই প্রাসাদের ধ্বংসাক্রম আজও আমাদের কিসের উদ্ভেক করে।

নবম-শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে অধিকাংশ আব্বাসীদ খলিফা ক্রমশঃ হয়ে পড়েন তুর্কী জঙ্গীবাজদের হাতের কীড়নকর। এক একে বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকার হস্তান্তরিত হতে থাকে প্রাদেশিক তুর্কী শাসনকর্তা বা মনসকদারের বিদ্রোহে। মিশর হস্তচ্যুত হল ৪৬৪ খ্রিষ্টাব্দে। সেখানে ফাতিমা-বংশীয় সুল-

তানেরা কায়রো নগরকে রাজধানী হিসাবে নির্বাচন করে। সেখানে গড়ে উঠতে থাকে নব নব স্থাপত্য-কীর্তি। তারপর সেখানে আসে মামলুকেরা।

সেলজুক ও অটোমান তুর্কী সুলতান : একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে সেলজুক তুর্কী শাসন-কর্তারা হয়ে পড়েন আব্বাসীদ খলিফার 'দক্ষিণহস্ত' ; শতাব্দী না ঘুরতেই সেই দক্ষিণহস্ত খলিফার মৃদুটি দেহভারমুগ্ধ করে উঠে বসল তক্তাউসে! আরব-পারস্য-আফগানিস্থান অঞ্চলের বিস্তৃত সাম্রাজ্যে তারাই হয়ে গেল স্বাধীন সুলতান। এর পরেই বাইজেন্টাইনের সঙ্গে এদের সংঘর্ষ বেধে গেল, ফলে পুনরায় জেরু-সালেম দখল করল তুর্কীরা। মালিক শাহ (1072-1092)-এর আমলে, তাঁর কটুকোশলী উজীর নিজাম-উল-মুল্ক-এর দৌলতে সেলজুকী তুর্করা ক্ষমতার ভুগ্মশীর্ষে ওঠে। ভারতবর্ষে তখন একচ্ছত্র কেউ নেই—কিন্তু হিন্দুস্থানের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন কীর্তিমান নৃপতি স্ব স্ব রাজ্যে সুশাসন বজায় রেখেছেন, গড়ে তুলছেন আঞ্চলিক শৈলীতে হিন্দু-স্থাপত্য : দাক্ষিণাত্যে রাজেন্দ্র চোল (1070-1122), কল্যাণে ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য (1076-1127), পূর্বাতে অনন্তবর্মন চোড়গঙ্গা (1076-1148), কাশ্মীরে হর্ষ (1089-1101) এবং খাজুরাহোতে কীর্তিবর্মন চন্দেলরাজ (আঃ 1098)।

এরপরেই সেলজুকী তুর্ক-দের সৌভাগ্য-গগনে সূর্যদেব পশ্চিমে ঢললেন। দুর্ভাগ্য এল তিন দিক থেকে। এক : ক্রুসেড। খ্রীষ্টান জগৎ জেরুসালেম উদ্ধার করবার প্রতিজ্ঞায় একে একে অভিযান পাঠায়। ইউরোপীয় সভ্যতা এই সূত্রে পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ইসলামের এক একতাবন্ধ প্রতিপক্ষ হয়ে ওঠে। দুই : বাইজেন্টাইন রাজক্ষমতার প্রত্যাঘাত। এবং তিন : মধ্যচীনের মঙ্গোলিয়া-অঞ্চল থেকে এক নয়া-বিভীষিকা : চৌঙ্গিস্থান! সেলজুকী সৌভাগ্যসূর্য অতি দ্রুত ঢলে পড়লেন পশ্চিমাকাশে।

সেলজুকী-তুর্কী আমলে স্থাপত্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য মসজিদের সঙ্গে অঙ্গাগীভাবে মাদ্রাসার আবির্ভাব। আগেই বলেছি, পূর্ববর্তী যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা প্রভূতভাবে প্রসারলাভ করেছিল—তারই প্রাণফলনে ধর্ম ও জ্ঞানচর্চা সম্পৃক্ত হল। মসজিদের মিত্ররূপের দুইপাশে সংযুক্ত হল মাদ্রাসা। মূলতঃ সার্বজনীন শিক্ষার আয়োজনে, কিন্তু ঐ সঙ্গে চলল জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানান শাখা-প্রশাখায় চর্চা। আমরা পরবর্তীকালে দেখব এই চিন্তাপাঠা, আল্লাউদ্দীন

খ্রিস্টীয় আমলে হিন্দুস্থানের ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যকে কী-ভাবে প্রভাবিত করেছে। সেখানেও মাদ্রাসা সংযুক্ত হল মসজিদের অঙ্গ হিসাবে। তার পূর্ণ পরিণতি ফিরোজশাহ তুগলকের আমলে। সে যাই হোক, সেলজুকী-স্থাপত্যের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল মসজিদ সংলগ্ন—‘মাখসুদরাহ’। সুলতান বংশীয়দের জন্য মসজিদ লিয়ানে নির্দেশিত হল একটি পৃথক স্থান—প্রভুতভাবে অলঙ্কৃত খিজান-সম্বলিত এই নতুন যোজনাটি শুধু মসজিদ প্ল্যানিং-এই নয়, মুসলিম ঐতিহ্যের সাম্যবাদী ধ্যান-ধারণাতেও আনল একটা বিরাট পরিবর্তন। এ-ক্ষেত্রেও আমরা দেখব, ঐ দ্বিতীয় ধারণাটি থেকেই ভারতবর্ষের প্রথম সুলতান কুৎব-উদ্দীন আইবক তাঁর কুওতুল মসজিদে কী-ভাবে ‘মাখসুদরাহ’-র অনুকরণ করেছেন। তৃতীয়তঃ, এই সঙ্গে এল মসজিদ-সংলগ্ন গোলাকৃতি মিনারিকা, যাকে ইংরেজিতে বলে ‘মিনারেট’। তাছাড়া প্রবেশ-তোরণে ফুল-লতা-পাতা নকশার খাঁজে খাঁজে আরবী ভাষায় লেখা কুরান-সরিফের বাণী—যা নাকি আমরা যথেষ্ট দেখতে পাই ভারতবর্ষে, একেবারে আদিম যুগ থেকে শেষ যুগে—কুৎব-এ, আজমীরের আড়াই-দিন-কা বোপড়া থেকে তাজমহলে—তাও এঁদেরই প্রথম প্রবর্তন।

চতুর্দশ-শতাব্দীর উষা মুহূর্ত থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত ইসলাম-জগতের নেতৃত্ব দেয় অটোমান তুর্স্ক জাতীয়রা। ইস্তাম্বুলে (কন্সতান্টিনোপলের ইসলামী নাম) এদের জমানাতে অনেকগুলি মসজিদ নির্মিত হয়। একটা কথা মনে রাখা দরকার—ভারত-বর্ষে সাধারণ মানুষের ধারণা যে, ইসলাম ধর্মে মনুষ্য মূর্তি আঁকা বা খোদাই করা নিষিদ্ধ। এজন্য ভারত-বর্ষে ইসলামী স্থাপত্যে মনুষ্যমূর্তি বিরল। জাহাঙ্গীরের প্রচেষ্টায় মিনিয়োটর পোর্ট্রেট যথেষ্ট প্রসারলাভ করে—হাতীর দাঁতের উপর সৌখীন প্রতিকৃতিতে দেখেছি—আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহাঁ, আলমগীর এবং নূরজাহাঁ, মমতাজ প্রভৃতির মূখ্যকৃতি—পোর্ট্রেট। ফতেপুর-সিক্রিতে—পরে আমরা দেখব—বিপ্লবী আকবর বাদশাহ্ সিয়াপন্থীদের ঐ কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাবটি স্বীকার করেননি। বিভিন্ন ইমারতে তিনি মানুষের ছবি আঁকিয়েছিলেন—অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার, এমন কি প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনীর। রাখাক্ষের যুগলচিহ্ন সমেত। কিন্তু আকবর বাদশাহ্ তো নিতান্ত ব্যতিক্রম। সাধারণ-ভাবে বলা যায়—মুসলিম-স্থাপত্যে ইনসানিয়াৎ-প্রতি-বিস্মিত প্রাচীরচিহ্ন কিস্কুল না-হজর। হজরত

মহম্মদ রশদুলের আসেখ্য তো নিতান্ত ‘টায়’।

অথচ অটোমান-তুর্কীদের জমানার অনেক-অনেক তস্বির ইরান-তুরানে আঁকা হয়েছে, মসজিদ-প্রাচীরেও, স্বয়ং পয়গম্বরের কীর্তি-কাহিনী বিজ্ঞাপিত করেও। কৌতূহলী পাঠককে অনুরোধ করব রিডার্স ডাইজেষ্ট প্রকাশিত ‘The Last Two Million Years’ গ্রন্থের 151 পৃষ্ঠাটি দেখতে। মসজিদ-প্রাচীরে অঙ্কিত সে তস্বিরে মহম্মদের জীবনের একটি ঘটনা বিচিহ্নিত। ঘটনা মক্কার। পয়গম্বরের বিপ্লবাত্মক অমৃতবাণী সহ্য করতে না পেরে বিক্ষুব্ধ-মক্কাবাসী তাঁকে পাথর ছুঁড়ে মারছে। হজরতের একান্ত-অনুচর আব্দ-বকর তাদের শান্ত করতে চাইছেন। এ-চিত্রে শিল্পী হজরত মহম্মদের দেহাকৃতি এঁকেছেন, মূখটুকু বাদে। হর কুরান-সরিফের নির্দেশ স্মরণ করে, অথবা সাহস না পেয়ে। তাঁর মাথার পিছনে একটি অগ্নিশিখা—অনেকটা হিন্দু বা খ্রীষ্টান-শৈলীতে দেবতা বা সামু-সন্তদের মাথার পিছনে যেমন ‘হ্যালো’ বা ‘জ্যোতিঃ-ছটা’ দেখা যায়। ভারতবর্ষে মুসলিম শিল্পে এই ‘হ্যালো’ এসেছে শাহজাহাঁনী জমানায়।

স্মর্তব্য—এ চিত্রটি যখন পারস্যদেশে আঁকা হিচ্ছিল, ততদিনে হিন্দুস্থানে সুলতান শেরশাহ শূর সাসারাম্মে তাঁর সমাধিসৌধ সমাপ্ত করেছেন, দিল্লীতে পুরানা-কিল্লা শেষ করেছেন, ‘পঞ্জাব-বঙ্গাল বাদশাহী-সড়ক’ (গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড)-এর ধারে ধারে নির্মাণ করিয়েছেন গণনাভীত সরাইখানা। তার একাঙ্কিতেও কিন্তু—পয়গম্বর দূর-অন্ত-স্বয়ং শেরশাহ শূরের একখানাও ছবি নেই!

বহির্ভারত পরিক্রমা শেষ করে ‘সর্বতীর্থ-সার’ স্বদেশে ফিরে আসার সময় হয়েছে।

অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের একটা মৌল পার্থক্য অনস্বীকার্য। অন্যান্য রাজ্য—এমন কি অতি প্রাচীনকালের ঐতিহ্যবাহী মিশর, পারস্য, তুরান প্রভৃতিও ইসলামকে গ্রহণ করল সম্পূর্ণভাবে। তারা ধর্মান্তরিত হয়ে গেল। নতুন ধর্ম, নতুন আদর্শ, নতুন জীবনবেদকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করল। ভারত-বর্ষ তা করল না। আপন জ্ঞানকরসে জীর্ণ করে যে-ভাবে সে ইতিপূর্বে গ্রীক-শক-পহলব-মূর্চি সংস্কৃতি গ্রহণ করেছিল সেভাবেই ইসলামকে আত্মসাৎ করতে চাইল। গ্রীক-শক-মূর্চিরা এখানে অস্ত্রবাসীর মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য শাসন করেছে—সাম্রাজ্য বিস্তার করে স্থায়ী আসন পাতেনি। এই সহজ সরল সত্যটা ভারত-বর্ষ বুঝল না। চার্বাকের নিরীশ্বরবাদিতা, বুদ্ধের বেদের অপৌরুষেয়তার বিষয়ে, ঈশ্বরের বিষয়ে নীর-

বাক্যে সহ্য করে সে ভেবেছে ইসলামকেও একই-
ভাবে মেনে নেওয়া যাবে। তা গেল না। যাওয়ার
কথাও নয়। অপরের বিশ্বাস আধা-আধি মেনে নিয়ে,
মানিয়ে নিয়ে, মাঝপথে রফা করার উপাদান যে
আগন্তুকদের ভিতর নেই, এটা চূড়ান্তভাবে বোঝা
শেল আকবর-বাদশাহর 'দীন-ইলাহী' ধর্মপ্রবর্তনের
কর্তৃত্ব। তাই কাম্বীর থেকে দাক্ষিণাত্য, প্রাগ্-
জ্যোতিষপুর থেকে স্মারকা পদানত করেও ইসলাম
ছয় শতাব্দী ধরে ভারতবর্ষে রয়ে গেল সংখ্যালঘু-রূপে।
সংখ্যাগরিষ্ঠ দল জিজ্ঞাসা কর জুগিয়েও আঁকড়ে রইল
ভার ধর্মবিশ্বাস। শাসনদণ্ড হস্তান্তরিত হবার পর
সেই সংখ্যালঘু প্রাক্তন-শাসক দল নিরাপত্তার আশ্রয়
খুঁজল 'সেপারেটে ইলেকটরেটে'; পরে 'পাকিস্তান'-এ।
রাজনীতির ক্ষেত্রে ইন্দো আর 'ইসলাম' কোনদিনই
হাতে হাত মেলাতে পারেনি।

কিন্তু রাজনীতিই তো মানবসভ্যতার সবটুকু নয়।
ধর্মের জগতির তুলে বহন মানবজন্মকে খোঁপিয়ে তোলা
হয়নি তখন তারা—ঐ হিন্দু ও মুসলমান নিরস্ত্র গ্রাম-
বাসীরা, শহরবাসীরা, পাশাপাশি বাস করেছে। পর-
স্পরের সূখে আনন্দ করেছে, দুঃখে কেঁদেছে। ক্ষেত্রে-
ঝামাঝে, কলকরখানায় তারা ক্রমশঃ বুঝতে শিখেছে
হিন্দু ও মুসলমান দুটো আলাদা জাত নয়, এক জাত।
জাতের রকম কের হয়েছে—অস্মিতদল ও নাস্মিতদল।
একপক্ষে বিত্তশালী হিন্দু-মুসলমান জমিদার-জোত-
দার-মিলমালিক, অপরপক্ষে হিন্দু-মুসলমান ভূমিহীন

কৃষক, বর্গাদার, শ্রমিক! তাই জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে,
শিল্পের ক্ষেত্রে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মিলন সার্থক
হওয়ার কোনো বাধা হয়নি। ডীক্ষদেব চট্টোপাধ্যায়
মিঞা-কি-মল্‌হার গেসে বিভোর হন, জয়নাল আবেদিন
দুর্গা প্রতিমার স্কেচ একে বৃন্দ হন। নৃত্য, সংগীত,
চিত্রশিল্প, লোক-গাথা, লোকসঙ্গীতে ইন্দো-ইসলামী
ভাবধারা মিলে মিশে একাকার হতে পেরেছে।

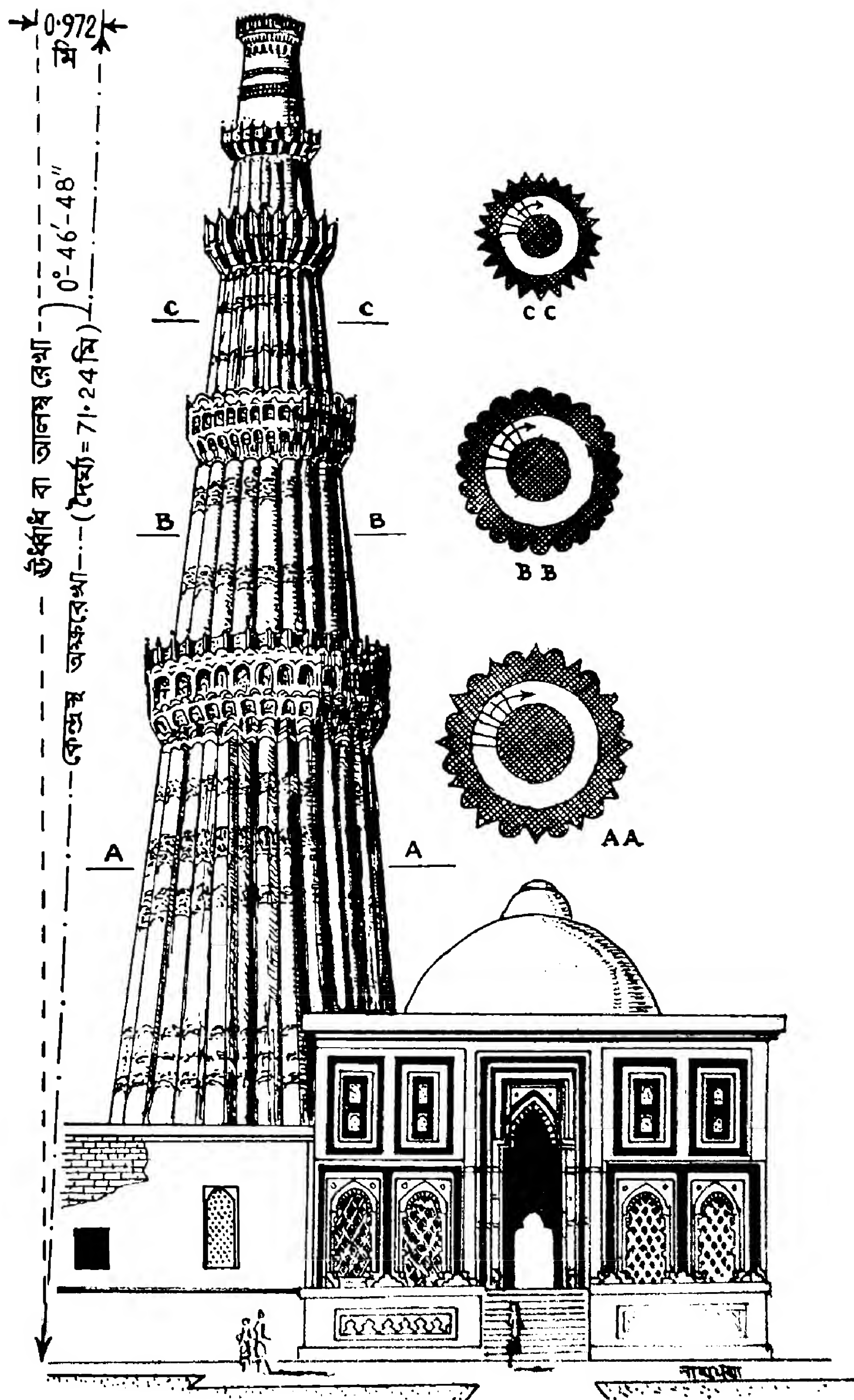
স্থাপত্যের ক্ষেত্রেও তাই। এখানেও প্রথম দিকে—
আমরা ক্রমশঃ দেখব—মিল হয়নি, গোঁজামিল হয়েছে।
চম্কে উঠবেন না যদি বলি—ইসলামী ইতিহাসের
প্রথম তিনশ বছর, আকবরী-জমানাতক, 'ইন্দো-
ইসলামী স্থাপত্য' বলে কিছু ছিল না।

মহা মহা পণ্ডিতরা বলে গেছেন জানি—কিন্তু
কুৎব মিনার থেকে হুমায়ুনের সমাধির কোনো একটিও
কি 'ইন্দো-ইসলামী' স্থাপত্যের? তাহলে তো ব্রিস্টলে
রাজা রামমোহনের সমাধিকে বলতে হয় 'ব্রিটিশ-টম্ব' ;
'রাডিয়ান্ট' কিপারিংকে ভারতীয় লেখক! কুৎবউদ্দীন
আইবক থেকে হুমায়ুনতক ভারত-ভূখণ্ডে 'ইসলামী
স্থাপত্য' গড়ে গেছেন মাত্র। সে-অর্থে ইন্দো-ইসলামী
স্থাপত্যের জন্ম আশ্রা-কিল্লায়—জাহাঙ্গীর মহালে।

না, অতটা গোঁড়া দৃষ্টি দিয়ে দেখলে চলবে না।
ভারত-ভূখণ্ডে ইসলামী স্থাপত্যকেও আমাদের
আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করে দেখতে হবে। আর তাহলে
আমাদের প্রথম পাঠ :

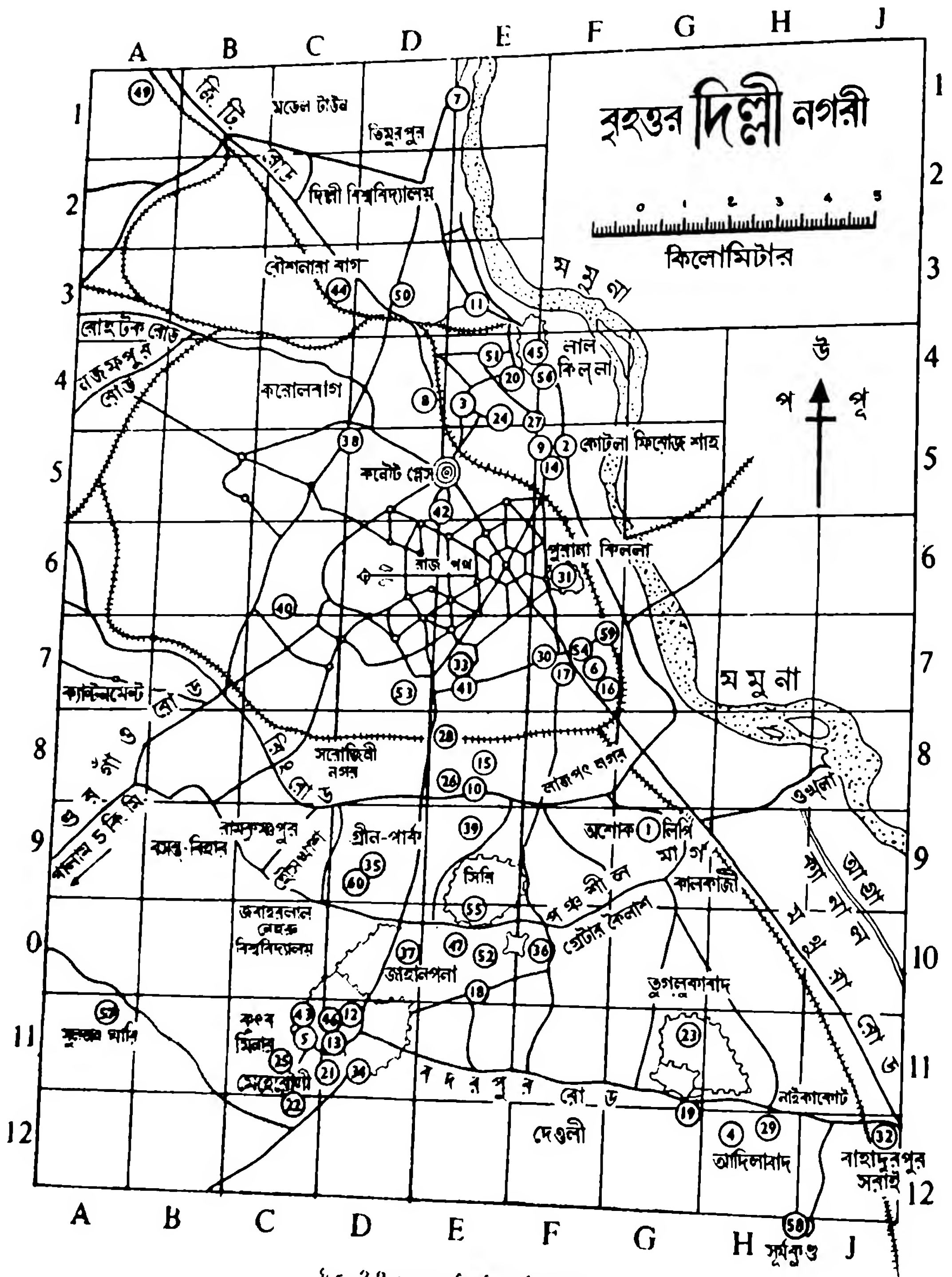
দাস-বংশ।

□



উর্ধ্বাধি
কেন্দ্রস্থ
অক্ষরেখা

চিত্র 3.1 কুম্ভ মিনার ও আলাই দরওয়াজা।



চিত্র-3.2 বৃহত্তর দিল্লীর ভূমি-নকশা।

দিঘলী-প্রক্টবোর ভৌগোলিক অবস্থান

[চিত্র-3.2]

ক্রম	বিষয়	চৌখুঁপি	ক্রম	বিষয়	চৌখুঁপি
1 ..	অশোক শিলালিপি	G-9	31 ..	পূরানা কিল্লা	F-6
2 ..	অশোক স্তম্ভ	F-5	32 ..	বদরপুর সরাই	J-12
3 ..	আজমীরী দরওয়াজা	E-4	33 ..	বড়া-গম্বুজ	E-7
4 ..	আদিলাবাদ	H-12	34 ..	বল্কনের সমাধি	D-11
5 ..	আদম খাঁ মক্‌বারা	C-11	35 ..	বাগ-ই-আলম-কা গম্বুজ	D-9
6 ..	আরব সরাই	F-7	36 ..	বাহুল্ল লোদীর সমাধি	F-10
7 ..	ওয়াজিরাবাদ	E-1	37 ..	বেগমপুরী মসজিদ	D-10
8 ..	কদম সরাই	D-4	38 ..	ভুলি-ভাটিয়ারী-কা মহল	D-5
9 ..	কাবুলী দরওয়াজা	F-5	39 ..	মথ্ মসজিদ	E-9
10 ..	কালে খাঁ-কা গম্বুজ	E-8	40 ..	মালচা-মহল	C-6
11 ..	কাশ্মীরী দরওয়াজা	E-3	41 ..	মুহম্মদ শাহ্ সৈয়দ মক্‌বারা ..	E-7
12 ..	কুওতুল-ইসলাম মসজিদ	D-11	42 ..	মস্তর-মস্তর	E-5
13 ..	কুংব মিনার	D-11	43 ..	যোগমারা মন্দির	C-11
14 ..	কোটলা ফিরোজশাহ্	F-5	44 ..	রোশনারা বাগিচা	C-3
15 ..	কোটলা মদ্বারকপুর	E-8	45 ..	লাল-কিল্লা	E-4
16 ..	খান-ই-খানান্ মক্‌বারা	F-7	46 ..	লালকোট	C-11
17 ..	খান-ই-জাহান তিলাখানী	F-7	47 ..	লাল গম্বুজ	E-10
18 ..	খিড়কি মসজিদ	E-10	48 ..	লোদী বাগিচা	E-7
19 ..	গিয়াসউদ্দীন মক্‌বারা	G-12	49 ..	শালিমার বাগ	A-1
20 ..	জাম-ই-মসজিদ	E-4	50 ..	সিপাহী-বিদ্রোহ স্মারক	D-3
21 ..	জামালি-কামালী মসজিদ	D-11	51 ..	শীশগঞ্জ গদুস্বারা	E-4
22 ..	জাহাজ মহল	C-12	52 ..	শেখ্ আলাউদ্দীন মক্‌বারা ..	E-10
23 ..	ভুগলকাবাদ	G-11	53 ..	সফরজদ্ মক্‌বারা	D-7
24 ..	ভূকর্মান দরওয়াজা	E-4	54 ..	সব্জ্ বর্জ	E-7
25 ..	দরগা কুংব-সাহিব	C-11	55 ..	সিরি	E-10
26 ..	দরগা খাঁ মক্‌বারা	E-8	56 ..	সুন্‌হারি মসজিদ	E-4
27 ..	দিঘলী দরওয়াজা	F-4	57 ..	সুলতান ঘারী	A-11
28 ..	নজফ্ খাঁর কবর	E-8	58 ..	সুন্‌ কুন্ড	H-13
29 ..	নাই-কা-কোট	H-12	59 ..	হুমায়ূনের সমাধি	F-7
30 ..	নিজামউদ্দীন আউলিয়া	F-7	60 ..	হোস-ই-খাশ্	D-9

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দাস-প্রথা

উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা	সময়কাল (খ্রিঃ)	খ্রীষ্টাব্দ
মহম্মদ বিন-কাসেমের সিংহ বিজয় (ভামবোর)	..	711
সব্বঙ্গানের শেষ বার ভারত লুণ্ঠন	..	987
হিন্দু রাজা জয়পাল পরাজিত	..	1001
তরাই-এর বংশে দিল্লী-অঞ্চলে হিন্দু রাজবংশের অবসান	..	1192
কুৎবউদ্দীন আইবক কর্তৃক লাটকোটে 'দাস-বংশের' প্রতিষ্ঠা	..	1198
কুৎব মিনারের বনিয়াদ, কুওওতুল মসজিদ ও আড়াই-দিন-কা	..	1210
ঝোপড়া (আজমীর) শেষে কুৎবউদ্দীনের মৃত্যু	..	1211
ইল্-তুর্কমিসের অভিযেক	..	1229
কুৎব মিনারের অধিকাংশ কাজ, মসজিদ সম্প্রসারণ, নাসিরউদ্দীনের	..	1236
মৃত্যু (বাঙলায়) ও সুলতান ঘারী নির্মাণ	..	1240
ইল্-তুর্কমিসের মৃত্যু (কুৎব-চত্বরে সমাধি)	..	1266
সুলতানা রেজিয়ার মৃত্যু (সমাধি অর্চিহিত)	..	1287
সুলতান নাসিরউদ্দীন (মৃত্যু 1266) ও বলবনের (মৃত্যু 1287)	..	1290
কোনো উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য কীর্তি নাই	..	1290
বংশের শেষ সুলতান কাইমুরের মৃত্যু	..	1290

দাস-বংশ শব্দটা ব্যবহারের জন্য একটা কৈফিয়ৎ অপরিহার্য হয়ে পড়ছে। শব্দটা ইদানিংকালে ঐতিহাসিকেরা পছন্দ করেন না। তা সে বাই হোক, ঐ শব্দটা থেকে প্রথমেই আমাদের সংস্কারমুক্ত হয়ে নিতে হবে—না হলে এই রাজবংশের ইতিহাস তথা স্থাপত্য-চিন্তার গভীরে আমরা প্রবেশ করতে পারব না। 'দাস' বা 'স্লেভ' কথাটা শুনলেই আমাদের মনে যে ধারণা হয়—বহির্ভারতীয় ইসলাম-সাম্রাজ্যের, বিশেষ করে তুর্কীদের 'দাস' সে অর্থবহ নয়। 'দাস' বললেই আমাদের মনে পড়ে মিশরের পিরামিড তৈরির কাজে শ্রমিকদের অবর্ণনীয় দুর্দশা, স্পার্টাকাসের বিদ্রোহ, আঙ্কল টমস্ কর্কিন। খেয়াল করে দেখি না—সে পরিবেশে আইবক বা ইল্-তুর্কমিস্ নিতান্তই অসম্ভব।

তুর্কী দাস-প্রথা সম্পূর্ণ অনন্যাতের প্রতিষ্ঠান।

তার ম্বরূপটা প্রণিধান করতে হলে ঐতিহাসিক টয়েনবী অনুসরণে এ-প্রথার মূলে প্রবেশ করতে হবে। এই দাস-প্রথা ওদের সমাজব্যবস্থায় অনুপ্রবেশ করেছে প্রাগদূর্তী বেদুইন-জীবন থেকে। আরব-ভূখণ্ডে তৃণ-ভূমিতে সমাজজীবন ছিল ত্রিস্তরে : সপরিবার ভ্রাম্যমাণ বেদুইন, তার মেঘযুথ এবং তার কুকুর-বাহিনী ; চাষের জমি নয়, উট-গরু-ভেড়াই সেই অনুর্বর তৃণখণ্ডে একমাত্র সম্পদ, আর তাদের তদারকী, রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজন সর্বাশিক্ষিত প্রভুভক্ত একদল অশ্ব ও কুকুর। আরব মরুভূমির বাহিরে এসে, সাম্রাজ্য গড়ে, প্রাসাদ বানিয়ে কিলাস-বাসনে আকণ্ঠ নিমগ্ন হয়েও ওদের সেই ত্রিস্তর-বিশিষ্ট আদিম মানসিকতাটা হারিয়ে যায়নি। বেদুইন-সর্দার বর্তমানে কিল্লাদার, জায়গীরদার, অথবা প্রাদেশিক শাসনকর্তা ; গবাদি পশু প্রজাসাধারণে

রূপান্তরিত। গরু দিত দুধ, মেঘ দিত পশম ; এরা দেয় শস্য, ফসল, শ্রম। কিন্তু সেই প্রভুভক্ত কুকুর ? যারা তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে এই রূপান্তরিত মেঘযুগ্মকে, রক্ষা করবে নেকড়ের আক্রমণ থেকে ? ঐ 'ওয়াচ-ডগ'-এর শূন্যস্থান পূরণ করতে গড়ে উঠল দাস-প্রথা। তাদের হতে হবে প্রভুভক্ত, শক্তিশালী, জাতিব-অনুভূতি-সর্বস্ব এবং চিন্তাশক্তি-বিরহিত।

তুর্কী দাস-প্রথা একটি অভূতপূর্ব প্রতিষ্ঠান—প্রাগদূর্তী মিশর, মেসোপটেমিয়া, রোমের অনুকরণে নয়। এই প্রতিষ্ঠান থেকেই নির্বাচিত হত সম্রাটের সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ধাপের জঙ্গী মানুষ : সেনাপতি, মন্ত্রী, প্রাদেশিক শাসনকর্তা এমন কি ক্ষেত্র বিশেষে রাষ্ট্রনায়ক ! অশ্চর্যের কথা, এদের অধিকাংশই জন্মসূত্রে মুসলমান নয় ! তুর্কী দেশের অধিকাংশ দাসই খ্রীষ্টান পিতামাতার সন্তান। বিদেশ জয় করার সময় তাদের ধরে আনা হত—নিতান্ত বাল্যকালে। পশ্চিম সীমান্ত থেকে দলে দলে ঐ শিশুদের, বাসকদের, আমদানী করা হত ইস্তাম্বুলের ক্রীতদাস হাটে। সেখানে তাদের বাছাই করা হত—দু-দলে বিভক্ত করা হত। একদল সুদর্শন, কিন্তু দুর্বল, তারা ইশ্ক অগ্লান। নিম্নশ্রেণীর। তাদের প্রেরণ করা হত একটি বিশেষ শিক্ষায়তনে। শিক্ষান্তে তারা নিয়োজিত হত বাদশাহের খিদ্মৎগার-বাহিনীতে। দ্বিতীয় দল, তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ : আজেম্ অগ্লান। তারা সুদর্শন না হলেও চলবে, ভারসহ বা শক্তিশালী হওয়া চাই। এদের প্রেরণ করা হত, প্রথম পর্যায়ে বিভিন্ন আমীর-মালিকদের হেপাজতে রক্ষিত ক্রীতদাসশালায়। সেখানে শিক্ষা সমাপনান্তে তারা এসে পরীক্ষা দিত, এবং প্রবেশ করত বাদশাহী বাহিনীতে। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে ফিরে যেত শিক্ষায়তনে। আরও কঠোর পরিশ্রমের জন্য উপযুক্ত হতে।

সেখানে তারা দুই ধারায় শিক্ষিত হত। প্রথম : কার্যিক শ্রম, কষ্টসহিষ্ণুতা, সাহসিকতা, অশ্বচালনা, অস্ত্রশিক্ষা প্রভৃতি। এদিক থেকে স্পার্টা অথবা তার পরবর্তী রোমান গ্ল্যাডিয়েটারের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি তুলনীয়। দ্বিতীয় : শরিয়তী শিক্ষা। শিক্ষার্থীর মন থেকে তার বাল্য-কৈশোরের যাবতীয় স্মৃতি ও ঐতিহ্য সমূলে উৎপাটিত করে ফেলা হত। এ-দিক থেকে ব্যবস্থাটি ছিল অভূতপূর্ব। মিশর-গ্রীস-রোম নয়, এবার সাদৃশ্য পাওয়া যাবে হিটলারের 'গেস্টাপো' বাহিনীতে। যাকে বলে 'মগজ ধোলাই' !

শিক্ষান্তে ওরা সেনাবাহিনীতে নতুন শিক্ষার আসরে আসত। তাদের বলে : জেনিসারি। এখানেও

তাদের সেখানে সময় বিদ্যায় শিক্ষিত করে তোলা হত তার সঙ্গে স্পার্টার শিক্ষায়তনের সাদৃশ্য আছে। ওমাং এই স্পার্টার বীরবন্দ ছিল মুক্ত, তারা সম্প্রতির অধিকারী হতে পারত। জেনিসারিরা দাস, ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার বাণ্ডত।

এই ব্যবস্থাপনার একটিই উদ্দেশ্য দিক-উন্নতির পথ উন্মুক্ত। একমাত্র যোগ্যতার মাপকাঠিতে প্রতিটি সৈনিকের বিচার হত। জেনিসারিরা সেনাপতি হতে পারত, শাসনকর্তা হতে পারত, এমন কি মালিকের কন্যাকে বিবাহ করে তার পরিবারভুক্ত নিকট আত্মীয় হওয়াও অসম্ভব নয়।

সে-সব ক্ষেত্রে ঐ ক্রীতদাস বা জেনিসারি মালিকের দক্ষিণ হস্ত হয়ে উঠত। মালিকের দেহান্তে তার সন্তান নয়, ক্রীতদাসই হয়ে বেত সম্প্রদায় উত্তরাধিকারী।

'দাস'-বংশের প্রতিষ্ঠাতা কুবুউদ্দীন আইবক সেই ধারারই এক উজ্জ্বল উদাহরণ।

হিন্দুস্থানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ইসলামের সংস্পর্শে প্রথম আসে অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে। 711-12 খ্রীষ্টাব্দে, ওমানিয়দ বৃগেই ইরাকের শাসনকর্তা হজ্জাদের নৌ-সেনাপতি মহম্মদ-বিন-কাসেম নিম্ন সিন্ধ উপত্যকা জয় করে একটি ক্ষুদ্র আরব উপনিবেশ স্থাপন করেন। করাচির প্রায় পঁয়ষাট কিলোমিটার পূর্বে 'ভামবোর' নামক স্থানে মাটি খুঁড়ে সেই অদিম আরব উপনিবেশের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। তার ভিতর একটি মসজিদকেই বলা যায় বৃহত্তর ভারত উপমহাদেশে প্রাচীনতম ইসলামী স্থাপত্য-কীর্তি। মূলতান অঞ্চল 713 খ্রীষ্টাব্দে ইসলাম-অভিযানের শিকার হয়। প্রথম যুগে কিন্তু বিজয়ী-বিজিতের সম্পর্কটা অত তিক্ত ছিল না। হিন্দু ও মুসলমান ঐ মূলতান ও সিন্ধু-অঞ্চলে নির্বিবাদে বসবাস করেছে, একে অপরের চিন্তা-ভাবনার হাতফির করেছে¹। আরবীয়রা হিন্দুস্থান থেকে শিখেছে দর্শন, ভেষজ-বিজ্ঞান, জ্যোতিষ এবং অক্ষশাস্ত্র। এমন কি বাণিজ্যের সড়ক বেয়ে সে জ্ঞান-গরিমা যুরোপ-খণ্ডে নিয়ে গেছে। 'এক' থেকে 'নয়' সংখ্যা ও শূন্যের ব্যবহার এই আমলেই আরব শিখেছে ভারতের কাছে, শিখিয়েছে যুরোপকে। উত্তরণের স্বীকৃতি রুয়ে গেছে এই সংখ্যাতত্ত্বের নামের ভিতরই : 'রকম-ই-হিন্দু' : হিন্দুস্থানের সংখ্যা। আমীর খসরোর জবানীতে জ্ঞানতে পারি, আরবী জ্যোতিষ-শাস্ত্রবিদ আব্দু মশার কাশীতে এসে দীর্ঘ দশ বছর ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান শিক্ষা করে যান।

ছবিটা কদলে গেল সবুজস্বর্গের ভরত আকস্মিকের (986-987) সমসাময়িক, এক আরও বোঝি করে তাঁর পুত্র সুলতান মাহমুদের উপস্থাপিত ভারত-লুপ্তনে। দ্বিতীয় মহম্মদের জন্মস্মৃতি (1001) ভারতীয় হিন্দু রাজা জয়পাল পরাজিত হলেন; তার পশ্চিম বছর পরে লুপ্তিত হল সোমনাথের মন্দির। তবু উত্তর-পশ্চিম বঙ্গে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে তখনও ইসলাম ছাড়াপাত করেনি। আরও প্রায় দু'শ বছর পরে গজনির সুলতান মাহমুদ বিন সাম—যাঁর সহজ পরিচয় মাহমুদ ঘোরী, এলেন উপস্থাপিত ভারত-লুপ্তনের বাসনা নিয়ে; 1192 খ্রিষ্টাব্দে তরাই-এর যুদ্ধ থেকে দিল্লী অঞ্চলে হিন্দু রাজত্বের অবসান হল বলে ধরে নেওয়া যায়। মাহমুদ ঘোরীর হাতে চোহান বংশীয় পৃথ্বীরাজ—যাঁর রাজধানী ছিল দিল্লীর লাটকোট অঞ্চলে—পরাজিত ও নিহত হলেন।

ভারত জয় করে মাহমুদ ঘোরী কোনো উত্তরাধিকারী নির্বাচন করে যাননি। 1210 খ্রিষ্টাব্দে তিনি বন্ধন নিহত হলেন তখন সে অধিকার বর্তালো কুৎবউদ্দীন আইবকের উপর। কুৎবউদ্দীনের জীবন কেন উপস্থাপিত উপাদানে গল্প। তুর্কীস্থানের একজন সামান্য ক্রীতদাস হিসাবে তাঁর জন্ম। অতি শৈশবে তাঁকে নবমাত্র যুলো বরিদ করেছিলেন নিশাপুরের এক কাম্বোজসাহেব। তিনিই 'আজম-আগলান' এই ক্রীতদাস কলকটিকে লেখাপড়া শেখান, অশ্বারোহণ ও যুদ্ধবিদ্যার শিক্ষিত করে তোলেন। নিত্যন্ত ব্যক্তিগত মনোবৃত্তি থেকে—অর্থাৎ বিজয়ের সময় ক্রীতদাসটি ঘাটে ঘেঁষে মূল্য আহরণে সমর্থ হয়। কুৎব-এর জীবনে কিন্তু সেই ঐতিহাসিক-প্রয়োজনে-লব্ধ শিক্ষা প্রচলিত কার্যকরী হয়েছিল। গজনির বাদশাহে বোদিন কাম্বোজসাহেব এই ক্রীতদাস তরুণটিকে নিলামে তুললেন তখন আকৃষ্ট হলেন মল্ল মাহমুদ ঘোরী। প্রথম যুগে মাহমুদ ঘোরী যুদ্ধবিদ্যাকে নিয়োগ করলেন 'আমীর-ই-আবদ' হিসাবে—অর্থাৎ অশ্বারোহণের প্রধান কর্মকর্তা-রূপে। অরণ ছিল। কুৎব ছিলেন অতি দক্ষ অশ্বারোহী। চিনতে তুল হরনি মাহমুদ ঘোরীর। সেই সামান্য চাকুরী গ্রহণ করেই কুৎবউদ্দীন এই দুনিয়ার দুর্ভিক্ষ-সাতের খোঁজ শুরুর করেন, আর শেষ অঙ্কে দেখ গেল তিনি দিল্লীস্বর!

লাহোর থেকে গজনিতে প্রত্যাবর্তনের পথে দিল্লীস্বরী মাহমুদ ঘোরী গুপ্তচরত্বের ছুরিকার প্রাণ হারালেন। কেউ বলে 'খোবর' সম্প্রদায়ের মুসলমান, কেউ বলে 'ইসমাইলী' সম্প্রদায়ের কোনো গুপ্তচরত্ব-কের কাজ। রাজপুত গণ্ডা, বা একজন সমসাময়িক

মুসলমান ঐতিহাসিকও মেনে নিয়েছেন শোনার অন্ত কথ্য : পৃথ্বীরাজ পরাজিত ও বন্দী হবার পর নাকি নিহত হননি! বোধকরি ঐ কালের রাজ্যটিকে গজনির চিহ্নিরাখানার স্থাপন করার বাসনা ছিল মাহমুদ ঘোরীর অন্তরে—তাই তাকে অশ্ব করে নিয়ে চলোছিলেন জিম্মা। লাহোর থেকে গজনি ফেরার পথে একদিন ঐ অশ্ব পৃথ্বীরাজ সুযোগমত স্বহস্তে মাহমুদ ঘোরীর বক্ষপঙ্ক্তরে তাঁর ছুরিকাটি আমূল বিদ্ধ করে দেন। সে যাই হোক, মৃত সুলতানের মরদেহ গজনি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হল। সেখানেই সমাধিস্থ হল।

ঘোরীর কোনো পুত্রসন্তান ছিল না। কিয়মানের শাসনকর্তা তাজউদ্দীন মালিকজ্ উঠে বসলেন গজনির মসনদে এবং কুৎব পেলেন ভারত শাসনের অধিকার। আঁচরেই দু'জনের সংঘাত বাধল এবং সে গৃহযুদ্ধে বিজয়ী হলেন কুৎবউদ্দীন। উঠে বসলেন গজনির মসনদে। মালিকজ্ নির্বাসিত হলেন। কিন্তু হঠাৎ সুলতান কুৎব বিলাসের স্রোতে গা ভাসালেন। গজনির আমীর মালিকেরা বিরক্ত হয়ে নির্বাসিত মালিকজ্কে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করল। কুৎব-এর বাদশাহী খোয়াব ভাঙতে না ভাঙতেই দেখা গেল তিনি পরাজিত। কুৎব তৎক্ষণাৎ গজনির মসনদের আশা ত্যাগ করে রঙনা দিলেন হিন্দুস্থানের দিকে। কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেন, কুৎবউদ্দীন আইবক ঐ কম্বোজসাহেবের বড়বকী না করলে—মাদিরা ও নর্তকীদের নিয়ে আবুহোসেনী খোয়াবে না মাতলে হয়তো ভারত-বর্ষের ইতিহাস ভিন্ন খাতে বইত! সেই ষোলোদশ শতাব্দী থেকেই গজনি ও দিল্লী একসূত্রে বাঁধা পড়ে যেত—যা হয়েছিল, স্বর্ণকের জন্য হলেও, আরও প্রায় তিনশ বছর পরে—বাবুর বাদশাহের আমলে, এবং আকবরশাহী জয়ানাতে।

কুৎবউদ্দীন আইবক দিল্লীতে এসে নতুন রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠা করলেন—যার প্রচলিত নাম 'দাস-বংশ', যদিও ইদানিংকালের ঐতিহাসিকেরা কথাটা পছন্দ করেন না। রাজধানী স্থাপন করলেন লাটকোট-এ, অর্থাৎ পূর্বযুগের চোহান বংশীয় পৃথ্বীরাজের দুর্গ এলাকায়। বর্তমানে জায়গাটার নাম কুৎব-চত্বর (চিত্র-3.3)। সেখানে পূর্বযুগ থেকে ছিল একটি দুর্গ, প্রাসাদ, মন্দির ও নগরীর নানান জাতের সৌধ। কুৎবউদ্দীন আইবক সবপ্রথমেই নির্মাণ করতে চাইলেন একটি জাম-ই-মসজিদ। তার নাম : 'কুওও-দুস মসজিদ'। ভিত্তি স্থাপন করলেন একটি বিজয় মিনারের—যা হতে চলেছে বিশ্বের বিস্ময় : কুৎব মিনার।

শেষ করে যেতে পারলেন না। খুব সম্ভবত শব্দ বনিয়াদটুকুই গড়া হয়েছিল তাঁর অমলে। মাত্র চার বছর সুলতানী করে তাঁর দেহাবসান ঘটল। নিতান্ত আকস্মিকভাবে। কথায় বলে—সাপড়ের সাতদিন, আর সাপের একদিন। কুৎব ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ সাপড়—না, বক্ষপদ সরাসরি নয়। তাঁর বাহাদুরী ছিল চতুষ্পদ অশ্ব নিয়ে। আগেই বলেছি, অশ্বারোহণ এবং অশ্বপরিচালনায় আইবকের ছিল অসামান্য দক্ষতা। বস্তুত তিনি তাঁর কর্মজীবন শুরুরই করেছিলেন ‘আমীর-ই-আখর’ হিসাবে অশ্বাবাসের অধ্যক্ষ-রূপে। সেই অশ্বের লাগাম ধরেই মৃত্যু বরণ করলেন দিল্লীশ্বর।

লাহোরের ময়দানে আয়োজন করা হয়েছে ‘চৌগান’-এর। চৌগান ঘোড়ার পিঠে চড়ে হকি খেলা—অর্থাৎ পোলো। সুলতান তদানীন্তন ভারতের শ্রেষ্ঠ চৌগান-খেলোয়াড়। লাহোরের খেলায় সুলতান কমটা গোল দিচ্ছেলেন ইতিহাসে লেখা নেই, শব্দ লেখা আছে দুরন্ত তুরগের সওয়ার তুর্কী-সুলতান যখন ছিটকে পড়লেন মাটিতে তখন খেলা বন্ধ হয়ে যায়। আমীর মালিকেরা ছুটে গিয়ে দেখে বিচূর্ণ-শির সুলতান ইহলোক ত্যাগ করেছেন।

দিশিখজরী গ্রীকবারী সেকেন্দার শাহ যখন মৃত্যুশয্যায় তখন তাঁর অনুচরেরা বুকুে পড়ে শেষ প্রশ্ন পেশ করেছিল : মহামহিম সম্রাট! বলে যান, এই বিশাল গ্রীক সাম্রাজ্যে কে আপনার উত্তরাধিকারী?

জীবনের শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে সকোতুকে এই কোতূহলের শেষ শাস্বত জবাব দিয়ে গিয়েছিলেন ম্যাসিডোনিয়ান আলেকজান্দার : যার ক্ষমতা সব চেয়ে বেশি!

কুৎবউদ্দীন আইবককে সে প্রশ্নটা পেশ করার সুযোগ পায়নি আমীর মালিকের দল। অশ্বপৃষ্ঠ থেকে পতনমাত্র মৃত্যু হয়েছে। কুৎব পুত্রহীন। তাঁর একটি কন্যা আছে। সে বিবাহিতও বটে। কিন্তু জামাতা থাকে দূর বাদাউনে। তাকে ডেকে এনে তত্ত-তাউসে বসানোর সময় কই? ওয়সাহের দল হাতের কাছে উপস্থিত আরায বককে বসিয়ে দিল শূন্য ঘস-নদে। ‘আরায বক’ লোকটা যে কে, এ নিয়ে ঐতি-হাসিকেরা অনেক জল ঘোলা করেছেন। কেউ বলেন, কুৎব-এর দত্তক পুত্র, কেউ জারজপুত্র, কেউ বলেন ভাই। সে যাই হোক, আরায তায় প্রকৃত পরিচয়টা অচিরেই জানিয়ে দিল : সে সার্থকনামা! অর্থাৎ অপদার্থ।

তিত্ত-খিরত আমীর মালিকেরা অতঃপর আহনান

জানলো কুৎব-এর জামাতা শামসউদ্দীন ইল্-তুং-মিস্কে। শব্দরের মতো তারও বিচিত্র জীবন—সে-ও নিজ ভাগ্য নিয়ে গড়েছে। আহনানমাত্র বাদাউনের জারজপুত্র ইল্-তুংমিস্ সৈন্য এসে উপস্থিত হল দিল্লীতে। অনুরাসে পরাজিত কল্ল অরায বককে। উঠে বসল শব্দর-মশায়ের শূন্য তত্ত-তাউসে। আর-মের কী হল, সেটা লেখা বাহুল্য।

ইল্-তুংমিসেরও জন্ম ঠাঁতলাস হিসাবে, তুর্কী-স্থানে। শোনা যায়, অশ্রু দেখতে ছিলেন তিনি। বৃন্দীন্দীত, গৌরবান্বিত, সুগঠিত দেহাকর। কুৎব-উদ্দীন দাস-হাটে তাকে ক্রয় করেন, প্রথমে সহচর ও পরে বাদাউনের শাসনভার অর্পণ করেন। আরও পরে তাঁর রূপ ও গুণে মুগ্ধ হয়ে কন্যাটিকে তাঁরই হস্তে সমর্পণ করেন।

ইল্-তুংমিস্ দীর্ঘ ছাশ্বশ বছর সুলতানী করেন। অত্যন্ত দক্ষ শাসক। সমসাময়িক ইতিহাসকার কল-ছেন,^১ তাঁর মতো ধার্মিক, দয়ালু, জ্ঞানী ও ধার্মিক-দের-প্রতি-সম্মতিচিহ্ন কোনো মক্কাবন্দু কোনোদিন সিংহাসনে বসেনি।

ইল্-তুংমিসের সাম্রাজ্য-বিস্তার, শাসন-কল্যাণ, রাজস্ব-আদায় পশ্চাতি ইত্যাদি আমাদের এতিহাসের বাইরে। তাঁর স্থাপত্যকীর্তি মূলতঃ দ্বিধারার বিস্তার। এক : কুওতুল-ইসলাম মসজিদের সম্প্রসারণ এবং নিজ সমাধি। দুই : বিশ্বের বিশ্বস্ত কুৎব মিনার। এবং তিন : সুলতান ঘরী সমাধিসৌধ। প্রথমটির উপাদান হিন্দু-জৈন মন্দিরের ধ্বংসস্তুপ, দ্বিতীয়টির দার্চ্য ও পাষাণ এবং শেষোক্তটির উপাদান বৃন্দ সুলতানের পাক্কর—অশ্রু ও শোণিতে গাঁথা!

উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সুলতান ইল্-তুংমিসের কোনো দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না। মহম্মদ ঘোরীর মত তিনি নিঃসন্তান নন, কুৎবউদ্দীনের মতো অশ্রুও নন। তাঁর চার ছেলে, দুই মেয়ে। তাঁর ভিতর সুলতান শ্বাভাবিকভাবেই নিবাচন করেছিলেন কোতপুত্র শাহজাদা নাসিরউদ্দীনকে। পিতার উপবৃত্ত পুত্র—যেমন সুদর্শন, তেমনি দক্ষ। পিতার আদেশে সে একের পর এক দিশিখজর করেছেন। অবশেষে সুলতান তাকে পাঠিয়েছেন বঙ্গদেশে, প্রাদেশিক সুবেদাররূপে কিছুটা শাসনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে। সেখানেই দুর্ভাগ্যক্রমে, এক বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে শাহজাদা নিহত হলেন। তাঁর প্রাণহীন দেহ নীত হল দিল্লীতে।

বৃন্দ ইল্-তুংমিস্ জীবনে প্রথম বঙ্গদ্রোহ পেলে। তৈরী করলেন সেই পুত্রের জন্য এক সমাধিসৌধ—সুলতান ঘরী। তারও-তুংমিস্ না হলেও দিল্লীতে

প্রথম উল্লেখযোগ্য সমাধিসৌধ। অসামান্য তার গঠন-চাতুৰ্য। যা ভবিষ্যতেও কেউ অনুকরণ করেনি।

এরপর ইল্‌তুৎমিশ্, যা করলেন, তা কেউ আশা করেনি—তিনি নিজের উত্তরাধিকারী হিসাবে নির্বাচন করে গেলেন—অপর তিন পুত্রের মধ্যে কাউকে নয়, তার জ্যেষ্ঠা কন্যা, অবিবাহিতা কিশোরী মেয়ে রেজিয়া বেগমকে। সুলতানের দেহান্তে কিন্তু আমীর মালিকেরা সম্মুখের সেই নির্বাচন খোলা মনে গ্রহণ করতে পারল না। ঠিক কবে দিল্লীর তক্ত-তাউসে? ইয়া আল্লাহ! তারা রেজিয়া-বিবিকে দূরে হঠিয়ে মসনদে এনে বসালো সুলতানের অর্ধশিশু পুত্রমীর সর্বজ্যেষ্ঠ রুক্নউদ্দীন ফিরোজশাহকে। দুর্ভাগ্য তাদের এবং রুক্নউদ্দীনের—লোকটা অপদার্থ। কিশাসী, অস্থিরমতি এবং সুলতানী দারিদ্ৰ নেবার কষতারাঁহিত। দেওয়ান-ই-আমে লোকটা নিতা গর-হাজির—সুবো-সাম দাখিল-ই-হারেম হয়ে দিন কাটায়। তার উপর ঐ পুতুল-সুলতানকে শিখণ্ডী করে তার গর্তধারিনী—শাহ্‌ তুর্খান (সে কিন্তু কুবুউদ্দীনের কন্যা নয়, একজন তুর্কী গৃহসেবিকামাত্র, যাকে সুলতান ইল্‌তুৎমিশ্ পরে বিবাহ করেছিলেন) বোরখার অন্তরাল থেকে যথেষ্ট অপশাসন শূরু করল। এতদিনে আমীর মালিকেরা তাদের ভুল বুঝতে পারল—উপলব্ধি করল, কেন যেহেতু-আসীন সুলতান ঠিককে বসাতে চেয়েছিলেন তক্ত তাউসে।

রুক্নউদ্দীনকে অপসারণ করে তারা এবার রেজিয়া সুলতানাকে এনে বসালো দিল্লীর মসনদে। রেজিয়া যে এ-কাজে সম্পূর্ণ উপযুক্ত অঁচিয়েই তার প্রমাণ পাওয়া গেল। স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরোধী অমাত্য-কর্ম নুরুউদ্দীন নামে এক শিপাহীসাজারের নেতৃত্বে আক্রমণ করল দিল্লী কিল্লা। বোরখার অন্তরাল থেকে নয়, অংশুষ্ঠে রেজিয়া স্বয়ং এ বিদ্রোহ দমন করেন। বিদ্রোহী বাহিনী অর্নিতাকিল্লায় তার বশ্যতা মেনে নেয়। নুরুউদ্দীন কোনোক্রমে প্রাণ নিয়ে পালায়। ঐতিহাসিক মীনহাউস্‌ সিরাজ কলছেন, লক্ষ্যপাণতী থেকে দেওয়ানগিরি বাতলা থেকে সিদ্ধ প্রত্যেকটি প্রাদেশিক শাসনকর্তা রেজিয়া সুলতানার বশ্যতা অকুণ্ঠ-চিত্তে মেনে নিয়েছিল।

সুলতানা রেজিয়ার শাসনকাল কিন্তু অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত—মাত্র চার বছরের। আর এট কেমনদায়ক ঘটনার গভীরে আছে সেই চিরবিবর্তিত বস্তুটি : মহম্মদ।

সুলতানা রেজিয়া পূর্ণসৌন্দর্য, সুন্দরী, সুকনুকা এবং অবিবাহিতা। রাজসভার অনেকানেক উচ্চ-

ভিষায়ীর মনোগত বাসনা ঐ পাণিপীড়নের। একাধিক কারণে—যদিও সবচেয়ে বড় হেতু : দিল্লীর তক্ত-সুলেমান! রেজিয়া যদি তার ভিতর সবচেয়ে শক্তিমান রাজপুরুষটিকে সময় থাকতে বিবাহ করত তাহলে দিল্লীর তক্ত-তাউসে-আসীন এই একমাত্র ভারতীয় মহিলাটির শাসনকাল কুইন ভিক্টোরিয়ার মতো হয়তো দীর্ঘস্থায়ী হত। হতে পারল না, তার হেতু, আগেই বলছি সেই চিরমহস্যবৃত্ত বস্তুটির প্রভাবে : প্রেম।

সুলতানা যাকে হৃদয় দিলেন, তার নাম জালাল-উদ্দীন মাকুৎ। লোকটা আদৌ খানদানী নয়—ক্বীত-দাস। তার চেয়েও বড় কথা লোকটা আরবী, ইরানী, ইম্পাহানী, তুর্কী বা আফগানী নয়—এশিয়াথেন্ডের মানুষই নয়, সে কাফ্রি। আবির্সিনিয়ান। আনার-কলির বরণ নিয়ে অসংখ্য আমীরজাদা দেওয়ান-ই-খাশ্‌ আলো করে থাকে প্রতিদিন—আর সুলতানার নজর হল কি না এক আবলুশ কালো কাফ্রির উপর। ‘ছিঃ!’ বললে যেন তৃপ্ত হয় না, বলতে ইচ্ছে করে : ‘তোবা! তোবা!’

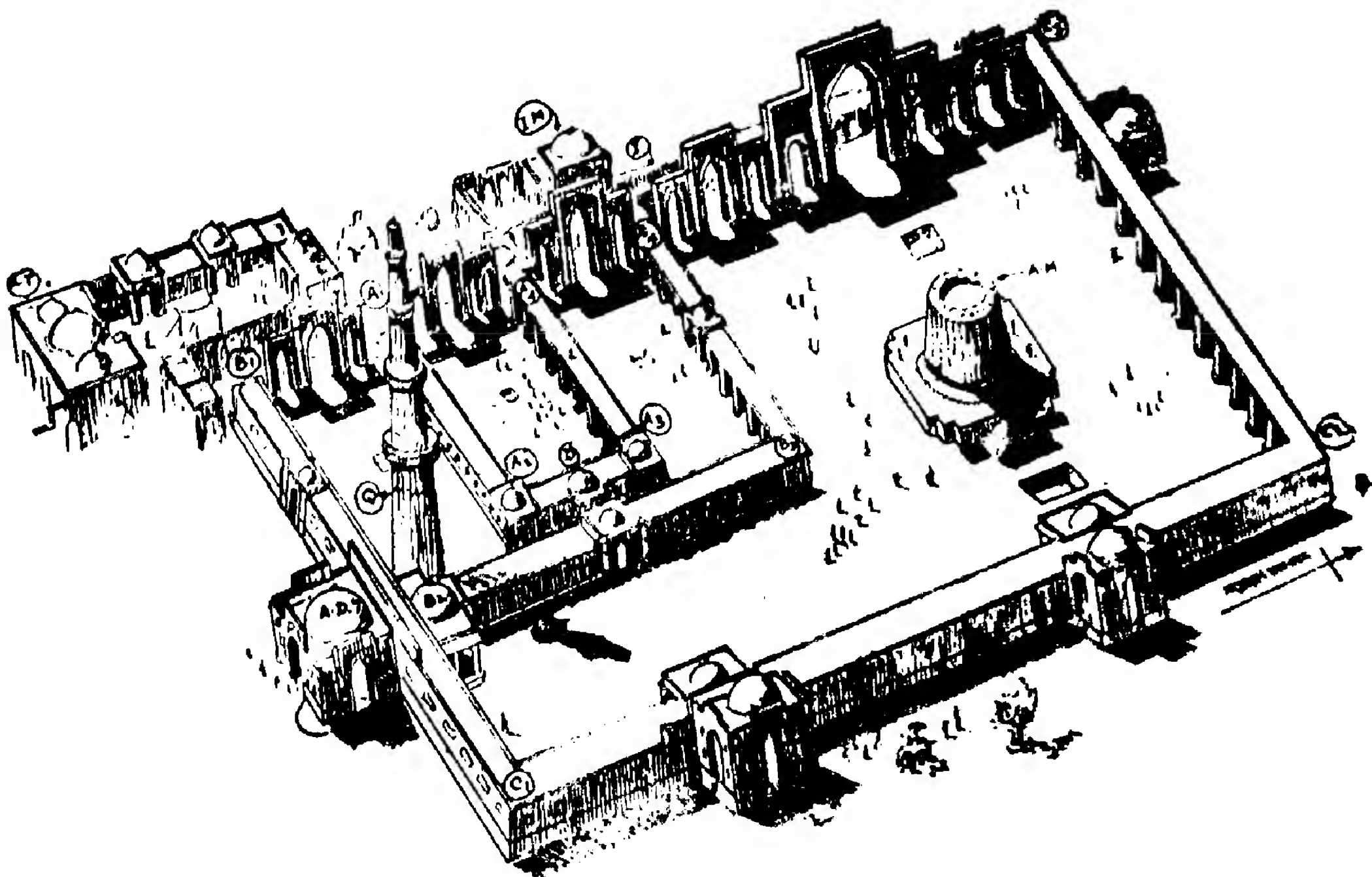
অবশ্য প্রকাশ্যে সুলতানা কোনো বেচাল ব্যবহার করেছেন এমন অভিযোগ তার শত্রুতেও করেনি। মীন-হাজ বলছেন,³ “The Abyssinian only acquired favour from the Sultana.” (আবির্সিনিয়ান ক্বীত-দাসটি শুধু সুলতানার নেকনজরে ছিল)। ফেরিস্তার একমাত্র অভিযোগ,⁴ “A very great degree of familiarity was observed to exist between the Abyssinian and the Queen, so much so, that when she rode, he always lifted her up on the horse by raising her up under the arms.” (আবির্সিনিয়ান ক্বীতদাস ও সম্রাজ্ঞীর অন্তরঙ্গতা দৃষ্টিকটু পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। যেমন বলা যায়, সুলতানা যখন অশ্বারোহণ করতেন তখন ঐ নিগ্রো যুবকটি দূই বাহুবন্ধে জড়িয়ে তাঁকে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দিত।)

গাঢ়দাহনের হেতু অনস্বীকার্য। দিল্লীর তাবৎ আমীর মালিক এবং তাঁদের সুযোগ্য যুবক পুত্রগণ কি ও-কাজটা পারে না? ঐ নাগিস্-কলির মতো হাল্কা সুলতানাকে বাহুবন্ধে বন্দী করে আলতোভাবে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দিতে?

প্রথম প্রকাশ্য বিদ্রোহ করল শাহাউদ্দীন-এর সুবেদার আপতুনিয়া। রেজিয়া সে বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে অনুভব করলেন, পয়ের ওলা থেকে মাটি সরে গেছে। যারা ছিল অনুরাগী, বিশ্বস্ত অনুচর, শূভা-

নুখায়া, তারা আজ বিপক্ষ-শিবিরে! তার মূল হেতু
মাৎস্যবধ! তবু অকুতোভয়ে সুলতানা অগ্রসর হলেন
শারহিন্দ-এর দিকে। দর্জীরা দিল্লী-বরীর-এ যুদ্ধে
বন্দিনী হলেন তিনি এবং নিহত হল তাঁর বিশ্বস্ত
পাশ্বেচর সেই আবিসিনিয়ান-আক্ষরিক এবং প্রেমের
মল্লো ক্রীতদাস, যাকুৎ।

বসিয়ে দিয়েছে তাঁর ছোটভাই মুইজউদ্দীনকে। সুল-
তানা স্বামী সৈন্যদলের নেত্রে দিয়ে উল্লসিত হলেন
দিল্লীতে। কিন্তু যে কুল তিনি করেছেন মৌকনের
প্রারম্ভে তা আর শোধরাবার তখন উপায় নেই।
দিল্লীর কাছাকাছি পৌঁছে দেখলেন ও'র স্বামীর কন্-
চরেরা ও'দের দৃজনকে ফেলে পালিয়েছে!



চিত্র-3.3 কুতুওতুল ইসলাম মসজিদ ও কুৎব মিনার।

[দ্বাদশ শতাব্দীর কল্পিত চিত্র]

কুতুওতুল মসজিদ চত্বর ..	কুৎবউদ্দীন আইবককৃত	A ₁ A ₂ A ₃ A ₄
ঐ সম্প্রসারণ ..	ইল-তুংমিস্ কর্তৃক	B ₁ B ₂ B ₃ B ₄
ঐ পুনঃ-সম্প্রসারণ ..	আলাউদ্দীন খিলজীকৃত	B ₁ C ₁ C ₂ C ₃
কুৎব মিনার ..Q	ইল-তুংমিসের সমাধি সৌধ	I.M.
আলাই মিনার ..A.M.	আলাই বরওয়ারা	A.D.
আলাউদ্দীনের সমাধি ..	A.T.	

যমদী সুলতানা বাধা হয়ে বিবাহ করলেন খিট্টোহী
অলতুনিয়াকে। কিন্তু তাতে অপরাপর আত্মীয়
মালিকদের ঈর্ষান্নি প্রশমিত হবে কেমন করে? তারা
সুলতানার অমঙ্গলচিন্তার সূচনায় দিল্লীর মসজিদে

13 অক্টোবর 1240 খ্রীষ্টাব্দে মুইজউদ্দীন বাহরাম
এর হস্তে সুলতানা রেজিয়া বন্দিনী হলেন আবার।
রাতি প্রভাত হল, উল্লসী ও উল্লসিতের মুভদেহ
পথদলিত করে বাহরাম বসলেন সিংহাসনে!

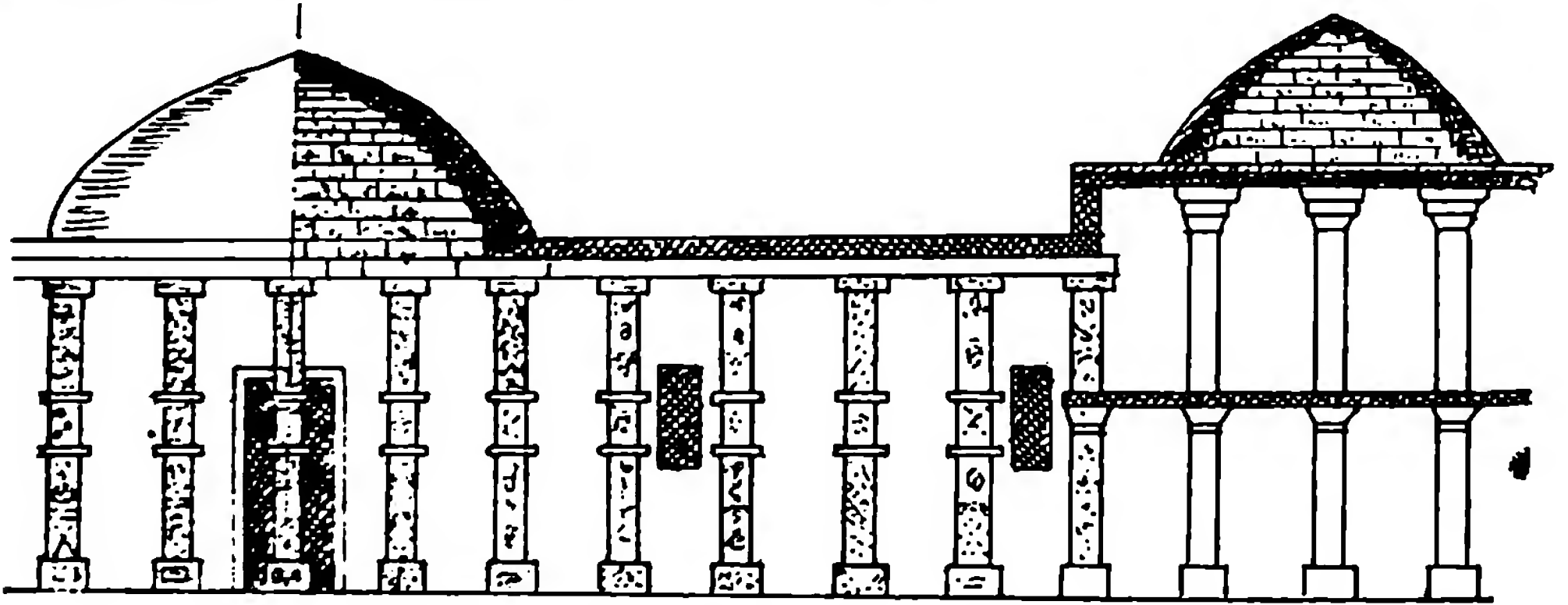
সুলতানা রেজিয়ায় এই মর্যাদিতক মৃত্যুতে একটি মহান সম্ভাবনার উপর যবানকাপাত ঘটল। রমণীর অর্থানুকূল্যে দিল্লী-আগ্রা এলাকায় একাধিক স্থাপত্য-কীর্তি নির্মিত হয়েছে—ইমামুদ্দীনের সমাধি, ইত্যদ-উদ্দৌলা, অথবা আগ্রার জাম-ই-মসজিদ। কিন্তু সেই রমণীকুল তক্ত-তাউসে সমাসীন ছিলেন না কোনদিন। প্রকাশ্য দরবারে অনবগুণ্ঠিতা দরবার করেননি : কিম্বা লৌহজালিকে নারী-হৃদয়ের যদুগাউছদাসকে স্দসংবন্দ করে সামসেরহস্তারূপে অশ্বপৃষ্ঠে লড়াই ফতে করেননি। রেজিয়ায় অকালমৃত্যু না হলে হয়তো ভারতের ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যে নতুন কিছুর দেখতে পেতাম আমরা। হিন্দুস্থানের এই একমাত্র সুলতানার সমাধি কোনটা সে-বিষয়েও পণ্ডিতেরা একমত হতে পারেননি।

পরবর্তী সুলতানেরা—মুইজউদ্দীন, আলাউদ্দীন, কাসেমুদ্দীন, কাসিমুদ্দীনের দল অপদার্থ। ইল-তুংমিসের কনিষ্ঠপুত্র নাসিরউদ্দীন ধর্মাত্মা ছিলেন। কুরাণ অনুলিপি করে নাকি তাঁর গ্রাসাচ্ছাদনের আরো-জন হত! কিন্তু দিল্লীশ্বর হবার মতো গুণ সেই পুণ্ড্রাচার ছিল না। সেটা বরং ছিল তাঁর শ্বশুর এবং ইল-তুংমিসের জামাতা গিয়াসউদ্দীন কুবনের। কিন্তু তিনিও কোন স্থাপত্যকীর্তি রেখে যেতে পারেননি। মঙ্গোল আক্রমণ প্রতিহত করতেই তাঁকে সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকতে হত। পারসিক কবি আমীর

অশ্লের স্থাপত্যকীর্তিগর্ভে দেখে নিই :

কুওওতুল-ইসলাম মসজিদ : দিল্লীর তক্ত-তাউসে আসীন হয়ে কুৎবউদ্দীন আইবক সর্বপ্রথমে নির্মাণ করালেন একটি জাম-ই-মসজিদ। যার নাম : 'কুওওতুল-ইসলাম' মসজিদ। তার অর্থ : ইসলামের শক্তি। নামকরণের মাধ্যমে নবগতের শক্তিমত্তার অসহিষ্ণু প্রকাশ ঘটেছে বলে অভিযোগ করা ঠিক নয়, কারণ ইসলাম অন্যান্য ধর্মের—হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, জরথুষ্ট্র, খ্রীষ্টান প্রভৃতির তুলনায় ধর্মপ্রচারে ভিন্ন পথের যাত্রী। বিধর্মীর অন্তর সে যুক্তি-তর্ক-প্রেম-সহনশীলতা দিয়ে জয় করতে চায়নি, তরবারির অগ্র-ভাগ দিয়ে সে সর্বদেশে, সর্বকালে ধর্মের পথে বাধা অপসারণ করেছে। ফলে, মসজিদের নাম 'ইসলামের শক্তি' হওয়া অপ্রত্যাশিত নয়।

মসজিদের প্ল্যানিং একটি আয়তক্ষেত্র। চিত্রা-চরিত পদ্ধতিতে তার পশ্চিমে মূল উপাসনাগৃহ ; পূর্বে একটি গম্বুজের (চিত্র—3.3D) ভিতর দিয়ে প্রবেশ দ্বার। তিন পাশে বারান্দা—সারি-সারি স্তম্ভের উপর সমতল ছাদ। ইসলামী স্থাপত্যে যার নাম লিয়ান (L)। চিত্র—3.3-তে কুৎবউদ্দীন আইবক নির্মিত আদি মসজিদের চৌহান্দি $A_1 A_2 A_3 A_4$ আয়তক্ষেত্রে বিধৃত।



চিত্র-3.4 কুওওতুল মসজিদের সেকশন।

কসরৌ এর রাজকাজে জীবিত ছিলেন। যার সমাধি আছে দিল্লীতে—নিজামউদ্দীন আউলিয়ার। কুবনের সমাধি সম্পূর্ণ অনদর্শন, কিন্তু তাতেই আছে এক বৈশ্ববিক চিত্রাধারা : জরত-ভৃগু-নির্মিত প্রথম প্রকৃত-খিলান, বা true-arch !

ইতিহাস আলোচনা অপরূপে স্থাপিত রেখে। এবার আসুন, আমরা প্রথম সুলতানী জমিনায় দিল্লী

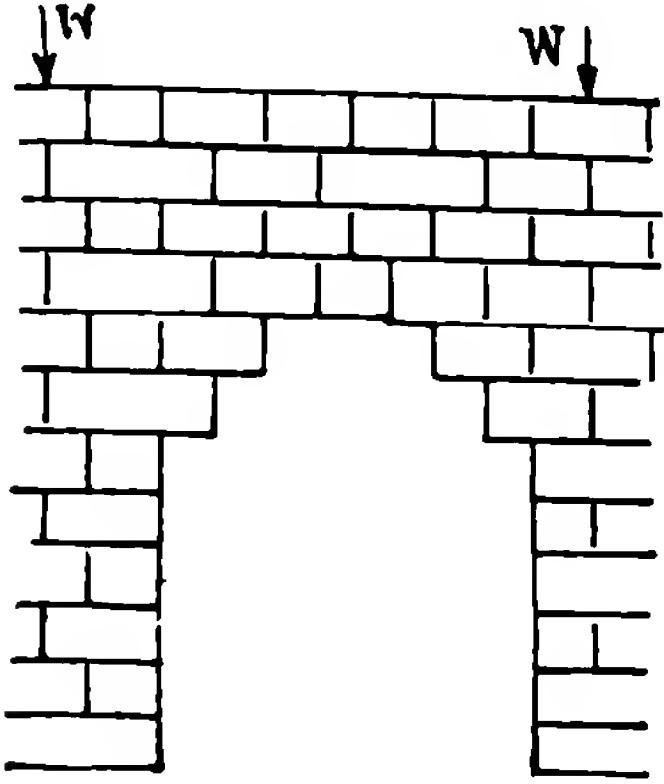
পরবর্তী সুলতান ইল-তুংমিস্ এই মসজিদটি সম্প্রসারিত করেন। তার চৌহান্দি ঐ চিত্রে $B_1 B_2 B_3 B_4$ রেখায় দেখানো হয়েছে।

তারও পরবর্তী যুগে, বস্তুত পরবর্তী খিলজী-বংশের আলাউদ্দীন খিলজীর আমলে—যার পরিচয় পরের পরিচ্ছেদে পাওয়া যাবে—এই মসজিদটি আরও বড় করে সম্প্রসারিত করা হয়। আলাউদ্দীনের মস-

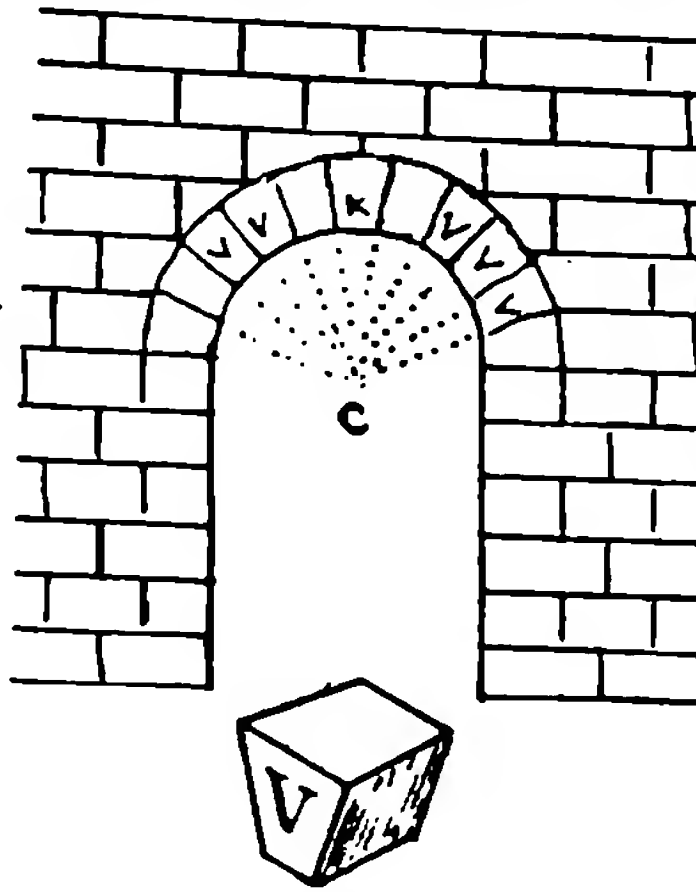
জিদ-চৌহান্দ B₁ C₁ C₂ C₃ রেখায় সীমায়িত।

চিত্র-3.3-তে কুওওতুল মসজিদ এবং তার সংলগ্ন অন্যান্য স্থাপত্যকীর্তি যা দেখতে পাচ্ছেন তা আজকের ধ্বংসাবশেষের নয়। আর্কিওলজিকাল ডিপার্টমেন্টের সূত্র ধরে পার্সি ব্রাউন সাহেবের অনুসরণে আমরা বরং আলাউদ্দীনের মৃত্যুকালের অবস্থাটা কল্পনায় দেখবার চেষ্টা করেছি। কুৎব-চত্বর ভ্রমণকালে এই নকশাটা হাতের কাছে থাকলে অনায়াসে বদ্বতে পারবেন কোন্ ভগ্নস্তূপ কার কীর্তি।

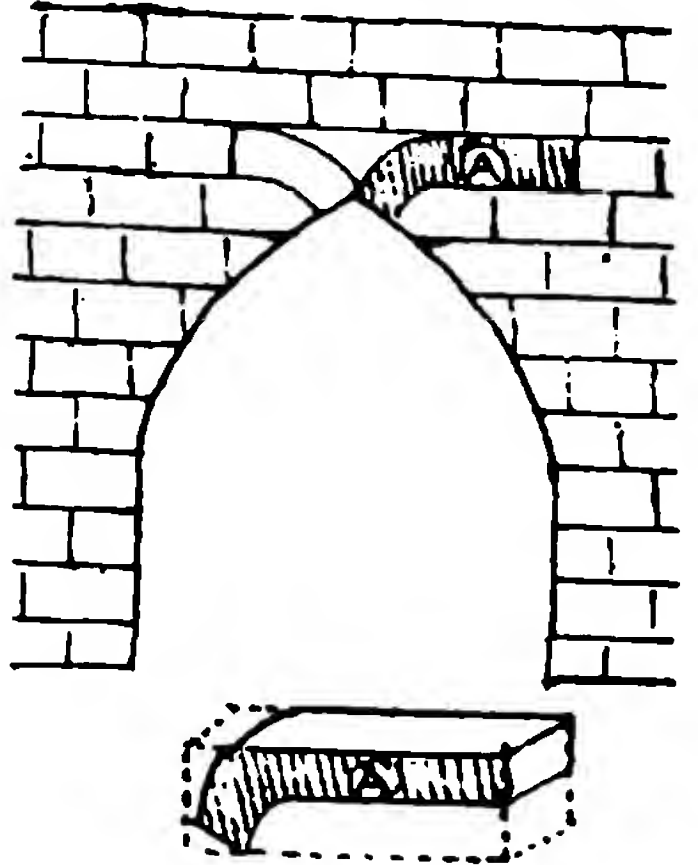
এই কুওওতুল-ইসলাম মসজিদে হিন্দু ও মুসলিম স্থাপত্যের একটি অদ্ভুত সংমিশ্রণ হয়েছে। আকবর পরিকল্পিত ফতেপুর-সিক্রিতে—আমরা পরে দেখব—হিন্দু-মুসলিম স্থাপত্যের সজ্ঞানকৃত সূচনামিলন ঘটেছে, প্রীতির বন্ধনে, দেওয়া-নেওয়ার ছন্দে ;



চিত্র-3.5 কবোঁলিঙ পদ্ধতি।



চিত্র-3.6 প্রকৃত-খিলান।



চিত্র-3.7 আইবক্কৃত খিলান।

এখানে তা নয়। এখানকার সংমিশ্রণ বিজিত ও বিজয়ীর বাধ্যতামূলক সহাবস্থান। কারণ কুৎবউদ্দীন কিল্লা রায় পিথোয়ায় সাতাশটি হিন্দু ও জৈন মন্দির ধ্বংস করেন।⁵ সেই মন্দিরের স্তম্ভগর্দল সংগ্রহ করে এই মসজিদের লিয়ানের অলিন্দ নির্মিত হয়। লিয়ানের উচ্চতা বৃদ্ধি করতে দুটি স্তম্ভকে মাথায়-মাথায় বসানো হয়েছে (চিত্র-3.4)। মসজিদ-চত্বরের উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব কোণায় আবার ঐ স্তম্ভগর্দলকে একরন্দায় সাজিয়ে শ্বিতল মোকাম বানিয়ে ছন্দবৈচিত্র্য ঘটানো হয়েছে। তাই এ মসজিদের স্তম্ভে হিন্দু-ভাস্কর্যের ছাপ—ফুল-পাতা-পাতা, পদ্ম-শঙ্খ-বণ্টা-চক্র সবই হিন্দু-শৈলীর কারুকার্য। এমন কি অভিনিবেশের সঙ্গে লক্ষ্য করলে অথবা গাইডকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিলে খুঁজে পাবেন চতুর্ভুজ দেবতার মূর্তি।

স্তম্ভ শোভিত লিয়ান নয়, এ মসজিদের সবচেয়ে দর্শনীয় বস্তুটি উপসনা-কক্ষের সম্মুখস্থ খিলান-সমন্বিত প্রস্তর-প্রাচীর ইসলামী স্থাপত্যে যার অভিধা : মাখসুদরাহ্। কুৎবউদ্দীন নির্মিত আদিম মসজিদে আছে পাঁচটি খিলান, কেন্দ্রস্থটি উচ্চতর, দু-পাশে দুটি অপেক্ষাকৃত ছোট। ইল-তুর্কিসের সম্প্রসারিত অংশে এক-একদিকে তিন-খিলান-ওরাসা দুটি মাখসুদরাহ্ এবং আলাউদ্দীন খিলজী শৃঙ্গমাগ্র উত্তরদিকে মসজিদ সম্প্রসারণকালে নির্মাণ করেন পর পর নয়টি খিলান। এর ভিতর আলাউদ্দীন-নির্মিত খিলানের চিহ্নমাত্র নেই। ইল-তুর্কিস-মাখসুদরাহ্-র সামান্য ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয় : অথচ কিম্বদন্তি-পরিচয়—সর্বপ্রথম-নির্মিত আদিম পাঁচটি খিলানের তিনটি এখনও অটুট। সেগর্দলিই এ মসজিদের সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আসুন, কাছে গিয়ে দেখা যাক। আদিম মাখসুদরাহ্-র দৈর্ঘ্য 33 মিটার, প্রভীরতা 2.56 মিটার এবং উচ্চতা 15.25 মিটার। কেন্দ্রীয় খিলানের উচ্চতা 13.5 মিটার এবং তার স্পন্ন 6.6 মিটার। স্থাপত্যের পরিভাষায় এক নিঃশ্বাসে বলতে পারি—“স্থানীয় স্থপতির পাশ্চিম-এশীয় আর্কুয়েট (arcuate) প্রথার সঙ্গে পরিচিত না থাকার ফলে এই খিলানগুলি নির্মাণে ভারতে-প্রচলিত ট্রাবিক্রেট (trabecate) প্রথার প্রয়োগ করেন।”⁶ পণ্ডিত ব্যক্তি হলেও বুদ্ধি নেবেন কী কী হল, কিন্তু আপনার আমার মত সাধারণ পাঠকের তাতে নিঃশ্বাস রুদ্ধ হবার উপক্রম হবে। তাই একটু বিস্তারিত আলোচনায় জেনে নিতে হচ্ছে ‘আর্কুয়েট’ ও ‘ট্রাবিক্রেট’ পদ্ধতি কাকে বলে।

সোজা কথায়, ভারতীয় স্থপতি 'আর্চ' বা 'প্রকৃত-খিলান' বানাতে জানতো না। তাহলে তারা দরজা-জানালায় ফোকরের উপর কী-ভাবে গাঁথনি করত? মন্দিরের চুড়ায় রেখ-শিখর, পীড়-শিখর প্রভৃতিই বা বানাতে কোন কারদার? সংক্ষেপে তার জবাব : কবেলিঙ করে। সেটা কী? কারদাটা হচ্ছে—প্রতিটি রম্মায় পাথরখানাকে সামনের দিকে সামান্য একটু ঝুঁকিয়ে কসাতে হবে। যাতে প্রতিটি রম্মায়—অর্থাৎ জমির সমান্তরাল 'লেয়ার'-এ, ফাঁকটা অল্প একটু করে কমে আসে। চিত্র-3.5-এ কারদাটা দেখানো হয়েছে। এ পদ্ধতিতে ভারসাম্য তখনই রক্ষিত হবে যখন ফোকরের বিপরীত-প্রান্তে গাঁথনির ওজন (w) চাপবে, ঝুঁকে থাকা অংশটাকে পিছন দিক থেকে চেপে ধরে রাখবে।

প্রকৃত-খিলান বা আর্চ কিন্তু এভাবে গাঁথা হয় না (চিত্র-3.6)। সেখানে ইট বা প্রস্তরখণ্ডগুলিকে বিশেষভাবে ছোট্টে নিয়ে কেন্দ্রবিন্দুর (c) দিকে মুখ করে কসানো হয়। এগুলিকে বলে ভসোর (v)। লক্ষ্য কর, তার নিচের দিকটা সরু, উপর দিকটা মোটা—অনেকটা কাঠের গজাল বা চৌকো ফুলগাছের টবের মতো। আর প্রতিটি ভসোরের পাশের রেখাগুলি কেন্দ্রবিন্দুর দিকে সম্প্রসারিত করলে তা ঐ c-বিন্দুতে গিয়ে মিলবে। সেই রেখাগুলি টানার পর হয়তো আপনার মনে পড়ে যাবে অতি শৈশবে নিজের হাতে আঁকা সূর্যোদয়ের ছবির কথা! খিলানের কেন্দ্রস্থলে সূর্যোদয় ভসোরটি জাতে কুলীন—তার নাম কী-স্টোন (k)। ভসোরগুলি এমন কারদার সাজানো হয় যাতে কেন্দ্রস্থ কী-স্টোন তার দু-পাশের ভসোর-সখীর স্কন্ধে পার্শ্বচাপে দেহতার ন্যস্ত করে। তারা দুজন আবার দু-পাশের দুই সখীর গা-টেপার্টেপ করে। কোনো ক্ষেত্রেদের কলঙ্কে কোনো উত্তম সিনেমা নায়ক এলে যেমনভাবে খবরটা চারিগুণে বার প্রায় সেভাবে ভসোরের দল পার্শ্ববর্তিনীদের চাপ দিতে দিতে ওজনটা দু-পাশের খাম্বিরায় (pier) পাচার করে।

সাতশতটি হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে মহামহিম সুলতান কুবকটখান আইবক তো কুওতুল মসজিদের লিলান, ইবান বানালেন, কিন্তু ভূমি পেলেন না। না পাওয়াই স্বভাবিক। সদস্যসম্পত্ত মসজিদটি দেখতে হল ঐ হেঁদুদের, ককেলুদের, পুতুলপুজার ঘরখানার মতো! ইসলামের শক্তি তাতে আদৌ পরিস্ফুট নয়। তাই সুলতান কুবকটখান বানাও এক মাথুসুদাহ। মদিনার মসজিদ পরগম্বর যে মসজিদটি নির্মাণ করছিলেন তাতে খলিফা ওসমান তাঁর কারিয়ে-

ছিলেন একটি মাথুসুদাহ; জেরুসালেমের ওমরের মসজিদেও (ডোম-অব-দা-রক) আছে মাথুসুদাহ। ঠিক তেমন জিনিস চাই। আর খিলানের বদনখানা হবে অর্ধচন্দ্রাকৃতি নয়, সূচীমুখ অশ্বখুঁরা কৃতি। অশ্ব নিয়েই তাঁর জীবনে হাতেখড়ি, যদিও সুলতান তখনও জানতেন না—ঐ অশ্বখুঁরেই তাঁর জীবনের শেষ নিঃশ্বাসটি বাঁধা।

স্থানীয় স্থপতি : হিন্দু অথবা সদ্য ধর্মান্তরিত হিন্দুস্থানী মিস্ত্রি পড়ল মহা ফাঁপরে। খিলান তারা না চেনে তা নয়, সাঁচীস্তূপের চারপ্রান্তে চারটি তোরণের ব্যস তখন হাজারের উপর, খাজুরাহোর কাণ্ডারীয় মহাদেও অথবা ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দিরে বিরাট-বিরাট ফাঁক তারা পূর্ণ হতে দেখেছে। সেগুঁলি কিন্তু খিলান নয়। খিলানের আকৃতিটাও তারা দেখেছে—অজ্ঞতার নানান চৈত্যে এবং ধামেক স্তূপে। কিন্তু সেগুঁলি তো ভারবাহী খিলান নয়। এ যে নিঃসঙ্গ-নায়ক—'ফ্রি স্ট্যান্ডিং' খিলান! এ খাড়া থাকবে কেমন করে?

তা হোক, তবু তাদের ধমনীতে বইছে সহস্রকের স্থাপত্য-ঐতিহ্য! অসামান্য তাদের দক্ষতা। এ সমস্যার সমাধান তারা করল অপূর্ব উদ্ভাবনীশক্তির মাধ্যমে। কোনো জোড়াতালি দেওয়া সাময়িক সমাধান নয়—সে তোরণ আজও মাথা খাড়া রেখে সালাম জানাচ্ছে সেই অজ্ঞাতনামা আবিষ্কারকদের। ওরা সমাধান করল 'ট্রাবিয়েট'-পদ্ধতিতেই—ক্লমঃ ঝুঁকে থাকা কবেলিঙ কারদাতেই। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে কারও বুদ্ধি-বার উপায় নেই সেগুঁলি আদৌ আর্চ নয়! মসজিদ সুলতান পর্যন্ত বুদ্ধিতে পারেননি—ঐ পাঁচটি খিলান নিখুঁত খিলান হওয়া সত্ত্বেও আদৌ আর্চ নয়! তারা হেঁদু-রীতিতেই খাড়া।

ফলে কুৎব-দর্শনকালে ঐ বিস্ময়কর আবিষ্কারটি খুঁটিয়ে দেখতে ভুলবেন না (চিত্র-3.7)। A-চিহ্নিত পাথরখানি কী-ভাবে কেটে বার করা হয়েছে তাও এ-চিত্রে বোঝাবার চেষ্টা করা গেছে।

এই খিলানগুলি হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের পাথর দিয়ে গাঁথা নয়—আনকোরা পাথর খুঁদে বানানো। তার গায়ে যে অঙ্গকরণ তার ইসলামী ঐতিহ্য, যদিও তা উৎকীর্ণ করেছে হয়তো কোনো হিন্দুভাস্কর, অথবা সদ্য-ধর্মান্তরিত মুসলমান। তোরণের ধার বরাবর খাড়া করে লেখা আরবী হরফে কুরাণ-সরিফের বাণীও ভারত-ভূখণ্ডে এই প্রথম রচিত হল। যার সম্বন্ধে সুলতানী-যুগের ঐতিহাসিক বসছেন, "তোরণের পাথরগায়ে কুরাণের বাণী এমনভাবে খোদিত,

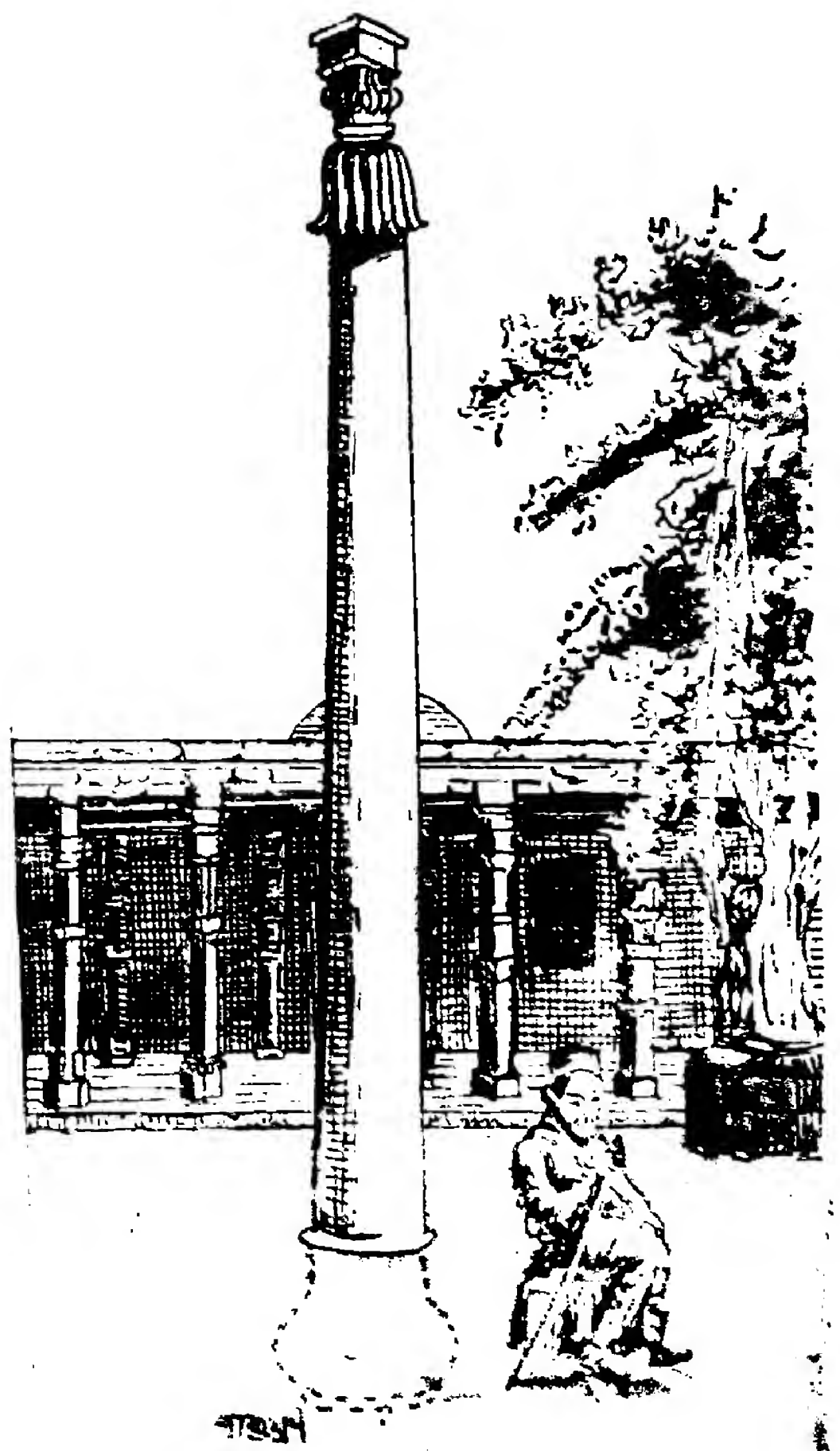
যা মোমের উপরেও লেগা যায় না। উদ্ভগামী আখর-
গুলি দেখলে দর্শকের মনে হয় কুরানের বাণী আশ্রা-
ভালার দিকে প্রসারিতবাহু হয়ে আশ্মানে উঠেছে ;
আবার পাশের লাইনের সোপান বেয়ে তা যখন জমিন-
সামিল হতে চায়, তখন মনে হয় এ যেন ঈশ্বরের বিগ-
লিত করুণাধারা।”

লৌহস্তম্ভ : মাথস্‌রাহ্‌-র সম্মুখে বিখ্যাত
লৌহস্তম্ভ (চিত্র-3.8)। উচ্চতায় 7.2 মিটার, যার
93 সেন্টিমিটার ভূগর্ভে প্রাথিত। তার গায়ে উৎকীর্ণ-
করা একটি লিপিপাঠে জানা যায়, জনৈক চন্দ্ররাজা
কোনো বিষ্ণুমন্দিরের সম্মুখে এ গরুড়খন্ডটি
নির্মাণ করান। পণ্ডিতদের মতে ঐ চন্দ্ররাজা বাস্তবে
শ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা বিক্রমাদিত্য (375-413 খ্রিঃ),
যাঁর সভাকবি ছিলেন শ্বয়ং কালিদাস। গরুড়খন্ডটি
চৌহান-বংশীয় কোনো নৃপতি-সম্ভবত পৃথ্বীরাজের
পূর্বপুরুষ অনঙ্গপাল নিয়ে এসে (কোথা থেকে জানা
নেই) তাঁর কোনো বিষ্ণুমন্দিরের প্রবেশদ্বারে স্থাপন
করেন। সুলতান কুৎবউদ্দীন সেটি তাঁর মসজিদ-
দ্বারে প্রতিষ্ঠা করার পূর্বে স্তম্ভের সর্বোচ্চস্থানে
নির্মিত গরুড়টির গর্দানা নিলেন। লৌহস্তম্ভটি
আদ্যন্ত নিখাদ লৌহ দিয়ে বানানো। অত্যন্ত আশ্চর্যের
কথা—দীর্ঘ দেড় হাজার বছর ঝড়-জলের মধ্যে পড়ে
থেকেও ঐ লৌহস্তম্ভটিতে কোনো মরিচার দাগ
নাগেলি। কী-ভাবে সে-আমলে ঐ প্রকাণ্ড লৌহ-
স্তম্ভটি নির্মিত হয়েছিল, আর কেনই বা তাতে মরচে
ধরেনি তার বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা আজও মেলেনি।
রিডার্স ডাইজেষ্ট তাঁদের সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থে বলে-
ছেন—“বিশ্বে যে-সব সমস্যার সমাধান বিজ্ঞান আজও
করতে পারেনি তার ভিতর রয়েছে এই প্রশ্নটো।

ফাগুসন-সাহেবের একটি গ্রন্থে” এ বিষয়ে একটি
কৌতুককর সংবাদ পেলাম। জেনারেল ক্যানিংহাম
তাঁর রিপোর্টে (1871) লিখেছিলেন, স্তম্ভটি মাটির
গভীরে 10.6 মিটার (35 ফুট) গাঁথা আছে! তার
মানে স্তম্ভটির মোট দৈর্ঘ্য $22+35=57$ ফুট। এ
কথা পুরাতত্ত্ব বিভাগের রিপোর্টে লিখে ক্যানিংহাম-
সাহেবের নিজেরই কেমন যেন সন্দেহ হল। বিশ্বস্ত
অনুচর পাঠিয়ে তিনি পুনরায় মাপ নেবার ব্যবস্থা
করেন এবং দেখেন স্তম্ভটির বনিয়াদ মাত্র 20 ইঞ্চি!
খলাবাহুজা, প্রাথমিক মাপ নির্ধারণের সময় ঠিকাদার
35 ফুট পাথর খননের মজুরি আদায় করতে স্থানীয়
কর্মচারীর বামহস্তে কিঞ্চিৎ মদ্রা গুঁজে দিয়েছিলেন,
যাতে তার দক্ষিণহস্ত মাপের খাতার 20 ইঞ্চিকে 35

ফুটে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়! অন্তরে ঠিক-
দার প্রভুর কী হরোঁছল পুরাতত্ত্ব বিভাগের রিপোর্টে
সে-কথা লেখা হয়নি। বোধকরি তাঁরই অসন্তোষ
পূর্ববর্তের সাক্ষাৎ এই অসম গ্রন্থকার পেরোঁছল তার
প্রথম যৌবনে বহুসত্সা পি. এল. ক্যাম্প!

অবশ্য শূন্যমাত্র বিশ ইঞ্চি বনিয়াদ নিয়ে অতবড়
একটা লৌহস্তম্ভ এত শতাব্দী কী করে খাড়া আছে
সেটাও একটা রহস্য!



চিত্র-3.8 লৌহস্তম্ভ।

য়ুরোপখণ্ডে সে-আমলে লৌহ-চাক্ষুই প্রযুক্তিবিদ্যা
বা ‘মোটোলাজি’ এতটা উন্নত হয়নি বলেই পশ্চিম-
খণ্ডের কাছে কুৎস মিনারের লৌহস্তম্ভ সমাধানের
অতীত একটি সমস্যা। এশিয়াখণ্ডে কিন্তু ঐ বিষয়ের
জড়ি আছে—মহাচীনে উকুরার পর্বতের পাদদেশে

১০৪০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত একটি অনুরূপ লৌহস্তম্ভ আছে। ১৩ ডিগ্রী, উচ্চতা ২.৩ মিটার, ওজন ৫৩.৩ টন। সেটিতেও প্রায় হাজার বছরে কোনো মরিচার দাগ ধরেনি।^{১০}

কুংব মিনার : মক্কাতে অঙ্গী লিখছেন^{১১} “কুংব মিনার পৃথিবীর সবশ্রেষ্ঠ মিনার। ইংরেজ পর্বত একথা স্বীকার করেছে। আশ্চর্য মনে হয় যে, এর পর্বতবর্তী নিদর্শন এদেশে নেই, ইরান-তুরানেও নেই। বহু স্থপতির বহু এক্সপেরিমেন্টের সম্পূর্ণ ফায়দা উঠিয়ে তাজ নির্মিত হল—কিন্তু মিনারের ক্ষেত্রে কুংব প্রথম এবং শেষ এক্সপেরিমেন্ট। এ ধরনের বিজয়-স্তম্ভ পূর্বে কেউ করেনি, কাজেই গুণাজনের বিস্ময়ের অবশিষ্ট নেই যে, হঠাৎ স্থপতি এ সাহস পেল কোথা থেকে? ক্যামিংহ্যাম, ফাগুদসন, কার, স্টিফেন, স্যার সৈয়দ আহমেদ অনেক ভেবেচিন্তেও, এর কোনো উত্তর দিতে পারেননি।”

কুংব যে ভারত-ভূখণ্ডে অনন্য সে-কথা একশবার ; কিন্তু এ-পরীক্ষা যে ইতিপূর্বে হয়নি তা কলা ঠিক নয়। উচ্চতায় এ মিনার নির্মাণ সময়ে অপরাধের ছিল, ক্ষয়ও জই। কাকরোর হাসান-মসজিদের মিনারিকা অবশ্য উচ্চতর ; কিন্তু সেটি একটি ইমারতের অঙ্গ, মিনারিকা—বিচ্ছিন্ন ‘মিনার’ নয়। সুতরাং কুংব উচ্চতায় চির অপরাজিত।

কিন্তু এ-ধরনের মিনার ইরান-তুরানে নেই—আলৌ-সাহেবের ও-কথাটা মেনে নেওয়া যায় না। ইসলামী-ঐতিহ্যে বিচ্ছিন্ন মিনার—যা নাকি কোনও সৌধের সংলগ্ন মিনারিকা নয়—তারও একটি ধারাবাহিক ইতিহাস আছে ; এবং কুংব মিনার সেই বিবর্তন ধারারই ক্রমিক ; স্বল্পমুদ্রা-স্থাপত্য-কীর্তি নয়।

আফগানিস্থানে সম্প্রতি (আলৌ-সাহেবের তিরোধানের পরে না হলেও, নিঃসন্দেহে ঐ রচনার পরবর্তী কালে) সেন্‌রোজ প্রদেশের ‘শাহ পোশ’-এ বননকালে একটি মিনারের ধ্বংসাক্ষেপ আবিষ্কৃত হয়েছে। একটি মসজিদের অন্তর্ভুক্ত সেই মিনারটি নির্মিত হয়েছিল নবম অথবা দশম-শতাব্দীর প্রথম পাদে। সামানিক্-ইটের তৈরী এই মিনারের শৃঙ্গ পাদদেশ-টুকুই আবিষ্কৃত হয়েছে—কিন্তু তার জ্ঞান কুংব মিনারের ছন্দে গড়া। একাট করে কোণ এবং একাট করে পেঙ্গাকৃতি (বাণী) পর পর সাজানো, ঠিক যেমনটি দেখতে পাই কুংব-এ। বিশেষজ্ঞ প্রী অর. সেন-গুপ্তের মতে এই মিনারটি^{১২} সর্গান-এ পূর্বদিকে নির্মিত সামানিক্-বংশের বৃদ্ধার শাসক ইসমাইল

(৪৭২-৭০৭) নির্মিত একটি মিনারের ছাপ পড়েছে। সেটিও নাকি প্রথম নয়—তারও পূর্বে নির্মিত হয়েছিল আফগানিস্থানের প্রাচীনতম মসজিদে একটি মিনার—স্থানীয় লোকেরা যার পরিচয় দিতে বলে বল্ক-এর ‘নাও গাম্বাদ’ (Naw Gumbad—‘নয়া গম্বুজ’)^{১৩}। কে জানে এ ঐতিহ্যের উৎসমুখে দুই-নদী উপত্যকার ‘জিগদুরাং’-এ যেতে হবে কি না। সেক্ষেত্রে কুংব-এর আদি-উৎস বোধকরি ওল্ড-টেস্টামেন্ট বর্ণিত ‘বাবেল’-এর আকাশচুম্বী মিনার।

কুংব মিনারের সঙ্গে শাহ-পোশ মিনারের কিছুটা সাদৃশ্য থাকলেও তার পরিকল্পনা যেন বেশি করে ছাপ ফেলেছে ‘জাম’-এ নির্মিত গীয়াউদ্দীন ঘোরীর (১১৫৭-১২০২) অপর একটি মিনার। বাস্তবিকপক্ষে, ঘোরীর অনেকগুণি বিজয় মিনার নির্মাণ করেছিলেন আফগানিস্থানের বিভিন্ন অঞ্চলে। ঘোরী-বংশের অন্যতম নিয়ামক আলাউদ্দীন (১১৫১-১১৫৭) প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক জুজ্জানী (Juzjani) লিখছেন, পরাজিত গজনির শাহ-এর হাত থেকে শাসন-ক্ষমতা গ্রহণ করে নিষ্ঠুর আলাউদ্দীন রাজধানীকে ভস্মীভূত করে, এবং ‘জাহান-সুজ’ (জাহান : পৃথিবী ; সুজ : দখল-কারী) খেতাব গ্রহণ করে একটি নতুন রাজধানীর পত্তন করে—‘ফিরোজ কোহ’। সেখানে সে একাধিক মসজিদ এবং মিনার বানায়। সবচেয়ে নৃশংস ও ন্যাকারজনক সংবাদ হল—ঐতিহাসিক জুজ্জানী বলছেন—সম্রাটের অভিলাষ অনুসারে ঐ মসজিদ ও মিনার গোঁথে তোলার সময় জল ব্যবহার করা হয়নি—মশলা প্রস্তুত করতে জলের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছিল পরাজিত বিখর্মী বন্দীদের রক্ত!!^{১৪}

এখানেই ধারাবাহিকতায় ছেদ টানা যাচ্ছে না। ফাগুদসন-সাহেব তাঁর অমূল্যগ্রন্থে^{১৫} বলছেন, কুংব-এর পূর্বদিকে গজনীতে দুটি মিনার গোঁথে তোলা হয়েছিল, যা কুংবউদ্দীন আইবক নিঃসন্দেহে দেখেছেন ভারত প্রবেশের পূর্বে। প্রথমটির নির্মাতা গজনির মাহমুদ (৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দ) ; অপরটি তাঁর পুত্র মাসুদ-এর। মরুপ্রান্তরের মাঝখানে দন্ডায়মান এ-দুটি নিঃসঙ্গ মিনারও কোনো মসজিদ বা ইমারতের অঙ্গ নয় ;—স্বয়ংসম্পূর্ণ মিনার। ফাগুদসনের দৃষ্টান্ত গ্রন্থ থেকে দীর্ঘতর মিনারটির একটি স্কেচ আঁকার চেষ্টা করছি (চিত্র—৩.৭)। দূরে মাসুদ নির্মিত দ্বিতীয় মিনারটিকেও দেখা যাচ্ছে। প্রথমোক্ত মিনারটি ৪২.৭ মিটার (১৪০ ফুট) উঁচু। মিনারটি নিচের দিকে অষ্টভুজ-দুটি বর্গক্ষেত্র একে অপরের কর্ণের সমান্তরালে ধসিয়ে বানানো। উর্দাংশ বৃত্তাকার।

কুৎব মিনারের সঙ্গে এই গজনী-মিনারের তুলনা-মূলক বিচার করলে আমরা দেখব উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়েছে 140 ফুট থেকে 242 ফুটে। দ্বিতল-পরিবর্তন বর্ধিত হয়েছে চারতলার বিস্তারে। নিচেকার দুটি বর্গক্ষেত্রের 'চার-দুকুনে আট' কোণার পরিবর্তন সম্প্রসারিত হয়েছে তিনটি বর্গক্ষেত্রের 'তিন-চারে বারো' কোণায়, এবং ঐ বারোটি কোণার মাঝে মাঝে 'বাঁশী' সংযোজিত করে।

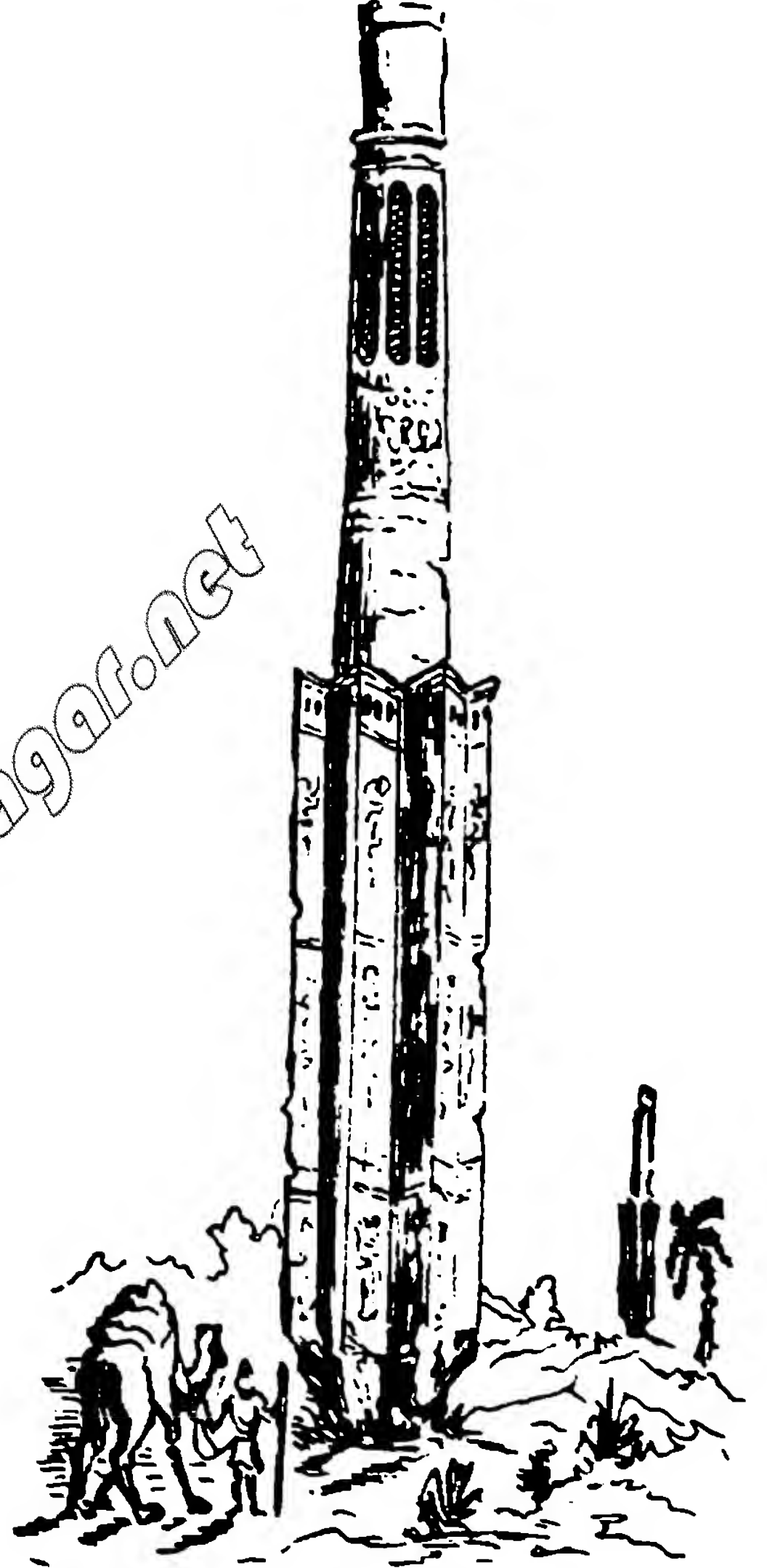
আলী-সাহেব আজকে নেই, না হলে আমি তাঁর সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিতাম।

তবে ও'র ঐটা 'নিযাস্' হক্-কথা : এ পরীক্ষায় কুৎব মিনার হচ্ছে খামোশ্। কেউ তাকে অতিক্রম করবার দঃসাহস দেখায়নি—কী উচ্চতায়, কী স্থাপত্য-সৌন্দর্যে, কী সৌন্দর্যে। একেবারে যে দেখায়নি, তাও বলা যায় না ; বরং বলব—যারা সে দঃসাহস দেখাতে চেয়েছে তারা স্থাপত্যের ইতিহাসে উপহাস্যাম্পদই হয়েছে মাত্র। যেমন, আলাই মিনারে আলাউদ্দীন খিল্জী, অথবা কলকাতার গড়ের মাঠে অষ্টারলোনি মিনারে ইংরাজ।

তাই আলী-সাহেবের উদ্দেশ্যে মাথার টুপি খুলেছি যখন তিনি ঐ তথ্যটাই ব্যক্ত করেছেন তাঁর অননুক্রমণীয় রসমন্ডিত ভাষায়, “কুৎবের সঙ্গে পাল্লা দিতে আর কোনো মিনার কখনো মাথা খাড়া করেনি। দীর্ঘ আট শতাব্দী ধরে বহু বাদশা বহু ইমারৎ গড়ে-ছেন, কিন্তু ‘কুৎবের চেয়েও ভালো মিনার গড়েনো’—এ সাহস কেউ দেখাননি। যে ইংরেজ দিল্লীতে সেক্রেটারি-য়েট, রাজ্যভবন গড়ে, কলকাতায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বানিয়ে নিজেকে অতুল বিড়ম্বিত করেছে সেও কিলঙ্কণ জ্ঞানতো কুৎবের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কোনো স্থপতির কর্ম নয়। (অষ্টারলোনি মনুমেণ্টে কেনো কলাপ্রচেষ্টা নেই বলে সেটাকে কুৎবের সঙ্গে তুলনা করা অন্যায়—সেটাকে চটকলের চোঙার সঙ্গে তুলনা করা যায়। বড়বাজারের দালানকোঠার সঙ্গে কেউ তাজের তুলনা করে না।)^{১৬}

মিনার হয়নি, কিন্তু মিনারিকা হয়েছে। অসংখ্য। কিন্তু তাদের আবির্ভাব অন্য উদ্দেশ্যে—কুৎবের সঙ্গে পাল্লা দিতে নয়, ইমারতের শোভাবর্ধন করতে। এ বিষয়েও আলী-সাহেবের আর একটি অনদ্বৈত অনবদ্য—“আপন মহিমায়, নিজস্ব ক্ষমতায় যে স্তম্ভ দাঁড়ায় তার নাম মিনার, এবং মস্জিদ, সমাধি কিম্বা অন্য কোনো ইমারতের অঙ্গ হিসাবে যে-মিনার কখনো থাকে, কখনো থাকে না, তার নাম মিনারেট—মিনারিকা। কুৎবের পর পাঠান-মোগল বিস্তার মিনারেট গড়েছে ;

কিন্তু সেগুলোও কুৎবের ধারণাচ্ছে আসতে পারে না। তাজের মিনারিকা কুৎবাবিধাত ; কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি শিল্পী সেখানে নতুনভাবে হার মেনে নিয়ে সেটাকে সাদামাটার চরমে পেঁপে দিয়ে খাড়া করেছেন। পাছে লোকে তাঁর মিনারিকার সঙ্গে কুৎবের



চিত্র—3.9 গজনী মিনার।

তুলনা করে লজ্জা দেয়। তাই তিনি সেটিকে গড়েছেন এমন ন্যাড়া করে যে, কুৎবের মন অজান্তেও কেন কুৎব-কে স্মরণ না করে। না হলে যে তাজের সবাত্ত গহনার ছড়াছড়ি তার চরখানা মিনারিকা-হস্তে 'নোয়া-টুকু'-র চিহ্ন নেই কেন? ওদিকে দেখুন, হুমায়ূনের

সমাধিনির্মাতা ছিলেন আরও ঘড়েল তিনি তাঁর ইমারতটি গড়েছেন মিনারিকা সম্পূর্ণ বজ্রন করে।”

ইংরাজীতে থাকে বলে critical appreciation—কিম্বদন্ত-মূলক মূল্যায়ন, সেটা আর আমাকে কষ্ট করে করতে হচ্ছে না। অগ্রজ সাহিত্যিক এ ডীল-এ তাঁর তুরূপের টেকাটি পেড়েই লীড দিয়েছেন। তাই বাধা হয়ে ও হাত পাশিয়ে আমি বরং সাদামাটা ভাষায় কুংবের বহিঃরূপ ও গাণিতিক পরিচয়টা দিই :

অনুমান করা হয় প্রথম তল পর্যন্ত (29.5 মিঃ) পৌছবার অনেক পূর্বেই কুংবউদ্দীন আইবকের এন্টেকাল হয় ; বাকি তিনটি তলা গোঁথে তোলেন তাঁর দামাদ ইজ্জুৎমিস্। সর্বসমেত উচ্চতা 71.24 মিটার বা 234 ফুট। ভূমি-অংশে বৃত্তের ব্যাস 14.32 মিটার, এবং উপরের অংশে 2.75 মিটার। সর্বসমেত সোপান সংখ্যা 379 ; মিনারটি নাকি দু-দুবার বজ্রপাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ; যথাক্রমে 1326 এবং 1368 খ্রীষ্টাব্দে। প্রথমবার মুহম্মদ তুগলক এবং দ্বিতীয়বার ফিরোজশাহ তুগলক সেই ক্ষতিগ্রস্ত মিনারের মেরামতি করান। আলাউদ্দীন খিলজীও কিছু মেরামতি করান। আরও পরে 1503 খ্রীষ্টাব্দে সিকান্দার লোদী মিনারের সর্বোচ্চ তলটি পুনরায় মেরামতি করান। প্রাথমিক অবস্থায় এটি চারতলা মিনার ছিল ; ফিরোজশাহ মেরামতির সময় সর্বোচ্চ তলটি দু-ভাগে বিভক্ত করেন—ফলে বর্তমানে ওটা পাঁচতলা। প্রাথমিক অবস্থায় সবটাই ছিল লাল-পাথরের গাথনি ; ফিরোজশাহ মেরামতির সময় উপরের দুটি তলা সাদা মার্বেল দিয়ে তৈরী করান।

কুংবের একতলা, দোতলা, তিনতলার ‘সেক্‌শানাল প্ল্যান’ কেমন হবে তা চিত্র—3.1-এ এঁকে দেখাবার চেষ্টা করেছি। অর্থাৎ মনে মনে জমির সমান্তরালে করাত চালিয়ে কুংবকে বিভিন্ন তলার ‘খোড়-কাটার’ মতো কেটেছি। বাঁরা মনে মনেও কুংবকে করাত দিয়ে কাটে সাহস পাকেন না, তাঁরা না হয় মনে করুন—গাথনি ঐ A-A অথবা B-B রেখা পর্যন্ত ওঠার পর বিরিণ্ডিবাবার আশীর্বাদে স্ফুটনশব্দে ঝরোদশ শতাব্দীতে হাজির হয়ে ভার্যার উপর চড়ে নির্ণয়মান কুংবের বদনখানি নিচু দিকে মূখ করে দেখছেন।

নিচের তলার চম্বিশটি পল-তোঙ্গা। পর্যায়ক্রমে একটি গোলাকৃতি, একটি কোণ-বিশিষ্ট। আলী-সাহেবের ভাষায় “একটা বাঁশ, একটা কোণা পর পর সাজানো।” তার মানে নকশায় দেখুন পর পর দুটি বাঁশ কেন্দ্রবিন্দুতে 30 ডিগ্রি কোণ রচনা করছে। আর তাইই দু-আখানা করে কোণপালি সাজানো।

দ্বিতলেও চম্বিশটি খাঁজ, প্রতিটি খাঁজ কেন্দ্রে 15 ডিগ্রি কোণ রচনা করছে। এবং তারা গোলাকৃতি বা ‘বাঁশ’। তিন তলাতেও সেই চম্বিশ ভাগের ছন্দ, অর্থাৎ 15 ডিগ্রির ব্যবস্থাটা পাকা আছে, যদিও এবার বাঁশ খোয়া গেছে, সবই কোণাকৃতি। এর উপরে তুরীয় অবস্থা—না বাঁশির তান, না কৌণিক অন্তরায় ; স্রেফ গোলাকার। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই ছন্দ বদলাবার অনুপ্রেরণাটাও এসেছে গজনীর মাহমুদী মিনার থেকে, যদিও ব্যাপকতায়, বিন্যাসে, এবং জ্যামিতিক সূক্ষ্মতায় কুংব তুলনামূলকভাবে তার পূর্ব-সূরীকে অনেক অনেক পিছনে ফেলে গেছে।

মিনার যে ক্রমশঃ মোটা-থেকে-সরু হয়ে উঠেছে তার মৌল হেতু নিঃসন্দেহে দৃঢ়তা বা ভারসাম্যের প্রয়োজনে। যে ইমারৎ তলায় চওড়া, উপরে সরু তা দীর্ঘস্থায়ী ; যেমন মিশরের পিরামিড—ঝড়ে উল্টে পড়ার সম্ভাবনা সেখানে আদৌ নেই। এখানে কিন্তু স্থপতি ভারসাম্যের প্রয়োজনের চেয়েও এই সরু-মোটর ছন্দটা বেশি প্রকট করেছেন। উদ্দেশ্য : দর্শককে বিভ্রান্ত করা ! অর্থাৎ মিনার বাস্তবে যত উঁচু, এজন্য তার চেয়েও সেটা বেশি মনে হয়। যে ছন্দে দিল্লীর জাম-ই-মস্জিদ, বা তাজের মিনারিকা মোটা-থেকে-সরু হয়েছে এখানে সেই ছন্দটা আরও প্রকট।

কুংব সম্বন্ধে একটি বিভ্রান্তিকর তথ্য কেউ কেউ প্রচার করতে উন্মুখ—“কুংব একটি হিন্দু মানমন্দির।” নিতান্ত অবাচীন উক্তি বলে এ-প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে পারতাম, কিন্তু কয়েকজন স্থাপত্যবিদ্যায় পণ্ডিতের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, এ-জাতীয় সংশয় তাঁদের মনেও আছে। কুংবের গায়ে খোদাই-করা কুরানের বাণীকে তাঁরা মনে করেন পরবর্তী সংযোজন ; নিতান্ত ইস্লামী-ঐতিহ্যের ‘স্ট্যাংলেক্টাইট’—যা ভার-বাহী অঙ্গ হওয়ায় পরবর্তী সংযোজন হতেই পারে না—দেখেও তাঁরা স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেন না। ওঁদের ধারণা এ মিনার আদিতে নির্মাণ করিয়েছিলেন পৃথ্বীরাজ চৌহান—দ্বিবিধ উদ্দেশ্যে। এক : জ্যোতির্বিদ্যা ; মানমন্দির হিসাবে। দুই : যাতে তাঁর বিধবা কন্যা মিনার-চূড়া থেকে প্রতীহ যমুনা দর্শন করতে পারেন। কুংব থেকে যমুনার যে তদানীন্তন দূরত্ব তাতে প্রাক্-গ্যালিলেও যুগে যে মিনার-চূড়া থেকে যমুনা দর্শন সম্ভবপর নয়, এটাও তাঁরা মানতে রাজী নন। ফলে, এবিষয়ে কিছু আলোচনা করতে হল।

এ-রকম একটা প্রান্ত ধারণার মূলে আছেন কিছু ভারত-অভিমানী তথাকথিত হিন্দু পণ্ডিত, যাদের মূলমন্ত্র একটি প্রচলিত প্রবাদে বিধৃত :—“যা নাই

ভারতে, তা নাই ভারতে।” অর্থাৎ মহাভারতে যে কথা বলা হয়নি তা অতীতেও ছিল না এবং বর্তমান ভারত-বর্ষে থাকতে পারে না। তাঁদের মতে এয়ারক্রাফট হচ্ছে পদুপকরণের বিবর্তিত রূপ, এ্যাটম-বোমা পাশ্চাত্য ব্রহ্মাস্ত্রের। হিন্দু ঐতিহ্যের এই কট্টর ধনুজাধারীদের মধ্যে সাম্প্রতিককালে খ্যাতিলাভ করেছেন শ্রী পি. এন. ওক। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির নামেই তাঁর চিন্তাধারার পরিচয়। যথা : (i) Delhi's Red Fort is Hindu Latkot, (ii) Lucknow's Imambara are Hindu Palaces, (iii) Some Blunders of Indian Historical Research, (iv) The Taj Mahal is a Hindu Temple, (v) Who Says Akbar was Great?—গ্রন্থগুলি আদ্যন্ত পাঠের মত সময়, কৌতূহল ও মানসিকতা আমার নেই—কিছু কিছু পাতা উল্টে দেখেছি মাত্র। গ্রন্থাগার থেকে সংগৃহীত শেষোক্ত পুস্তকে পূর্ববর্তী পাঠকের একটি কৌতুককর মন্তব্যের কথা মনে পড়ছে। প্রথম পৃষ্ঠায় শিরোনামের পরে পেন্সিলে লেখা আছে—বোধকরি গ্রন্থকারের প্রশ্নের জবাবে : “Entire Forest, Except Oak !”

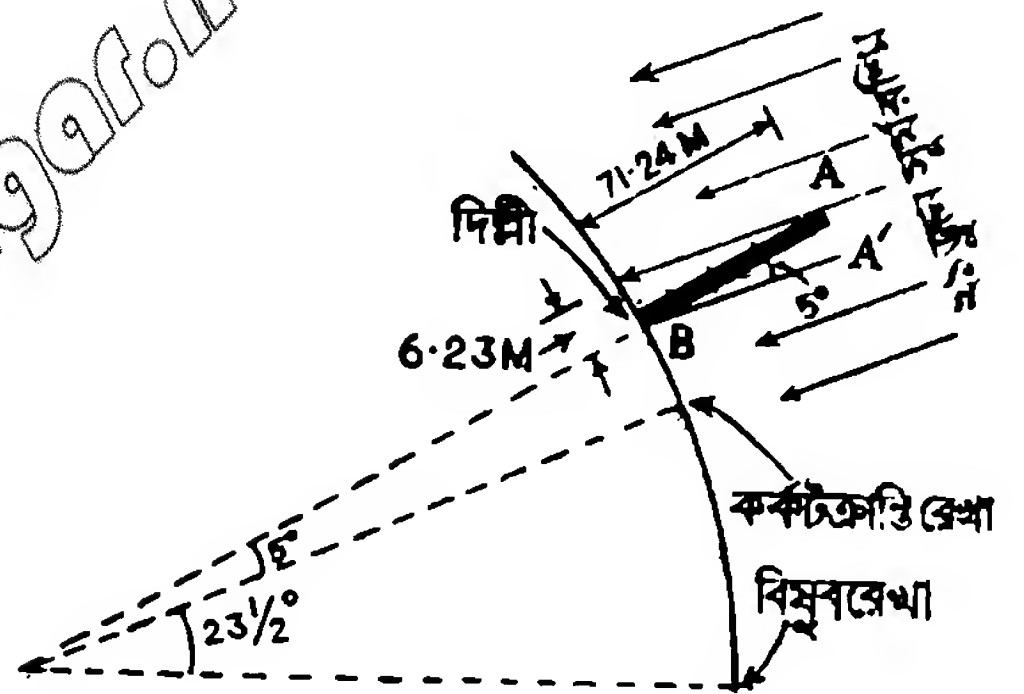
এক শ্রেণীর হিন্দু পাঠক যে এ-জাতীয় গ্রন্থ পাঠ করে আত্মশ্লাঘা অনুভব করেন ও আনন্দ পান এ-কথা অস্বীকার করা যায় না। না হলে প্রকাশক কেন ঐ ধরনের বই পর পর ছেপে যাবেন? দুঃখ হয় যখন দেখি ঐ-সব তথ্যের উপর নির্ভর করে সত্যিকারের ক্ষমতাবান লেখক ও পণ্ডিত তাক লাগাবার চেষ্টা করছেন। ব্যাপক আলোচনা পরিহার করে আমাদের আলোচ্য প্রসঙ্গে ফিরে যাই। কুংবের প্রসঙ্গে।

কয়েক বছর পূর্বে (তারিখ বলতে পারছি না, আমার কাছে যে কাটিংটা আছে তার তারিখটা পড়া যাচ্ছে না) ম্বনামখ্যাত বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রাবন্ধিক শ্রী অরুণরতন ভট্টাচার্য আনন্দবাজারের রবিবাসরীয় অংশে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন : “কুতুব মিনার কি একটি হিন্দু মানমন্দির?” সেই প্রবন্ধে ও-পক্ষের যে যুক্তিগুলি দেখানো হয়েছে সেগুলি আলোচনা করলেই আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারব।

অরুণবাবুর সিদ্ধান্ত দাঁড়িয়ে আছে একটি অত্যন্তুত তথ্যের উপর—কুংব মিনার আলম্ব নয় (ভাটিকাল নয়) দক্ষিণদিকে 5 ডিগ্রি হেলে আছে। এটি নাকি ঘটনাচক্রে হয়নি, স্থপতিবিদ সজ্ঞানে মিনারকে দক্ষিণদিকে হেলিয়ে বানিয়েছেন—যেহেতু সেটি একটি হিন্দু মানমন্দির। মূল্যবোধে তিনি বলছেন, “আপনারা ইটালী দেশের পীসা নগরীর Leaning Tower বা হেলানো স্তম্ভের কথা শুনেছেন।

সঙ্গে সঙ্গে কী-ভাবে এটা সম্ভব হওয়ার অস্বাভাবিক হয়েছেন, এবং পরে, সহজে এটি প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয় মনে করে দীর্ঘশ্বাস গেলেন। কিন্তু দীর্ঘশ্বাস গেলার কিছু নেই। কুংব মিনার আমাদের দেশের মাটিতে ঐ জাতীয় একটি হেলানো স্তম্ভ। এটি ভূমির সঙ্গে লম্বভাবে না থেকে দক্ষিণদিকে 5 ডিগ্রি কোণ রচনা করে অবস্থান করছে।... কিন্তু দিল্লীর পটভূমিতে এই যে মানমন্দির, এটির 5 ডিগ্রি দক্ষিণে হলে থাকার যৌক্তিকতা কোথায়? যৌক্তিকতা আছে...”

অতঃপর শ্রীভট্টাচার্য পাঠককে বদিকরে দিয়েছেন—সজ্ঞানকৃতভাবে মিনারকে দক্ষিণদিকে হেলিয়ে নির্মাণ করানোর উদ্দেশ্য : যাতে প্রতিবছর একুশে জুন তারিখে মধ্যাহ্নকালে মিনারের কোনো ছায়া না পড়ে। যদি নাই পড়ে, তাতে কোন্ চতুর্ভুজ লাভ হবে? সে-কথায় পরে আসছি। আপাতত বুঝে নিই, কেন ঐদিন, ঐসময়ে ছায়া পড়বে না।



চিত্র-3.10 কুংব কি হেলানো মিনার?

একুশে জুন তারিখে মধ্যাহ্নকালে সূর্য ককটিকান্তি রেখার উপর 'জেনিথ'-এ থাকবে। ফলে, পৃথিবীতে ককটিকান্তি রেখার উপর কোনো সূউচ্চ মিনারের ছায়া মধ্যাহ্নকালে ঠিক তার পাদদেশেই পড়বে। ছায়া দেখা যাবে না। কিন্তু দিল্লীর অক্ষাংশ 28 1/2 ডিগ্রি উত্তর। অর্থাৎ ককটিকান্তি রেখা (23 1/2 ডিগ্রি) থেকে 5 ডিগ্রি উত্তরে। সুতরাং, দিল্লীতে অবস্থিত কোনো মিনার যদি দক্ষিণদিকে 5 ডিগ্রি হেলে থাকে তাহলে তার ছায়া ঐদিন, ঐসময়ে পড়বে না। এ-পর্বন্ত অরুণ-রতনবাবুর সঙ্গে আমরা একমত। যদিও এখনও একটু সন্দেহ আছে তাঁরা চিত্র-3.10 দেখে ততটা বুঝে নেবার চেষ্টা করুন। B-বিন্দু হচ্ছে দিল্লী নগরী। মিনার যদি আলম্ব রেখার (BA) সঙ্গে 5

ডিগ্রি কোণ রচনা করে BA' অবস্থানে থাকে তাহলে সেটা ত্রৈধীন, ঐসময়ে সূর্য রশ্মির সমান্তরাল হয়ে যায় - ছায়া পড়ে না।

এখন আলোচনা স্থিতিধারায় বইবে। এক : যে প্রশ্নটা মূলতুবী আছে, অর্থাৎ, তাতে কোন চতুর্ভুজ লাভ হবে? দুই : অরুপরতনবাবু এ-তথ্য কোথায় পেলেন?

প্রথম প্রশ্নটা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। জ্যোতির্বিদ্যার কোন পরীক্ষার প্রয়োজনে অতবড় মিনারকে হেলানো হল? প্রয়োজন যদি থাকে তাহলে দিল্লী, কাশী, উম্মায়িনী বা জয়পুরের যন্ত্র-মন্ত্রে এমন হেলানো-মিনার তৈরি করা হল না কেন? বরং মিনার যদি আলম্ব হত তখন মাপে দেখা যেত ছায়ার দৈর্ঘ্য 6.23 মিটার। যে-হেতু মিনারের দৈর্ঘ্য 71.24 মিটার তাই জ্যোতির্বিদ আঁকি কষে কলতে পারতেন দিল্লীর অক্ষাংশ $= \tan^{-1} (6.23/71.24) = \tan^{-1} 0.0874 = 5$ ডিগ্রি উত্তর (ছায়া যেহেতু উত্তরে পড়েছে)।

দ্বিতীয় প্রশ্নটা আরও বিভ্রান্তিকর। পাঁচ ডিগ্রি দক্ষিণে হলে থাকার তত্ত্বটা অরুপরতনবাবু কোথায় পেলেন? তিনি নিজেই থিওডোলাইট ঘাড়ে করে দিল্লী গিয়ে মাপেছেন, তা বলেননি; আর্কিওলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের গ্রন্থ ঘেঁটে এ-তথ্য উদ্ধার করেছেন কিনা সে-কথাও জানাননি। এমন কি শ্রী পি. এন. ওকের 'Some Blunders of Indian Historical Research' থেকে সংগৃহীত কিনা তাও বলেননি। শুধু আশ-বাক্যের মতো তথ্যটা ঘোষণা করেছেন।

আমি সহজলভ্য গ্রন্থে জবাব পাইনি। অথচ অনেক পণ্ডিতই মৌখিক জানাঙ্গেন, কুৎসব যে হলে আছে এটা তাঁরা শুনছেন। পাঁচ ডিগ্রি কিনা তা কলতে পারেন না। কথা হলে ডাইরেক্টর জেনারেল, আর্কিওলজিকে প্রশ্নটা পেশ করি। তাঁর দপ্তরের অফিসার শ্রী আর. সেনগুপ্ত আমাকে অনুগ্রহ করে জানাঙ্গেন যে, মিনারটি $0^\circ-46'-48''$ হলে আছে (দক্ষিণে কিনা তা-ও বলেননি)¹⁷। সাদা কথায়, একদিকে পৌনে এক ডিগ্রি হলে ক্ষেত্র। পৌনে এক ডিগ্রিকে পাঁচ ডিগ্রি বলা মানে অশ্লীল প্রায় সাতশ পারসেন্ট ভুল—কারাক আস্-মান-জমিন! নিঃসন্দেহে ফাউন্ডেশন বা বনিয়াদ একদিকে কস বাওয়ার এটা হয়েছে। কোনো মানমন্দির-স্থপতির সম্মানকৃত কৃতিত্ব নয়!

অরুপরতনবাবু তাঁর প্রবন্ধের উপসংহারে কলছেন, “কুৎসব মিনার কারা নির্মাণ করেছেন, সে-কথা সঠিক কলতে পারি না। কিন্তু বিতর্কমূলক সে আলোচনার বাহিরে গিয়েও একথা নিঃসংশয়ে কলা যায় যে,

মিনারটিকে মানমন্দির হিসাবে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে।”

অবশ্য “নিঃসংশয়ে” এই স্থিতিসিদ্ধান্ত ঘোষণা করার পূর্বে লেখক আরও দুটি যুক্তির অবতারণা করেছেন। যথা :

(i) “এর ভিত্তিভূমি সাতাশটি বাহুবিশিষ্ট একটি বহুভুজ। বাহুরঙ্গটিও সাতাশটি অর্ধবৃত্তাকার ও কৌণিক বিভাগে বিভক্ত আছে।... হিন্দু জ্যোতিষ শাস্ত্রের ক্ষেত্রে সাতাশ সংখ্যাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা জানেন যে, চান্দ্র-তিথি সংক্রান্ত বিভাগের যে সাতাশটি নক্ষত্র আছে, সেটি হিন্দু উদ্ভাবন বলেই স্বীকৃতি পেয়েছে...”

এ-ক্ষেত্রে থিওডোলাইট যন্ত্র নিষ্প্রয়োজন, এক থেকে বারো গুণতে পারলেই বদ্বতে পারবেন তথ্যটি ভ্রান্ত। ভিত্তিমূলে আছে বারোটি কোণা ও বারোটি বাঁশি, একুনে চম্বিশ ভাগ। ‘হিন্দু উদ্ভাবন বলে’ চম্বিশকে সাতাশ বলে ধরা হয়েছে; যেমন পৌনে এক ডিগ্রিকে পাঁচ ডিগ্রি।

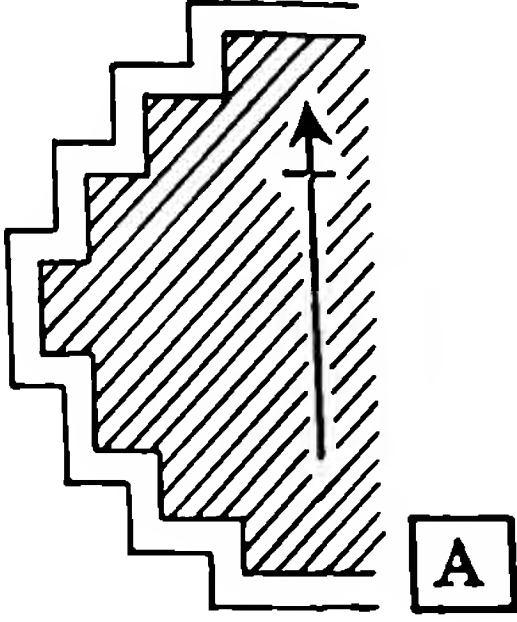
(ii) “মিনারে সাতটি তল”... (সপ্তাহের সাত-দিনের সূচক)—এবারেও গুণে দেখছি পাঁচটি তলা, আদিতো ছিল চারটি!

হিন্দু-ঐতিহ্যের ধরুজাধারীরা যত কুযুক্তির অব-তারণাই করুন না কেন, যে তথ্যটি অরুপরতনবাবু ‘নিঃসংশয়ে’ ঘোষণা করেছেন সেটিই অগ্রাহ্য; আর যেটিকে তিনি ‘বিতর্কমূলক’ বলেছেন সেটিই ধ্রুব সত্য : এ স্থাপত্য ইসলামী।

কুৎসব-প্ল্যানিং-এর যে মূল আকর্ষণ, তিনটি বর্গ-ক্ষেত্রে কেন্দ্রের বরাবরে ঘুরিয়ে ‘কৌণিক-কোণ’ উৎপন্ন করা—এটিকে কেউ কেউ বলেছেন নিছক ইসলামী রীতি। কারণ প্রাক্-কুৎসব হিন্দু শৈলীতে ‘কৌণিক-কোণ’ ছিল না, ছিল—‘সমান্তরাল কোণ’। আলোচনার প্রয়োজনে শব্দ দুটিকে পয়দা করলাম—ফলে একটু বিশদভাবে ব্যাখ্যা করতে হচ্ছে।

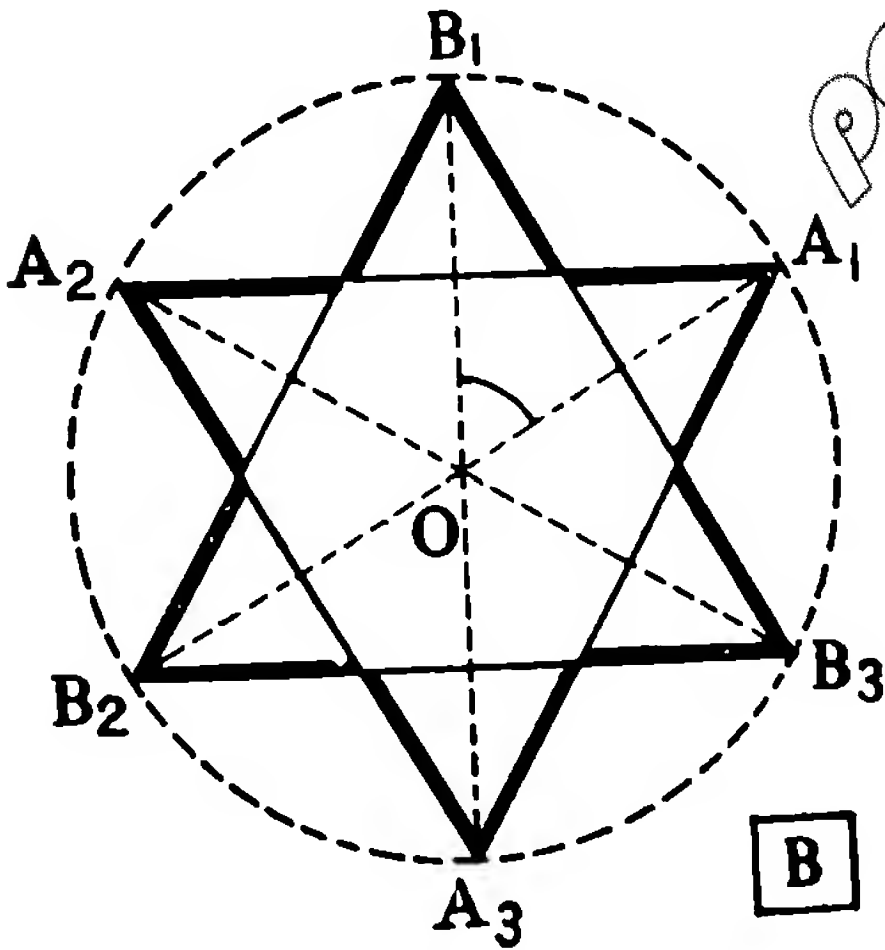
আহিওল, বাদামী, পাটুকদল, কলিঙ্গ, খাজু-রাহো প্রভৃতির যে-কোনো মন্দিরে লক্ষ্য করে দেখুন—তাতে যে অসংখ্য কোণ বা খাঁজ আছে তাদের বাহু-গর্দা হয় পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা, নয় উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। যেমন দেখা যাচ্ছে চিত্র—3.11 A-তে। অর্থাৎ, পাশা-পাশি দুটি কোণ-এর বাহু, ভিতরের দিকে যে-কোণ উৎপন্ন করেছে, তার মাপ 90 ডিগ্রি বা এক সমকোণ। এদেরই আমি ‘সমান্তরাল কোণ’ বলেছি। অপরপক্ষে, কুৎসবের বারোটি কোণ বাহিরদিকে সমকোণ রচনা

করলেও ভিতর দিকে সমকোণের চেয়ে বড় কোণ উৎপন্ন করেছে—কারণ কোণগুলি কেন্দ্রাবিন্দুর সঙ্গে যোগকারী রেখার দূ-পাশে সমানছন্দে বানানো। একেই আমি আলোচনার খাতিরে ‘কৌণিক-কোণ’ বলাছি।



চিত্র—3.11 A নাগর স্থাপত্যে মন্দির-ভূমিক-শায় সমান্তরাল কোণের সাধারণ ছন্দ।

স্থাপত্যে এই ‘কৌণিক-কোণ’-এর প্রাচীনতম নিদর্শন দেখতে পাচ্ছি মিশরের সম্রাট তৃতীয় রামেসিস্-এর ঢালিকার মোহর-চিহ্নে। দুটি সমকোণী ত্রিভুজ—একটি অপরটির উপর এমন সুষম ছন্দে বসানো, যাতে

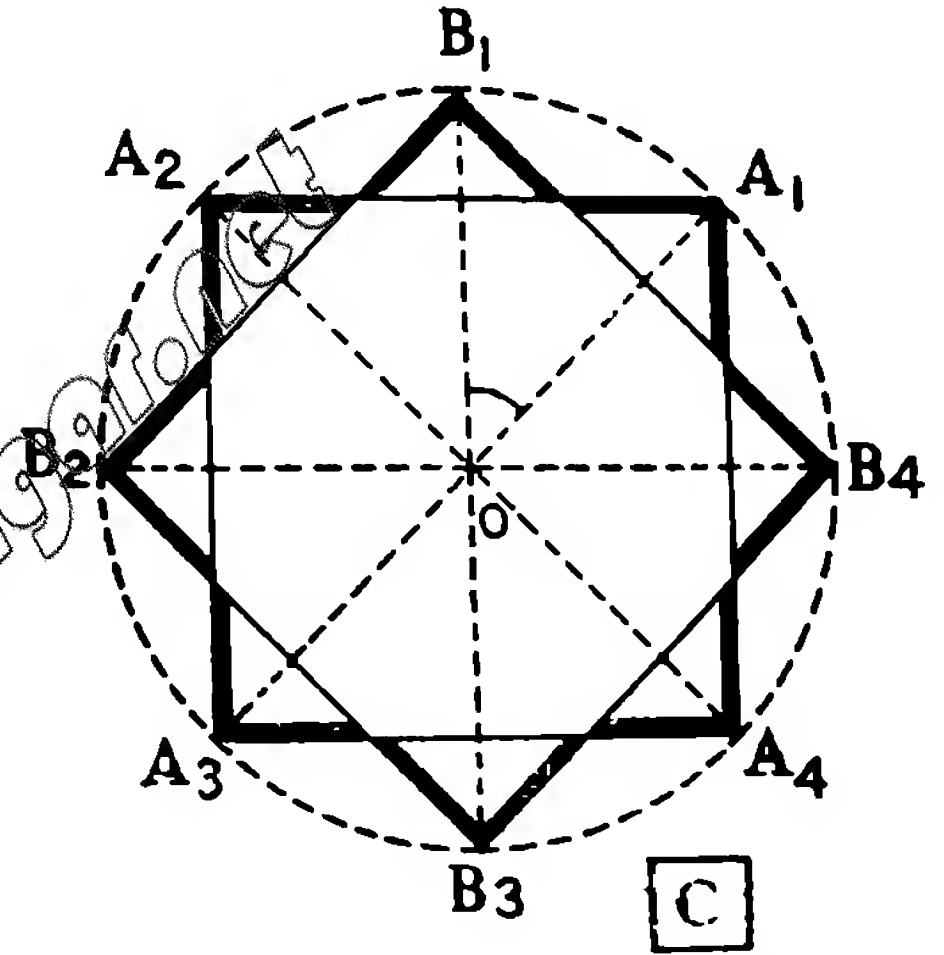


চিত্র—3.11 B মিশরীয় স্থাপত্যে সম্রাট তৃতীয় রামেসিস্-এর ঢালিকার নকশা (খ্রীঃ পূঃ ১২ শতাব্দী)—দুটি সমকোণী ত্রিভুজ; এখানে $\angle A_1OB_1=60$ ডিগ্রি।

কেন্দ্রাবিন্দুকে ঘিরে ছয়-পাপড়িওয়ালা একটি তারকার জন্ম হয়েছে (চিত্র—3.11 B)। এই ছয় কোণ বিশিষ্ট নকশাটি ইসলামী স্থাপত্যে যুগে যুগে অনুরুত—ভারতে আমরা ফতেপুর-সিক্রি, ইতমদ্ উদ্দৌলা, তাজ

প্রভৃতিতে বারে বারে দেখেছি। সমকোণী ত্রিভুজের ঐ ব-ভূমি যেমন ত্রিভুজ-ত্রিভুজের একটি গুহাচিহ্ন, তেমনি এই ষটকোণও ইসলামী জগতে বিশেষ কিছুই ইঙ্গিতবাহী। গজনী-মিনারে (চিত্র—3.11 C) দেখুন দু-দুটি চতুর্ভুজ মিলে আটটি কোণ উৎপন্ন করেছে—পাশাপাশি দুটি বাঁজ কেন্দ্রাবিন্দুতে 45 ডিগ্রি কোণ পয়দা করে। কুংব-স্থপতি ঐ ছন্দটিকেই জটিলতর করেছেন তিন-তিনটি বর্গক্ষেত্রের সাহায্যে—যেখানে $\angle A_1OB_1$ কেন্দ্রে 30 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করেছে (চিত্র—3.11 D)।

প্রাক-ইসলাম যুগে কৌণিক-কোণের সাহায্যে স্থাপত্য-নকশা রচিত হয়নি, এ-কথা কলা যায় না।

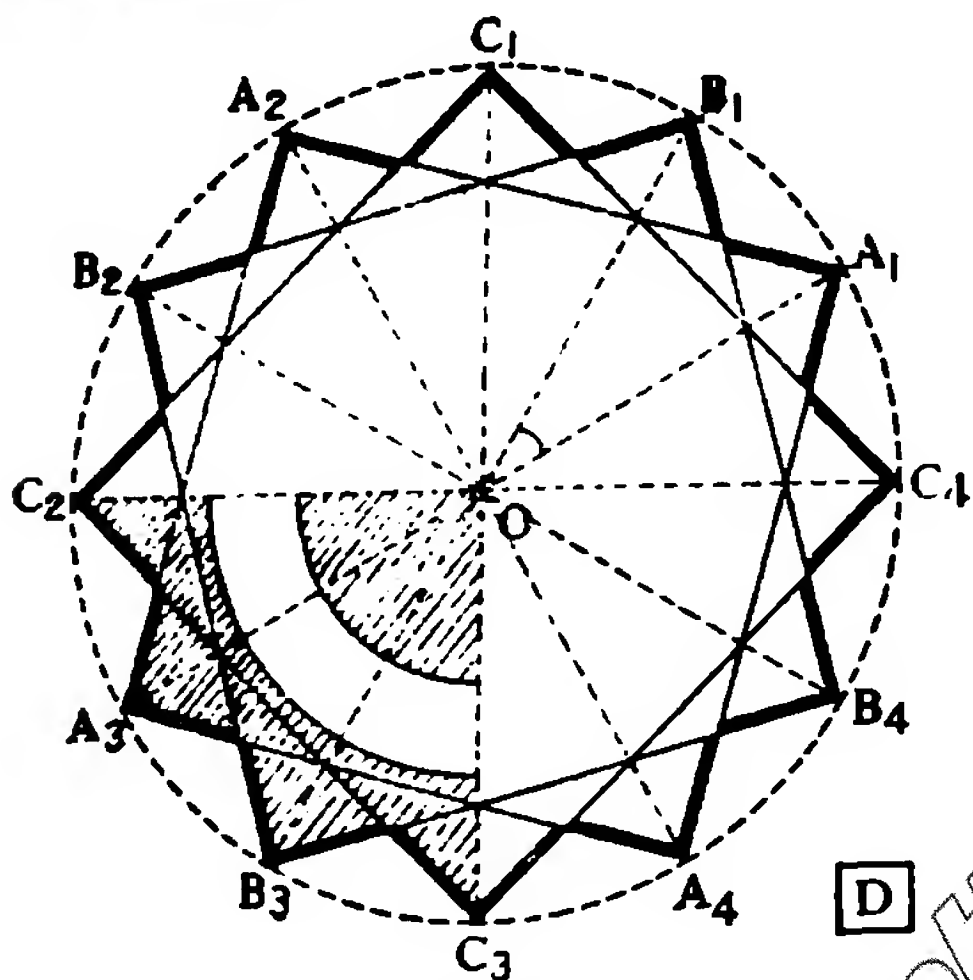


চিত্র—3.11 C ইসলামী স্থাপত্যে গজনী-মিনার (ষোলশ শতাব্দী) দুটি বর্গক্ষেত্র; এখানে $\angle A_1OB_1=45$ ডিগ্রি।

নাগর-স্থাপত্যে—অর্থাৎ কলিঙ্গ-খাজুরাহো-বাদামী-আহিওল-নালন্দা-গোড়-এ কৌণিক-কোণ আমার নজরে পড়েনি, কিন্তু বেশর-স্থাপত্যে এবং দ্রাকিড়-স্থাপত্যে জটিলতর কৌণিক-কোণের সাহায্যে নকশা তৈরী করা হয়েছে। অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যায়। মধ্যপ্রদেশে সিরপুর্নে শ্রীরামচন্দ্র মন্দিরে¹⁸ (সপ্তম শতাব্দী, বেশর-স্থাপত্য) কৌণিক-কোণ পাচ্ছি। স্বেদশ-শতাব্দীতে নির্মিত দুটি মন্দিরের চিত্র এখানে যুক্ত হয়েছে¹⁹ (চিত্র—3.11 E ও F)। সেখানে পাঁচটি এবং আটটি বর্গক্ষেত্রের সাহায্যে কত জটিলতর মন্দির গঠিত হয়েছে তা দেখা যাচ্ছে। সবগুলি কুংব-এর প্রাম্বর্তী-যুগের ভারতীয় মন্দির যদিও নাগর-স্থাপত্যশৈলীর নয়।

সুতরাং, একথা বলা চলে না যে, ইসলাম এ 'কৌণিক-কোণ'-এর নয়নাভিরাম ছন্দটি ভারতবর্ষে আমদানী করেছে।

বরং কুংবের কোলাবারান্দার নিচে এ স্ট্যালেক্টাইট (stalactite) পদ্ধতিটিকে (চিত্র-3.14) বলা যায় ইসলামের আমদানী। এ জিনিস হিন্দু-ভারতে ছিল না। এর আদিজনক—যদিও কিছুটা অন্য ধরনে—দেখা গেছে খোঁসাবাদে রাজা সারগনের প্রাসাদে, আশিরীয়

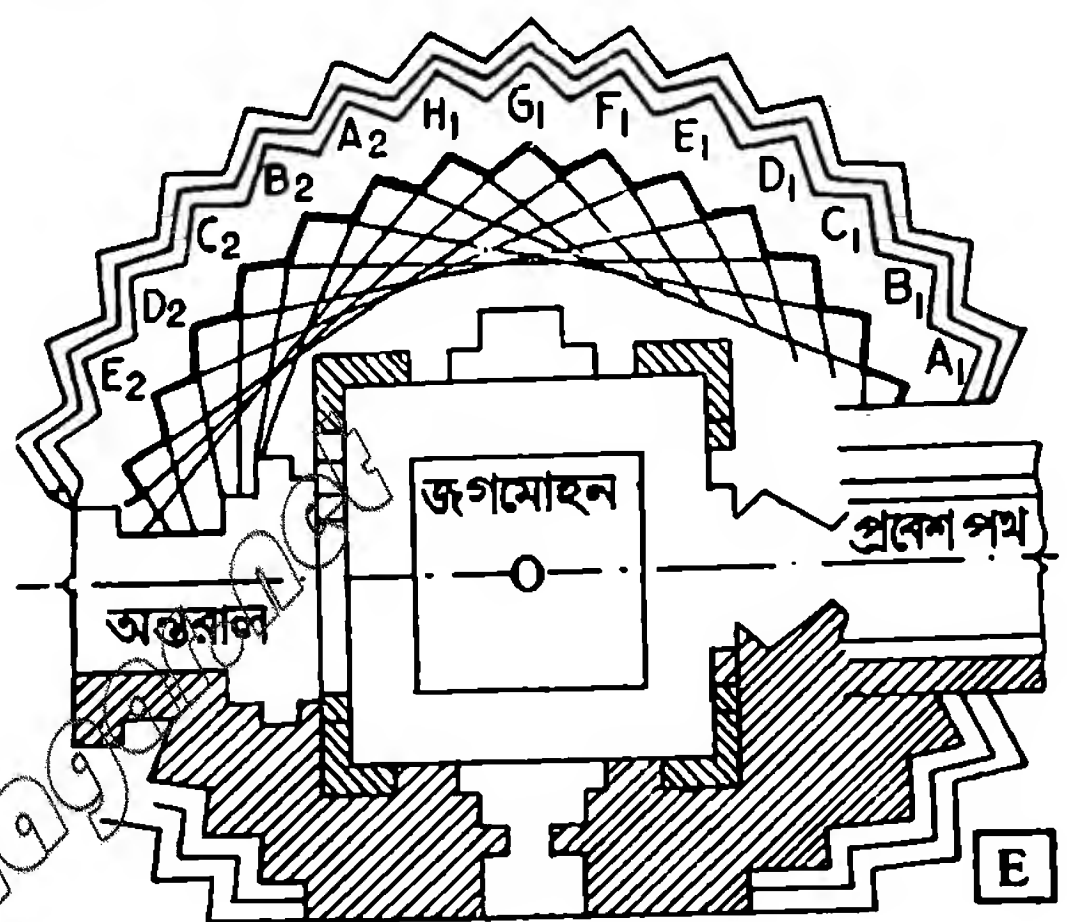


চিত্র-3.11 D ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যে কুংব মিনার (জ্যোত্স্ন শতাব্দী)—তিনটি কর্ণের ; এখানে দেখছি $\angle A_1OB_1=30$ ডিগ্রি।

সম্রাট (722-705 B.C.)। এখানে তা রূপান্তরিত হয়েছে কতকগুলি পাশাপাশি সাজানো ছোট ছোট খিলানের আকারে। অনেকটা যেন পাশাপাশি কতকগুলি কুন্ডলি বানিয়ে বাইরের দিকে বকুকে আসা হয়েছে। 'কৌণিক-কোণ' সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলেও বেশ বোকা বলা, স্থানীয় নিমিত্ত এ করসাজি জানতো না। কর্নর জুড়ে নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে—সেমন কর্ণেই কুন্ডলি ফস্‌জিসের ফিলানে। সামান্য নীতিত হয়েছিল সম্ভব নেই—কারণ কুংবের এ স্ট্যালেক্টাইট কোলাবারান্দা সাতশ বছরেও ভেঙ্গে পড়েনি।

এই সম্প্রদায়ের উদ্ভব করে কই, কুংবের গায়ে যে কণী খোদিত তার কিছুটা কুংব-এর XIX পরিচ্ছেদ থেকে সংকলিত—যার শিরোনাম 'খিলান'। তাতে এতদূর ও অতিক্রম নাহয় প্রমাণ করা হয়েছে এমন কি কখনো সেরী অমোহনিসম্মত সন্তান লাভের কথাও!

মুজতবা আলী বলছেন,²⁰ "মিনারের মদকুটরূপে সর্বশেষে (যেখানে এখন আলো জ্বালানো হয়) কী ছিল সে-সম্বন্ধে রসিকজনের কৌতূহলের অন্ত নেই (গত শতকের গোড়ার দিকে এক ইংরেজ মেজরের হাতে কুংবের মেরামতির ভার পড়ে। ব্যাল্কনির রেলিঙ-গুলো ছিল না বলে তিনি সেখানে চার-পাণ্ডির নিজস্ব নকশা দিয়ে রেলিঙ বানান—নীচের হানিকুম্ অর্থাৎ মোমাইর চাকের নকশা মূল স্থপতির—এবং মাথায় 'নিজস্ব' কল্পনাপ্রসূত একটা মদকুট পরান। সেইটি



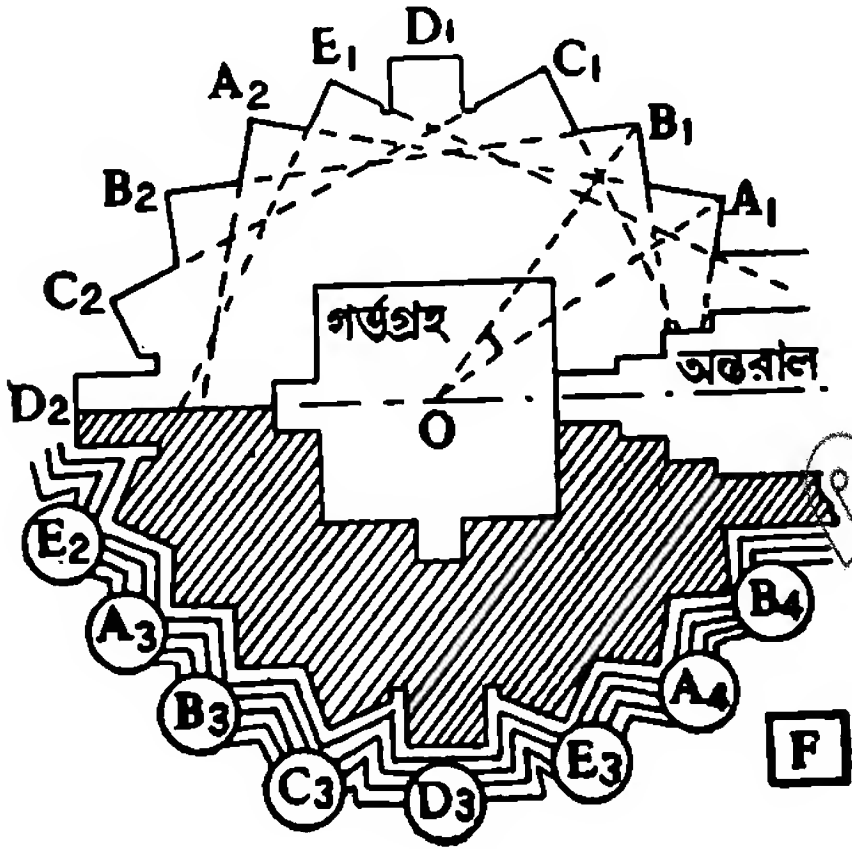
চিত্র-3.11 E বেশর স্থাপত্যে 'দোদবসনানা'-র দম্বল মন্দির (ষোড়শ শতাব্দী)—আটটি বর্গক্ষেত্র ; এখানে দেখছি $\angle A_1OB_1=11^\circ-15'$ ।

দেখে দিল্লী-ওয়ালারা সত্যসে তারম্বরে চিৎকার করেছিল। বহু বছর পরে লর্ড কার্জন সেই মন্ডুটি কেটে নীচে নামিয়ে দূরে সরিয়ে রাখেন। দুনিয়ার সবচেয়ে সেরা মিনারকে স্থপতি কী রাজমদকুট পরিচয় দিয়েছেন—সেখানেও তিনি তাজ রেখে শেষরক্ষা করতে পেরেছিলেন কিনা, তাঁর যে অদ্ভুত কল্পনাশক্তি মিনারের সর্বাপেক্ষা স্বপ্রকাশ, সে কল্পনাশক্তি দিয়ে তিনি দর্শককে কোন্ দূরলোকে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, কে জানে?"

যাযাবর তাঁর দৃষ্টিপাতে এ-প্রসঙ্গে লিখেছেন,²¹ "দিল্লীর প্রথম মসজিদে স্থাপত্যের যে নিদর্শন রইল সেটা হিন্দু ও মুসলিম স্থাপত্যের সম্মেলন নয়, গোঁজা মিলন। কুতুব মিনার সংলগ্ন মসজিদে আজও তার প্রমাণ আছে।"

মুজতবা আলী-সাহেব কিন্তু একেবারে ভিন্ন সূত্রে একথা বলেছেন, "মিনারকে কোমরবন্ধের মতো ঘিরে রয়েছে সারি-সারি লতা-পাতা, ফুলের থালা, চক্রে

নকশা। এগুলো জাতে হিন্দু এবং এর সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে এক-সারি-অন্তর আরবী লেখার সার—সেগুলো জাতে মুসলমান। কিন্তু উভয় খোদাই-এর কাজই যে হিন্দু শিল্পী করেছেন সে-বিষয়ে কণামাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। গোটা মিনারটির পরিকল্পনা করেছে মুসলমান, যাবতীয় কারুশিল্প করেছে হিন্দু—ভারতবর্ষে মুসলমানদের সর্বপ্রথম সৃষ্টিকার্যে হিন্দু-মুসলমান মিলে-মিশে যে অদ্ভুত সাফল্য দেখিয়েছিল সে মিলন পরবর্তী যুগে কখনও ভঙ্গ হয়নি, কভুবা মুসলমানের প্রাধান্য বেশী, আবার কোনো ইমারতে হিন্দুর প্রাধান্য বেশী। আটশত বৎসর একসঙ্গে থেকে হিন্দু-মুসলমান চিন্তার ক্ষেত্রে, রাজনীতির জগতে সম্পূর্ণ এক হয়ে যেতে পারেনি, কিন্তু কলার প্রাঙ্গণে (স্থাপত্য, সঙ্গীত এবং নৃত্যে) প্রথম দিনেই তাদের যে মিলন হয়েছিল আজও সেটা অটুট আছে।”

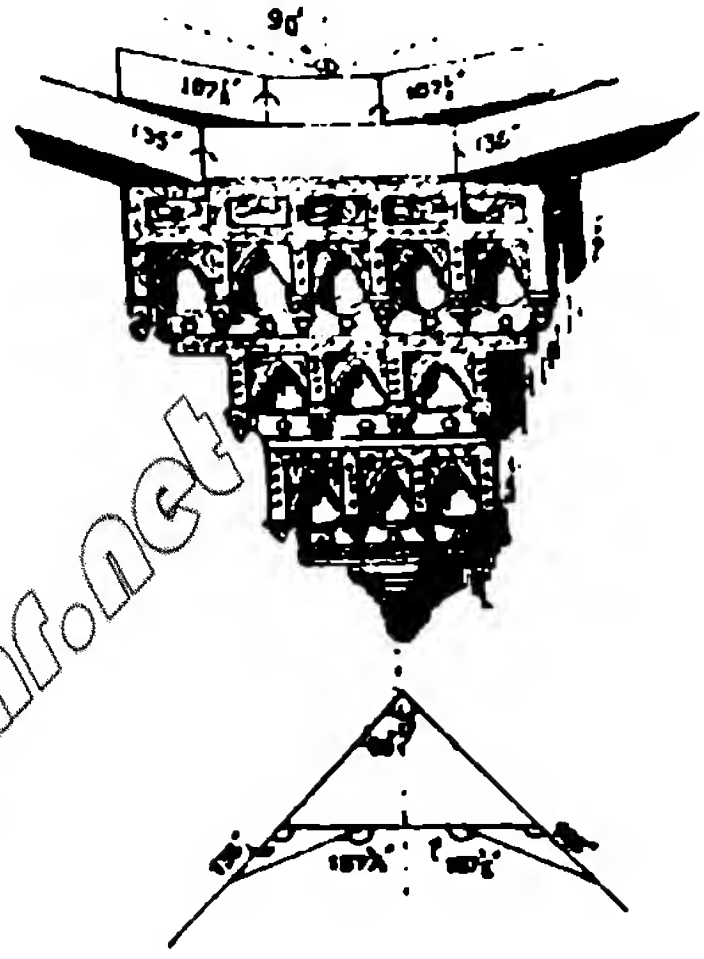


চিত্র-3.11 F বেষর-স্থাপত্যে গুজরাটের মহেশ্বর মন্দির (ষোড়শ শতাব্দী)—পাঁচটি বর্গক্ষেত্র; এখানে দেখাচ্ছে $\angle A_1 O B_1 = 18^\circ$ ডিগ্রি।

কুওওতুল মসজিদের ধ্বংসস্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হয় বিজয়ী-বিজিতের সে-স্বন্দর আজ ছায়ার চেয়েও ছায়া। বিস্মৃত ইতিহাসের দেহলিতে ঐ কুংব-চক্করের ডাঙা পাথরগুলোর উপর কান পেতে শুনতে চাই হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোর কথা—দিল্লীর ধুলোয় ধুলোয় মিশে আছে অতীতের যে হাসি-অশ্রুর ঐকতান সহযোগীর পোটেবল্ টোনাঙ্কিস্টারের ককশ নিনাদে ছিন্ন হয় ধ্যানমগ্নতা। ইচ্ছে করে গালিঘের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে ওদের ডেকে বলি—

“দৈর্ নহী, হরম্ নহী, দর নহী, আস্তা নহী,
বৈঠে হৈ রাহ-গুজর-পে হম, গৈর হমে উঠারে
কিস্?”

না থাক! আট-শতাব্দীর এ-পারে দাঁড়িয়ে “কর জয় হল, কর পরাজয়, কাহার বৃদ্ধি কর হল কর, কেবা ভালো আর কেবা ভালো নয়” সে-কথা আজ আর মনে রাখব না—প্রত্যাধিনন্দ্যচিত্তে আলী-সাহেবের যুক্তিই মেনে নিতে ইচ্ছে করে কুংব-চক্করে দাঁড়িয়ে।

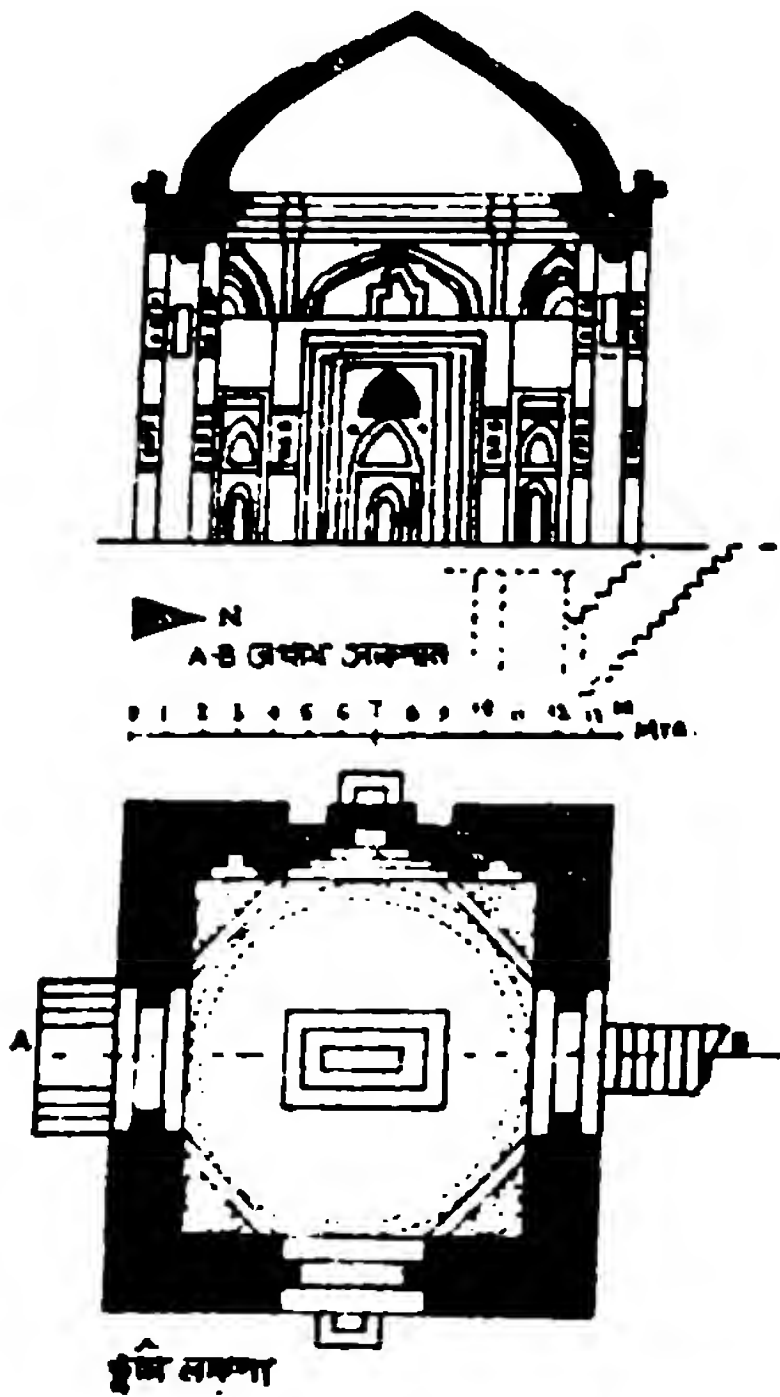


চিত্র-3.12 স্কুইক পর্ষাতির জ্যামিতিক ছন্দ।

ইল্-তুংমিসের সমাধি : কুওওতুল মসজিদের উত্তর-পশ্চিমে সুলতান ইল্-তুংমিসের সমাধিসৌধ (চিত্র-3.13) সম্রাট নিজেরই এটি নির্মাণ করে যান। 1235 খ্রীষ্টাব্দে, শাহ-জাদার সমাধি সুলতান ঘারী—ইমারৎ নির্মাণের মাত্র পাঁচ বছর পরে। পুত্র ও পিতার সমাধিসৌধের প্ল্যানিং, আঙ্গিক এবং আবেদনে আস্-মান-জমিন ফারাক। পুত্রের সমাধিতে নেই গম্বুজ—সমস্তই জমিন-সামিল। পিতার সমাধিতে হয়েছে সেই আশ্চর্য পরীক্ষাটা—চতুষ্কোণ কক্ষের উপর গোলাকার গম্বুজ বসানোর প্রচেষ্টা। ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্য এতদিনে নিজের বৈশিষ্ট্যটা খুঁজে পেয়েছে। কেন্দ্রস্থ কামরাটি বর্গক্ষেত্র—দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ১) মিটার। তিন দিকে তিনটি প্রবেশদ্বার; পশ্চিম-

“মন্দির নয়, মসজিদ নয়, আস্তানা নয়, ধনী কেইনি দোরে
ঠাই পেতেছি পথের ধলার, সেখানে থেকেও উঠিরে দেবে
যোরে?”

দিকে, কাষার দিকে পাশাপাশি তিনটি মিহরাব, কেন্দ্রস্থটি উচ্চতর এবং মাবেলমন্ডিত। ইমারতের ছাদটি ভেঙে গেছে। ফিরোজশাহ তুঘলক (1351-88) এই গম্বুজটি মেরামত করিয়েছিলেন একবার—কিন্তু আবারও তা ভেঙে পড়েছে। বাহিরের দিক থেকে ইমারৎ সরল, অনাড়ম্বর—ভিতরে অলঙ্করণের প্রাচুর্য। কুফি ও নাশখ্ লিপিতে আরবী ভাষায় কুরানের বাণীর সঙ্গে মিশে আছে নানান নকশার কাজ—তর কিছুটা হিন্দু শৈলীর, চক্ৰ-ঘন্টা-শঙ্খল-পদ্ম-হীরক ইত্যাদি, আবার কিছুটা ইসলামী জ্যামিতিক নকশা। আমার মনে হল, এই নকশায় যেন কিছুটা ষাড়াবাড়ি করা হয়েছে। এত ঠাণ্ডাবন্দ



চিত্র-3.13 ইল্‌তুৎমিসের সমাধি কুংব-চক্ৰ-দিল্লী।

অলঙ্কারের আদর্শকে চোখ পীড়িত হয়। ফাগুদসন-সাহেব অবশ্য এর উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করেছেন,—
"One of the richest example of Hindu art applied to Muhammadan purposes." পড়ে মনে হয়েছিল richest মানেই best নয় কিংকৃত।

কিন্তু কি-জানি, হয়তো এটিটা শিল্পকর্মসূত্রে অর্জননিহিত নয়, হয়তো আছে বিংশ শতাব্দীর এই দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গিতে। এত ঠাণ্ডাবন্দোত নকশা

হয়তো ভালোই লাগতো সেই ত্রয়োদশ শতাব্দীর দর্শকের চোখে। শিল্পীকে দোষারোপ না করে বরং গালিবেস সঙ্গে সদর মিলিয়ে বলি :

"নহী" গয় সর ও-বর্গ-এ আদ্রাক-এ মানে,

তামাশা-এ নৈরংগ-এ সদরং সলামৎ ॥"

এ ইমারতে বিশেষ করে লক্ষ্য করার বিষয় কী-ভাবে চতুষ্কোণ ঘরের উপর গোলাকৃতি গম্বুজটো বসানো হয়েছে। পশ্চতিটাকে—আগেই বলেছি, বলে স্কুইঞ্চ (Squinch)। চিত্র-3.12-তে শেরশাহ-এর তৈরী মসজিদের একটি অপূর্ব স্কুইঞ্চ দেখা যাচ্ছে। নিচে দেখা যাচ্ছে সমকোণকে কী-ভাবে প্রথমে আট-কোণা ও পরে ষোলো-কোণায় বিভক্ত করা হয়েছে। ইল্‌তুৎমিসের সমাধিতে প্রতিটি কোণায় একটি করে খিলান বানানো হয়েছে, আর তার পিছনদিকটা হয় ট্রাবিসেট অথবা আকুয়েট পশ্চতিতে ভরাট করে কিছুটা গোঁথে তোলা হয়েছে। তারপর ঐ আট-কোণা ঘরকে ষোলো-কোণায় পরিণত করা হয়। জ্যামিতিক স্বরূপটর লিখিত বর্ণনা দিচ্ছি না, চিত্র-3.12 দেখে যদি বুঝতে পারেন, আমি কৃতার্থ ; না পারেন, আমি নাচার !

মেহেরোলীর বাওলী : ইল্‌তুৎমিসের জমানায় নির্মিত। যদিও ঠিক কুংব-চক্রে নয়, আধ কিলো-মিটার দক্ষিণে (চিত্র-3.2), মেহেরোলীতে ; তবু তা এই সঙ্গেই উল্লিখিত হল। 'বাওলী' অর্থে জ্বলাশয়, কূপ জাতীয়। আথম খাঁর সমাধি দেখতে যদি মেহেরোলী যান, এটিও দেখতে পাবেন। পাঁচটি ধাপে নেমে গেছে সোপানশ্রেণী। কূপটি গোলাকার। এখানে জলে গন্ধকের গন্ধ পাওয়া যায় বলে এর নাম 'গন্ধক-কি-বাওলী'। কূপটি যথেষ্ট গভীর। স্থানীয় কোনো কোনো দঃসাহসী জওয়ান অপূর্ব দক্ষতায় উপর থেকে কাঁপ খেয়ে পড়ে কূপের ভিতর, দর্শকেরা কিছু মদ্য কবুল করলেই। আশা করব, তা দেখতে আপনি দিল্লী যাননি।

সুলতান খারী : কুংব মিনারের আট কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে মেহেরোলী-পালাম রোডের ধারে হত-ভাগ্য শাহজাদা নাসিরউদ্দীনের অনাড়ম্বর কবর। সম্রাট ইল্‌তুৎমিস-নির্মিত। এর দক্ষিণে, একই চক্রে সমাধিস্থ আছেন সুলতান ইল্‌তুৎমিসের আরও

* "অর্থ বৃদ্ধির যোগ্যতা যদি না-ও হয় কোনদিন,

তবু হৃদের বর্ণবৈচিত্র্য দেখার পাঁচটুকু বেঁচে থাক ॥"

(আব্দুল সন্নাদ আইয়ুবকৃত অনুবাদ।)

দুটি অমোগ্যপুত্র রুক্ন-উদ্দীন ফিরোজশাহ এবং মদইজ-উদ্দীন বাহরামশাহ। সুলতান ঘারী মক্কারা নানান কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ—ইতিহাস ও স্থপতির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। প্রথম কথা, কচ্ছ-অঞ্চলের দু-একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে এইটিই ভারত-ভূখণ্ডে প্রাচীনতম মুসলীম কবর, রাজবংশীয় কোন মরদেহের উপর। পাকিস্তানে হিসাবে কচ্ছ, মুলতান ও লাহোরের কথা বাদ দিলে বর্তমান ভারতে এটিই প্রাচীনতম (চিত্র-3.15)।

স্থলে গম্বুজ (G), বার পশ্চিমে ইকান (I); পূর্ব-প্রান্তেও একটি অলিন্দ। কেন্দ্রস্থলে অষ্টভূজবিশিষ্ট মূল সমাধিকক্ষ। সেখানে বাবার পথ সিঁড়ি বেয়ে, ডুগর্ভে। আট-কোণা কেন্দ্রীয় কক্ষটির উপরে প্রত্যাবর্তিত গম্বুজটি কিন্তু অনুপস্থিত। বরং ঐ ভূমণ্ডল-কক্ষে চারটি স্তম্ভের উপর প্রায়-সমতল ছাদ বানানো হয়েছে।

এই রচনাশৈলী হিন্দুস্থানে অনন্য। এই বিচিত্র প্ল্যানিংটি ইল-ভুংমিস্ কী-করে কল্পনা করেছিলেন



চিত্র-3.14 কুংবের স্ট্যালেকটাইট ও কুংবের কাবা।

কুওওতুল-ইসলাম মসজিদের মতো এর উপাদানও ধ্বংসপ্রাপ্ত হিন্দু মন্দির থেকে সংগৃহীত। স্থপতি-কার এর প্ল্যানিং-এ দেখিয়েছেন অশেষ কৃতিত্ব। সংলগ্ন ভূখণ্ড থেকে তিন মিটার উঁচু ভিত্তির উপর একটি বর্গক্ষেত্র, তার চারপ্রান্তে চারটি অনাড়ম্বর গম্বুজ সমাধিসৌধকে দৃঢ়তা দান করেছে। পশ্চিম-প্রান্তে এক সারি স্তম্ভসম্মিলিত জিরান (L); কেন্দ্রে-

সে ইঙ্গিত কাগু'সন, হ্যাভেন বা পার্সি ব্রাউন দিয়ে বানানি। পার্সি ব্রাউন খুদ কলছেন, "অনুপ-আলোকন অনেক অনেক দেশের রাজ-পরিবারের সমাধি-চত্বরে করা হয়েছে সেই মিশরীয় কল্যাণ-যুগ থেকে।"

অম্বার ধারণা এ পরিকল্পনাটি সম্রাট ইল-ভুংমিস্ আমদানী করেছিলেন ডিররিয়াস-এর 'বুখিকা মসজিদ' থেকে। বাস্তব ভাে ব্র-অন্-সে মসজিদের

প্ল্যান-সেকশনও আমি দেখিনি, তবে নাসির-ই-খসরো 1047 খ্রীষ্টাব্দে লিখিত একটি ইতিবৃত্তে^১ বলেছেন—
যুদ্ধিকা-মসজিদে এইরকম একটি বর্গক্ষেত্র-আকারের চত্বরে আছে অষ্টভূজ-বিশিষ্ট, গম্বুজ-বিহীন এক সমাধিকক্ষ। যার গভীরে আছে সমস্তজন পরগম্বরের সমাধি।^২ হয়তো সেইটিই এই প্ল্যানিং-এর গণগোষ্ঠী!

সমাধিসৌধে—হুমায়ুন-মক্‌বারা থেকে সেকেন্দ্রা, ইংমদ্ উদ্‌দৌলা, তাজ পার হয়ে সফদরজঙ্গ-এর সমাধি-ইস্‌তক সবটাই একটা দার্চের ব্যঞ্জনা। দেহাবশেষ জমিন-সামিল; অথচ ইমারৎগুলি মাটি ছেড়ে আশ্মানের দিকে উৎক্লিষ্ট-বাহু। শাহ্-এন-শাহ্, বেগম-সাহেবা অথবা উজীরে-আজম তাঁদের জিন্দগিতে কী-পরিমাণ মহিমময় ছিলেন সেই জৌলুসের জিস্‌লুল্লা ইমারৎ যেন আজও সোচ্চারে ঘোষণা করতে চায়। জরাগ্রস্ত সুলতান সামস্-উদ্‌দীন ইল্‌তুৎমিস্ নিজ জমানাতে নওজোয়ান

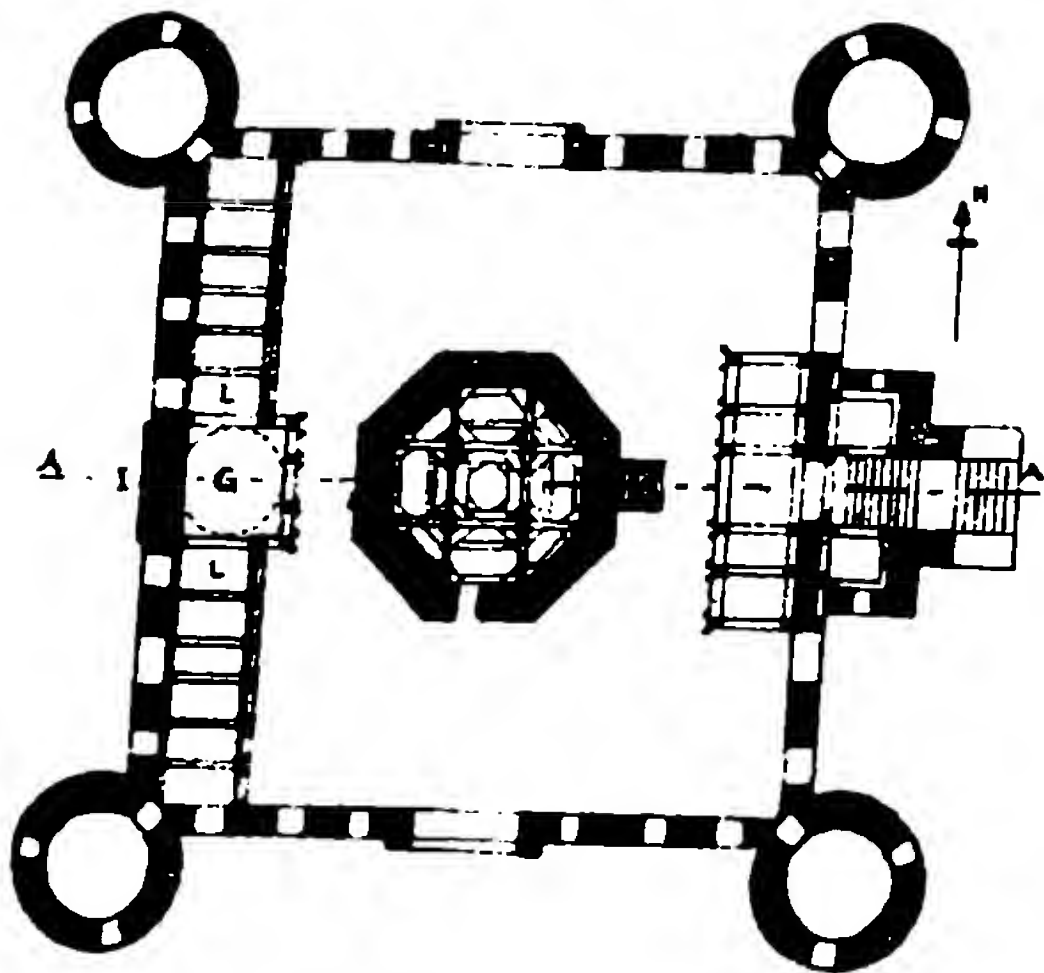
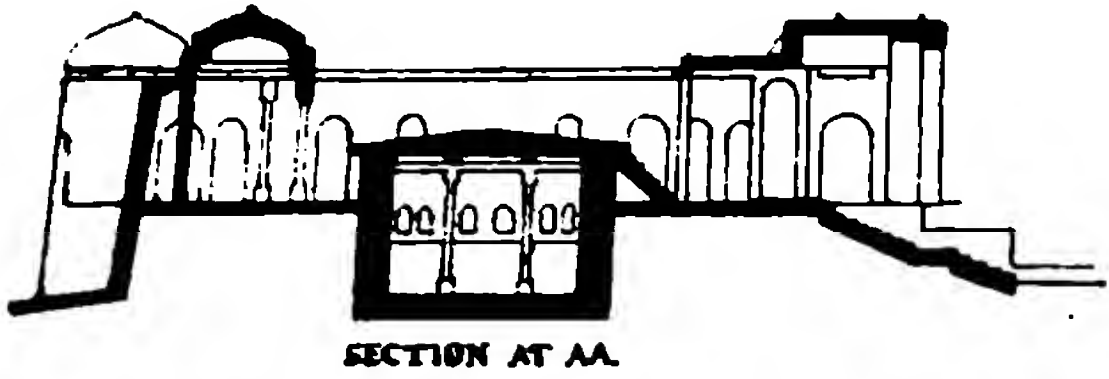


Fig-3.15 সুলতান ঘাণী (দিল্লী)।

শাহ্‌জাদার মক্‌বারা রচনার সময় সে-ভাবে ভাবতে পারেননি।

ঐ ইমারতে নেই কোনো আকাশচুম্বী মিনার-মিনারিকা, ক্ষীণতাদর পূর্ণত্বিতর গম্বুজ, নৃত্য-পাটিলসীর মতো তব্বী ছত্ৰী, অলসসন্ধ্যাবাপনের

চবুতরা অথবা সারবাণ্ডি প্রহরীর মতো সার সার গুলদস্তা। শোক-ভারাক্রান্ত বৃদ্ধ সুলতান তাঁর যুবক-পুত্রের অকালপ্রয়াণে যেন ক্ষোভে, লজ্জায়, অনুশোচনায় মাটিতে মিশে যেতে চান। মস্‌নেদে বসার কথা যে নওজোয়ানের, সে মিশে গেল মাটিতে, আর তস্‌বি-ছড়া হাতে নিয়ে মক্কার দিকে যার রওনা দেবার জমানা সে পড়ে রইল তস্‌ই-সদলেমানে। যেনাহা-শাম শাহ্-জাদার হিজরে শাহ্-এন-শাহ্‌র কলিজা তওবা-বাহিতে দগ্ধ হতে থাকে। তাই এখানে দার্চ্য অপাংস্তেয়। সবই জমিন-সামিল।

সুলতান ঘাণী মক্‌বারার সামনে দাঁড়িয়ে হয়তো আপনার মনে পড়ে যাবে আর একটি জমিন-সামিল মক্‌বারার কথা। অনূরূপ পারিকল্পনা—যদিও ভিন্ন দেশের, ভিন্ন কালের এবং ভিন্ন আবেদনের। আমি পারীতে অবস্থিত বিশ্ববিজয়ী নেপোলিয়ন^৩র সমাধি-সৌধের কথা বলছি। স্থপার্তিবিদকে প্রশ্ন করা হয়েছিল—সম্রাটের সমাধি ভূগর্ভে কেন? জবাবে তিনি নাকি বলেছিলেন, ‘জীবিতকালে যার সামনে কোনো মরমানুষ মাথা সোজা করে দাঁড়াতে সাহস পায়নি,—মৃত্যু তাঁর হৃদস্পন্দনটাই শূন্য বন্ধ করেছে, তাঁর মহিমায় কোনো মালিন্য লাগেনি। এখানে এলে সবাইকেই তাই মাথা নিচু করতে হয়!’

ইল্‌তুৎমিস্ বোধকরি সে-রকম কোনো কিছু বলতে চাননি।

চোখবুজে ঐ চুনবাঁলিখসা ইমারতের দিকে তাকিয়ে দেখুন—স্পষ্ট দেখতে পাবেন, শাহ্‌জাদার খুন-রঞ্জিত হাত দুটি দিয়ে সুলতান তাঁর মৃদু ঢেকেছেন! ক্ষোভে, লজ্জায়, অনুশোচনায়! তাঁর সাদা-দাড়িতে লেগেছে রক্তের ছোপ—খুন আর আঁসু মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে! কান পাতলে আজও শুনতে পাবেন ইমান-ইনসাফের মালিকের সেই কলিজা-বিদীর্ণ করা আতঁ হাহাকার আজও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ঐ ভগ্ন ইমারতের আর্ক-বৃতবে :

দো লব্‌জোঁ মে পদাশিদা এক মেরি কহানী হয়,
এক লব্‌জ্ মহস্বৎ হয়, এক লব্‌জ্ জওয়ানী হৈ—
আঁসুকে মেরে লে-কর দায়ন্-পো জরা যাঁচ্‌চো
জম্‌ যায় তো খুন হয়, বহ্‌ যায় তো পানি হৈ ॥*

□

* শূন্য দুটি কথার বলে যাব আমার কাহিনী। এক কথা : আমার পুত্রস্নেহ; আর কথা তার যৌবন। এই কলিজা-বিদীর্ণ করা নির্যাসকে তোমার আঁচলে কষে দেখ—যদি জমে যায় তো বৃকবে তার রক্ত, আর যদি বহে যায় তো বৃকবে সেটা আমার চোখের জল ॥

খিলজী-বংশ

উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা

সময়কাল (খ্রিঃ) খ্রীঃাব্দ

জালালউদ্দীন খিলজী কর্তৃক দিল্লী অধিকার	1290
জালালের মৃত্যু ও আলাউদ্দীন খিলজীর অভিষেক ..	1296
কুওওতুল মসজিদ সম্প্রসারণ, কুৎব মিনারের মেরামতি ও নিজ সমাধিসৌধ নির্মাণান্তে আলাউদ্দীনের মৃত্যু	1316
দেবলাদেবী-খ্যাত শাহজাদা খিজির খাঁর হত্যা ..	1316
বংশের পঞ্চম ও শেষ সুলতান কুৎবউদ্দীন মবারকের মৃত্যু	1320
অনধিকারী নাসিরউদ্দীন খসরৌ-এর অভিষেক ও মৃত্যু ..	1320

খিলজী-বংশের শাসনকাল—ভারত-ইতিহাসের পরি-
প্রেক্ষিতে অকিঞ্চিৎকর, মাত্র ত্রিশ বছর—1290 থেকে
1320; এই বংশের আধ-ডজন সুলতানের মধ্যে একটি
নামই ইতিহাসে প্রোজ্জ্বল : আলাউদ্দীন শিকান্দার
সানী মাহমুদ শাহ বা সংক্ষেপে আলাউদ্দীন
খিলজী।

দাস-যুগে দিল্লী-সুলতানীর চৌহান্দ ছিল উত্তর-
পশ্চিমের সীমিত ভূখণ্ডে; আলাউদ্দীন সেটাকে
দক্ষিণ ও পূর্বভারতে বিস্তৃত করেন। নামমাত্র নয়,
রীতিমতো দখলদারী শাসন-ব্যবস্থা। আলাউদ্দীনের
দুর্বার বিজয়-অভিযান, সাফল্য ও শাসন-ব্যবস্থার
বিস্তারিত বিবরণ ও পর্যালোচনা ঐতিহাসিকদের জন্য
মূলতুবী থাক; আমরা শুধু তাঁর স্থাপত্য-কীর্তি-
গুলির মূল্যায়ন-মানসে ঐ সুলতানের ব্যক্তি-চরিত্রটা
বুঝে নেবার চেষ্টা করব। আলাউদ্দীন-নির্মিত
যাবতীয় স্থাপত্য-নিদর্শনে, কুওওতুল মসজিদ সম্প্র-
সারণে, এবং বিশেষ করে, আলাই মিনারে একটা
আকাশচুম্বী দাটোর, গগনস্পর্শী আত্মভরিতার
ব্যঞ্জনা আছে—সেটার মূল কোথায় এটুকু বুঝে নেবার
চেষ্টা করব। কিন্তু আলাউদ্দীনের আগে তাঁর চাচার
কথা বজতে হয়। জালালউদ্দীনের কথা।

দাস-বংশের শেষ সুলতানের অপদার্থতার সুযোগ
নিয়ে আফগান-বংশীয় জালালউদ্দীন দিল্লী অধিকার
করলেন 1290 খ্রীষ্টাব্দে। জালালের বয়স তখন সত্তর।

তাঁর দুই পুত্র; জ্যেষ্ঠ আরকালী খান কিছু উদাসীন,
দার্শনিক প্রকৃতির, ধর্ম-ধর্ম ব্যতিক এবং কনিষ্ঠ
রুকনউদ্দীন নেহাই নাবালক। তা হোক, সেজন্য
সুলতানের কোনো দুশ্চিন্তা নেই। উত্তরাধিকারী
হিসাবে তিনি নির্বাচন করে রেখেছেন ভ্রাতৃপুত্র
আলালকে। ছোটভাই শিহাব-এর এন্তেকাল হয়েছে
অনেকদিন, আলাল তখন শিশুমাত্র। তাই নিজ
সন্তানদের সঙ্গে জালাল এই ভ্রাতৃপুত্রটিকে মানুস
করেছেন নিজের সংসারে। আলাউদ্দীন অত্যন্ত দক্ষ,
কর্মঠ, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, সব দিক থেকেই সুলতান হবার
উপযুক্ত। তাই উত্তরাধিকার-প্রসঙ্গে সুলতান নিশ্চিন্ত
ছিলেন।

তক্ত-তাউসে আসীন হয়ে জালাল রাজ্যবিস্তারে
মন দিতে পারেননি। প্রথমতঃ, দরবারে ক্ষমতাশালী
আমীর-মালিকের দল তখনও এই নবাগতকে মনে-
প্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি; দ্বিতীয়তঃ, উত্তরদিক
থেকে হাচ্ছিল ক্রমাগত মোঙ্গল আক্রমণ। জালাল
মোঙ্গল-সর্দার হালাকুকে পরাস্ত করেন এবং বহু মোঙ্গল-
সৈন্যকে গ্রোস্তার করে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করেন।
তারা দিল্লীতেই নতুন জীবন শুরু করল স্থায়ীভাবে।
তাদের নাম হল : নয়া-মুসলমান। এদের সঙ্গে প্রাচীন
মুসলমানদের লড়াই-কাজিয়াও লেগে থাকে নিত্য ত্রিশ-
দিন!

জালালের প্রধানা বেগম মালিকা জাহান ছিলেন

এক জাহাঙ্গীর মহিলা। সুলতান যে তাঁর প্রাচুর্যকে নেকনজরে দেখেন এটা তাঁর বরদাস্ত হয় না। আর হবে নাই বা কেন? অমন ঐদের চাঁদের মতো রক্ত-উদ্দীন থাকতে--যড় ছেলে আরকালীকে তিনি ধর্তবোর মধ্যে ধরেন না। ওটা বাওয়া--তাঁর দেবরপুত্র কর্তার গদীতে বসবে এটা সহ্য হয়? জাগাল বৃন্দ-মান, এ সমস্যার সমাধান সহজেই করলেন--সাপও মরুস, লাঠিও ভাঙল না। কন্যাটিকে অর্পণ করলেন প্রাচুর্যের হাতে। দেবরপুত্র নয়, আলাল হয়ে গেল জাগালের ঘরের মূল্য : বেগমসাহেবার দামাদ।

সুলতান থাকেন দিল্লীতে। মেয়ে-জামাই 'কারাতে। এলাহাবাদের কাছে যমুনাতীরে যুবরাজের কিল্লা। সেখান থেকে আলাল খদশাহের তরফে একে একে জয় করলেন মালোয়া, জিলসা, এবং সবশেষে দেবগিরি। শেখোজ রাজার যাদবরাজ রামচন্দ্রদেবের পরাজয়ে আল্লাউদ্দীন লাভ করলেন বিপুল সম্পদ। দেবগিরি লুণ্ঠন করে এবং সন্ধির সত্বে অনুযায়ী অতুল ঐশ্বর্য নিয়ে এলেন নিজ কিল্লায়। রামচন্দ্রদেবকে দিতে হয়েছিল পঞ্চাশ মণ সোনা, সাত মণ মুদ্রা, চল্লিশটি হাতী এবং সহস্রাধিক রত্নস্বর্ণ! এই প্রথম দাক্ষিণাত্য-বিজয়!

দুতের মধ্যে বার্তা পেয়ে সুলতান উচ্ছ্বসিত! তখনই, ভাইপোকে অভিনন্দন জানাতে এলাহাবাদ-মুখো রওনা হতে চান আর কি। বারণ করেছিল সভাসদেরা, বিশেষ করে ঐর ব্যক্তিগত পার্শ্বচর অখম চাপ। যত্নেছিল, এমন কাজটি করবেন না, শাহ-এন-শাহ! কাফেরদের রক্তভাজন লুণ্ঠন করে শাহজাদার শির এখন বে-ঐশ্বর্য! আপনি আগ-বাড়িয়ে গেলে সে ডাববে সুলতান বুঝি তাঁর হিসসা আদার করতে এসেছেন।

শুনে, অট্টহাস্যে ফেটে পড়েন সুলতান : কী বে-দিল, বে-ওকুফ, বাওয়ার মত কথা! আরে হিসসা নেব কেন? আমি সুলতান মোহাম্মদ-আনাই তো কেড়ে নেব, সাক্ষ্য করব তহখানায়। তারপর গোটা তুর্ক-সুলেমান-সম্মত সব কিছু ওয়াপস্ দেব ঐ আলাল-কেটাকেই! কেন, তোমরা জান না ঐ আলালই হচ্ছে এই বুঢ়ার দিলকা-কাজিয়া? হিন্দুস্থানের হব্দ-সুলতান? তোমরা না জানলেও সে জানে।

সম্পূর্ণ অস্বস্তি! এমন কি দেহরক্ষী ব্যক্তিগত সুলতান করায় চপে রওনা দিলেন যমুনা নৈরে। এসে উপনীত হলেন ত্রিবেণীর ঘাটে। তারিখটা উল্লেখ জুলাই : 1296 খ্রিষ্টাব্দ। সেখানেই আল্লাউদ্দীন খিলজী কি-জানি-কি-করে চলে গেল তারায় চন্দ্র-স্থানের মালিক।

ঐতিহাসিক জিরা বারানি সংক্ষেপে বলেছেন।

"স্নেহের ঋণ এভাবে রক্ত দিয়ে পরিশোধ করার নৃশংস ঘটনা এমন কি কাফেরদের ইতিহাসেও দুর্লভ।"

মালিকা জাহান অত্যন্ত সাবধানী। কর্তার বে-অকুফিতে আদৌ সাগিল হননি। স্বামীর সঙ্গে এলাহাবাদ যাননি, যেতে দেননি শাহজাদাদেরও। কর্তামশায়ের এন্ডকাল হয়েছে সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র বেগম-সাহেবা গস্নদে বসিয়ে দিলেন কোজপৌছা শাহজাদা রক্ত-উদ্দীনকে। তিন্ত-বিরক্ত যুবরাজ আরকালীখান এই কিল্লীশী রাজনীতির রুদ্ধ বাতাস থেকে মুক্তি পাওয়ার বাসনায় দিল্লী ত্যাগ করে চলে গেলেন মুলতানে। একান্তে সাধন-ভজন, কাব্যপাঠ করে কাটিয়ে দেবেন জীবনটা : ওমর-খৈয়াম, ফির-দৌসী, রুমী আর সূফী পন্ডিতদের বাণী পাঠ করে।

শ্রাবণের অগ্রান্ত ধারাপাত অগ্রাহ্য করে উল্কার বেগে আল্লাউদ্দীন ধৈর্যে এল দিল্লীতে। সে প্রচণ্ড বেগে হতচকিত মালিকা জাহান পাঙ্গিয়ে বাঁচলেন। আখম চাপ-এর তত্ত্বাবধানে শিশুপুত্রকে নিয়ে চলে গেলেন মুলতানে। বেচারী আরকালী। তার কাব্যপাঠ মুলতাবী রইল--রিস্তাদারদের খিদ্মতে ব্যস্ত হতে হল তাকে।

আল্লাউদ্দীনের অভিযেক হল দিল্লীর লাল-কিল্লায়। না, বর্তমানের ঐ লাল-কিল্লায় নয়, কল্বন-নির্মিত এ-প্রাসাদ বর্তমানে নিশ্চিহ্ন। তন্তু-তাউসে আসীন হয়েই সম্রাট আল্লাউদ্দীনের প্রথম হুকুমনামা হল : পলাতক আত্মীয়দের পাকড়াও করে নিয়ে এস।

আল্লাউদ্দীনের সহোদর উলুঘ খান-এর নেতৃত্বে বাদশাহী ফৌজ ছুটল মুলতানে। আরকালী নিতান্ত অপ্রস্তুত। লড়াই-এর জন্য সে বিল্কুল তৈয়ার নয়। তার এক-নম্বর কসদর--সে শাহজাদা, স্বর্গত সুলতানের জ্যেষ্ঠপুত্র, তন্তের হক-হিস্যাদার ; দ্ব-নম্বর অপরাধ আশ্রা আর ভাইজানকে সে দরওয়াজার বাহির থেকে হাঁকিয়ে দেয়নি। আজীবন যে রাজনীতিকে পরিহার করতে চেয়েছে সেই জঘন্য রাজনীতিই নিমজ্ঞমানের পায়ে শৈবালদামের মতো তাকে আঁকড়ে ধরল। সুলতানী ফৌজ মুলতানে পৌঁছে বিনাবাধায় হাজির হল আরকালীর গরীবখানায়। উলুঘ খান বোধকরি এতবড় যুদ্ধ জয় করে কী করবে ভেবে পায়নি। বিজয়ী সেনাপতির প্রথম কর্তব্য হিসাবে সে সবার আগে পাইকারীহারে অন্ধ করে দিল বন্দীদের। তারপর বীরবিক্রমে শিপাহ-সাজার নিয়ে এল এক অন্ধ নর-নারীর মিছিল। দিল্লীতে নয়া সুলতানের শাসুড়ী, দৃষ্ট শালক, সদা-প্রয়াত আল্লাউদ্দীনের প্রিয় বন্দ

আধম চাপ।

শুধু হুগ আল্লাউদ্দীনের সন্নিধ্যাত সুলতানী।
পরের কাহিনীগুলি আমাদের অজানা নয়।
ভারতেতিহাসের পরীক্ষায় এই সুলতানের অপকীর্তি-
গুলি রাত জেগে মূখস্ত না করলে স্বাধীন-ভারতের
ছায়াছায়া রাস প্রমোশন পায় না। গুজরাট, রণথম্ভোর,
চিতোর, মালোয়া এবং দাক্ষিণাত্য বিজয়। সেনাপতি
মালিক কাফুরের অপ্রতিহত বিজয় অভিযান। বলতে
ভুলেছি, ঐ মালিক কাফুরই স্বহস্তে সুলতান জালাল-
উদ্দীনের বক্ষপঞ্জরে বসিয়ে দিয়েছিল তার খঞ্জর,
বজ্রার ভিতর—তারই পুরস্কার তার সেনাপতিপদ।

গুজরাটের হিন্দুরাজা রায়কর্ণদেবের মহিষী কমলা-
দেবী ছিলেন অসামান্য সুন্দরী। তাঁর কন্যা দেবলা-
দেবীও নাকি বেহেশত-এর হুরী। সংবাদ শ্রবণে নয়া-
সুলতান হুকুম দিলেন, গুজরাট শুধু জয় করলেই
চলেবে না, জ্যান্ত ও অক্ষত অবস্থায় ধরে আনতে হবে
মা-মেয়েকে! দুটোকেই চাই! কমলাদেবীকে তিনি
হারেমজাত করোছিলেন, পারেননি দেবলাদেবীকে।
সে কাহিনী পাবেন আমীর খসরৌ-এর কাব্যগাথায়।

চিতোরও জয় করেছিলেন, লাভ করেনি পশ্চিমী
নারী। অবন ঠাকুর আর টেডের কলমে জহর-রতের
অগ্নিকুণ্ড থেকে তিনি পুনর্জীবিত হয়েছেন।
সেসব কীর্তিকাহিনী থাক। আমি বরং রমেশ
মজুমদার মশায়ের “একটা অনচ্ছেদ নিজের ভাষায়
শোনাই—যা-থেকে আলাউদ্দীনের স্থাপত্য-মূল্যায়নে
কিছুটা সন্নিধ্য হবে :

ক্রমাগত সাফল্যে আলাউদ্দীনের মাথা ঘুরে গেল।
সম্ভব-অসম্ভব নানান পরিকল্পনা তাঁর মাথায় দানা
বোঁধে উঠত। পার্শ্ববর্তী কোন হিন্দু রাজার পরমা-
সুন্দরী স্ত্রী-কন্যা আছে সংবাদ পেলেই সেরাজ্য জয়ের
কামনা উদগ্ৰ হয়ে উঠত সুলতানের। একদিন তিনি
তলব করলেন কাজী আলা-উল-মলুককে। কাজী-
সাহেব পান্ডিত ব্যক্তি—প্রখ্যাত ঐতিহাসিক জিয়া বারনির
চাচা। সুলতান যখন শাহজাদা হিসাবে কারা-তে
সুবেদারী করতেন, তখন এই কাজী-সাহেব ছিলেন
তাঁর দক্ষিণ হস্ত ; বর্তমানে দিল্লীর কোতওয়াল। কাজী-
সাহেব হুজুরে হাজির হলে সুলতান তাঁকে জনান্তিকে
ডেকে বললেন, দুটি বাসনা আমার দিল্লি-এ পূরণ
হয়েছে। কাজে হাত দেবার পূর্বে আপনার সায়
চাইছি।

কাজী কুনিশ করে বললেন, মহান শাহ-এন-
শাহের অসীম অনুগ্রহ। ফরমাইয়ে ?

এক নম্বর : আমি রসুলের মতো একটি ধর্ম্মত

প্রচার করতে চাই। দুনিয়ার আমার পরিচয় হবে
দু-নম্বর রসুল। দুনিয়ার মালিক হয়েছি এবার
‘দীন’-এর মালিক হব। দু-নম্বর : আমি ব্যক্তি-পাখিবী
জয় করে দ্বিতীয় সেকেন্দার শাহ খেতাব নেব।
আপনি কি বলেন ?

কাজী-সাহেব নির্বাক। শুধু তাঁর শেকত শব্দে
হাত বুলাতে থাকেন। সুলতান বিরক্ত হয়ে বলেন,
আপনি তো কোন সলাহ দিলেন না ?

কাজী বললেন, আপনি তো সলাহ চাননি
জাহাপনা, চেয়েছেন—সায় !

সুলতান শব্দবাস্তে বলেন, না, না, এ বিষয়ে যদি
আপনার কোন সলাহ থাকে তাহলে তাও অকুণ্ঠভাবে
আমাকে বলুন ?

কাজী-সাহেব বলেন, অল্প বয়স দিলেন তখন
বলি, দু-নম্বর পয়গম্বর বনা এমনকিহু কঠিন নয়,
তবে সে-ক্ষেত্রে আপনাকে ঐ তক্ত-তাউস থেকে নেমে
আসতে হবে। আমি বতটুকু পড়াশুনা করেছি, তাতে
দেখোছি, নয়া-ধর্ম্মের প্রবর্তকেরা মসনদে বসেন না।
বুদ্ধদেব বসেননি, মুসা বসেননি, জরথুষ্ট্র-কর্মান
মহাবীর বসেননি, হিন্দুদের মুনির্বাষরা বসেননি এবং
পয়গম্বর রসুলও বসেননি...

সুলতান বে-দিল ! অনেকক্ষণ চিন্তা করে
সিঁধ্যান্তে এলেন—নাঃ ! দু-নম্বরী পয়গম্বর বনা তাঁর
কিস্মতে নেই। তক্ত-তাউস থেকে নেমে দাঁড়ানোটা তাঁর
পোষাবে না। কিন্তু দু-নম্বর সেকেন্দার শাহ কতে
বাধা কি ?

—একটিই বাধা জাহাপনা। আপনার বে আরিস্তত্বল
নেই ?

—আরিস্তত্বল ! সেটা কোন-জাতের চিড়িয়া ?
তামাম হিন্দুস্থানে নেই ?

কাজী বুঝিয়ে বলেন, আরিস্তত্বল ছিলেন ম্যাসি-
ডোনীর সেকেন্দার শাহর উজীর-এ-আজম ! কড়
জ্বরদস্ত কিন্তু বিশ্বাসী আদমী ! সেকেন্দার বতদিন
কাঁহা-কাঁহা দিগ্বিজয় করেছেন ততদিন শূন্য মসনদে
আর কাউকে চড়ে বসতে দেননি। ব্যাখ্যা শেষে প্রশ্ন
করেন, জাহাপনার এমন কোন বিশ্বস্ত উজীর-এ-আজম
আছেন কি ?

সুলতান ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন। না, নেই !
তিনি পিছন ফিরলেই সবকটা কমবস্ত, আমীর মালিকের
দল গিং-গিং লাফাতে থাকে, কে আগে সুলতান হবে !

ফলে সুলতান ঐ দু-নম্বর খোয়াবটিকেও বর্জন
করলেন। শুধু হুকুম দিলেন, অতঃপর তাঁর মৃত্যুর
ছাপা হবে ঐ নুতন খেতাবটা : দ্বিতীয় সেকেন্দার

শাহ।

এতে অবশ্য কাজী-সাহেব আপত্তির কোন কারণ খুঁজে পাননি।

সংলাপ আমার কল্পিত : কিন্তু কথোপকথন আদ্যন্ত ঐতিহাসিক। আর এই সংলাপ থেকেই বোঝা যায় আলাউদ্দীনের যাবতীয় স্থাপত্যকীর্তির মৌল স্বরূপ।

কুওওতুল মসজিদের সম্প্রসারণ : কুওওতুল-ইসলাম আইবক নির্মিত আদিম মসজিদে এবং ইল্-তুংমিসের সম্প্রসারণে যে সর্বমুখ ছন্দ ছিল তা ব্যাহত হল এবার। চিত্র-3.3-তে লক্ষ্য করে দেখুন, ইল্-তুংমিস্ মসজিদকে দু-পাশে সমছন্দে বর্ধিত করেছেন, যেন একদিকের সম্প্রসারণ অপরদিকে বৃদ্ধির 'জবাব'। দু-পাশে দুটি প্রবেশদ্বার : দু-দুটি অজুদর জলাধার, এক-এক পাশে তিনটি করে খিলান। আদ্যন্ত 'সিমেট্রি'।

আলাউদ্দীন ঐ সমতারক্ষার কোন ধার ধারলেন না—প্রাঙ্গণকে বর্ধিত করলেন শুধু একদিকে, উত্তর প্রান্তে। দৈর্ঘ্য ইল্-তুংমিসের প্রাচীরের ডব্লু. প্রস্থে আদিম মসজিদের দৈর্ঘ্য বিগুণিত। প্রস্তাবিত আলাই মিনার বসল সম্প্রসারিত অংশের কেন্দ্রবিন্দুতে। কিন্তু যে-কোনো মসজিদের যা-নাকি মূল আকর্ষণ কিবলা-সম্মুখিত মিহরাব, সেটিকে স্থানান্তরিত করা দ্বিতীয় সেকেন্দার শাহ-র হিম্মতে কুলারে না। বর্ধিত মসজিদের কেন্দ্র—হাবিতে দেখুন, আগে থেকেই হাবির কাছে ইল্-তুংমিস্-নির্মিত লিয়ান। সেটাকে ভেঙে যে নতুন করে বানাবেন তারও উপায় নেই—কারণ শরিরতী নির্দেশে মিহরাব ভাঙা চলেবে না। ফলে ছন্দপতন হল। আলাউদ্দীন এটাও খেয়াল করলেন না যে, তাঁর সর্দিগাল পরিকল্পনা সমাপ্ত হলেও তা সার্থক স্থাপত্যকীর্তি হতে পারত না—অত কড় শেহান ও মিনারের পরিকল্পনিত মিহরাব হারে যেত নিত্যন্ত বেমানান। বিরাট কিছ্র একটা গড়তে পারলেই তা সার্থক স্থাপত্য হয় না।

আলাই মিনার : একতলা-তক্ গাথা আলাই মিনার একটা সুলতানী খোয়সের কক্ষাল-রূপের অসমাপ্ত স্বর্ণের সিন্ধুর মতো। শুধু ফিত দিয়ে মোপ দেখা যায়, তার কাস কুৎব মিনারের কাসের মিলন। আলাউদ্দীন হয়তো আশা করেছিলেন যে, মিনারের ভিত ও বনিয়াদ মিলগুণিত হলেই তাঁর মহিমা বিগুণিত হবে। তা হয় না। অর্থাৎ আলাউদ্দীন যদি শতাব্দে হতেন এবং উদানীকৃত প্রদীপ-বিদ্যায়

ঐ আলাই মিনারটি যদি শেষ-তলা-তক্ গেথে তোলা সম্ভবপর হত, তা হলেও কুৎব মিনারের 'আর্কিটেক্ট-নিকাল' মহিমাকে অতিক্রম করা যেত না। ঔরঙ্গজেবের বিবি-কা-মক্‌বারা গিয়াস-উদ্দীন-সমাধির দ্বিগুণ ; কিন্তু দ্বিতীয়টিই সার্থক স্থাপত্যকীর্তি, প্রথমোক্তটি নয়।

সদৃশ্য কোনো স্থাপত্যকীর্তি তখনই সার্থক যখন শিল্পী দর্শককে ন্যূনতম দূরত্বে দাঁড়বার সুযোগ দিতে পারেন। একথা প্রণিধান করেছেন তাজমহল-পরিকল্পনাকার, হুমায়ূন-সমাধির স্থপতি থেকে হাল-আমলে মার্কিন মূল্যকে নর্থ-ডাকোটা চার-প্রেসি-ডেন্টের আবক্ষমূর্তির ভাস্কর। এ-কথা জানতেন কুৎব মিনারের মূল ডিজাইনার—নাহলে তিনি অত আদরের মিনারটিকে মসজিদ-চত্বরে ঢুকতে দিলেন না কেন ? আলাউদ্দীন-স্পর্ধিত আলাই মিনার যে-হেতু সম্প্র-সারিত মসজিদের ভিতর, তাই প্রয়োজনীয় ন্যূনতম দূরত্বে দাঁড়িয়ে গোটা মিনারটিকে কোন দর্শক দেখতে পেত না—যেমন পারে না নর্থ-ডাকোটা পর্বতের পাদ-দেশের গ্রামবাসী, কারণ তাদের জন্য ও ভাস্কর্য নয় ;—যেমন পারে না আগ্রার দয়ালবাগের মন্দিরটি শেষ হলে একবিংশ-শতাব্দীর দর্শক। মার্বেলে নিখুঁত আতা-উল-আলম-আঙ্গুর গড়তে নিবন্ধদৃষ্টি মূল নিয়ামক খেরাল করে দেখছেন না যে, চারপাশে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে নানান ইমারৎ। মন্দির যেদিন শেষ হবে সেদিন থাকবে না তাকে দেখবার মতো ন্যূনতম দূরত্বের অবকাশ।

আলাউদ্দীনের সমাধি : কুওওতুল-ইসলাম মসজিদের দক্ষিণ-পশ্চিমে সম্রাট আলাউদ্দীন খিলজীর সমাধি। তার মূল আকর্ষণ—সংযুক্ত দুটি মাদ্রাসা। তার হেতু এ নয় যে, আলাউদ্দীন জ্ঞান-মার্গের পথিক—যেমন ছিলেন নিরক্ষর আকবর বাদশাহ্—তার কারণ এই যে, এটি গড়ে তুলেছেন কিছ্র সেলজুকী-তুর্ক স্থপতি ও শিল্পী। দ্বিতীয় পরি-চ্ছেদেই বলছি, এই অনভাবনাটি কী-ভাবে ইসলামী-স্থাপত্য অনপ্রবেশ করেছে। তুর্কীস্থানে রাষ্ট্র-দিল্লীতে অনেক সেলজুকী স্থপতি ও মিস্ত্রি খিলজী-অমলে হিন্দুস্থানে চলে এসেছিল, জীবিকার সন্ধানে। তাদেরই হাতের কাজ দেখতে পাবেন মসজিদ-সংলগ্ন আলাই দরওয়াজায় (চিত্র 3.1)।

দ্বিতীয় দিল্লী নগরী : সিরি : বর্তমানে 'গোটোর-কেন্দ্র' এর পশ্চিমে চিত্রাগ-দিল্লী সড়কের উত্তরে

আলাউদ্দীন পরিকল্পিত দ্বিতীয় দিল্লী নগরীকে যদি দেখতে চান তাহলে চিত্র-3.2-তে খুঁজে দেখুন। বাস্তবে তা খুঁজতে যাওয়া বৃথা। সিরি-র ধ্বংসাবশেষ দেখে সে-আমলের রোশনাই সম্বন্ধে কোন ধারণাই হয় না। এই নগরীর পশ্চিমে আলাউদ্দীন বাদশাহ্ একটি জলাশয় খনন করান—যথারীতি নিজ নাম যুক্ত করে তার নামকরণ করেন 'হোস-ই-আলাই'। পরবর্তী-যুগে সুলতান ফিরোজশাহ্ ঐ জলাশয়টি আমূল সংস্কার করান। সেখানে নির্মিত হয় বহু ইমারৎ। বর্তমানে তার নাম 'হোস-ই-খানা'। এই সিরি-নগরীর প্রাচীরচড়ায় সেলজুকী-তুর্ক স্থপতিবিদেরা আমদানি করে আর এক জাতের অলঙ্করণ—যার দর্শনধারী ভূমিকার চেয়ে বড় কথা প্রয়োজনের তাগিদ। অগ্নি-শিখার মতো প্যারাপেটের উপর সারি সারি গাঁথনি। ইংরাজীতে যাকে বলতে পারি 'merlon' সমন্বিত battlement parapet; বাঙলায় তার উপযুক্ত প্রতিশব্দ খুঁজে পাচ্ছি না। ফার্সিতে একটি প্রতিশব্দ আছে : 'কঞ্জুর'। আপনারা অনুমতি করলে এর পর ঐ শব্দটাই ব্যবহার করব। এ-রীতি পরবর্তী যুগের ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যে বহুল ব্যবহৃত। গিয়াস-উদ্দীনের সমাধি-দুর্গে, ফিরোজশাহ্ কোটলায়, অথবা লাল কিল্লায় এই 'কঞ্জুর' অলঙ্করণটি দেখতে পাবেন। মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে—এই অলঙ্করণের আড়ালে দাঁড়িয়ে দুর্গরক্ষীদল তীর বা বন্দুক ছুঁড়ে আক্রমণকারীদের প্রতিহত করতে পারে। মূল উদ্দেশ্য যাই হোক, পরবর্তীকালে এটি একটি 'ম্যানারিজম'-এ পরিণত হয়, অর্থাৎ নিছক অলঙ্করণ হিসাবেই ইমারতে স্থান পেয়েছে। যেমন ধরুন গিয়াস-এর সমাধিতে ঐ কঞ্জুরের উচ্চতা এত কম যে, প্রয়োজনেও কোনো দুর্গরক্ষী তার আড়ালে আত্মগোপন করতে পারবে না; অথবা খিড়কি-মসজিদের মাথায় যে কঞ্জুর তাতে আদৌ কোন ছিদ্র নেই।

এইখানে স্থাপত্যের বিবর্তন-সংক্রান্ত একটি মৌল তত্ত্বের কথা প্রসঙ্গত উঠে পড়ছে। পার্সি ব্রাউন বলেছেন, "স্থাপত্যের ক্ষেত্রে এমন প্রায়ই দেখা যায় যে, পরবর্তী যুগের শিল্পী নিতান্ত অভ্যাসবশে পূর্ব-যুগের রীতির হুবহু অন্ধ অনুকরণ করে যায়। তার প্রয়োজনীয়তার কথা বিস্মৃত হয়ে।" উদাহরণস্বরূপ তিনি বরাবর-পর্বতে লোমশমূর্নি গৃহার কথা বলেছেন : সেখানে পর্ণকুটিরের অনুকরণে পাথরের গৃহায় 'ছাড়া' খোদাই করা হয়েছে; কিম্বা অজমতা উন-বিশিষ্ট চৈত্রে কাঠের পালিন-রাফটার খোদাই করা হয়েছে নিরেট পাথরের গায়ে। আমার কাছে ঐ 'অন্ধ

অনুকরণ' বিশেষণটা আপাততঃ ঠেকেছে। এ রীতির পশ্চাতে সাধারণত তিনটি হেতু। প্রথমতঃ, অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা; দ্বিতীয়তঃ, প্রাসঙ্গিকতায় সঙ্গো ধারাবাহিকতা রক্ষা; এবং তৃতীয়তঃ, উদ্দেশ্য যাই হোক, ঐ অলঙ্করণটি পরবর্তী শিল্পীদের তখনও ভালো লাগছিল। আমার এই বিরুদ্ধ বক্তির স্বপক্ষে আমি দাখিল করতে চাই একটি উদাহরণ : আগ্রা-কিল্লার জাহাঙ্গীরী-মহলে পাথরের স্ট্রাট-বীম-রাফটার-আর্কিট্রেভ'গুলি। আকবর বাদশাহ্-র আমল ঐ কাঠের যুগের দেড়-দু হাজার বছর পরে। ফলে এগুলি কেমন করে 'অন্ধ-অনুকরণ' হবে? জাহাঙ্গীরী-মহলের ঐ পাথরের বীম নিশ্চয়ই সজ্ঞান প্রয়োগ, সৌন্দর্যের খাতিরে। 'কঞ্জুর' অলঙ্করণ সম্বন্ধেও আমার ঐ বক্তব্য।

আলাই দরওয়াজা : আলাউদ্দীন-জমানার শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্তি। তিন-তিনটি দরওয়াজা নির্মিত হয়েছিল, একটি মাত্র টিকে আছে। যাকে দেখতে পাচ্ছি কুৎব মিনারের সামনে (চিত্র-3.2) সম্প্রসারিত কুণ্ডল মসজিদে। ভূমি-নকশা বা প্লানে এ ইমারৎ বর্গক্ষেত্র, 17.2 মিটার বাহুর। চার প্রান্তে চারটি খিলান, উপরে অনুচ্চ গম্বুজ। তিন-দিকে তিনটি ম্ভার, যার খিলান সূচীমুখ অশ্বখুরাকৃতি; শৃঙ্গমাত্র উত্তরদিকের বা ভিতর দিকের তোরণটি তিন-খাঁজ-ওয়ালা। এই তিন-খাঁজ-ওয়ালা খিলান পরবর্তী যুগে দিল্লীর আর কোন উল্লেখযোগ্য ইমারতে অনুকৃত হয়নি (যদিও শাহজাহাঁ সেটিকে তিনগুণ বর্ধিত করে নয়-পাপড়ির খিলান বহু ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন)—অথচ কি-জানি কি-করে বহু দূর বঙ্গদেশের আদিনা মসজিদের মিহরাবে এই জাতের একটি খিলান গঠিত হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। আলাই দরওয়াজাতেও স্কুইঞ্চ-পদ্ধতিতে চতুষ্কোণ কক্ষকে গম্বুজ গ্রহণের উপযুক্ত করা হয়েছে, যদিও পদ্ধতিটা ইল্ডুৎমিস্-সম্মতির অনুকরণে নয়। আরও লক্ষণীয়, এখানে ইসলামী-পদ্ধতিতে অর্থাৎ আকুয়েট-প্রকার 'প্রকৃত খিলান' (true arch) নির্মিত হয়েছে, রীতিমতো ভাসোর-এর মাধ্যমে, আইবকের মাখসুদরাহ্-র-জোড়াতালি বেওয়া খিলান (চিত্র-3.6) নয়। অর্থাৎ কলবনের সমাধিতে যে পরীক্ষাটি সর্বপ্রথমে করা হয়েছিল, যার ধ্বংসাত্মক মেহেরোলী-বাইপাসে এখনও গিয়ে দেখতে পাবেন (আগামী বছর পাবেন না, কারণ পুরাতত্ত্ব-বিভাগ এই অনবদ্য ঐতিহাসিক নিদর্শনটি ডেপো ফেলে তা আদ্যন্ত নতুন করে বানাচ্ছেন!) তার স্মরণ ও সার্থক প্রয়োগ হয়েছে আলাই দরওয়াজায়।

ইমারটি লাল-পাথরের, যদিও কুলাঙ্গ, জাফর-কাটা গবাক ও খিলানের ধার বরাবর সাদা-মাবেলের বড়ার বৈচিত্র্য এনেছে। খিলানের বহিঃস্থ-রেখায়, লক্ষ্য করে দেখুন, কী অপূর্ব পক্ষকুঁড়ির নকশা। এটি বহুদিন ধরে অনুকরণ করে গেছেন পরবর্তী যুগের শিল্পীরা। আলাই দরওয়াজার বৈশিষ্ট্য ঐ অলঙ্কৃত বতুল (boss), দেওয়াল-গাধিনিতে সরু হেডার (header) এবং চওড়া স্ট্রেচার (streacher)-এর ক্রমান্বয় ব্যবহার, নানান জাতের জ্যামিতিক নকশা। এবং অলঙ্করণগুলি ইল্-তুংমিস্-সম্মাধির মতো অতি-অলঙ্করণ দ্বায়ে দৃষ্ট নয়। বোধকরি আলাই দরওয়াজা সাক্ষ্য স্মৃতি হতে পেয়েছে এজন্য যে, 'এগোসেনট্রিক' সম্মাতি তাঁর আলাই মিনার ও মস্জিদ-সম্প্রসারণের তুলনায় একে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর মনে করেছিলেন। ফলে শিল্পীদল স্বাধীনতা পেয়েছিল।

কুংব মিনারের মেরামতি : আমীর খসরো-এর ক্রন্দন^১ কলা হয়েছে, আলাউদ্দীনের হুকুমে পূর্বযুদ্ধের কুংব মিনারে কিছু মেরামতি করা হয়। উপরে একটি ছত্রীও বসানো হয়। দূর্ভাগ্য আমাদের, ছত্রীটি টিকে নেই। তা হোক, তবু এজন্য আলাউদ্দীন ধন্যবাদার্থ। কারণ ফিরোজশাহ তুগলক ব্যতীত আর কোন দিল্লীস্বরকে পুরাতন স্থাপত্যকীর্তি মেরামতির জন্য বিশেষ ব্যগ্র হতে দেখি না। তবু আলাউদ্দীনকে সর্বাঙ্গীণ জানাতে পারছি না—কারণ ফিরোজশাহ-র মতো শৃঙ্খল স্থাপত্য-প্রেমের তাগিদে তিনি নিঃস্বার্থভাবে একাজ করেননি। এই সূবাদে তিনি গোটা কুংব মিনারটিকেই তাঁর জেবের পকেটে পুরতে চাইলেন! মেরামতি বন্ধন করেছেন তখন কেরামতির শতকরা শতভাগ তাঁতে বর্তাবে না কেন? হাজার হক তিনি যে 'আলেকজান্ডার দ্য সেকেন্ড'! তাই মেরামতি শেষ করে তার গারে একটি ফলক সেঁটে দিলেন : আলাউদ্দীনের বিজয়স্তম্ভ!

এ বিজয়স্তম্ভ ঠিক ক্রিকেট নয়। এ-যেন ইংরাজ স্পর্শিত পরিকল্পিত, ইংরাজের পয়সায় বানানো অষ্টারল্যান্ডি মনুষ্যের গারে এক পোঁচ চুনকাম করিয়ে তার গারে একটি মার্বেল ফলক সেঁটে দিয়ে স্বাধীনতা-স্বাধীনদের উদ্দেশ্যে কলা : তাম্র শব্দ!

জামায়ে খানা মস্জিদ : আস্তে না, আলাউদ্দীনের গড়া নয়। এটি তৈরী করিয়েছিলেন শাহজাদা খিজির খান। তিনি তক্ত-তাউসে কোনদিন বসেননি। হজরৎ নিজামউদ্দীন আউলিয়ার সম্মাধির

আশে পাশে অনেকগুলি স্থাপত্যকীর্তি পরবর্তী যুগে গড়ে উঠেছে। এটি তার মধ্যে বয়ঃজ্যোষ্ঠ (1325)। মস্জিদে তিনটি প্রবেশপথ, প্রত্যেকটির উপর একটি করে গম্বুজ। মাঝেরটা কিছু বড়, আর প্রত্যেকটি খিলানে সেই পক্ষকুঁড়ির বদলমত নকশা, যা ইতিপূর্বে দেখেছি আলাই দরওয়াজায়।

শাহজাদা খিজির খান দিল্লীর তক্ত-তাউসে বসবার সুযোগ পাননি। যুবক বয়সেই তাঁর দেহান্তর ঘটে। তাঁর বৃদ্ধ পিতৃদেব আলাউদ্দীন গুজরাটের রাজা রায়কর্ণদেবের মহিষী কমলাদেবীকে হারেমজাত করলেন; কিন্তু জীবন্ত ধরতে পারেননি কমলার আত্মজা দেবলাদেবীকে। রায়কর্ণ তাঁর কন্যাকে নিয়ে আশ্রয় নিলেন দেবগিরির রাজা রামচন্দ্র যাদবের দরুণে। সংবাদ পেয়ে আলাউদ্দীনের সেই অপ্রতিরোধ্য সেনাপতি মালিক কাফুর—সেই যিনি জালালকে হত্যা করার পুরস্কারস্বরূপ আলাউদ্দীনের প্রিয়পাত্র ও সেনাপতি হয়েছেন—তিনি আক্রমণ করলেন দেবগিরি। রাজা রামচন্দ্রকে দত্ত পাঠালেন, জানালেন, আশ্রিতা দেবলাদেবীকে হস্তান্তরিত করলে তাঁকে রেহাই দেওয়া হবে। রাজা রাম স্বীকৃত তো হলেনই না, পরিবর্তে তৎক্ষণাৎ তাঁর যুবকপুত্র শঙ্করদেবের সঙ্গে দেবলাদেবীর বিবাহের আয়োজন করলেন। নহবৎখানায় বিবাহের মানাই বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল কামান। বিবাহ-উৎসব বন্ধ রেখে রামচন্দ্রকে যেতে হল বাদশাহী ফৌজকে রুখতে। এ অসমযুদ্ধে জয়ী হওয়া অসম্ভব। শেষ পর্যন্ত সুলতানী ফৌজকে সমর্পণ করতে হল দরুণের চাঁবি। মালিক কাফুর আর শিপাহীসালার আলপ খান বন্দিদলকে উঠিয়ে নিয়ে গেল তাদের ছাউনিতে।

দেবলাদেবীকে কিন্তু ঐ বৃদ্ধ সুলতান আলাউদ্দীনের পাশবর্ন্তির শিকার হতে হয়নি। শাহজাদা খিজির খান বন্দিদলকে দেখে মূগ্ধ হয়ে গেলেন। পিতার রোষবাহিকে উপেক্ষা করে বিবাহ করলেন সেই পশ্চিমী নারীকে। এই রোমান্টিক গাথাটি পাবেন কবি আমীর খসরো-এর 'কিরান-উস্-সদাই' কাব্যগ্রন্থে।

খিজির ও দেবলাদেবীর বিবাহিত জীবন কিন্তু সুখের হয়নি। আলাউদ্দীনের মৃত্যু সময়ে খিজির ছিলেন গোয়ালিয়র দরুণে। সেখানেই তিনি বন্দী হন।

আলাউদ্দীন খিজির ইতিহাসের 'ইম্পোর্টেন্ট কোন্সেন'। জানের চেয়ে মানকে যিনি বড় করেছিলেন সেই চিতোরমহিষী পশ্চিমী নন, সর্বনাশের চেয়ে আত্মপ্রদর্শকে যিনি বড় করেছিলেন সেই রাজা রামচন্দ্রদেব যাদব নন, ইতিহাস প্রশ্নপত্রে ফিরে ফিরে

আসেন সেই ভদ্রলোক, যিনি নিজেকে দ্বিতীয় আলেক-জান্ডার ভাবতেন। অথচ তাঁর সম্বন্ধে ইতিহাস আর একটি শিক্ষাই দিয়েছে—সে শিক্ষা তাঁর নির্বংশ হওয়া!

পিতৃপ্রতিম খুল্লতাতকে নির্বংশ করে যে মালিক কাফুর আলাউদ্দীনের প্রিয়পাত্র হয়েছিল সেই এ নারকীয় কাণ্ডের নিয়ামক! বিষপ্রয়োগে সে হত্যা করে আলাউদ্দীনকে; তারই নির্দেশে তার এক অনুচর মালিক সাম্বল অরক্ষিত যুবরাজ খিজিরকে অন্ধ করে দেয়। আলাউদ্দীনের অপর পুত্র শাহজাদা সাদীখান-এর ভাগ্যও হল অনুরূপ। এত হত্যা ও পাপের মাশুল দিয়েও কিন্তু মালিক কাফুর তত্ত্ব-তাউসে বসবার অধিকার পেল না। তারই অনুচরদল মালিক মদশীর-এর নেতৃত্বে একদিন খুন করে বসল মালিক কাফুরকে! মসনদে বসল সুলতান কুৎবউদ্দীন মদবারক শাহ। তার মতো ইন্দিয়াসক্ত, অপদার্থ, এবং যৌন ব্যাভিচারী নরাদম খুব অল্পই বসেছে দিল্লীর সিংহাসনে। তাকে হত্যা করে অনধিকারী নাসির-উদ্দীন খসরৌ শাহ দখল করল তত্ত্ব-তাউস (1320)। শেষ হল খিজী-বংশ।

আমীর খসরৌ পাঠে মনে হয়, শাহজাদা খিজির ছিলেন দিলদরাজ পুরুষসিংহ। পিতার বিকৃতকামের হাত থেকে দেবলাদেবীকে তিনি উদ্ধার করেছিলেন। স্বীকার্য, তিনি নিজেও মোহিত হয়েছিলেন সেই পশ্চিমী নারীর অনিন্দ্য-সৌন্দর্যে।

জানি না, দেবলাদেবী ভালবাসতে পেরেছিলেন কিনা সেই উদ্ধারকারীকে। হয়তো হিন্দু-সংস্কারের কৈশিকর্ষে; শঙ্করদেবের প্রতি অনুরাগে—যে দুলহনের বহুমুখিত্তে তিনি তাঁর মেহদি-রঞ্জিত হাতখানি রাখতে গিয়ে বিবাহরাত্রে শূন্যে ছেঁয়ে কামানের গর্জন এবং মায়ের দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করে তিনি খিজিরকে ক্ষমা করতে পারেননি আদৌ। কিম্বা কে কলতে পারে, শাহজাদা খিজির অন্ধ হয়ে বাবার পর অনুকম্পার উৎসর্গে সঞ্জীবিত হয়েছিল সেই দুর্লভ বস্তুটি, বার নাম : মহম্মদ।

শোনা যায়, ঐ হজরৎ নিজামউদ্দীন আউলিয়ায় অবস্থিত জামায়েৎ-খানায় পাশাপাশি দুটি কবরে শূন্যে আছেন কবি আমীর খসরৌ-র নাস্তক-নাস্তিকা। কোন দুটি তা জানি না। কোন স্মারক চিহ্ন নাই। কবর দুটি খুঁজে পেলে হয়তো দেখবেন অদৃশ্য-আখরে লেখা আছে ব্যর্থপ্রেমিক শাহজাদার অন্তর-নিঃস্রাবের আতি :

“দুনিয়ামে হুঁ দুনিয়াকা তলব্দার নেহী হুঁ
বাজারমে গুজরা হুঁ খরিদ্দার নেহী হুঁ।
মায় ও গুল হুঁ খিজা যিসে বরবাদ কিয়া হয়
উল্খু কিসি দামনসে, মায় ও খার নেহী হুঁ ॥ **

□

* দুনিয়াদারীর ফুলের বাজারে বরবাদই শূন্য হলাম,
সুবাস বিলায়ে বিকাইনি হাটে, কেউই দিল না দাম;
ফুলের বদলে চোরকাটা হয়ে জন্ম নিলেও বুঝি
চরণে-জড়ানো ঘাগ্রায় ছিপে রহিত এ-গোলাম ॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গিয়াসউদ্দীন

উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা
গিয়াসউদ্দীনের রাজত্বকাল
গিয়াসউদ্দীনের অপমৃত্যু
মুহম্মদ বিন-এর রাজত্বকাল
কিরোজশাহ-র রাজত্বকাল
ছরজন অখ্যাত সুলতানের শাসন
তৈমুরলঙের ভারত আক্রমণ

সময়কাল

1320-1325
ফেব্রু' 1325
1325-1351
1351-1388
1388-1413
1398

তুগলক-বংশে নব্বজন সুলতান ; তার বিস্তৃতি 93 বছর—1320 থেকে 1413 ; তার ভিতর তিনজনের কথা শুধু বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে—প্রথম তিনজনের। বাদশাহিক কী ইতিহাসে, কী স্থাপত্যে বিশেষ রেখাপাত করতে পারেননি।

খিলজী-বংশের শেষাংশে যে নৃশংস কান্ড-কারখানা হয়েছিল সে-বিষয়ে আমরা অবহিত হয়েছি। দিল্লী-সুলতান আলোউদ্দীনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যুব-রাজ বিজয় ঠাকুরে অন্ধ করা হল, নিতান্ত নাবালক শিহাবউদ্দীন ওমরকে করা হল হত্যা। মালিক কাকুরের মৃত্যুর পর নিতান্ত অযোগ্য কুৎবউদ্দীন মুবারক উলুগ বর্গভিচারের স্রোতে গা ভাসালো। বছর-চারেকের মধ্যেই সুযোগসন্ধানী এক বহিরাগত—নাসিরউদ্দীন খসরৌ উঠে কসল দিল্লীর মসনদে। খসরৌ মাত্র কয়েক মাস তক্ত-তালুসে বসবার সুযোগ পায়। আমীর মালিকদের দুই হাতে মণিমুক্তা বিলিয়ে সন্তুষ্ট রাখবার চেষ্টা করে। তবু অসন্তোষ চাপা থাকে না। অকস্মেৎ একজন বৃদ্ধ তুর্কী সেনাপতি—গাজী মালিক, ঐ অর্নধিকারী সুলতানের বিরুদ্ধে কিছ্রাহ ঘোষণা করেন, তাকে পরাজিত ও হত্যা করে খিলজী-বংশের প্রতি বিন্দুততার প্রমাণ দেন। প্রশ্ন উঠল—অর্নধিকারী তো হত। এখন মসনদে বসে কে? খিলজী-বংশের উপর্যুপ উপর্যর্নধিকারী কেউ নেই, ঐশ্বর্য্য সেকেন্দার শাহ্ নির্বংশে! সবাই গাজী

মালিককেই অনুরোধ করল দায়িত্বটা নিতে। ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে বলেছে, গাজী মালিক প্রথমে অস্বীকৃত হন। বলেন, এজন্য তিনি দিল্লী অভিযানে আসেননি ; কিন্তু সকলের নির্বন্ধাতিশয্যে বৃদ্ধ বয়সে তাঁকেই নিতে হল শাসিন-দায়িত্ব।

এই নবাগত গাজী মালিকই হচ্ছেন তুগলক-বংশের প্রতিষ্ঠাতা : গিয়াসউদ্দীন।

ইতিহাস নিজের পুনরাবৃত্তি !

গিয়াসউদ্দীনও সম্পূর্ণ নিজের প্রচেষ্টায় সামান্য সৈনিক থেকে ক্ষমতার তুঙ্গ শিখরে উঠেছেন—কুৎবউদ্দীন আইবক, ইল্-তুৎমিস্ এবং জালালউদ্দীন খিলজীর মতো। তাঁর আশ্বাজান বল্বনের সময়ে তুর্কীস্থান থেকে হিন্দুস্থানে আসেন এবং পঞ্জাবের এক জাঠ রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁদেরই সন্তান গিয়াস্ বাল্যে ও কৈশোরে নিতান্ত দারিদ্র্যের মধ্যে মান্দ্য। নিজের ভাগ্য তিনি নিজে গড়েছেন, অসম-সাহসিকতায়, নিপুণতায়, চারিত্রিক দৃঢ়তায়।

গিয়াস্ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকেরা উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করেছেন। তাঁর হৃদয়ের প্রসার ছিল, রাজকীয় নানান গুণে তিনি বিভূষিত—ধর্মাত্মা, দৃঢ়চেতা, ন্যায়নিষ্ঠ এবং জ্ঞানী। আমীর খসরৌ তাঁর রাজত্বকালেও জীবিত—লিখেছেন, 'গিয়াস্-এর তাজের নিচে যে মগজ তাতে যে পরিমাণ জ্ঞান সঞ্চিত তা শতজন মোল্লাকে লজ্জা দেবে।'

গিয়াসউদ্দীনের রাজ্যবিস্তার, সূশাসন-ব্যবস্থা ইত্যাদি আমাদের এস্তিরারের বাহিরে ; তাঁর মর্মান্তিক মৃত্যুর কথাটা বাঙালী পাঠকের অজানা নয়। যাযাবরের 'দৃষ্টিপাত'-এর সেই অনবদ্য কাহিনীটি—'দিল্লী দূর অস্ত', নিশ্চয় মনে আছে আপনাদের। পুনরুজ্জ্বল হচ্চে জেনেও একটি বিশেষ কারণে কাহিনীটি আবার বলতে হচ্ছে ; কারণ পর পর দুটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা—খিলজীর 'জালাল' এবং তুগলকদের 'গিয়াস' যে ইতিহাসের ঐ সূত্রটির উপর দাগা বুলিয়ে গেছেন—'History repeats itself' (ইতিহাস নিজের পুনরাবৃত্তি) সে-কথাটা যাযাবর বলে যাননি।

"সেকালে মঘলদের আক্রমণ এবং আনুর্ভাগিক হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন ছিল উত্তর ভারতের এক নিরন্তর বিভীষিকা। গিয়াসউদ্দীন তাদের আক্রমণ ব্যর্থ করতে পশ্চিম করলেন নতুন নগর, তৈরি করলেন নগর-ঘিরে দুর্ভেদ্য-প্রাচীর এবং প্রাচীর ম্বারে দুর্জয়-দুর্গ। একদিকে ক্ষুদ্র পর্বত এবং আর একদিকে প্রাচীর-বেষ্টিত নগরী, মাঝখানে খনিত হল বিশাল জলাশয়। বর্ষার দিনে শৈলশিখর থেকে ধারাস্রোতে জল সঞ্চিত হত এই জলাশয়ে ; সংবৎসরের পানীয় সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত আশ্বাস থাকতো প্রজাপুঞ্জের।"

নবনির্মিত নগরীটি তুগলকাবাদ, জলাশয় বেষ্টিত দুর্গ (চিত্র—5.1) এবং সেইসঙ্গে সুলতানের নিজস্ব সমাধিসৌধ (চিত্র—2.5), যা তিনি নিজের জীবদ্দশায় গড়েছিলেন ; সে-প্রসঙ্গে এখনি আসব। আপাতত কাহিনীর সূত্র ধরে এগিয়ে যাই। কী-ভাবে সুলতানের সঙ্গে এক সর্বভাগী ফকিরের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠল :

হজরৎ শেখ নিজামউদ্দীন আউলিয়ার জন্ম বাদাউনে (1236)। মাত্র পাঁচবছর বয়সে তাঁর পিতৃ-বিয়োগ হয়—আম্মাজানের হাত ধরে নিজামউদ্দীন চলে এলেন দিল্লীতে। পরে বিখ্যাত ফকির শেখ ফরিদ শকর-গঞ্জের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তিনি নিজের প্রখ্যাত দরবেশ হয়ে পড়েন। আলাউদ্দীন খিলজী, এবং মুহম্মদ তুগলক, দু-জনেই তাঁর পরম ভক্ত। হজরৎ নিজামউদ্দীনের দেহান্ত ঘটে 1325 খ্রীষ্টাব্দে, ঊননব্বই বছর বয়সে। এই পুণ্যস্থান কবরটি ভূমিদশায় দেখে ফিরোজশাহ তুগলক সেটিকে পুনর্নির্মাণ করান। কি জানি কার পাপে আবার তা ভেঙে পড়ে। সে কবরের চিহ্নমাত্র বর্তমানে নেই ! তবে এই ফকিরের খনন করা একটি জলাশয় আজও বর্তমান। ঐ জলাশয় খনন করা নিয়েই সুলতান গিয়াস আর ফকিরের বিরোধ ঘনিষ্ঠে উঠল। সেই কাহিনীই লিপিবদ্ধ করেছেন যাযাবর :

"ফকির-সুলতানে সংঘর্ষ ঘটলো এই নগর নির্মাণ, কিম্বা আরও সঠিকভাবে বললে বলতে হয় নগরপ্রাচীর নির্মাণ উপলক্ষ করেই। নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দীর্ঘ কাটতে মজদুর চাই প্রচুর। গিয়াসুদ্দিনের নগর তৈরী করতেও মজদুর আবশ্যক সহস্র সহস্র। অথচ দিল্লীতে মজদুরের সংখ্যা অত্যন্ত পরিমিত। দু-জায়গায় প্রয়োজন মিটানো অসম্ভব। অত্যন্ত ম্বাভাবিক যে, বাদশাহ্ চাইলেন মজদুরের আগে শেষ করবে তাঁর কাজ, ততক্ষণে অপেক্ষা করুক ফকিরের বয়রাতি খনন। কিন্তু রাজার জোর অর্থের, সেটা পরিমাপ করা যায়। ফকিরের জোর হৃদয়ের, তার সীমা শেষ নেই। মজদুরেরা বিনা মজদুরিতে দলে দলে কাটতে লাগলো নিজামুদ্দিনের তাল্লাও। সুলতান হৃদয়ের ছেড়ে ফেললেন, 'তবে রে—'।

"কিন্তু তার ধর্মানি আকাশে মিলাবার আগেই এতলা এল আশু কতবোর। বাঙলাদেশে বিদ্রোহ দমন করতে ছুটেতে হল সৈন্য সামন্ত নিয়ে।

"শাহজাদা মহম্মদ তোগলক রইলেন রাজধানীতে রাজ-প্রতিভূরূপে। তিনি নিজামুদ্দিনের অনুরাগীদের অন্যতম। তাঁর আনুকূল্যে দিব্যরাত্রি খননের ফলে পরহিতব্রতী সম্মাসীর জলাশয় জলে পূর্ণ হল অনতি-বিলম্বে। তোগলকাবাদের নগরপ্রাচীর রইলো অসমাপ্ত।

"অবশেষে সুলতানের ফিরবার সময় হল নিকট-বতী। প্রমাদ গণনা করল নিজামুদ্দিনের অনু-রাগীরা। তারা ফকিরকে অবিলম্বে নগর ত্যাগ করে পলায়নের পরামর্শ দিল। ফকির মৃদু হাস্যে তাদের নিরস্ত করলেন—দিল্লী দূর অস্ত্। দিল্লী অনেক দূর।

"প্রত্যহ যোজন পথ অতিক্রম করছেন সুলতান। নিকট হতে নিকটতর হচ্ছেন রাজধানীর পথে। প্রত্যহ ভক্তেরা অনুন্নয় করে ফকিরকে। প্রত্যহ একই উত্তর দেন নিজামুদ্দিন—দিল্লী দূর অস্ত্ !

"সুলতানের নগর প্রবেশ হলো অসম, আর মাত্র একদিনের পথ অতিক্রমণের অপেক্ষা। ব্যাকুল হয়ে শিষ্য-প্রশিষ্যরা অনুন্নয় করল সম্মাসীকে, এখনও সময় আছে, এই বেলা পালান। গিয়াসুদ্দিনের ক্রোধ এবং নিষ্ঠুরতা অবিস্মৃত ছিল না কারো কাছে, ফকিরকে হাতে পেলে কী দশা হবে সে-কথা কম্পনা করে তারা ভয়ে শিউরে উঠল বারংবার। স্মিত হাস্যে সেদিনও উত্তর করলেন বিগতভয় সর্বভাগী সম্মাসী—দিল্লী হনুজ দূর অস্ত্। দিল্লী এখনও অনেক দূর ! বলে, হাতের জপমালা ঘোরাতে লাগলেন নিশ্চিন্ত ঔদাসীন্যে।

“নগরপ্রান্তে পিতার অভ্যর্থনার জন্য মহম্মদ তৈরী করেছেন মহাঘর মন্ডপ। কিংখাবের সামিয়ানা। জরীতে, জহরতে, কলমল। বাদাডাড। লোকলস্কর। অমীর ওমরাহ্ মিলে সমারোহের চরমতম আয়োজন। বিশাল ভোজের ব্যবস্থা, ভোজের পরে হাঙ্গামার প্রদর্শনী প্যারেড।

“মন্ডপের কেন্দ্রস্থলে ঈশ্বর উন্নত ভূমিতে বাদশাহের আসন, তার পাশেই তাঁর উত্তরাধিকারীর। পরদিন গোয়ালি বেলায় সুলতান প্রবেশ করলেন অভ্যর্থনা মন্ডপ। প্রবল হাস্যোচ্ছ্বাসের মধ্যে আসন গ্রহণ করলেন। সিংহাসনের পাশে বসালেন নিজ প্রিয়তম পুত্রকে। কিন্তু সে মহম্মদ নয়, তার অনুজ।

“ভোজনান্তে অতি বিনয়বনত কণ্ঠে মহম্মদ প্রার্থনা করলেন সন্তোষের। জাহাপনার হুকুম হলে এবার হাতীর কুচ্কাওয়াজ শব্দ হয়, হস্তিযুগল নিয়ন্ত্রণ করবেন তিনি নিজে। গিয়াসদ্দিন অনুমোদন করলেন স্মিতহাস্যে।

“মহম্মদ মন্ডপ থেকে নিষ্কান্ত হলো ধীর শান্ত পদক্ষেপে।

“কড় কড় কড় কড়াং!

“একটি হাতীর শিরসগালনে স্থানচ্যুত হল একটি স্তম্ভ। মূহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত ভূপতিত হলো সমস্ত মন্ডপ। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল অসংখ্য কাঠের খাম। চাপাপড়া মানুষের আত্মকণ্ঠে বিদীর্ণ হলো অধিকার রাত্রির আকাশ। ধূলার আচ্ছন্ন হলো দৃষ্টি। ভীত সচকিত ইতস্ততঃ ধাবমান হস্তিযুগলের গুরুভার পদতলে নিষ্পিষ্ট হলো অগণিত হতভাগ্যের দল। এবং সে-বিভ্রান্তকারী বিশ্ব্বলার মধ্যে উদ্ধারকারীরা বাক্য অনুসন্ধান করল বাদশাহের।

“পরদিন প্রাতে মন্ডপের ভগ্নস্তূপ সারিয়ে আবিষ্কৃত হলো বৃদ্ধ সুলতানের মৃতদেহ। যে প্রিয়তম পুত্রকে তিনি উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন মনে মনে, তার প্রাণহীন দেহের উপরে সুলতানের দুই বাহু প্রসারিত। বোধকরি আপন দেহের বর্ম রক্ষা করতে চেরেছিলেন তাঁর স্নেহাস্পদকে।

“সমস্ত ঐহিক ঐশ্বর্য প্রতাপ ও মহিমা নিয়ে সপত্র গিরিসন্দিপনের শোচনীয় জীবনান্ত ঘটল নগর-প্রান্তে। দিল্লী রইল চিরকালের জন্য তার জীবিত পদক্ষেপের অতীত।

“দিল্লী দূর অন্তঃ। দিল্লী অনেক দূর।”

অনবদ্য কাহিনী। অতুলনীয় রচনাশৈলী। বেশ মনে আছে, প্রথম বৌবনে যখন এই কটা পৃষ্ঠা পড়ে-

হিলাম তখন বার বার চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল। গ্রিকালস্ ফকিরের অলৌকিক ক্ষমতায় বারংবার রোমাঞ্চিততনু হয়েছিলাম।

এ-গ্রন্থ রচনাকালে পুনরায় ‘দৃষ্টিপাত’ পড়তে বসে দেখি, সেই যুবক-পাঠকের মৃত্যু ঘটেছে। বোধকরি “কাটা-সিরিজের” গোয়েন্দা কাহিনী রচনার অপরাধেই সেই সরলবুদ্ধি পাঠকের এই অপমৃত্যু। এবার মনে জাগল একাধিক প্রশ্ন : (১) সুলতান যখন দিল্লীর পাদদেশে পেঁছেছেন তখন শাহজাদা কেন একটি অস্থায়ী মন্ডপ বানালেন? অদূরেই তো ছিল রাজ-ধানীর দেওয়ান-ই-আমের পাকা ইমারৎ? (২) হাতীর প্যারেড শব্দ হবার পূর্বেই কেন শাহজাদা “মন্ডপ থেকে নিষ্কান্ত হলেন ধীর পদক্ষেপে”? (৩) রাতে গশাল জ্বলে সুলতানকে উদ্ধার করার আয়োজন করলেন না কেন শাহজাদা? (৪) মহম্মদের কণ্ঠস্বর কেন “অতি বিনয়বনত”?

ঘটিতে শব্দ করলাম প্রামাণিক ইতিহাস। দেখলাম, যাযাবর স্বজাতি ঐতিহাসিক সত্যটা সঙ্গোপন রেখেছেন। খিলজী-বংশের প্রতিষ্ঠাতা ‘জালাল’ এবং তুগলক-বংশের প্রতিষ্ঠাতা ‘গিয়াস’-এর ইতিহাস অর্ডিন। ইতিহাস নিজের পুনরাবৃত্তি মাত্র।

সব ঐতিহাসিক এ-বিষয়ে আজ একমত : মহম্মদ বিন্ তুগলক সুপরিচালিতভাবে তাঁর পিতাকে হত্যা করেছিলেন। ঈশ্বরীপ্রসাদ, রমেশচন্দ্র, কালীকিঙ্কর প্রভৃতি। এটা যে দুর্ঘটনা এমন একটা ভ্রান্ত ধারণা প্রথম যুগে করা হয় সমকালীন ঐতিহাসিক জিয়া বারনির একটি পংক্তি থেকে। তিনি বলেছেন, “A thunderbolt of calamity from heaven fell upon the Sultan and he was, with five or six others crushed under the debris.” (চরম দুর্ভাগ্যের এক বজ্রপাত হল সুলতানের মাথায়, এবং আরও পাঁচ-ছয়জনের সঙ্গে তিনি ধ্বংসস্তূপে পিষ্ট হয়ে মারা যান।) ঈশ্বরীপ্রসাদ^১ বলেছেন, ইলিয়ট-সাহেব ঐ পংক্তিটির অনুবাদে কিছ্র ভুল করেন। তাঁর অনুবাদ পড়ে মনে হয়, বাস্তবেই বৃষ্টি একটি বজ্র সেই মন্ডপের উপর পড়েছিল। বারনি-বর্ণিত ‘বজ্রপাত’ যে তীর্থক অর্থে অলঙ্কার হিসাবে ব্যবহৃত সেটা অনুবাদক বদ্বতে পরেননি। যাহিদা বিন্ আহমেদ, ফেরিস্তা প্রভৃতি বলেন, এই দুর্ঘটনার পিছনে একটি গভীর ষড়যন্ত্র ছিল, যদিও মহম্মদের নামোল্লেখ তাঁরা করেননি।^২ অপর-পক্ষে, বিদেশী পর্যটক ইব্ন বতুতা স্বার্থহীন ভাষায় বলে গেছেন, এটি শাহজাদা মহম্মদের একটি চরম অপকীর্তি। ইব্ন ভারতে আসেন 1333 খ্রীষ্টাব্দে,

ঘটনার আট বছর পরে এক এ-কাহিনীটি লিপিবদ্ধ করেন প্রত্যাদেশী শেখ রুকনুদ্দীন মুলতানীর জবানী থেকে। তাঁর প্রথম কাহিনীতে ইব্ন বতুতা শূধু মুলহম্মদকে দৃঢ়ভাবে অভিযুক্ত করেই ক্ষান্ত হননি বলেছেন, “When the workmen were called upon to dig up the body of the Sultan with their shovels, the Prince deliberately delayed their arrival.” (সেরাফে মজদুরদের ডেকে এনে যখন ধ্বংসস্থাপ সরিয়ে সুলতানের আহত দেহকে উদ্ধার করার আয়োজন হচ্ছিল, তখন শাহজাদা ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের দেরি করিয়ে দেন।)

ইব্ন বতুতা নাছোড়বান্দা ঐতিহাসিক—সব কিছুর শেষ পর্যন্ত তলিয়ে দেখতে চান। তিনি খুঁজে খুঁজে বার করেছিলেন সেই অম্ভুত মণ্ডপটি—যা নাকি একটি-মাত্র কেন্দ্রীয় স্তম্ভের উপর ভারসাম্য রক্ষা করে নির্মিত, সেটি কোন্ স্থপতিবাদের এলেম-এর স্বাক্ষর! খুঁজে পেয়েছিলেন। লোকটার নাম আম্জান আয়াজ! “Whom Muhammad afterwards, probably to signify his gratitude, made his Chief Minister.” (যাঁকে পরে মুলহম্মদ—সম্ভবত প্রতিদান হিসাবে পুরস্কৃত করতেই—নিজের উজীরে-আজম করে দেন।)।

আম্জাদ বোধকারি তুলনামূলক আলোচনায় ষোলো-কলার ষোড়শ কলা! জালালউদ্দীনের হত্যাকারী মালিক কাফুরকেও আলাউদ্দীন প্রধান সিপাহ-সালার করে দিয়েছিলেন না?

ইব্ন বতুতা বিদেশী, নিরপেক্ষ বিচারক। তাই তাঁকে অবিশ্বাস করা কঠিন। তা-ছাড়া মুলহম্মদের স্বপক্ষে তো কোনো যুক্তিই নেই—ইলিয়টকৃত বারনির ঐ ভুল অনুবাদ ছাড়া?

তাহলে ‘যাযাবর’ সে-কথা বলে গেলেন না কেন? মিথ্যা তিনি লেখেননি, কিন্তু সত্য গোপন করেছেন। এবং সজ্ঞানে—না হলে ঐ বর্ণনাটা তাঁর কলম দিয়ে কিছতেই বেরতো না—ঐ “প্রিয়তম পুত্রের প্রাণহীন দেহের উপর সুলতানের দুই বাহু প্রসারিত।” ওটা ইব্ন বতুতার ভ্রমণকাহিনী থেকে সংগৃহীত।

একটাই হেতু। সে-কথা লিখলে সন্দেহবাতিক পাঠকের কু-চিন্তা আবার কোঁদিকে মোড় নেয় কে জানে! তারা হয়তো ভাবতে বসবে “বিগতভয় সর্ব-ত্যাগী সন্ন্যাসী” নিজামউদ্দীনের ঐ বহু উদ্ভূত ভবিষ্যৎবাণী ‘দিল্লী দূর অস্ত’-এর গভীরে কোনো ঐশ্বরিক ক্ষমতা নেই, আছে কটকৌশলী ষড়যন্ত্রীর অভিজ্ঞান! ‘দিল্লী হনুজ দূর অস্ত’ বলে সন্ন্যাসী তস্বি ঘোরাচ্ছেন শূনে পাঠকের বর্ষা মনে পড়ে যাবে

‘শাহজাহান’ নাটকে আলমগীরের কামিনায় শিশির ভাদুড়ীর মালা উপস্থাপনা। তাহলে এ কাহিনীর মূল আবেদনটাই মাঠে মারা যায়। লেবন নিজেই সে ইতিপূর্বে বলেছেন, শাহজাদা মুলহম্মদ ফিরুজ ‘অনুরাগীদের অন্যতম, তাঁর ‘আনুঙ্গো’.....ইত্যাদি।

ঐতিহাসিক নিজামউদ্দীন আহমেদ কিন্তু সেই কান্ডটাই করে বসে আছেন। যা ছিল সান্দ্র পাঠকের আশঙ্কা তাই স্পষ্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ করে গেছেন তিনি : “He charges Barni with intentionally suppressing the truth out of regard for his patron Firuz Shah Tughluq. He thinks that the death of the Sultan was due to a conspiracy formed by Shaik Nizam Uddin Aulia and the Crown Prince [তাঁর (ঐতিহাসিক আহমেদ) অভিযোগ, বারনি সজ্ঞানে সত্য গোপন করেছিলেন, ফিরোজ-শাহ তুগলুকের কথা মনে করে (ফিরোজ মুলহম্মদকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং বারনি ফিরোজ-এর কাছ থেকে মাসোয়ারা পেতেন)। তিনি আরও মনে করেন, সুলতানের মৃত্যু একটি কড়ম্বলের পরিণতি—যার মূল নিয়ামক ষোথভাবে শাহজাদা মুলহম্মদ এবং হজরৎ শেখ নিজামউদ্দীন আউলিয়া]।”

শূধু দিল্লী নয়, দিল্লীর প্রকৃত ইতিহাসও সাধারণ পাঠকের কাছে আচ্ছন্ন : ‘হনুজ দূর অস্ত’!

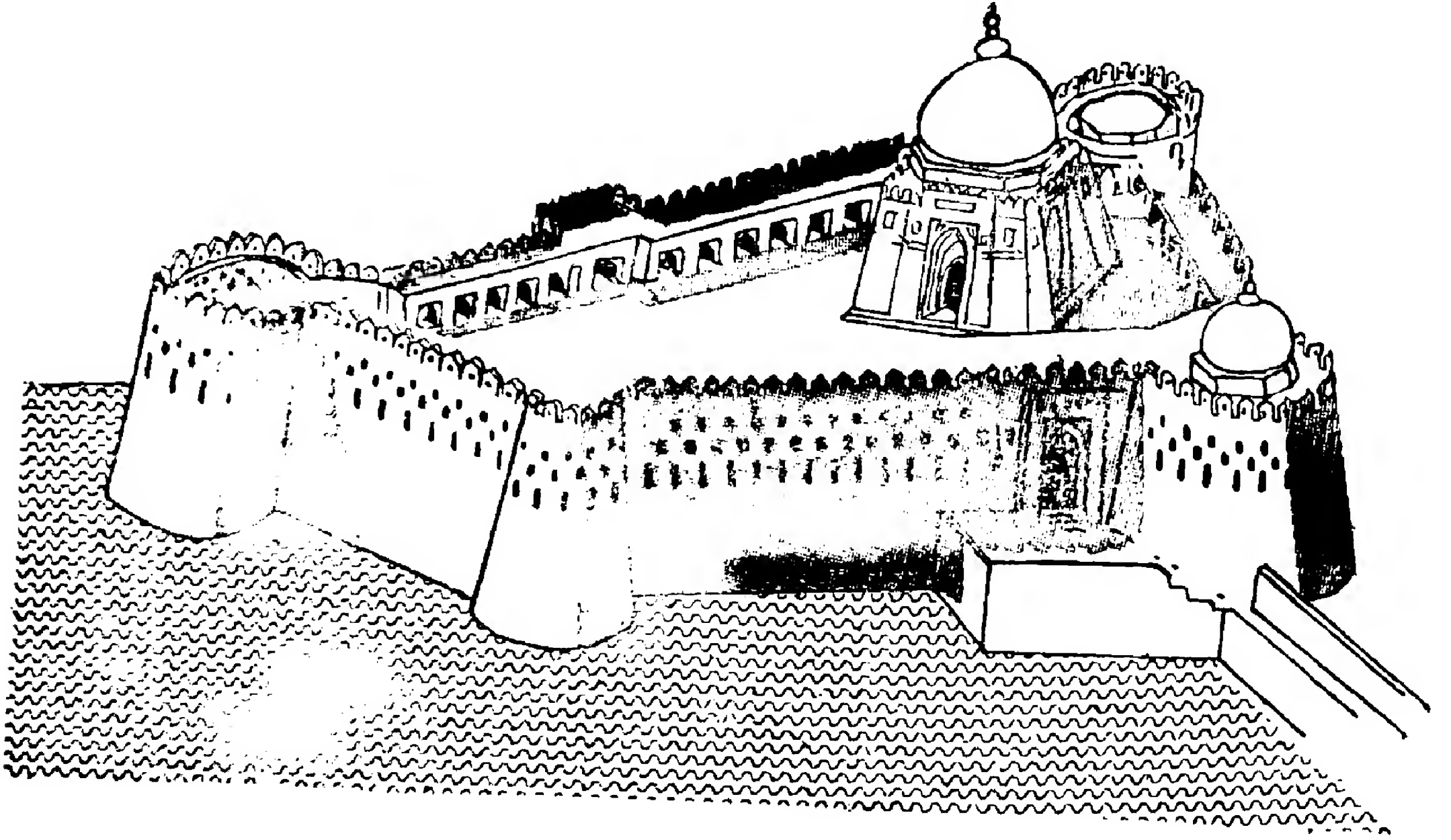
তুগলুকাবাদ ও গিয়াস্-এর সমাধি : গিয়াস্-নির্মিত দিল্লীর তৃতীয় নগরীর একদিকে অনুচ্চ পাহাড় এবং বাকি তিনদিকে জল। জলটা সঞ্চিত কৃত্রিম জলাধারে, সুকৌশলে বৃষ্টির জমি-ধোওয়া জলও তাতে এনে ফেলা। কুংব-বদরপুর রোডে কুংব-চত্বর থেকে আট কিলোমিটার দূরে এই শহরের ধ্বংসাবশেষ দেখে আন্দাজ করা শক্ত—তদানীন্তন তুগলুকাবাদের স্নিন্ধ নয়নাভিরাম রূপ। জলাশয় বর্তমানে বিশুদ্ধ, রুদ্ধ-ধ্বংস প্রস্তরস্তূপের মধ্যে কঙ্কালসার গিয়াস্-এর দুর্গ। নগরীর দক্ষিণপ্রান্তে নির্জন প্রান্তরে গিয়াস্-উদ্দীনের অনাড়ম্বর কবর। কিন্তু সমাধিসৌধের প্রসঙ্গে আসার আগে বলতে হয় তুগলুকাবাদের কথা :

তুগলুকাবাদ নগরীকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমভাগ, কুংব-বদরপুর সড়কের উত্তরে, প্রবেশপথের পূর্বদিকে, সুউচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত মূল দুর্গ। তার দক্ষিণে অনুচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত অংশে ছিল আমীর মালিকদের প্রাসাদশ্রেণী এবং উত্তরদিকে সাধারণ নগর-বাসীর ইমারৎ। তিনটি অংশকে সংযুক্ত করে নানান রাজপথ যে নির্মিত হয়েছিল তার সামান্য চিহ্ন আচ্ছন্ন

বর্তমান। মূল দুর্গে একটি মিনারও ছিল—বিজয়-মন্ডল। আটকোণা রাব্-আনন্দির গাধিনি, তুগলক-বৈশিষ্ট্য। তার ঢালু প্রাচীর এবং চারদিকে চারটি প্রবেশদ্বার। বিজয়মন্ডলের পূর্বদিকে একটি প্রাসাদের ধ্বংসাক্ষেপ। সেটাকে একটি মসজিদ বলে ধরে নিতে পারলে বিজয়মন্ডলকে মুরাশ্বিন-মিনার হিসেবে কল্পনা করা চলত; কিন্তু বিধ্বস্ত প্রাসাদটি মসজিদ নয়। তাই অনুমান করছি, 'বিজয়মন্ডল' কল্পিত ছিল একটি প্রহরী-মিনার, observation tower.

গিয়াস্ বখশ মস্‌নে আসেন তখন তিনি বৃদ্ধ। মাত্র পাঁচবছর তিনি ছিলেন দিল্লীশ্বর। বিলাস-বাসন, রাজসম্ভোগ তাঁর ললট-লীপ নয়, স্বভাবতও তিনি মৃদু-কিন-পসন্দ, আদ্যন্ত বোদ্ধা, স্পার্টান জঙ্গীমানুষ। তাই তাঁর পরিকল্পিত নিজের সমাধিসৌধটিরও যেন

মুখী হয়। পঞ্চভুজের প্রতিটি কোণে স্ফীতোদর বাস্টিয়ান (bastion)। তাতে এবং প্রাচীরে যে সূক্ষ্ম-ছন্দে দাগগুলি দেখছেন তা অলঙ্করণ আদৌ নয়, ছিদ্রপথ। দুর্গ আক্রান্ত হলে ঐ ছিদ্রপথে বেরিয়ে আসত সারি সারি ধানুকীর সূচীমুখ শায়ক! সমাধিসৌধ চতুষ্কোণ, ঢালু—উপাদান রক্তিম চুনা পাথর, শুদ্ধ গম্বুজটা সাদা। জালি কাজকরা জানালা এবং খিলানের উপর সাদা বর্ডার। অশ্বখুরাকৃতি সূচালো খিলানের কিনার-বরাবর শ্বেতবর্ণের পশ্মকুণ্ডি—যা দেখেছিলাম আলাই দরওয়াজায়। প্যারাপেটে একসার অগ্নিশিখা-নকশার কঙ্কর। গম্বুজের উপর হিন্দু-স্থাপত্যের আমলক ও কলস এই প্রথম ইসলামী স্থাপত্যে প্রবেশ করল। এ-দুটি হিন্দু অলঙ্করণ কুশীলব পরের কয়েকশ বছর ধরে ইসলামী স্থাপত্যের



চিত্র-5.1 তুগলকাবাদ দুর্গ ও গিয়াসের কবর (দিল্লী)।

বোদ্ধার বেশ। তাতে কারুকার্য নেই, সৌখিনতা নেই—অর নিতান্ত কেঁজা ভূমিকা। সমাধিসৌধ কল্পিত দুর্গের ভিতর আর এক দুর্গ! রাষ্ট্রবিস্তার শেষ অগ্রসংকল হিসাবে উপস্থিত।

ভূমি-নকশায় মক্‌বরা-চত্বর বা দুর্গটি একটি অসমবাহুর পঞ্চভুজ (চিত্র-5.1)। মূল মক্‌বরাটি তার কেন্দ্রে নয়, এক পাশে কিন্তু শান্ত-মতে ঠিকমতো কমানো, যাতে কিল্লা সমাধিত মিহ্রাব ঠিক পশ্চিম-

নাটকে বারে বারে প্রবেশ ও প্রস্থান করেছে এবং তার চরম পরিণতি তাজমহলের চড়ায়—যেখানে আমলক ও কলস মিতালী করেছে ঈদের চাঁদের সঙ্গে।

সৌধের তিনদিকে প্রবেশদ্বার, শুদ্ধ, পশ্চিমদিকে মিহ্রাব। এই অনাড়ম্বর মক্‌বরায় সবার আগে যেটা নজরে পড়ে তা হচ্ছে বহিঃপ্রাচীরে একটা অশুদ্ধ ঢাল, যা আগে কখনও দেখিনি। জমির সঙ্গে প্রায় 75 ডিগ্রি। অথচ এই নয়া-আমদানী ঢালটা পরবর্তী যুগেও

অনুকৃত। তুগলকী যুগ অতিক্রম করে সৈয়দ, লোদী এমন কি শেরশাহ্ শুরের কবরে। তফাৎ এই—গিয়াস্-এর মক্‌বারায় যা ছিল 'স্টাইল', অন্যান্য ক্ষেত্রে তা শুধুমাত্র 'ফ্যাশন'।

মনে প্রশ্ন জাগে, এই বিচিত্র ঢালটা এল কোথা থেকে? কেন? এই প্রশ্নের একটি সুন্দর জবাব দিয়ে গেছেন পার্সি ব্রাউন-সাহেব।^১ বলছেন, এই বাইরের দিকে ঢাল সমন্বিত দেওয়াল গেথে তোলার কামদাটা পারস্যে বহু পূর্বযুগ থেকেই প্রচলিত। সেখানে পাথরের বদলে ইট, কখনও বা কাঁচা-ইটের গাঁথনি ছিল স্থাপত্যের উপাদান। গিয়াস্ তুগলকাবাদের নির্মাণ-কার্যে আত্মনিয়োগের পূর্বে মূলতানে একটি মক্‌বারা নির্মাণ করান—দরবেশ শাহ্ রুক্ন-ই-আলম-এর সমাধি (1320)। আটকোনা অতি উচ্চ কুর্সির (plinth) উপর অষ্টভুজ সমাধিসৌধ। তুর্কী স্থপতিবিদেরা সেখানে পাথরের বদলে ইটের ব্যবহার করেছিল এবং পারস্যরীতি অনুযায়ী বাহির দিকে ঢাল দিয়েছিল। গিয়াস্ মূলতানী মিস্ত্রিদের দিল্লীতে নিয়ে এসেছিলেন কিনা ইতিহাসে লেখা নেই, কিন্তু মূলতানী রীতিটা তিনি আনতে ভোলেননি।

হুবহু অনুকরণ করলেন না তা বলে। অষ্টভুজ ইমারৎ হয়ে গেল চতুর্ভুজ। আর সব চেয়ে বড় কথা মূলতানী মক্‌বারার সুক্ষ্ম কারিগরী—ফুল-লতা-পাতা জ্যামিতিক নকশা অতি সযত্নে পরিহার করলেন। দরবেশের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলির অর্ঘ্য যে পুষ্পসম্ভার ছিল শোভন, তা আজন্ম-যোদ্ধার সমাধিতে বর্জন করা হল। গিয়াসের সমাধির উপরস্থ সন্দোখ্-এর ঠিক নিচে—ভূগর্ভে যে কবরখানায় তিনি শায়িত সেখানে মূলতানের জীবিতকালে সঞ্চিত ছিল তাঁর আজীবনের সঞ্চয়। ইব্ন বতুতার ভাষার আক্ষরিক অনুবাদ, "সেখানে, ঐ ভূগর্ভে একটি চৌবাচ্চা তৈরী করে সম্রাট তাতে গলিত স্বর্ণ ঢেলে দেন; প্রকাণ্ড চৌবাচ্চাটা পরিণত হয়ে যায় নিরেট সোনার তালে।"

'দুর্ঘটিনায় মৃত' মূলতানের মরদেহ পরদিন প্রভাতে আবিষ্কৃত হলে তাঁর পুত্র মুহম্মদ তুগলক—বোধকারি শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে—প্রথমেই ঐ সোনার তালটিকে অপসারিত করতে বাধ্য হন—না হলে আম্বাজানকে শোয়াবেন কোথায়?

মক্‌বারা-চত্বরে প্রবেশের স্মারিট কিল্লার দরওয়াজার মতো। কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করে সেখানে যেতে হয়—সংকীর্ণ সে পথ, একের-পিছে এক প্রবেশ করতে হয়, সদলবলে নয়। আন্দাজ করছি, তুগলকাবাদের রাজপ্রাসাদ থেকে প্রতিদিন গভীর রাতে বোরখা-

পরিহিতা এক হতভাগ্য কিংবা চিরাগহস্তে ঐ মক্‌-বারায় আসতেন, যখন রাতির তৃতীয় বায়ে উৎসবমুখরিত রঙমহাল ক্রান্ত ধূমে ঢলে পড়ত। সেই হতভাগিনী হচ্ছেন সম্রাটজননী—মুহম্মদ তুগলকের গর্ভধারিণী! হারেমের ভিতর নিষ্ঠুরে কাঁদবার অবকাশ তাঁর ছিল না—চারিদিকে মূলতান আর তাঁর উজীরে আজন্ম প্রাক্তন-স্থপতি আমজাদ-আয়াদ নিযুক্ত খোজা প্রহরী। কি জানি কেন হতভাগিনী হজরৎ নিজামউদ্দীন



চিত্র-5.2 গিয়াস্-উদ্দীনের মক্‌বারা।

আউলিয়ার দরগাতে গিয়েও শান্ত পেতেন না! সম্রাট দিনের রুদ্ধ অশ্রুকে মুক্তি দিতে গভীররাতে ঐ সোপান বেয়ে মক্‌বারায় উঠে আসতেন। বিম্বস্ত প্রহরী পাহারা দিত বাহির-স্বারে, আর ঐ পাথরের কবরটা আলিঙ্গন করে বুকফাটা-কান্নায় ভেঙে পড়তেন বিগতভর্তা রাজমহিষী। সার্থক হত জীবিত গিয়াস্-এর স্বপ্ন :

"বাল বিধারকে টুটি কয়রোপো
জব কোই মেহেজবীন রোতি হয়,
মুঝকো অফসর খয়াল আস্তা হয় :
মোং কিংনি হাসিন হোতি হয় ॥"

মুহম্মদ তুগলক : মুহম্মদ তুগলকের কিছু অপকীর্তির কথা বলছি, তিনি ইতিহাসকে অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন, ইতিহাসের কণ্ঠরোধ করে। দিল্লীশ্বর বিদ্যুৎগর্ভ কালবেশাধী মেঘের মতো ক্ষমতাধর—কিন্তু ইতিহাস যে তার চেয়েও শক্তিশালী : সূর্যের মতো জ্যোতির্ময়! ইতিহাসও তাই প্রত্যাঘাত

* মক্‌বারা-অভিসারিকা দেখেছি কিন্তু ভিত্তি কম্বী :
বিকীর্ণমুখ্যতার বিলাপ : বসুধাকল্লম ধনী :
আমি তা দেখেছি! তাই সানন্দে রচনা প্রতীক্ষা
কবে এ পাষণ-কলকের বৃকে লুটবে ধ্বংসভনী ॥

করেছে, প্রতিশোধ নিয়েছে—মুহম্মদ তুগলকের ললাটে
লেপে দিয়েছে শ্রান্ত পরিচয়ের শাস্বত তিসিক। আমরা
আজও কথায় কথায় বলি, 'যেন পাগলা মুহম্মদ বিন্
তুগলক !'

মুহম্মদ বিন্ তুগলক পাগল ছিলেন না আদৌ—
অত্যন্ত মেধাবী, পণ্ডিত, বস্তুত তিনি প্রতিভাধর
ছিলেন।

'পাগল' আর 'প্রতিভা'-র ফারাক সামান্যই—
লক্ষ্যমণ্ডলের গাণ্ডির এ-পাশ ও-পাশ ! পাগল কে ? যার
চিন্তার পারম্পর্ষ নেই। কিন্তু কে সেটা বিচার করে
রায় দিচ্ছে ? কেন, সমসাময়িক সাধারণ-বুদ্ধির মানদণ্ড,
যাদের চিন্তায় পারম্পর্ষ আছে। আর প্রতিভাধর ?
তাকে চিহ্নিত করেছে ভবিষ্যৎ কালের মানদণ্ড, সমকালীন
নয়। সমকালের কণ্ঠস্বরে তাই সক্রোটস্ পাগল,
যীশু পাগল, গ্যালিলেও পাগল, ভল্টেরার পাগল,
ভ্যানগাথ্ পাগল, মায় 1919-এর পূর্ণ-সূর্য-গ্রহণ-
ইম্ভক্ আলবার্ট আইনস্টাইনও পাগল ! প্রতিভাধরের
সংজ্ঞাটাই তাই। সে সমকালের চেয়ে কয়েক কদম
এগিয়ে আছে। মুহম্মদ বিন্ তুগলকের পাগলামীটা
ধরা পড়ে গেল এজন্য যে, তিনি শূদ্র আবিষ্কারকই
নন, তাঁর খিরোরির স্বয়ং প্রয়োগকর্তা। যেহেতু তিনি
সক্রোটস্-যীশু-গ্যালিলেও-ভল্টেরার-ভ্যানগাথ্ - আইন-
স্টাইনের মতো বিস্তারিত নন, তিনি দিল্লীশ্বর।
আইনস্টাইন যদি জেনারেল প্রোভিস্-এর মতো সং-
গঠকের ভূমিকায় নিজ তত্ত্বাবধানে 'এ্যাটম-বোমা' বানাতে
চাইতেন তাহলে তিনিও মুহম্মদ বিন্ তুগলকে পরিণত
হতেন। রাডার ফোর্ড, অটো হান, এনরিকো ফার্মি,
নীলস্ বোহর, আইনস্টাইন, সত্যেন বোস এক জাতের
মানুষ—জেনারেল প্রোভিস্, ওপেনহাইমার, যুদ্ধ-
সচিব স্টিমসন অন্যজাতের। সূর ও অসূর অজগরের
দুই প্রান্ত চেপে না ধরলে বিজ্ঞান-সমুদ্রে প্রয়োগ-
বিদ্যাকে মন্দার পর্বত করে মন্থন সম্ভবপর হত না !
পরমাপদ্র অন্তর বিদীর্ণ করে পারমাণবিক শক্তি এক
হাতে অমৃত আর হাতে হসাহস ভাঙ নিয়ে আবির্ভূত
হত না !

মুহম্মদ বিন্ তুগলক দিল্লী থেকে রাজধানী
স্থানান্তরিত করতে চেয়েছিলেন দক্ষিণাভ্যে, দৌলতা-
বাদে। অত্যন্ত সুবুদ্ধিপূর্ণ প্রস্তাব। কয়েক শতাব্দী
ধরে উত্তরাদিক থেকে উপদ্রুপরি মঙ্গোল আক্রমণ
হচ্ছে তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার এ এক
চমৎকার সমাধান। মঙ্গোলরা থেকে পারস্য যাবার
সড়ক ছেড়ে, তৎকালীন রেশম সড়ক ছেড়ে, বেশ কিছু
দূরে সরে যাওয়াই তো মঙ্গল। মাঝখানে থাক না কেন

রাজপুতানার পার্বত্য মরু অঞ্চল, থাক না প্রথম মহড়া
নিতে দুর্ধর্ষ রাজপুত জাতি ! চীনের প্রাচীরের মতো।
ভৌগোলিক বিচারেও তদানীন্তন সাম্রাজ্যের কেন্দ্র-
বিন্দুর নিকটতর দৌলতাবাদ। সেখানে রাজধানী
স্থানান্তর করার প্রস্তাবে পাগলামী নেই কিছু,
পাগলামীটা ধরা পড়ল ঐ নীতিটোর প্রয়োগ কৌশলে !

মুহম্মদ বিন্ তুগলক রূপার বদলে তামার
মুদ্রায় ছাপ দিয়ে অর্থনীতির এক নয়া-বিশ্লব আনতে
চাইলেন—যা আজ সারা দুনিয়ায় চলছে মুদ্রাবাজারে :
কাগজের নোট। চীন ও পারস্য দেশে এ জাতীয় ছাপ
সম্বল কারেন্সি মুহম্মদের পূর্বযুগেই সাফল্যমণ্ডিত-
ভাবে প্রচলিত হয়েছিল। সম্ভবতঃ পণ্ডিত সুলতান সে
সম্বন্ধে অবহিতও ছিলেন। এ প্রস্তাবটাতেও বাতুলতা
নেই, তাঁর ব্যর্থতা শূদ্র প্রয়োগ-কৌশলে, যথাযোগ্য
সাবধানতার ব্যবস্থা না করায়। যুগান্তকারী আবি-
ষ্কারটাকে তিনি বাস্তবায়িত করতে চাইলেন কয়েক
শতাব্দী আগে। তখনও ভারতবর্ষ সেজন্য প্রস্তুত নয়।
ঠিক যেমন নিজের দুই বাহুদুলাে কৃত্রিম ডানা বেঁধে
উড়বার চেষ্টা করে উপহাসাস্পদ হয়েছেন মানব-ইতি-
হাসের আর এক বিশ্ব-বিদ্রুত 'পাগল' : লেওনার্দো দ্য
ভিঞ্চি !

আদিলাবাদ : তুগলকবাদের দক্ষিণে অবস্থিত
আদিলাবাদকে কেউ কেউ বলেছেন মুহম্মদ বিন্
তুগলকের পত্তন করা নগরী। সেটা মেনে নিতে মন
চায় না। দুটি কারণে। প্রথমতঃ, মুহম্মদ তো আর
একটি নগরীর পত্তন করেছিলেন—কুৎব-চত্বরের দক্ষিণ-
পূর্বে, জহান্পনাহ্ (চিত্র—3.1) ; তাহলে এত
কাছাকাছি আর একটা নগরী তিনি পত্তন করবেন কেন ?
দ্বিতীয়তঃ, দেখতে পাচ্ছি—তুগলকবাদের দুর্গ, অর্থাৎ
গিয়াস্-এর কবর থেকে ঐ আদিলাবাদে যাবার একটি
সড়ক তো গিয়াস্-এর আমল থেকেই ছিল। তাই মনে
হয়, আদিলাবাদ গিয়াসের যুগ থেকেই ছিল, যদিও
মুহম্মদ তুগলক সেখানে 'নাই-কা-কোট' নামে একটি
ইমারৎ এবং 'মুহম্মদাবাদ' নামে একটি দুর্গ তৈরী
করান।

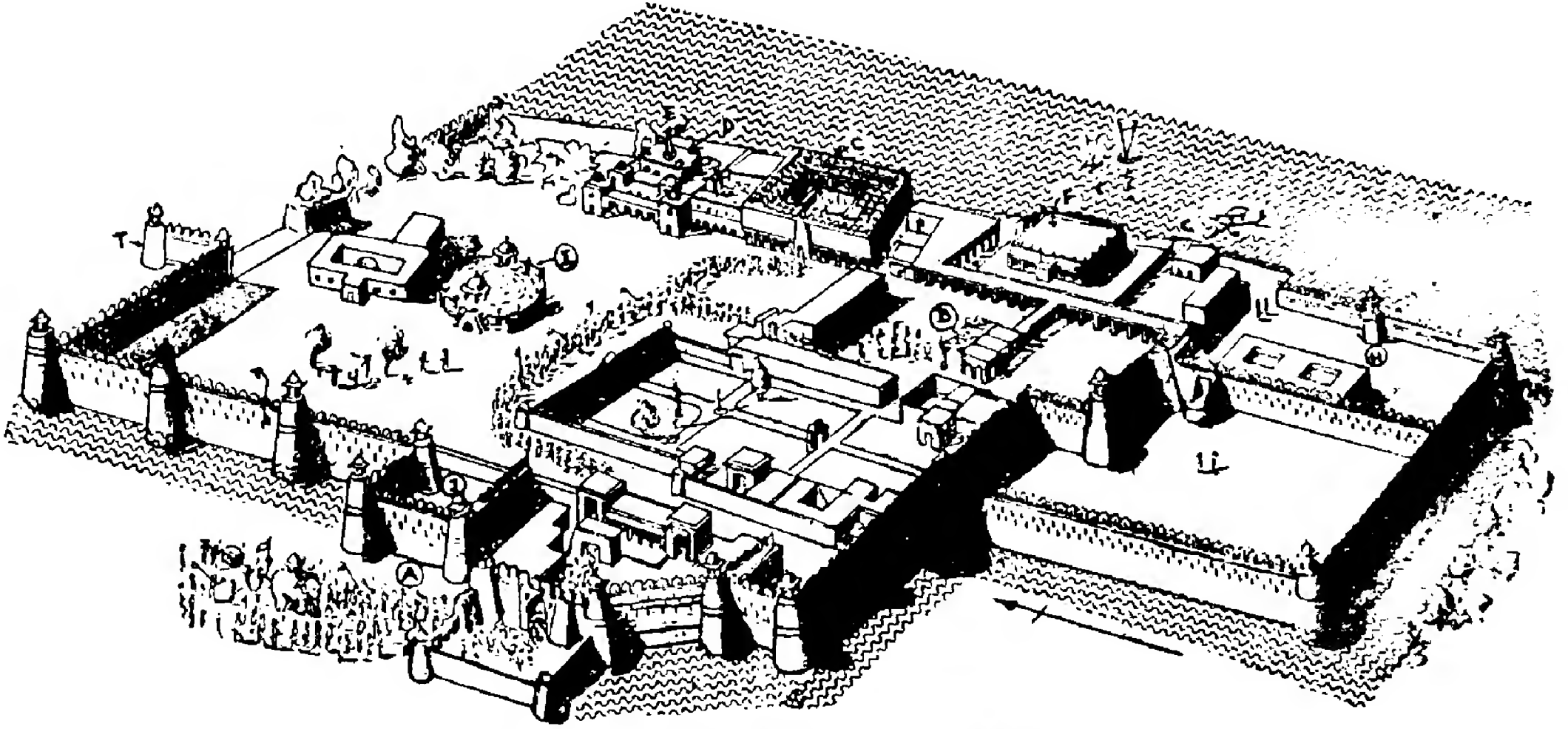
জহান্পনাহ্ : দিল্লীর চতুর্থ নগরী, মুহম্মদ
তুগলক পরিকল্পিত। তিনি সেখানে স্বয়ং বাস
করতেন (চিত্র 3.2)। কিন্তু প্রাচীর-বেষ্টিত সেই অংশে
সাধারণ প্রজার স্থানাভাব হওয়ায় মুহম্মদ রায়-পিথোরা
কিন্জা এবং সিরিকে সংযুক্ত করে এই জহান্পনাহ্
গড়ে তোলেন। এ শহরের বস্তুত চিহ্নমাত্র নেই।

ধ্বংসস্তূপ থেকে শতাব্দীর পর শতাব্দী সাধারণ মানুষ উঠিয়ে নিয়ে গেছে প্রস্তরখণ্ড। তবু নজর করলে কিছ, কিছ, প্রাচীন চিহ্ন এখনও দেখা যায়—আই. আই. টি.-র উত্তরে, খিড়কি মসজিদের দক্ষিণে অথবা চিরাগ-দিল্লীর পথের ধারে ধারে।

ফিরোজশাহ্ তুগলক : এবার তুগলক বংশের তৃতীয় সুলতান ফিরোজশাহ্-এর প্রসঙ্গে আসি। দিল্লী-আগ্রা অঞ্চলে ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যের গোটা নৈশ আকাশটা দূর থেকে যদি দেখি তাহলে মাত্র পাঁচটি তারকা ঝল্‌ঝল্‌। আর সবাইকে স্মান করে দেয় :—কুৎব-নির্মাতা ইল্‌তুৎমিশ্, ফিরোজশাহ্ তুগলক, শেরশাহ্ শূর, আকবর এবং শাহ্‌জাহাঁ। তার ভিতর একটি বিষয়ে ফিরোজ অম্বিতীয়—মেরামতির কেরা-

ছিল দার্টোর নামান্তর ; আকবরের কাছে স্থাপত্য ছিল তাঁর জীবন-দর্শনের ধর্ম ও রাজ্যশাসনের রূপক ; শাহ্‌জাহাঁর কাছে স্থাপত্য ছিল ‘প্যাশান’ ; শেরশাহ্ শূরের কাছে তা নির্দিধ্যাসন এবং ফিরোজের কাছে তাঁর জীবন !

নিজের সম্বন্ধে ফিরোজ বলছেন, “Among the gifts God bestowed on me, His humble servant, was a desire to erect public buildings.”¹⁰ (পরমকারুণিক আল্লাহ্ তাঁর এই কৃত্যকে যে কয়টি গুণ দিয়েছেন তার অন্যতম জনসাধারণের জন্য ইমারৎ বানানোর বাসনা।) তাই তিনি ক্রমাগত ইমারৎ গড়ে গেছেন, ভগ্নপ্রায় মোকাম মেরামত করে গেছেন—নামের মোহে নয়, কাজের নেশায়, ভালো কাজের আন্তরিক তাগিদে।



চিত্র-5.3 ফিরোজশাহ্ কোটলার প্ল্যানিং।

মতিতে। স্থাপত্যের সঙ্গে অহমিকা প্রায় অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত। স্থাপত্যকীর্তিতে নিজের নাম যুক্ত করা ফলক বসানোর বাসনা, রায় পিথোরার পরবর্তী যুগের ভারতবর্ষে—পাঠান, মগল, ইংরেজ এবং স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে একটা ম্যানিয়া। আজকের দিনেও সংবাদপত্রে দেখতে পাই—অধিকাংশ পূর্তমন্ত্রীর এক-মাত্র কাজ শুধু ভিত্তিস্থাপন, পুরস্কার-বিতরণ, পটো-শুলন, মালাদান, স্মারোচ্ঘাটন ! ফিরোজ ছিলেন অন্য-জাতের মানুষ—নৈর্ব্যক্তিক উদাসীনতায় তিনি শুধু গড়েই যাননি, ভাঙাকে ঠেকিয়েছেন ; প্রাচীন যুগের স্থাপত্য-কীর্তিকে একের পর এক মেরামত করে গেছেন। তাই বলা চলে, আইবক্-ইল্‌তুৎমিশের কাছে স্থাপত্য

তাঁর স্থাপত্যরীতির একটা বৈশিষ্ট্য হল—‘রান্ডাম-রাব্ল-ম্যাসনরি’। ইতিপূর্বে স্বস্থানে প্রস্তরখণ্ডটিকে বসানোর পূর্বে তাকে নিপুণভাবে এবং সমান মাপে ছোট্টে নেওয়া হত। যাতে প্রতিটি জোড়াই সমান দ্রুত, সমান বেধ-এ হতে পারে। যাকে বলে ‘ব্রাশ্‌লার গার্ডিনি’। রান্ডাম-রাব্ল গার্ডিনিতে তা নয় ; অসম মাপের ছোট-বড়ো পাথর এলো-মেলো সাজিয়ে যাওয়া হয়, যাতে দেওয়ালের শৃঙ্খল মোট প্রস্থটা সর্বত্র সমান থাকে। তাই এ দেওয়ালের ভারবাহী ক্ষমতাটা কম, ফলে একটু বেশি চওড়া করে গাঁথতে হয়।

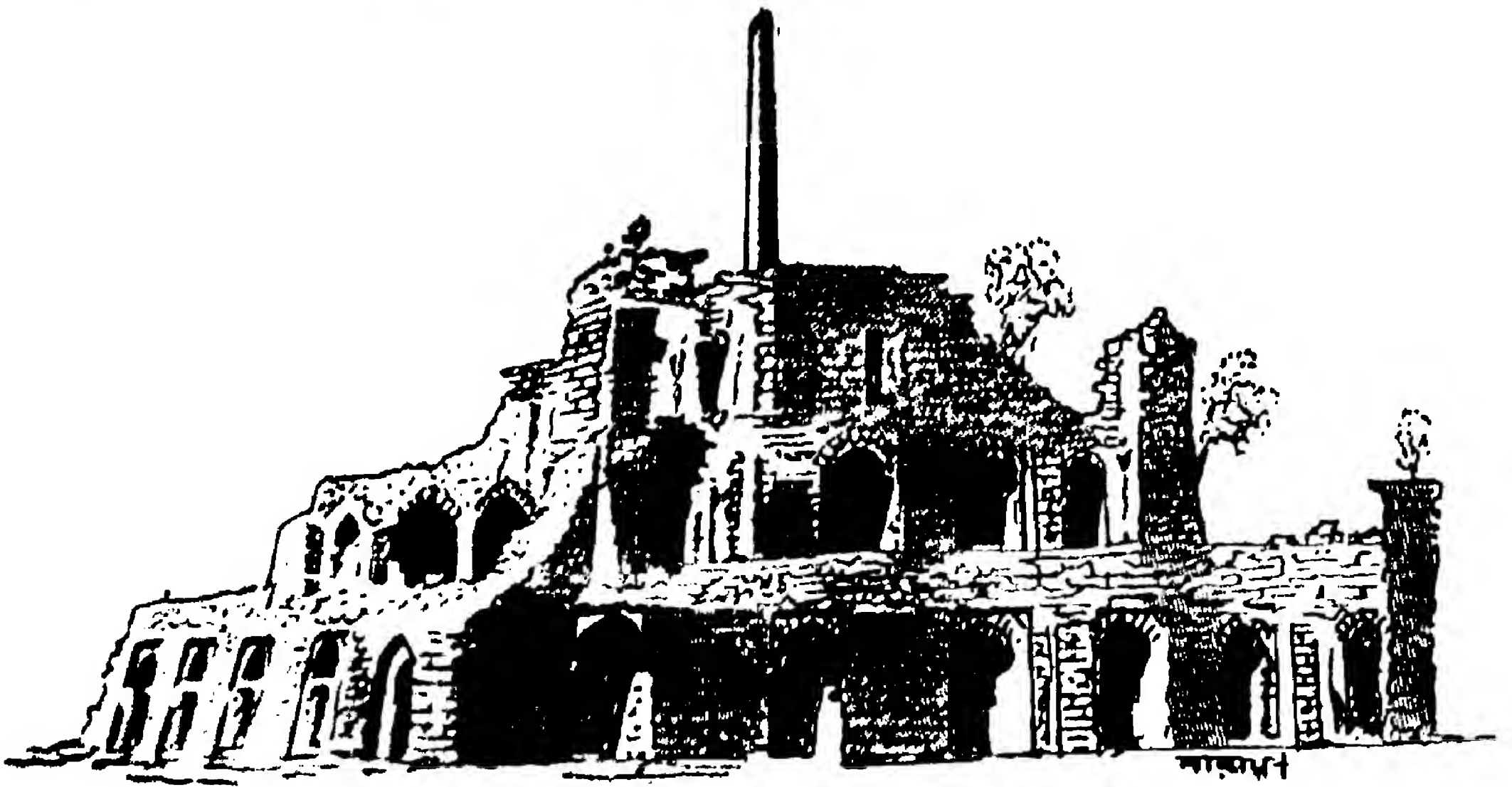
ফিরোজশাহ্ অভিনবত্বের তাগিদে এই নতুন রীতির আবিষ্কার করেননি, সেটা আগেও ছিল। তিনি এ

পশ্চাতির ব্যাপক ব্যবহার করেছেন শব্দ : নিতান্ত প্রয়োজনের তাগিদে ; একটি বাস্তব সমস্যার সমাধান করতে। তাঁর পূর্ববর্তী সুলতান মুহম্মদ যখন দিল্লী থেকে দৌলতাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন, তখন দক্ষ মিস্ত্রির দল ডেরা-ডাউন্স গুটিয়ে নিয়ে বিভিন্ন প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের স্মারক হর, বহুলোক যারাও যার, বা অন্য ব্যবসারে চলে যার। ফিরোজ বহু অনুসন্ধানেরও বশেষ্টে সংখ্যক দক্ষ মিস্ত্রি জোগাড় করে উঠতে পারেননি, অথচ পুঁতকর্মে তাঁর অদম্য উৎসাহ। তারই ফল এই রাণ্ডা-রাবল্ গাধুনি, যাতে দক্ষতার প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত কম।

ফিরোজ দিল্লীতে আবার একটি নতুন রাজধানী

দিক রক্ষা করবে নদী, দ্বিতীয়তঃ, জলাভাবের আশঙ্কা নেই, তৃতীয়তঃ, পরিখা শূন্যকিয়ে যাবে না, চতুর্থতঃ, গ্রীষ্মপ্রধান দিল্লীতে নদীর শীতল বাতাস পাওয়া যাবে। তাই ফিরোজ নিজের কিল্লা বানালেন যমুনা ঘেঁষে, আর জঙ্গী প্রয়োজনে, বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দিল্লীর কিছ্র দূরে দূরে পত্তন করলেন আরও কয়েকটি দুর্গ-সম্মিলিত নগরী : জোনপুর, ফতাবাদ, হিশার প্রভৃতি।

যমুনা-কিনারের এই 'ফিরোজশাহ্ কোটলা' দুর্গ 'মিলিটারী এঞ্জিনিয়ারিং'-এ এক যুগান্তরে উত্তরণ। ফিরোজশাহ্-কোটলার নগর-বিন্যাস ও কিল্লা নির্মাণের ছন্দটি মধ্যযুগ পার হয়ে বর্তমান শতাব্দীর



চিত্র-5.4 ফিরোজশাহ্-র প্রাসাদ, বর্তমান অবস্থা।

স্থাপন করেন, যা প্রায় দেড়শ বছর (1354-1490 ?) দিল্লীশহরের আত্মসম্মান ছিল। স্থান নির্বাচনে ফিরোজ একটি বাস্তব এবং আধুনিক চিন্তাধারার পরিচয় দিলেন। পূর্ববর্তী সুলতানদেরা—রায়-পিঠোরা, সিরি, তুসল্-কাবাদ, জহান্সনাহ্, আদিলাবাদ যারা পত্তন করেছিলেন তারা একটা সত্যকে স্বীকার করেননি—দিল্লীর অর্নাতসূর দিয়ে যমুনা নদী প্রবাহিত। মানব-সভ্যতার আদিযুগ থেকে হোরাও হো, নীল, ইউক্রেটিস, টাইগ্রিস, সিন্ধু নদের ধারে ধারে গড়ে উঠেছিল সমৃদ্ধিশালী জনপদ। যমুনা যখন অদূরে তখন তার কিনার-ঘেঁষে কেন রাজধানী স্থাপন করা যাবে না ? এতে অনেকগুলি লাভ। প্রথমতঃ, কিল্লার এক-

প্রাক-উড়োজাহাজ-যুগ পর্যন্ত ছিল জঙ্গী প্রয়োগ-বিদ্যার 'মাস্টার-প্ল্যান'। সেকেন্দার লোদীর বাদলগড়, আকবরের আগ্রা কিল্লা, এলাহাবাদ কিল্লা, শাহ্-জাহীর জাল-কিল্লা, এমন কি ইংরাজের গড়া কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম—সর্বত্র তার প্রভাব পড়েছে। প্রত্যেকটি প্লানেই নদী আছে দুর্গের এক প্রান্ত দিয়ে জম্বালম্বভাবে ; বাকি তিন দিকে নদীর জল টেনে আনা হয়েছে কৃত্রিম পরিখার মাধ্যমে। মূল প্রাসাদগুলি নদীর কিনার বরাবর বিন্যস্ত, যাতে নদী-দৃশ্য ঘরে বসেই বা ছাদে উঠে দেখা যায়, নদীর শীতল বাতাসে গ্রীষ্মপ্রধান শহরে ইমারৎগুলিতে স্নিগ্ধতা আনে, এবং আল্লাহ্-না-করুন, তেমন তেমন অবস্থায় পড়লে দুর্গ-

রক্ষীদের হাতে দায়িত্ব দিয়ে নদীপথে গান ছেড়ে অস্তিত্ব জ্ঞান নিয়ে পাশিয়ে যাওয়া যায়।

ফিরোজশাহ্ কোটলা (চিত্র-5.3) উত্তর-দক্ষিণে প্রায় পোনে এক কিলোমিটার লম্বা, প্রস্থে তার অর্ধেক। প্রধান ও একমাত্র প্রবেশদ্বার বর্তমান শহরের দিকে, পশ্চিমে। তাতে পর পর দুটি সূর্য্যঙ্কিত আগমনদ্বার (A)। প্রাচীরে প্রায় সমদূরত্বে ব্যাস্টিয়ান।

আগ্রা, এলাহাবাদ ও লাল-কিল্লার সঙ্গে ফিরোজশাহ্ কোটলার সাদৃশ্য এবং বৈপরীত্য দুটোই লক্ষ্য করবার মতো। সাদৃশ্যটা মূল প্রাসাদগুলির বিন্যাসছন্দে। দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস, মসজিদ, খাস-মহল ও জেনানামহালের পারস্পরিক অবস্থানে। ফিরোজশাহ্-র আদি প্ল্যানিং সর্বত্রই অনূসৃত—সর্বত্রই প্রথমে দেওয়ান-ই-আম পিছনে দেওয়ান-ই-খাস, রাজপ্রাসাদের উত্তরে মসজিদ এবং দক্ষিণে জেনানামহাল। ফিরোজশাহ্-র দুর্গের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে প্রধান প্রবেশদ্বার থেকে সাধারণ দর্শনাথীদের আসতে হবে একটা বিসর্পিণ পথে, প্রাচীরবেষ্টিত আঙ্গুরবাগকে প্রদক্ষিণ করে। সেটা বোঝানোর উদ্দেশ্যে চিত্র-5.3—তে আমি একসারি দর্শনাথীদের একে দিয়েছি—ওদের একদল চলেছে রাজসন্দর্শনে দেওয়ান-ই-আম-এ, অপর দল চলেছে জাম-ই-মসজিদে। দেওয়ান-ই-আমের পিছনে উত্তর-দক্ষিণ-লম্বা আবার একসারি অলিঙ্গ সমন্বিত ইমারৎ—তার পূর্বে, নদী-কিনারে, সুলতানের খাস-মহল ও জেনানা। কোটলার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ইমারৎ—যার চিহ্ন এখনো বর্তমান, তা হচ্ছে অশোক-স্তম্ভ (E) শোভিত সৌধটি। এটি চার তলা। ছাদের উপরে কেন্দ্রস্থলে অশোক-স্তম্ভটি প্রোথিত। সুলতান ফিরোজশাহ্ এই বিচিত্র-দর্শন প্রস্তরখণ্ডটি দেখেছিলেন আম্বালায়। তার বহিরঙ্গের মসৃণতা বিস্ময় জাগায়, তার গায়ে বিচিত্র বর্ণলিপিতে কী-যেন লেখা। সুলতান সেটিকে সযত্নে নিয়ে এলেন রাজধানীতে। ঘোষণা করলেন, কোন পণ্ডিত যদি তার পাঠোদ্ধার করতে পারেন তবে তাঁকে যথোপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হবে। কেউই পাঠোদ্ধার করতে পারেননি। সমকালীন ঐতিহাসিক¹¹ বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন, কী-ভাবে ঐ বিশালায়তন স্তম্ভটি আম্বালা থেকে দিল্লীতে নিয়ে আসা হয়, কী-কায়দায় চার-তলা বাড়ির ছাদে তাকে বসানো হয়! দেড়শ বছর আগে কুৎসুদীন আইবক যেমনভাবে গুপ্তযুগের লৌহস্তম্ভটি কুওতুল্ মসজিদে ব্যবহার করেন, তেমনি ফিরোজ ও মোঘলগণের একটি কীর্তি সংস্থাপন করলেন নিজের প্রাসাদশীর্ষে। তফাৎ এই

কুৎসু অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নন, নির্বিধায় তিনি গরুড় মূর্তির গর্দানা নিয়েছিলেন, নিজের ধর্মবিশ্বাস ও জীবনদর্শনের সঙ্গে অতীত ঐতিহ্য না মিললে তাকে ছেঁটে নিতে কুৎসু পরাম্ভ নন; অপরপক্ষে, ফিরোজ অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। যেখানে অতীত ধরা দেয় না, সেখানে তিনি অতীতকে ভবিষ্যতের হাতে সমর্পণ করেন। বস্তুত মোঘল-সম্রাট অশোকের সে বাণীর পাঠোদ্ধার করা হয়েছে একেবারে হাল আমলে, এই শতাব্দীতে, পণ্ডিতপ্রবর প্রিন্সেপের কৃতিত্বে।

ফিরোজশাহ্ নির্মিত এই কিল্লার পূর্বদিক দিয়ে অবশ্য যমুনা নদী বর্তমানে প্রবাহিত নয়—নদী সরে গেছে অনেকটা পূর্বে। চিত্র-5.3-তে যেখানে আমি যমুনা নদীকে একেঁছি, সেখান দিয়ে বর্তমানে আছে প্রকাণ্ড রাজপথ। ছবিতে ঠিক যে বিদ্রুত 'D'-অক্ষরটা লিখেছি, ঐখানেই দাঁড়াতে টুরিস্ট বাসটা—যদি আপনি দিল্লী টুরিজম্ বিভাগের বাসে একদিনের জন্য দিল্লী দেখতে বেরিয়ে থাকেন। গাইড আপনাদের বাস থেকে নামতে দেবে না; বলবে, 'এখানে দেখার কিছুই নেই, সবই ভাঙা ধ্বংসস্তুপ। একমাত্র দর্শনীয় হচ্ছে অশোক-স্তম্ভ—ঐ দেখুন', বলে বাঁ-হাতটা তুলে দেখিয়ে দেবে : অশোকল্যাট!

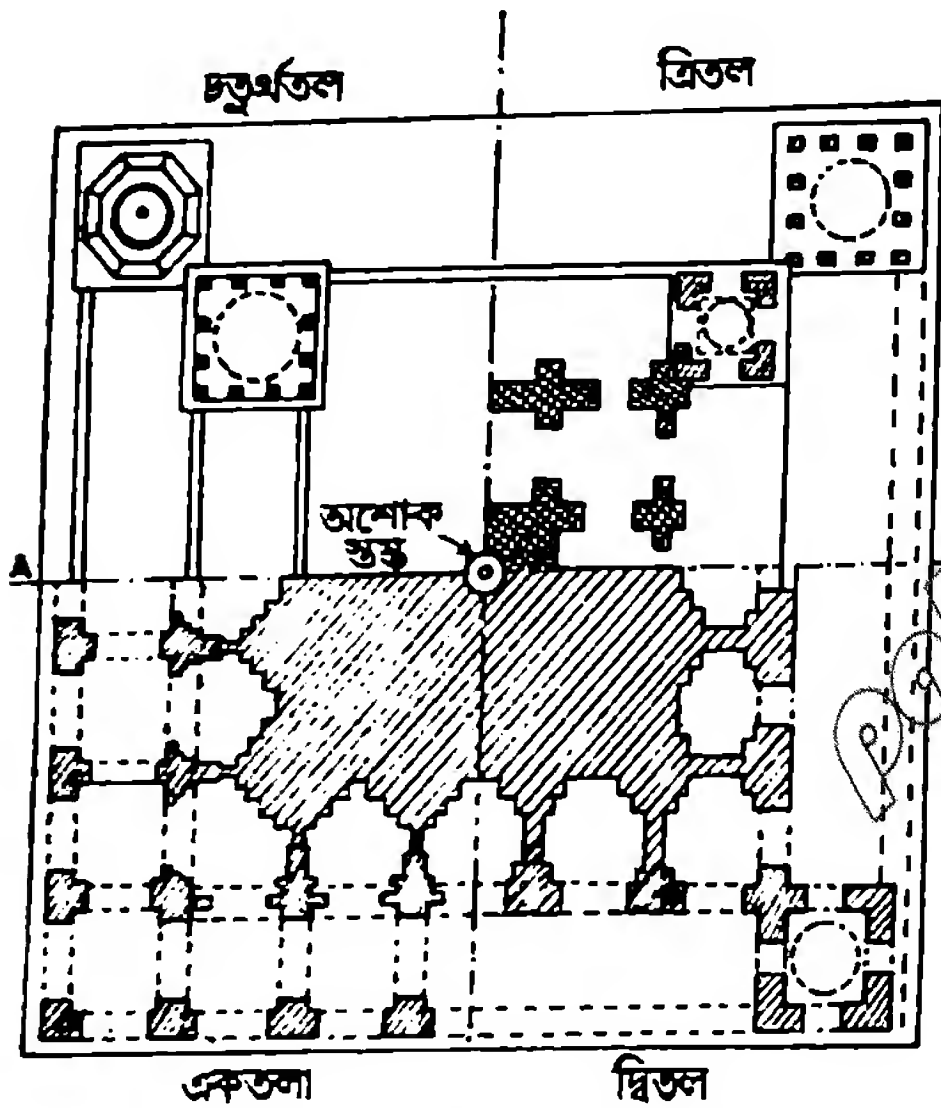
বেচারির দোষ নেই, কর্মকর্তাদের নির্দেশ সেই মোতাবেক!

হয়তো আপনি আমার মতোই 'মর্শাকিল্-পসন্দ', ও-কথায় সন্তুষ্ট না হয়ে পরদিন নিজেই দেখতে যাবেন ফিরোজশাহ্ কোটলার ঐ একটিমাত্র জীবনপ্রায় ধ্বংস-স্তুপ। এলেনই যখন, তখন চলুন খুঁটিয়ে সেটা দেখা যাক।

যা দেখাচ্ছি (চিত্র-5.4) তাতে ধারণা করা কঠিন সে আমলে এ প্রাসাদ কেমন দেখতে ছিল। সেজনা, আদিমরূপটা বোঝানোর উদ্দেশ্যে একটি প্ল্যান (চিত্র-5.5) এবং A B রেখায় কাটা একটা সেক্ষানাল এলিভেশান ঐই সঙ্গে একে দিলাম। প্রাসাদটি চতুর্দিক থেকে একই রকম দেখতে। চারতলা বাড়ি। একতলার সাতটি খিলান, দ্বিতলে পাঁচটি ও ত্রিতলে তিনটি। চতুর্থ বা সর্বোচ্চতলে খিলান নেই, শুধু অশোকস্তম্ভ। মাঝখানের অংশটি নিরেট পাথরের গাঁথনি। প্রতি তলার তা থেকে পৃষ্ঠপ্রদীপের মতো অলিঙ্গ-বাহু প্রসারিত। মাঝখানের ঐ বিরাট নিরেট অংশটা অন্যায়সে অশোক-স্তম্ভের ভারবহনে সমর্থ।

হিন্দু শৈলীর নবরঙ্গ-মন্দিরের হুকে ছত্রীগুলি বসানো। ত্রিতলে চারপ্রান্তে চারটি ছত্রী স্বাধীনস্তম্ভ শোভিত, চার তলার উপরেও চারটি ছত্রী, স্বাধীনস্তম্ভ

শোভিত। কিন্তু হিন্দু নবময় মন্দিরে নয়টি চড়া যেমন ঘেঁষাঘেঁষি, ঠাশাঠাশি হয়ে থাকে, এখানে তা নেই; আর তাতেই বোঝা যায় ফিরোজ ছিলেন জাত-আর্কিটেক্ট। অশোকলিপির পাঠোন্মার তিনি করতে পারেননি, কিন্তু বুঝেছিলেন—সেটি ইতিহাসের এক দিকটি। তাই তাকে দিয়েছেন অপরিসীম মর্যাদা—কিন্দার একপ্রান্তে, অথবা কেন্দ্রস্থলেও জামিন সই-সই করে তাকে বসাননি। বসিয়েছেন সর্বোচ্চ স্থানে—চার দিকুনে-আর্টটি ছত্রী ঘেরা রাজসিংহাসনে। এবং তৃতীয় ও চতুর্থ তলের ছত্রী গায়ে গায়ে থাকলেও মধ্যমণি অশোকস্তম্ভের কাছাকাছি তারা কেউ ঘেঁষে আসেনি। সসম্মুখে সরে দাঁড়িয়েছে!

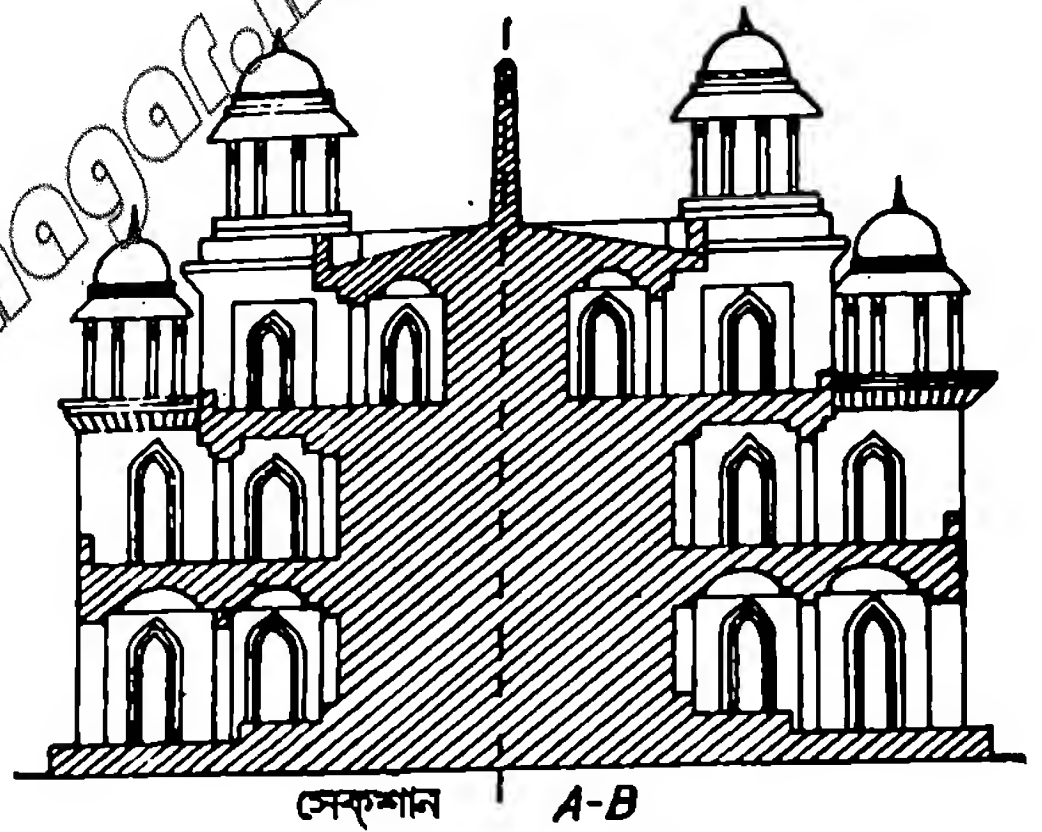


চিত্র-5.5 A ফিরোজশাহ্ প্রাসাদের প্ল্যান।

দর্ভাগ্য আমাদের—ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যের এই অনবদ্য উদাহরণটি টিকে নেই। তার চেয়েও বড় দর্ভাগ্য—এটি খুব অল্প লোকেই দেখতে যান। তার আদিম নকশাভিরাগ রূপের একটি মডেল ওখানে না থাকার বৃকতে পারেন না এটি একটি অনন্যসাধারণ স্থাপত্যকীর্তি। এবং সবচেয়ে বড় দর্ভাগ্য—যে ফিরোজশাহ্ কোটলা মিসিটারী প্ল্যানিং-এ অর্ধসহস্রক-কাল ছিল মাস্টার-প্লানের মর্যাদা নিয়ে তাকে আমরা মনে রেখেছি অন্য কারণে। ইন্টারভিউ-বোর্ডে যদি পেশ করেন প্রশ্নটা : 'ফিরোজশাহ্ কোটলা কি জন্য বিখ্যাত?' শুনবেন হব্দ আই. এ. এস. মেধাবী

ছাত্রের চট্‌জলদি জবাব : 'সেখানে 1972 সালে চন্দ্রশেখর উনআশি রানে আর্টটি ইংলিশ উইকেট দখল করেছিল বলে।'

সম্রাট ফিরোজের আমলে নির্মিত মস্জিদগুলির মধ্যে যে-গুলি দিল্লীতে অবস্থিত তার ভিতর উল্লেখ-যোগ্য : কালি মস্জিদ (আঃ 1370), জহান-পনাহ-তে বেগমপুরী মস্জিদ (আঃ 1370), এবং খিড়কি মস্জিদ (আঃ 1375), তিমুরপুরীতে শাহ্ আলম দরগার কাছে একটি (আঃ 1375) আর শাহ্-জানাবাদে কালান মস্জিদ (আঃ 1375)। এর ভিতর অন্তত দুটি খুঁটিয়ে দেখার মতো—কালান ও খিড়কি মস্জিদ। তাদের মধ্যে সামান্য প্রভেদ থাকলেও তারা মোটামুটি একরকম। দুটিতেই সুউচ্চ বেদী বা ভিত্তি আছে, এক-তলায় বা প্লিন্থে সারি-সারি খিলান, ছাদে সারি-সারি গম্বুজ ও আংশিকভাবে ছাদ আকাশে উন্মুস্ত। পার্সি ব্রাউন অনুসরণে তাদের একটির—খিড়কি মস্জিদের, একটি চিত্র এখানে যুক্ত করে দিলাম (চিত্র-5.6)।



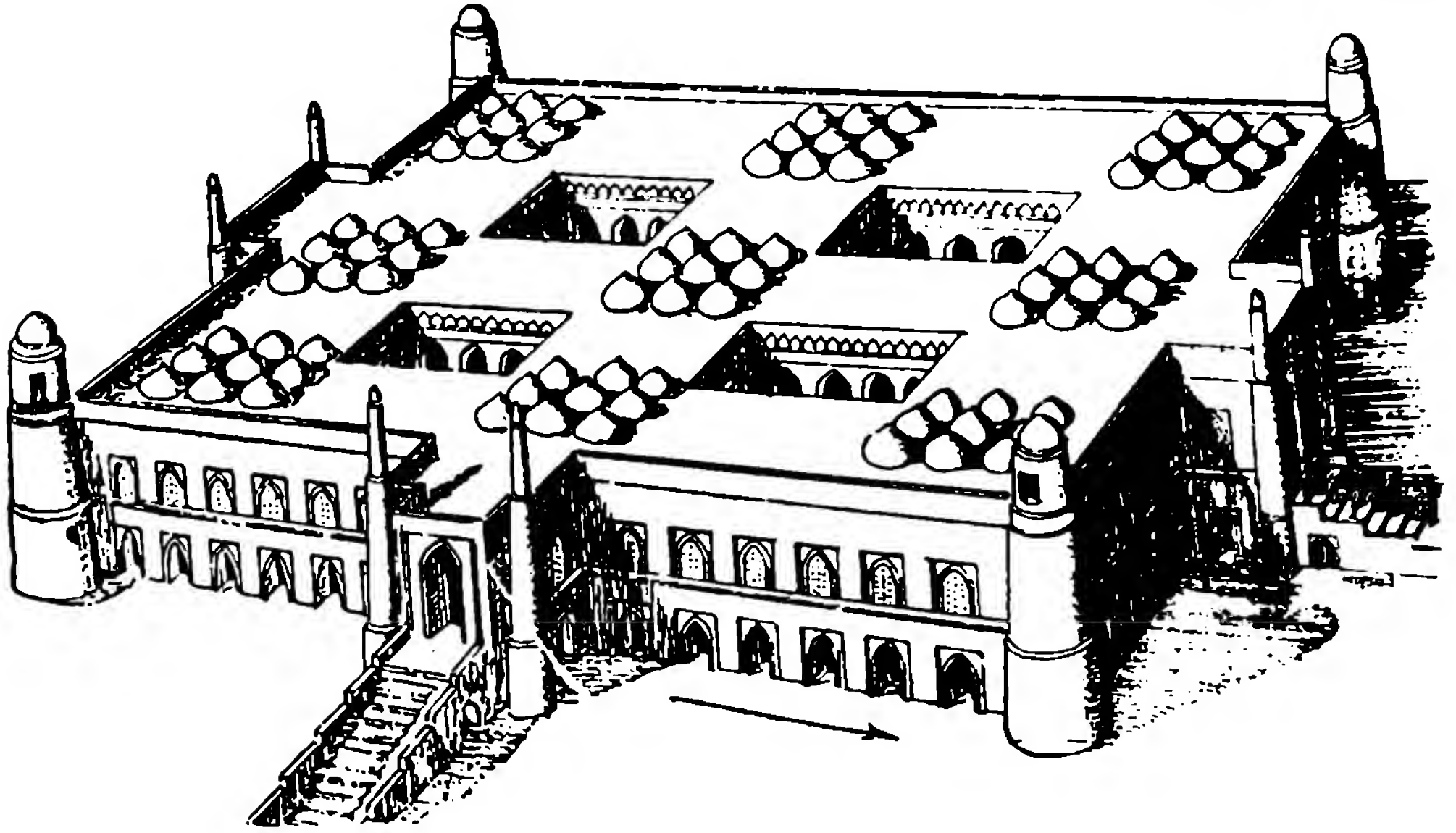
চিত্র-5.5 B ফিরোজশাহ্ প্রাসাদের সেকশন।

খিড়কি মস্জিদ : আয়তক্ষেত্রের চারকোণায় চারটি ব্যাস্টিয়ান, তিন দিকে তিনটি প্রবেশদ্বার—চতুর্থ দিকে, পশ্চিমদিকে কিব্লা-সমন্বিত মিহরাব। দ্বিতলে জানালাগুলিতে মোঁচাকের মধুকোষের মত ছোট ছোট খুঁপরি, যা-থেকে এ মস্জিদের নামকরণ। ছাদের কিছুটা অংশ সমতল, কিছুটা গম্বুজায়িত, কিছুটা বা আলো-আসার জন্য আকাশে উন্মুস্ত। কী-ভাবে ঐ গ্ররীর বিন্যাস সুসম হুন্দে রূপায়িত তা চিত্র-5.6 থেকে বোঝা যাচ্ছে। তিনদিকের তিনটি প্রবেশদ্বারে, লক্ষ্য করে দেখুন, এক জোড়া করে সরু 'পাইলন'। মিনারিকা এদের বলা যাবে না, কারণ এরা বিচ্ছিন্ন

নয়, ইমারতের গায়ে, হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে : এ অলঙ্করণ পরবর্তী যুগে ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যে বারে-বারে ফিরে-ফিরে এসেছে, গায় তাজমহলে। স্পষ্টতই ফিরোজ পরিকল্পিত এ মসজিদে চিত্রাচারিত প্ল্যানিং-এর ছন্দটা বদলানো হয়েছে। মাঝখানে আকাশে-উন্মুক্ত শেহান্-ঘিরে তিনদিকে লিয়ান বানানো হয়নি। এমন কি পৃথক ময়াল্জিন মিনারও গঠিত হয়নি। চার কোণার চারটি ব্যাস্টিয়ানের একটি থেকেই নামাজের আহ্বান দেওয়া হত।

ফিরোজ-জমানায় নির্মিত মক্কারা ভিতরে অন্তত তিনটির উল্লেখ করতে হয় : ফিরোজের

ছিলেন-ফিরোজ তাও পরিহার করেছেন। তাঁর গম্বুজে হিন্দু-স্থাপত্য থেকে সংকলিত আমলক ও কলস বর্তমানে নেই, আদি যুগে ছিল কিনা জান না। কিন্তু প্রবেশপথে খিলানের নিচে লক্ষ্য করে দেখুন, দরজার মাথায় হিন্দু ট্রাকিওট-পদ্ধতিতে কর্বেলিঙ করা। মক্কারা সম্মুখে রোজিং-ঘেরা অংশটা একটা স্নিগ্ধ পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এখানে পাথরের জোড়াই সাঁচী স্তূপের কায়দায়। সাঁচী স্তূপে 'খন্ড'-র সঙ্গে যে-ভাবে সূর্য্যরী-কোশলে 'সূচিকা'গুলি বস্তু হয়েছিল এখানেও ঠিক একই কায়দায় খাড়া পোস্টগুলির সঙ্গে জমির সমান্তরাল



চিত্র-5.6 খিড়কি মসজিদ।

নিজের সমাধি, তাঁর উজীরে-আজম খান-ই-জাহান তিলাপানীর মক্কারা এবং ফিরোজের উত্তরাধিকারী কর্তৃক সমাপ্ত কবীরউদ্দীন আউলিয়ার সমাধিসৌধ।

ফিরোজশাহ্‌র সমাধি : হোস্-ই-খাস্‌এ অসংখ্য ইমারতের মধ্যে মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে ফিরোজশাহ্‌ তুগলক্‌র সমাধিসৌধ। আঙ্গিকের দিক থেকে এটি গিয়াস্‌উদ্দীনের মক্কারার উত্তরসূরী-পার্শ্বকোণের মধ্যে এর বহিরাবরণ আরও সরল, আরও অনাড়ম্বর। গিয়াস্‌ গম্বুজটা সাদা মাৰ্বেলে গড়েছিলেন, জাফ্রিকান্টা মর্মর গাঁড়িত গবাক্ষ, এবং জমির সমান্তরালে কয়েকটি শূন্য মাৰ্বেল-ব্যান্ড ব্যবহার করে-

রোলিং-এ পাথরের জোড়াই করা হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, ফিরোজ ইসলামী স্থাপত্যে হিন্দু-শৈলী গ্রহণে আপত্তির কিছু দেখেননি, আর তা থেকেই অনুমান করি, তাঁর গম্বুজের উপরেও এককালে আমলক-কলস ছিল, গিয়াসী মক্কারার অনুকরণে।

এ মক্কারার অনবদ্য বৈশিষ্ট্য হল সংযুক্ত চক্রে ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত ছত্রীগুলি—ছত্রী না বলে চবুতরাই বলা উচিত, ইংরেজিতে যাকে বলে Kiosk। এগুলি মাদ্রাসা-সংলগ্ন মোকাম। বীরভূমের এক মাস্টার মশাই যেমন বর্তমান শতাব্দীতে বকুল গাছের ছায়ায় পড়াশুনার আয়োজন করেছিলেন তাঁর শান্তিনিকেতনে, প্রায় সেই একই রকম প্রেরণায় ফিরোজশাহ্‌ তুগলক্‌

মুজকাদের নিচে বানিয়েছিলেন এই চব্বতরাগদুলি—
খোলা-প্রকৃতির মাঝখানে শিশুরা জীবনের প্রথম পাঠ
নিক।

ফেন্দার কক্ষটি বর্গক্ষেত্র। তার চারকোণায়
প্রতিষ্ঠিত স্কুইণ্ড আটকোণা বায়টিক ধরে রেখেছে,
যার উপর বস্তাকার গম্বুজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা গগন-
অভিসারী। এ মক্কার ভিতরে ও বাহিরে ষেটেকু
অলঙ্করণ দেখছেন তাও ফিরোজ পরিকল্পিত নয়,
পরবর্তী জোদী-যুগের সংযোজন। যে-ফিরোজ তাঁর
দীর্ঘ জীবনে অগণিত ইমারতে অলঙ্করণের প্লাবন
বইয়ে দিয়েছেন, নিজের সমাধিসৌধে তাঁর এই আশ্চর্য
সংকলন দেখে মনে পড়ে যার কবি গালিব-এর শেষ
শের :

“গালিব-এ খসতা কে বগের কওন-সে কাম বন্দ হৈ”।

রোইয়ে জার-জার ক্যা, কীজিয়ে হায় হায় কি’উ?”

জবানতরে, যার প্রায়-অনুবাদ : “বাহার লাগি
চক্ মদে কইরে দিলেম অশ্রুসাগর/অহারে বাদ দিয়েও
দেখি কিব্বলুন মস্ত জগর।”

খান-ই-জাহান তিলাপানীর মক্কার : নাম—
মক্কা খান। সাকিন : দাক্ষিণাত্য, তিলাপানা।
ধর্মাস্ত্রিত মসলমান। উঠেছিলেন বুরোক্তেসির
সর্বোচ্চ শিকরে—ফিরোজ-এর উজীরে-আজম, প্রধান-
মন্ত্রী বা খান-ই-জাহান। এই ইমারৎ মক্কার-নির্মাণে
এক ক্রান্তিকারী সংযোজন। স্থাপত্য-ইতিহাসে এক
চিহ্নিত সম্পদ। দূর্ভাগ্যবশতঃ এটি ভস্মদশায়। তা
হোক, কলকনের সমাধি বেঙ্গন ধ্বংসস্থাপ হওয়া সত্ত্বেও
স্থাপত্য-ইতিহাসের এক দিক্‌চিহ্ন, এ ইমারৎ-ও তাই।

এতদিন সমাধিসৌধ ছিল অনিবার্যভাবে চতুষ্পাণ্ড।
স্কুইণ্ড পদ্ধতিতে তার চারটি কোণা কী-ভাবে অষ্টভুজ,
এক ফেরাক্ষেত্রে ষোড়শভুজ রূপান্তরিত হয়ে
গম্বুজ-ধারণে উপযুক্ত হত তা আমরা চিত্র-3.13-তে
পর্যালোচনা করছি। এখানে কল্প হল একটি নতুন
পরীক্ষা। সমস্ত শব্দই কল্প হল অষ্টভুজ ইমারৎ-
রূপে। ফল স্কুইণ্ড পরিচাল্য হল—নির্মাণ পদ্ধতি
হল সরল, বৈচিত্র্যময় এবং নমনীয়তাময়। এই নির্মাণ-
কৌশল পরবর্তী যুগে যার যারে অনুকৃত হয়েছে।
সৈয়দ ও জোদী যুগে, শেরশাহ শব্বের সাসারাম-
মক্কার, এমন কি আকসরী-জমাদার অধম খাঁর
সমাধিতে। অষ্টভুজ স্থপতিক্ষেত্রের মাধ্যম কোথা
কোথেকে এসে, অলঙ্কার সে কথা কোথা নিম্নপ্রয়োজন করে
আশ্চর্য লাগে জাক-উ-কেন এতদিন কেউ সেই জের-
সময়ের ওপর মসজিদের (চিত্র-2.3) অনুকরণ

অষ্টভুজ মক্কার বানাবার চেষ্টা না করে ক্রমাগত স্কুইণ্ড
ঠেঁরি করে গেছেন।

তিলাপানী-মক্কার অষ্টভুজ-কক্ষের বাহির
দিয়ে একটি অলিন্দ মূল সৌধকে পরিক্রমা করেছে।
তার আটকোণায় আটটি মূল স্তম্ভ এবং দুই স্তম্ভের
মাঝের ফোকরে তিনটি করে খিলান। খিলানগুলি
অম্বদুরাকৃতি নয়, টিউডরী খিলান।

লক্ষণীয়, তিলাপানী-মক্কার স্থপতি ‘ডোম
অব দ্য রক’ থেকে স্থাপত্যের বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ বিদ্যা-
টেকুই শব্দ গ্রহণ করেছেন, ‘আর্কিটেক্টোনিকাল’
মহিমা আরোপ করার সময় তাঁর স্বকীয়তা স্বয়ং-
প্রকাশ। জেরদসালেম মসজিদে বাহিরের দিকে ছিল
আটকোণা প্রাচীর, ভিতরদিকে স্তম্ভ-সমন্বিত অলিন্দ।
এখানে সেটা উল্টে দেওয়া হয়েছে। আট কোণা কক্ষটা
এসেছে ভিতরে, স্তম্ভ-সমন্বিত অলিন্দ বাহির দিকে।
আর সেই জন্যই যুক্ত হয়েছে আর একটি নতুন জাতের
অঙ্গ : প্রসারিত-বাহু ছজ্জা (chujja)। তার সঙ্গে
আমদানী করা হয়েছে আটকোণায় আটটি ছত্রী।

খান-ই-জাহান তিলাপানীর মক্কারটি সুরক্ষিত
নয়, তাই তার ছবি দিলাম না। কিন্তু স্থাপত্য-বিষয়ে
এখানে যা আলোচনা করা হল তা পরবর্তী যুগে
নির্মিত এই প্ল্যানিং সমন্বিত যে-কোনো মক্কার
(চিত্র-6.1 থেকে 6.5) দেখে বুঝে নিতে অসুবিধা
হবে না।

ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যে ফিরোজ একজন দিক-
পাল। তাই তাঁর সম্বন্ধে অনেক প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ
করেছি। তা পড়ে ইতিহাসের ছাত্র যেন মনে না করেন,
ফিরোজশাহ তুগলক ছিলেন একজন আদর্শ সুলতান।
না, রাজ্যসীমা তিনি বর্ধিত করেননি নব নব রাজ্য
জয় করে, সূশাসনও প্রবর্তিত করতে পারেননি। তিনি
ছিলেন অত্যন্ত গোঁড়া সুন্নি-মসলমান। বোধকারি
ঔরঙ্গজেব ভিন্ন এমন ধর্মাত্ম আর কেউ বসেননি
দিল্লীর তক্ত-তাউসে। কিন্তু আমরা তো ফিরোজের
সার্বিক বিচার করতে বসিনি। আমরা যে দেখেছি,
তিনি বৃহত্তম দিল্লী শহরে 1200টি নতুন উদ্যান
ঠেঁরি করেন।¹² ফিরিস্তার হিসাবে তিনি 845টি নতুন
ইমারৎ নির্মাণ করেন, তার অনেকগুলির বর্ণনা
সুলতান স্বয়ং লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এছাড়া,
আগেই বলছি, অনেক অনেক প্রাচীন পুরাকীর্তি
তিনি মেরামত করিয়েছিলেন—কুৎব মিনার, সুলতান
জাহাঙ্গীর, সুল কুন্ড বা আলাই-তাল্লাও। শিকারের নেশা
ছিল তাঁর। অনেকগুলি শিকার-ভবনও ঠেঁরি করান—
মালচা মহল, ডুলি-জাটিয়ারি-কা-মহল, অথবা পীর

গালিব।

আর একটি কারণে মাসাম জানাবো ফিরোজকে—
দিনপঞ্জিকায় সুলতান উল্লেখ করে গেছেন তাঁর প্রধান
স্বপ্নপরিভ্রমের নাম : মালিক গাজী শাহানা এবং তাঁর
শিষ্য আবদুল হক (ওরফে জাহিরসুন্দর)^{১৩}। ইতিহাসে
স্বপ্নপরিভ্রমেরা স্বতই উপেক্ষিত, কিন্তু এঁদেরই
উদ্ভাবনী শক্তিতে আমরা পেয়েছি খান-ই-জাহান
মক্কার অষ্টভুজ প্ল্যানিং, ফিরোজশাহ-কোটলার
অপূর্ব বিন্যাসছন্দ, অথবা অশোকস্তম্ভ শোভিত ঐ
বিচিত্রদর্শন স্থাপত্যকীর্তি।

ফিরোজ দীর্ঘ আশি বছর বেঁচেছিলেন। সে
যুগের হিসাবে খুবই বেশি। তাঁর শেষ জীবনও
চিরাচরিত প্রথায় বেদনাক্লান্ত। হেতুও সেই একই :
উত্তরাধিকারীদের অযোগ্যতা।

খান-ই-জাহান তিলাঙ্গানী তর্কাদিন মাটি নিয়ে-
ছেন। তাঁর পুত্র জুনাহ-শাহ হয়েছে নতুন খান-ই-
জাহান, আজকের পরিভাষায় স্বরাষ্ট্র-তথা-অর্থমন্ত্রী।
লোকটি সুবিধের নয়। জুনাহ-শাহ মনে করল, পিতা-
পুত্রে যদি বিরোধ বাধিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে হয়তো
সে নিজেই মস্‌নে উঠে বসবার সুযোগ পেরে যাবে।
তাই নেপোর ভূমিকায় দখিভক্ষণমানসে সে একদিন
সুলতানের কানে কানে নিবেদন করল—শাহজাদা
মুহম্মদ সুলতানকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে! শেষ বয়সে
সব সুলতানই এই জুজবুর ভয়ে কাবু! ফিরোজ
তৎক্ষণাৎ হুকুম দিলেন—শাহজাদাকে বন্দী করে নিয়ে
এস।

শাহজাদা কিন্তু অতি ঘড়েল! তাঁর গুপ্তচর
ওয়াকিবহাল। খবরটা তাঁর কানে পৌঁছালো তৎক্ষণাৎ।
তিনি তখন দুর্গের বাহিরে। বেমালুম আত্মগোপন
করলেন তিনি। শাহজাদা জানেন, জুনাহ-শাহ-র
গুপ্তচরেরা তাঁকে আঁতিপাতি করে খুঁজছে—প্রকাশ্যে
কিল্লায় প্রবেশ করতে গেলে ওরা তাঁকে হত্যা করে
বসবে। তিনি তো রাজদ্রোহীরূপে চিহ্নিত! শাহজাদা
একটি বিচিত্র কৌশল করলেন। স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে,
সর্বাঙ্গ বোরখায় ঢেকে পাল্কি-চেপে এলেন কিল্লার
ভিতর। সোজা বেগম মহালে। সুলতান তখন হারে-
মের রঙমহালে পাঁচ হুঁরী পরিবৃত হয়ে সুখের সন্তম
বেহেশত-এ। খোজা প্রহরী এসে সুলতানকে তিন-
কুর্নিশ করে নিবেদন করল—একজন সম্ভ্রান্ত আমীরের
ঔরং সম্মানের সঙ্গে গোপন-সাক্ষাতের আঁডলাষ
জানিয়েছেন। অশীতিপর সুলতান তাঁর মোম দিয়ে
পাকানো মোচ্ মচড়ে বললেন :

“মেরে তসবিঁকে দানে হয় এ সারে হাসিন চেহরে,
নিগাহে কিরাঁত যাঁত হয়, এবাদৎ হোঁত যাঁত
হয় ॥”

সুলতানের হুকুমে তসবিঁ-ছড়ার নতুন মদ্যাদানা-
টিকে আনা হল। দানা নয়, দানো! ঔরই তনয়—শাহ-
জাদা মুহম্মদ! বোরখা থেকে গুম্ফবটী হুঁরীর আঁব-
ভাবমাত্র অর্ধবিবস্ত্রা হারেন-হুঁরীর দল ছুটে পালাবার
পথ পায় না! শাহজাদা সটান লুটিয়ে পড়লেন সুল-
তানের টেবিলের গদায়! কললেন, তিনি নির্দোষ, কোনও
ষড়যন্ত্রের ভিতর নেই, কখনও ছিলেন না।

ফিরোজ ঠুকে বিশ্বাস করলেন। কিন্তু মুহম্মদ
ছিলেন অপদার্থ। তাই শেষ পর্বন্ত তাঁকে বঞ্চিত
করে ফিরোজ উত্তরাধিকারী নির্বাচন করে গেলেন
পৌত্রকে। দর্ভাগ্য একেই বলে—সেটা আরও
অপদার্থ।

তাছাড়া ফিরোজের দেহান্তের বছর দশকের
ভিতরেই মাহমুদ-শাহ-র আমলে ভারত-ইতিহাসে ঘটল
একটি যুগান্তকারী ঘটনা। উত্তর-পশ্চিম থেকে অশ্ব-
খরে ধ্বংসজাল সৃষ্টি করে আবির্ভূত হল এক নিষ্ঠুর
দুর্ধর্ষ তাতার : তৈমুর লঙ!

লুণ্ঠিত হল দিল্লী নগরী (1398)। ফিরোজশাহ
কোটলা শ্মশান হয়ে গেল। আবালবৃদ্ধবনিতার শব
পড়ে রইল রক্তস্নাত দিল্লীর রাজপথে। শব্দ প্রাণে
বাঁচল যৌবনবতী কিছু নারী, মরণান্তিক যন্ত্রণা সহিতে।
প্রাণে বাঁচল আর এক জাতের মানুষ, যাদের পরিচয় :
কারিগর! রাজমিস্ত্রি, সূত্রধর, কর্মকার, প্রস্তর-শিল্পী,
স্বপ্নপরিভ্রম। বিচিত্র কারণে! প্রত্যক্ষদর্শীর জ্বান-
বন্দিতে^{১৪} জানতে পারি—সোনা-রূপা-হীরা-জহর
বাদে শব্দমাত্র কারিগর, তাদের যন্ত্রপাতি আর গৃহ-
নির্মাণের মালমশলা নিয়ে নব্বইটি হাতীর ক্যার-
ভান চলল দিল্লী ত্যাগ করে, খাইবার গিরিবর্ষের পথে,
সমরকন্দের দিকে। দিল্লীকে উদ্দেশ্য করে তৈমুর-
বলেছিল—“আমার সিংহাস্ত—আমার রাজধানী সমর-
কন্দে এমন একটি জাম-ই-মস্‌জিদ বানাবো যা পৃথিবী
কোনদিন দেখেনি! সুতরাং হে দিল্লী-নগরী! প্রাচীন-
কালের ব্যাবিলনের মতো ‘no craftsman, of whatever
craft he be, shall be found any more in thee’
(তোমার ছত্রছায়ায় থাকবে না একটিও কারিগর—তার
এলেম যে-কোনো প্রযুক্তিবিদ্যাতেই থাকুক না কেন)।

* সারি সারি সুলতানদের মৃত্যু
ঔরই ভো মোর তসবিঁ-ছড়ার দানা।
চোখ আঙ্গুলে জপ করে পাই সুখ,
নতুন দানায় ফিরিয়ে দেওয়াই মানা ॥

রাবণরাজার স্বর্গের সিঁড়ি আর আলাউদ্দীনের মিনার শেষ না হলেও শূর্য হরোছিল। তৈমুরের সে জাম-ই-মসজিদ শূর্যই হয়নি। আশ্চর্য্যমতই তার শূর্য ও সমাপ্তি।

ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যের সেটা দ্বিতীয় শত-বার্ষিকী বৎসর। ঠিক দশ বছর আগে কুৎবউদ্দীন

আইবক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন কুৎব মিনার-এর। ইতিমধ্যে পাঁচ পাঁচবার দিল্লীর রাজধানী ঠাই বদলেছে—শূন্য হয়নি। এবার তাই হল। তৈমুরের বিশাল মঙ্গোলীয় বাহিনীর অশ্বখরের ধূলিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল দিল্লী। সে আঁধা যখন খিঁচিয়ে গেল তখন দেখা গেল পড়ে আছে এক মহাশ্মশান। □

pathagor.net

সৈয়দ ও লোদী

উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা

খিজির খাঁ প্রতিষ্ঠিত সৈয়দ বংশের শাসনকাল

লোদী বংশের শাসনকাল

পানিপথের প্রথম যুদ্ধে সুলতানী জমানার শেষ ..

সময়কাল

1413-1450

1450-1526

1526

“খিজা কি জিকর না খাঁরো কি বাৎ করতে হা'য়,
হাম আনেওয়াল। বাহারৌকি বাৎ করতে হা'য় ॥”
খয়াল কানপদুরী বলছেন, “কন্টক-সমাকীর্ণ
ধ্বংসস্তূপে রিক্ততার গান গাইতে আমি আসিনি,
আমি এসেছি শোনাতে আগামী বসন্তের গান।”

তৈমুরের বিধ্বংসী নিষ্ঠুরতা মহাকালের নিরিখে
একটি যতিচিহ্ন মাত্র, বর্নিকাপাত নয়। স্বয়ং ভিসু-
ভিয়াসই পারেনি পম্পাই ও হারকিউলেনিয়াম গ্রাস করে
গ্রীক সভ্যতাকে সমাধিস্থ করতে ; তৈমুরও পারল না
দিল্লী নগরী ধ্বংস করে হিন্দুস্থানের শিল্পমানসকে
মুছে ফেলতে। অজাত ভ্রূণের অন্তরে বংশানুক্রমিক
সেই প্রকাশের ব্যাকুলতার বীজ নতুন করে অঙ্কুরিত
হল ; ঐ মহাশ্মশানেই, লা-জবাব দেহলিতেই,—
গহীরুদেহে পরিণত হতে,—বাহারৌকি বাৎ শোনাতে
তার কিছুটা সময় লাগল, এই যা।

সৈয়দ ও লোদী বংশের ইতিহাস একশ' বছরের
সামান্য কিছু বেশি। সৈয়দ বংশে চারজন সুলতান 1414
থেকে ইতিহাসকে টেনে নিয়ে গেলেন 1451 পর্যন্ত, মোট
37 বৎসর মাত্র। লোদী বংশের তিনজন 1451 থেকে
1526, অর্থাৎ 76 বৎসর। এই সাতজন সুলতানের
ব্যক্তিগত ইতিহাস আমাদের পক্ষে নিস্প্রয়োজন। এ
যুগের স্থাপত্য—স্বাভাবিকভাবেই গড়ে উঠেছে মৃত্যুকে
ঘিরে। ইমারৎ যা মাথা তুলে উঠেছে তাও জীবনের
দ্যোতক নয়, শুধু মক্‌বারা আর মক্‌বারা।

ইংরেজীতে একটি শব্দ আছে—‘macabre’
(ম্যাকাব্র) যার অর্থ ‘মৃত্যুশীতল’। শুনোঁছ শব্দটা
এসেছে ল্যাটিন শব্দ ‘maccabee’ থেকে—রোমানদের
সঙ্গে সিরিয়াবাসীদের ত্রিশবর্ষব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের
সূত্র ধরে। জানিনা, ফার্সী ও উর্দুতে ‘মক্‌বারা’ শব্দ-

টাও ঐ একই সূত্র থেকে উদ্ভূত কিনা। তবে এই সৈয়দ
ও লোদী যুগকে বোঝাতে ঐ ইংরাজী বিশেষণপদটিই
সবচেয়ে ভালো মানায়।

কিন্তু মৃত্যুও তো জীবনেরই একটি পর্যায়।
অনিবার্য পর্যায়। সুতরাং চিত্রশিল্প, কাব্য, সাহিত্য,
সঙ্গীতে যেমন মৃত্যুর একটি আবশ্যিক ভূমিকা আছে,
স্থাপত্যেই বা তা থাকবে না কেন? আসুন, সৈয়দ ও
লোদী যুগের মক্‌বারাগুলিকেই বিচার করে দেখা
যাক :

এ আমলে যে সমাধিসৌধ নির্মিত হয়েছে তা
স্পষ্টতঃ শ্বিধারায় বিভক্ত। হয় তারা চতুষ্কোণ, নয়
আটকোণা। আরও লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, আটকোণা
মক্‌বারাগুলি সুলতান এবং তাঁর পরিবারবর্গের জন্য
চিহ্নিত—আমীর মালিকেরা বরং চতুষ্কোণ সমাধিসৌধেই
চিত্রশয়ান। এ যেন এ যুগের এক অলিখিত আইন।
এ-ছাড়া আছে কিছু মিশ্র শৈলীর মক্‌বারা—অষ্ট-
ভুজাকৃতি থেকে চতুর্ভুজে সংক্রমণের মধ্যবর্তী স্থানে।
আশ্চর্যের কথা, এই সংক্রামণধর্মী মক্‌বারার কথা
পার্সি ব্রাউন-সাহেব তাঁর প্রামাণিক গ্রন্থে উল্লেখ
করেননি ; বরং বলেছেন—সৈয়দ ও লোদী যুগের
সমাধিমন্দির শ্বিধারায় বিভক্ত, চতুষ্কোণ ও অষ্টভুজ।

অষ্টভুজ-বিশিষ্ট সমাধিসৌধ : আলোচ্য যুগে
অন্তত তিনটি মক্‌বারার নাম উল্লেখ করতে হয়—
মুবারকশাহ সৈয়দ (মৃত্যু : 1434) ; মুহম্মদশাহ সৈয়দ
(মৃত্যু : 1444) ; এবং সিকান্দার লোদী (মৃত্যু : 1517)।
প্রথম দুটি প্রায়-সমকালীন একক-সৌধ ; অর্থাৎ তাদের
ঘিরে সে-আমলে যদি কোনো প্রাচীর, তোরণ ইত্যাদি
নির্মিত হয়ে থাকে তবে তা কালের কবলে অকলান্ত।

অপরপক্ষে, অষ্টশতাব্দী পরে দেখছি, সিকান্দার লোদীর সমাধিতে সুপরিষ্কৃত ব্যাপক প্ল্যানিং-এর স্বাক্ষর। তার চারিদিকে উঁচু পার্চিল, দক্ষিণদিকে অলঙ্কৃত ভোরণ, পশ্চিমে একটি মসজিদ এবং প্রাচীরের কোণায় কোণায় অষ্টভুজ টারেট (বাঙলা প্রতিশব্দ খুঁজে পাচ্ছি না। আরবীতে 'বাহুদ্রাহ্' বলে একটা শব্দ আছে, তার অর্থ ঠিক turret নয়, barbican ; তা ছাড়া 'বাহুদ্রাহ্'-র চেয়ে turret-কে বাঙালী পাঠকের বেশি চেনা-চেনা লাগবে।—তাই আপাতত টারেটই চলুক)। সিকান্দার লোদীর উদ্যান শোভিত মক্‌বারা সে-হিসাবে একটি সংক্ৰমণের দ্যোতক। দুটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, চিন্তারাজ্যে ও কর্ম জগতে। প্রথমতঃ, তৈমুর-লঙের বিধ্বংসী আঘাতের পর দিল্লীর শ্মশানে যে নতুন বীজ অঙ্কুরিত হচ্ছিল, এবার তাতে দেখা গেল কিশলয়। ইন্দো-ইসলামী স্থপতি যেন এতদিনে আবার নতুন করে অনুভব করলেন—মানবজীবনের অনিবার্য স্বনিকা শৃঙ্খল ভঙ্গকরই নয়, সে মহান, সে সুন্দর, সে শ্যামসমান : 'মোত কৈসিন হাসিন হা'য়!' দ্বিতীয়তঃ, মক্‌বারা-প্ল্যানিং-এর দৃষ্টিভঙ্গিটাও কলাক্ষে—প্রান্তরী গিয়াস্‌উদ্দীন অথবা ফিরোজ-শাহ-র দূর্সপ্রতিম প্রাকার বেষ্টিত, টারেট-সমন্বিত আশ্চর্যকামূলক বহিরাবরণ থেকে পরবর্তী মৃগল-যুগের কাবুরী বাগান-ঘেরা নরনাভিরাম শান্তির নীড়ে উদ্ভরণের এ-যেন এক অন্তর্বর্তী অবস্থা।

অষ্টভুজাকৃতি এই জাতীয় ইমারতের আদি জনক হচ্ছে—আগেই বলেছি, জেরুসালেমের ওমরের মসজিদ বা 'ড্রেম অব দ্য রক' (চিত্র—2.3)। দিল্লীতে তার সার্থক প্রথম প্রয়োগ খান-ই-জাহান তিলাঙ্গানীর মক্‌বারায়, ফিরোজী-জমিনায়। এই অষ্টভুজাকৃতি ইমারতের ক্রম-বিবর্তনের ধারাবাহিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে এ-গ্রন্থের প্রচলিত পদ্ধতিকে পরিহার করে বিভিন্ন যুগের ইমারতকে পাশাপাশি রেখে আলোচনা করতে হয়।

নাম	চিত্র
ওমরের মসজিদ	2.3
খান-ই-জাহান তিলাঙ্গানী	..
মক্‌বারা-সৈয়দ	6.1, 6.2
মুহাম্মদীয় সৈয়দ	..
সিকান্দার জোশী	6.3
গোলাব পুর	8.1
গোলাব পুর	8.2
মুলা খাঁ	6.4
আখর খাঁ	6.5

ইতিহাসের ক্রমানুসারে সাজালে তাদের যা পরিচয় তা এই পৃষ্ঠার নিচে দেওয়া হয়েছে।

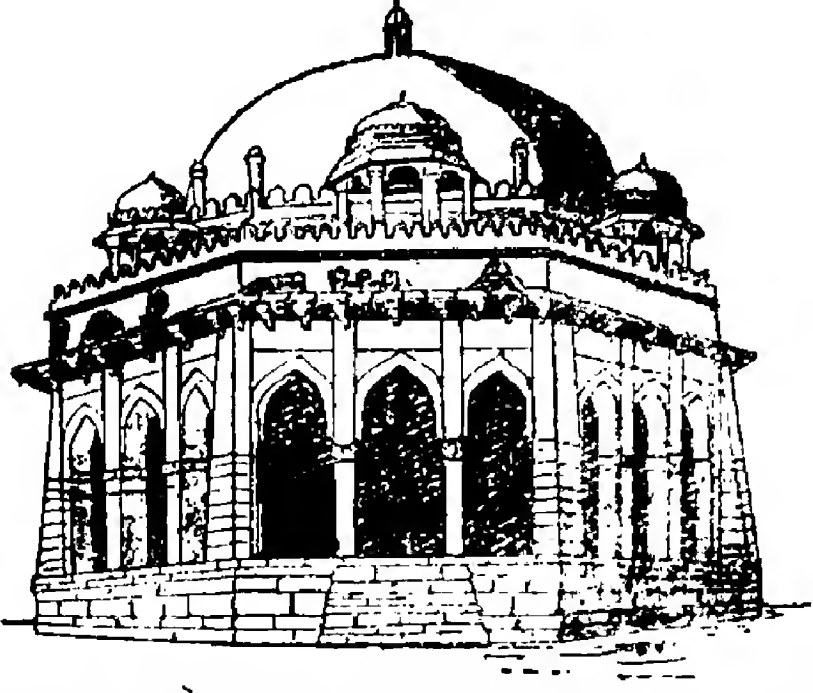
ওমর-মসজিদের যে পরিবর্তন খান-ই-জাহান তিলাঙ্গানী মক্‌বারায় করা হয়েছিল—অর্থাৎ কক্ষ ও আলিন্দের স্থান পরিবর্তন—সেটা পরবর্তী প্রত্যেকটি ইমারতে অনুসরণ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই ভিতরে আটকোণা মূল সমাধিকক্ষ, তার বাহির দিয়ে অষ্টভুজাকৃতি আলিন্দের আটকোণায় আটটি প্রায়স্‌তম্ভ বা 'পায়ার' (pier) এবং দুটি পায়ারের মাঝখানে তিনটি করে খিলান। প্রতিটি ক্ষেত্রেই গিয়াস্‌উদ্দীন প্রবর্তিত 'বাহিরের দিকে ঢাল' দেওয়া হয়েছে ঐ পায়ারে, যদিও তার অন্তর্বর্তী স্তম্ভগুলি আলম্ব। ঐ ঢালটা প্রথম যুগে খুব বেশি, শেরশাহী আমলে সেটা কমেছে, আকবরী জমানাতে তা সম্পূর্ণ বিজ্ঞিত। এই বাঁধা-ধরা ছকের ভিতরেই ক্রমবিবর্তনের পথে কীভাবে সৌন্দর্য পরিষ্কৃত হয়েছে দেখুন—

মুবারকশাহ্ সৈয়দের পরিকল্পনাকার ছাদের আট প্রান্তে আটটি ছত্রী বসিয়েছেন (চিত্র—6.1)। কুর্সি (ভিত, plinth) যথেষ্ট উঁচু। তবু বিস্তারের আপেক্ষিকে উচ্চতা যথেষ্ট না হওয়ায় গোটা ইমারত নরনাভিরাম হয়নি। গম্বুজটির কোনো ভিত্তিমূল বা 'গম্বুজ-কুর্সি' না থাকায় তা যেন চাপা পড়ে গেছে। বাস্তু-নকশায় (প্লানে) জ্যামিতিক বিন্যাস-ছন্দটা ভালোই লাগে ; 'মডেল' তৈরি করে যদি গরুড়া-বলোকনে দেখা যায় (চিত্র—6.2) তাহলেও মন্দ লাগে না ; কিন্তু বাস্তবে ভূতলে দণ্ডায়মান দর্শকের দৃষ্টিতে মনে হয় ছত্রীগুলি গম্বুজের ঘাড়ে চড়েছে। ইমারত গম্বুজের অনেকটা অংশ ঢেকে রেখেছে। প্রাকৃতভাষায় যাকে বলে 'ঘাড়ে-গদানে' চেহারা, অনেকটা সেই অবস্থা হয়েছে গোটা ইমারতের। এই অবকাশে চট করে একবার তাজমহলের ছবিটা দেখে নিতে পারেন, তাহলেই মালুম হবে তাজ-পরিকল্পনাকারের কৃতিত্ব—ছত্রীর ঘেঁষে আসা, গম্বুজের চাপা-পড়া সৌন্দর্যহানী,

অবস্থান	যুগ	নির্মাণকাল
.. জেরুসালেম	.. ওমানীয়	(আঃ) 670
.. দিল্লী	.. তুগলক	1370
.. এ	.. সৈয়দ	1434
.. এ	.. এ	1444
.. এ	.. লোদী	1517
.. সামারাম	.. শাহ	1530
.. এ	.. এ	1534
.. দিল্লী	.. শাহ	1547
.. এ	.. আকবর	1561

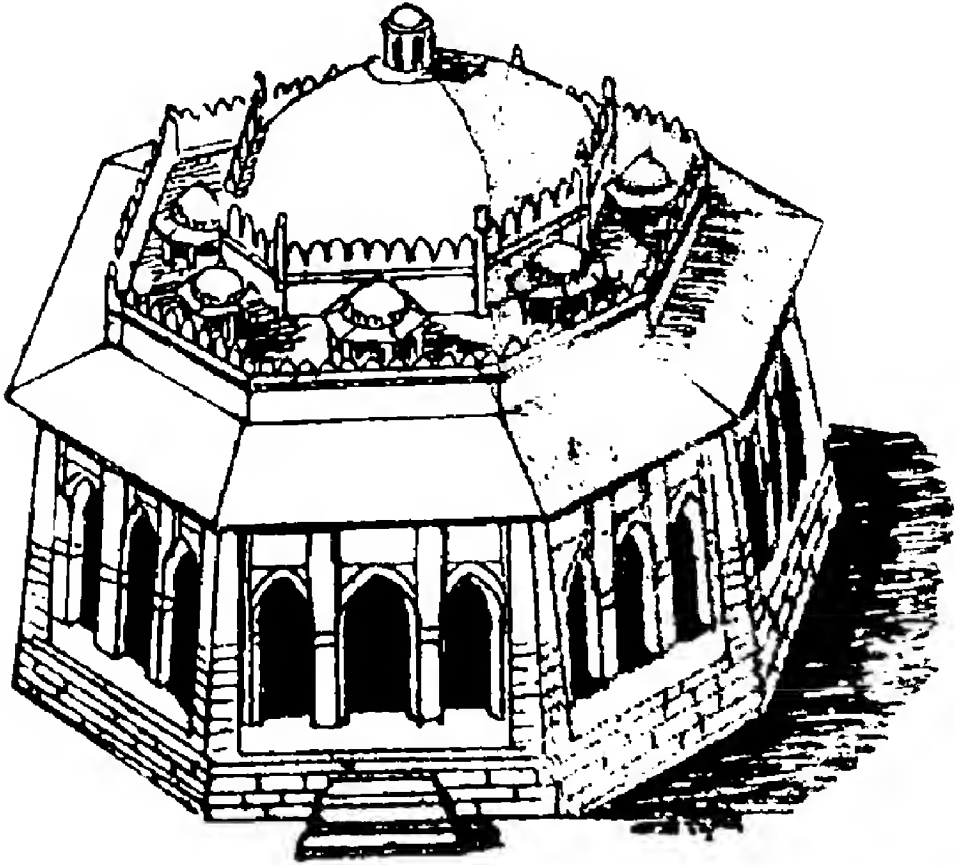
সৌধের বিস্তার-উচ্চতার অসমতুল্য, ইত্যাদি প্রত্যেকটি বস্তুটি পরিহার করতে পেরেছেন বলেই তাজমহল হয়েছে : তিলোত্তমা।

প্রায় দশবছর পরে মদহুমদশাহ সৈয়দের সমাধি রচনার সময় স্থপতিবিদ ঐ বস্তুগুলির বিষয়ে নিশ্চয়ই অবহিত হতে পেরেছিলেন। তাই তিনি তাঁর গম্বুজকে



চিত্র-6.1 মদবারকশাহ সৈয়দ-এর সমাধি (সম্মুখ দৃশ্য)।

বসালেন একটি পিচের ড্রামের মতো (barrel-shaped) গোলাকার গাঁথনির উপর—যাকে আমরা এর পর ‘গম্বুজ-কুর্সি’ বলব। ফলে ভূতলে দৃশ্যমান দর্শক এবার গম্বুজটার ম্বরূপ অনুধাবনে সক্ষম হল।



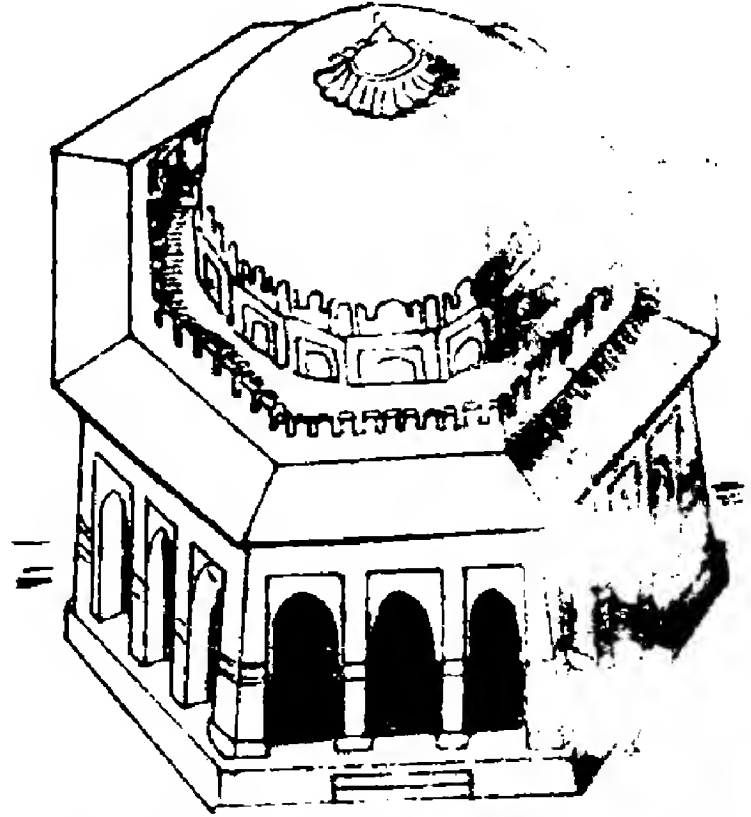
চিত্র-6.2 মদবারকশাহ সৈয়দ-এর সমাধি (পার্শ্বদৃশ্য)।

গোটা ইমারতে দৈর্ঘ্য ও উচ্চতার সামঞ্জস্য-বিধান করে ঐ ‘খাণ্ডে-গদানে’ ভাষাটা দূরীভূত করা গেল। বৈচিত্র্য আনতে দুই খাম্বার-মধ্যবর্তী ভিতটি খিলানের মাঝেরাটিকে উচ্চতায় কিছু বেশি করা হল। নিঃসন্দেহে বলা যায়, গ্রাম্যতীর-ধূগের পরিকল্পনার অনেক উন্নতি-

সৈয়দ ও লোদী মংশ

বিধান করা গেছে।

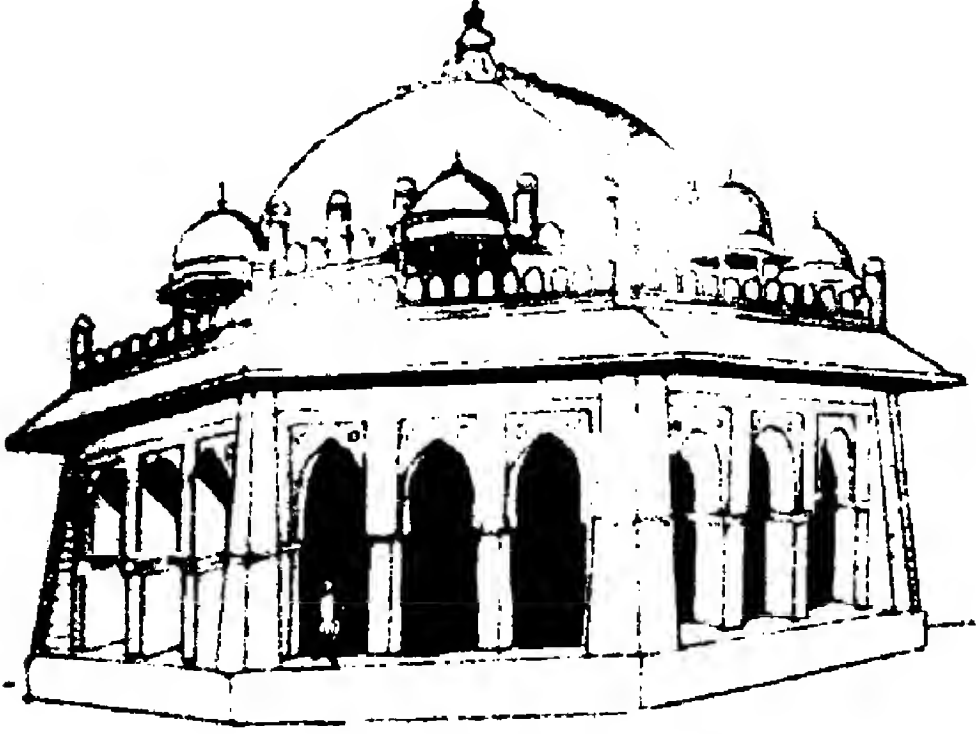
তবু দেখাছি, আরও পঞ্চাশ বছর পরে সিকান্দার লোদীর মক্‌বারা বানাবার সময় স্থপতিবিদ আত্মসম্মত নন। তিনি ছত্রীগুনিকে সম্পূর্ণ বর্জন করলেন (চিত্র-6.3)। ইমারতের ভিতরটাকেও কমিয়ে আনলেন। গম্বুজটাকে এবারও কমানো হয়েছে গম্বুজ-কুর্সির উপর। শুধু তাই নয়, সেই গোলাকৃতি গম্বুজ-কুর্সির ধার ঘেঁষে ষোলো-কোণা বিশিষ্ট একটি অলঙ্কৃত প্রাচীর গেঁথে তোলা হল। যেন মসজিদের সম্মুখে মাখসুদরাহ। অথবা বলা যায়, সাঁচী মতুপের চারিদিক ঘিরে যেমন প্রদক্ষিণ-পথ প্রাচীর ছিল, সেই ধরনের। আরও লক্ষ্য করে দেখুন, এতকাল গম্বুজের উপর যে ছত্রীটি ছিল সেটি অপসারিত। অর স্থান



চিত্র-6.3 সিকান্দার লোদীর মক্‌বারা।

নিরেছে হিন্দু-মন্দিরের পশ্চকলস। সিকান্দার লোদী মক্‌বারার সবচেয়ে বড় যে বৈশিষ্ট্য তা চিত্র-6.3-তে দেখানো যায়নি। তা দেখতে হলে সেক্ষানাল এলিভেশান আঁকতে হয়। সেটি অকুণ্ঠলে ঘিরেও স্বচক্ষে দেখতে পাবেন না। অথচ তা প্রযুক্তি-বিদ্যার এক বৃদ্ধান্তর : ডব্লু-ডোম। কান্দাটা পুরনো, ইরাক, ইরানে বহু পূর্ববদল থেকেই মাঝামাঝি-ভিত্ত-ভাবে প্রযুক্ত হচ্ছিল। দিল্লী-স্থাপত্যে এইবার প্রথম সেটা দেখা গেল। তার কারণ—দিন-দিনই গম্বুজ বাস ও উচ্চতায় বৃদ্ধিমান হচ্ছিল। না হলে স্থপতি-বিদের তৃপ্তি নেই। বাহিরের দিক থেকে বৃহত্তর ইমারতে বৃহত্তর গম্বুজ তো প্রয়োজন হবেই : কিন্তু ভিতরে দাঁড়িয়ে তাতে অনুভূতিটা অস্বাভাবিক হয়। বস্তু পরিবেশে, ছোট্ট ঘরে সমাধিবন্ধের ভিতর থেকে মনে হয় চোঙার মত চারদিকের দেওয়াল অস্বাভাবিক

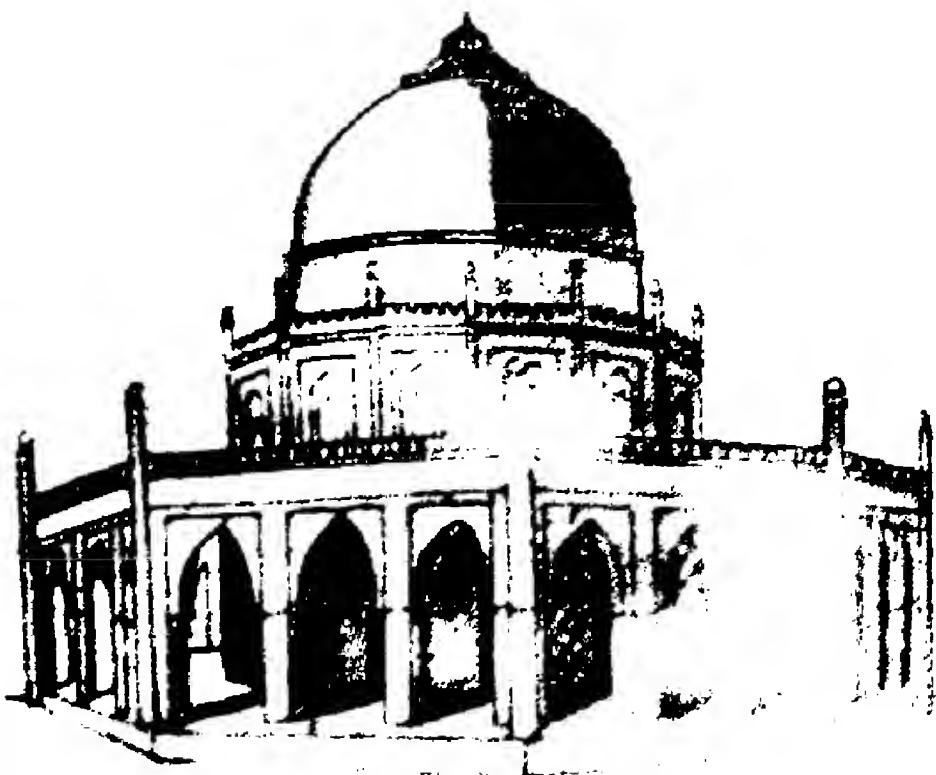
মিশে গেছে। ছাদটা বেন অনেক উচুতে! এই সমসার হাত থেকে মুক্তি পেতেই ডব্লু-ডোমের আরোজন। ডব্লু-ডোম বা দু-পদার গম্বুজ কাকে বলছি বুঝে নিতে হুমায়ুন মক্কারার সেকশানটা দেখে নিন।



চিত্র-6.4 ইশা খাঁর সমাধিসৌধ।

ডব্লু-ডোম বানাতে পারলে, কী-ভিতরে, কী-বাহিরে ছাদের উচ্চতা ইমারতের অন্যান্য অঙ্গের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে। বলা বাহুল্য, এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে, ঘরটা ঠান্ডাও থাকে। যে-হেতু দুটি পদার মধ্যে একটা 'এয়ার-কুলন' বা বাতাসের প্রতিরোধক কক্ষকে গ্রীষ্মে শীতল এবং শীতে উষ্ণ রাখে।

শেরশাহ্ শূর সামারামে যখন তাঁর আত্মজ্ঞান হাসান শূর, অথবা নিজের মক্কারা বানান তখন এই



চিত্র-6.5 আদম খাঁর সমাধিসৌধ।

পরিষ্কপনা সোটাযুট পরিগ্রহ করলেও স্বকীয় স্থাপত্য-চিন্তার একটি সুন্দর পরিচয় রাখেন। উল্লেখ করা স্মৃতি পত্র, শেরশাহ্ শূর এই দুটি মক্কারা নির্মাণের পূর্বে

কখনও দিল্লীতে পদার্পণ করেননি—তার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। ফলে, তিনি নিজে প্রাস্বতী যুগের তিলাঙ্গানী-মুবারক শাহ্-মুহম্মদ সৈয়দ অথবা সিকান্দার লোদীর সমাধিসৌধ প্রত্যক্ষ করেননি। তাঁর স্থপতিবিদ করেছিলেন হয়তো। শেরশাহ্ নিজের অতিপ্রকাণ্ড মক্কারায় কিন্তু সিকান্দার লোদীর অনুকরণে ডব্লু-ডোম বানাননি। গম্বুজে সূর্যালোক প্রবেশের বিচিত্র ব্যবস্থা থাকায় কক্ষের ভিতর থেকে অনুভূতিটা অন্য জ্বতের হয়। চার দেওয়াল সেখানে অন্ধকারে নিঃশেষিত নয়, গম্বুজ-চন্দ্রাতপে বিলীন। সে আলোচনা যথাস্থানে করব।

শেরশাহ্-র পুত্র সালিমশাহ্ শূরের আমলে নির্মিত ইশা খাঁর মক্কারায় আবার পূর্ববর্তী যুগের বিভিন্ন কারুদার বিচিত্র 'পারমুটেশন' করা হল। গম্বুজকে উঁচু কুর্সির উপর বসানো হল, ডব্লু-ডোমও বানানো হল। কিন্তু স্থপতিবিদের মনে হল, সিকান্দার লোদীর ঐ ছতীবর্জিত ঠিক হয়নি। তাই তিনি সেই মুবারকশাহ্ সৈয়দের ছতীবর্জিতকে স্বস্থানে ফিরিয়ে আনলেন। অর্থাৎ ইশা-খাঁ-স্থপতির মতে মুবারকশাহ্-এর মক্কারাতে যে অলঙ্করণ, ছতীর ঘনিবন্ধ পদ্পগচ্ছ সেটা খোলতাই হয়নি, ফুল-দানীটা খর্বকায় হওয়ার জন্য। তাই তিনি দুটির মিলিতরীতিতে এক সিন্থেসিস বানাতে চাইলেন।

পরবর্তী উদাহরণ আদম খাঁর মক্কারা (চিত্র--6.5) মাত্র চৌদ্দ বছর পরে নির্মিত। ইতিমধ্যে কিন্তু ভারত ইতিহাসে যুগান্তর ঘটে গেছে। সুলতানী-জমানা শেষে আমরা পৌঁচেছি 'মুগল-এ-আজমে'। শেরশাহ্, বাবুর, হুমায়ুন অতিক্রম করে আকবরী আমলে। নতুন যুগের মুগল স্থপতি পূর্বযুগের সব কয়টি কীর্তি খুঁটিয়ে দেখে শোনালেন নতুন কথা। বললেন, না, ছতী চলবে না। ওরা বড় ভীড় করে! তার চেয়ে গম্বুজ-কুর্সির সই-সই ঐ প্রাচীরের আট প্রান্তে বসাও আটটি গুলদস্তা। 'গুলদস্তা' কাকে বলে জানো না? ছোট আকারের মিনারিকা, যার অনেকটাই ইমারতের গা-সই-সই, আর উপরে আধফোটা কুর্সির পাপড়ি। কবর ঘিরে যেগন মোমবাতি সাজানো হয়, অনেকটা সেই কারুদায় গুলদস্তাগুলদস্তা সাজিয়ে দাও। তাছাড়া গম্বুজ-কুর্সির সই-সই পাঁচলটাকে খাড়াইয়ে আরও বড় কর, তাতে কসাও এক-এক দিকে তিন-তিনটে কৃষ্টিম খিলান, কুলপি আর কি! তাতেই ছতীর অভাবজনিত শূন্যতা পূরণ হবে। গম্বুজ-কুর্সিটাকে আরও অনেক উঁচু কর এখানেই এতদিন ভুল হাজির চোমাদের। তাছাড়া

ঐ যে চারিদিক ঘিরে এতদিন ছজ্জাটা বানানো ছিল ওটাকে বার্তিতল কর। তার বদলে গম্বুজকে বেণ্টন করে একটা বর্ডার দাও। খিলানের মাথায়-মাথায় একটা চওড়া ফেটি বানো দেখি—এবার দেখ কেমন খোলতাই হয়েছে!

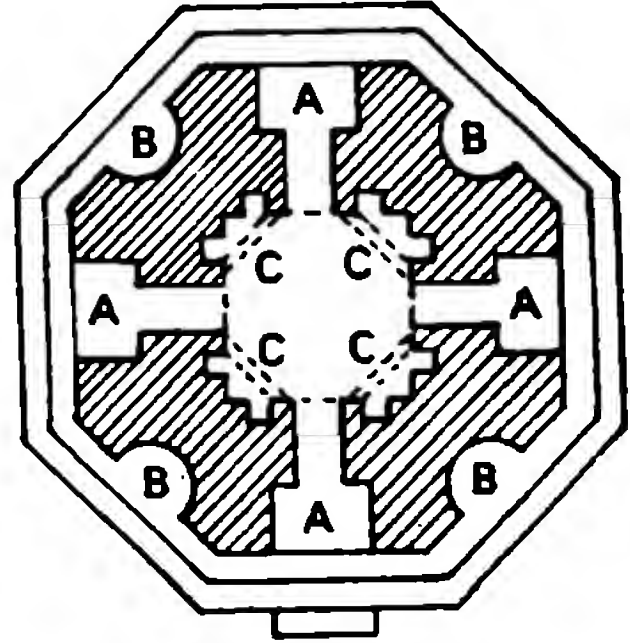
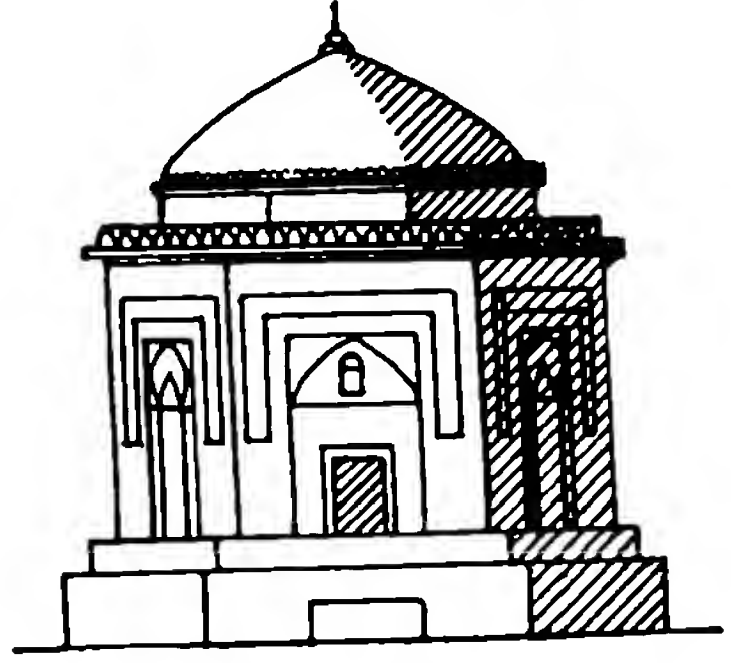
অষ্টভুজাকৃতি মক্কারার বিবর্তন বোঝাতে এখানে কিছু ছবি একে দিয়েছি। কোনো কোনো ছবি গরুড়া-বলোকনে—অর্থাৎ শিল্পী তার মানসচক্ষে অথবা কাঠের মডেলে কী-রূপ দেখেছিলেন। কোনটি বা সম্মুখ দৃশ্য—‘ফ্রন্ট এলিভেশান’ নয়, স্মিটিতে দাঁড়িয়ে দর্শক যা দেখে। আপনাদের রুচি কী বলছে? প্রস্থ ও উচ্চতায়, বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রূপায়ণ ও অনুপাতে এ বিবর্তন কি ক্রমশঃ সুন্দরতর সার্থকতার দিকে অভিযাত্রী নয়? আলী-সাহেব যাকে ‘আর্কিটেকটনিক’ গুণ (পৃঃ ৩) বলেছিলেন, সেটা কি চরমসিদ্ধি লাভ করেনি আধম খাঁর মক্কারায় উপনীত হয়ে? আকবরী জমানায়?

প্রসঙ্গত বলি, এই আধম খাঁর মৃত্যু শোচনীয়। স্থিতিধি সন্ন্যাসী আকবর জীবনে খুব কম বারই সংঘম হারিয়েছেন। আধম খাঁর মর্যাদান্তিক মৃত্যু তারই একটি উদাহরণ! সে গল্প যথাস্থানে।

আরও বলি, এই অষ্টভুজাকৃতি মক্কারার পরিকল্পনা রাজধানীর বাহিরেও ভারত-ভূখণ্ডে দূর-দেশে ও দূর কালে প্রসারিত হয়েছিল। তার প্রভাব অনুধাবন করতে হলে আপনাকে ট্রেনে চেপে দিল্লী-আগ্রা যেতে হবে না। আপনি যদি কলকাতাবাসী হন, তাহলে ট্রামে চেপে বি. বা. দী. বাগে গিয়ে এই শৈলীর একটি মৃগলয়দুগের অনবদ্য নমুনা দেখে আসতে পারেন—এই কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা জোব চার্ণকের সমাধিতে।

সংক্রামণ-ধর্মী মক্কারা :^১ সৈয়দ ও লোদী আমলে দুই জাতের মক্কারার—অর্থাৎ অষ্টভুজ ও চতুষ্কোণের সংক্রমণের যুগচিন্তায় আছে আর এক জাতের সমাধিসৌধ, যা বহিরঙ্গ অষ্টভুজ এবং অন্তরঙ্গ চতুষ্কোণ (চিত্র-6.6)। অষ্টভুজাকৃতি মক্কারার যে আবশ্যিক অনুষণ—খাম্বরা-সমন্বিত আলিন্দ, সেটি এখানে বর্জিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছতী বা গুলদস্তাও বানানো হয়নি। সম্মুখ-পশ্চাৎ ও দুই পাশে প্রবেশ পথটি স্ল্যানে আয়তক্ষেত্র (A); অথচ চারকোণায় চারটি গোলাকৃতি কুলুঙ্গির মতো, যা শ্চুইণ্ড-পদ্ধতিতে খিলানে গিয়ে মিশেছে (B)। ভিতর-দিকে চতুষ্কোণ কক্ষকে কোণায় কোণায় কাড়ি (beams) (C) পেতে অষ্টভুজে পরিণত করা হয়েছে। তার উপরে গেঁথে তোলা হয়েছে গম্বুজ-কুর্সি।

এই ডিজাইনটি বেশি প্রসার লাভ করেনি। কেন করেনি, তা সহজেই অনুমেয়। চতুষ্কোণ কক্ষের উপর গোলাকার গম্বুজ-কুর্সি নির্মাণের সময় ভারসাম্যের ঝামেলা এড়াতেই বিবর্তনের পথে এসেছিল অষ্টভুজাকৃতি মক্কারা। এখানে তার আদলটাই শৃঙ্খলিত নেওয়া হয়েছে, প্রযুক্তি বিদ্যার সদুযোগটুকুকে পরিহার করে। অর্থাৎ অষ্টভুজাকৃতি বহিরঙ্গ বানানো সত্ত্বেও ভিতরে সেই আদিম সমস্যাটা থেকেই বাড়ে। তাই এই



চিত্র-6.6 সংক্রামণধর্মী মক্কারা (সৈয়দ লোদী যুগ)।

সংক্রামণ-ধর্মী মক্কারা একটা বৈচিত্র্য হিসাবেই গ্রহণ করেছিল ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্য-অনুকরণযোগ্য পরিকল্পনা হিসাবে নয়।

চতুষ্কোণ মক্কারা : সৈয়দ ও লোদী আমলে চতুষ্কোণ মক্কারাগুলি সুলতান বা তার পরিবারের জন্য সচরাচর নির্মিত হত না। দিল্লী-অঞ্চলে একজাতের উল্লেখযোগ্য অন্তত সাতটি ইমারৎ (i) কড়া খান কি গম্বুজ, (ii) ছোট খান কি গম্বুজ, (iii) বড়া গম্বুজ, (iv) শীশ গম্বুজ, (v) খিহাবউদ্দীন-তাজ খাঁর মক্কারা (প্রথম আপাত-ম্বিডল মক্কারা), (vi) দাদী-কা-গম্বুজ, (vii) পোলি-কা-গম্বুজ। অধি-

কোনো একক দোষ—অর্থাৎ কোনো প্রাচীরবেষ্টিত উদ্যান বা প্রবেশ ভোরণ নেই। আকারে চতুষ্কোণ মক্কারাদুলি সাধারণত অষ্টভূজাকৃতি সমাধিসৌধের চেয়ে কম উচ্চতায় বেশি। এগুলির মধ্যে বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্য আনতে স্থপতিবিদ এমন কায়দা করেছেন যাতে বাহিরের দিক থেকে মনে হয় ইমারৎ দু'কি ম্বিতল অথবা গ্রিডল। বাস্তবে সবই কিন্তু একতলা।

ঐতিহাসিক টেন্নেবি বলেছেন, 'সমস্যা' হচ্ছে মানবসভ্যতার অগ্রগতির অন্যতম উপজীব্য। সমসাময়িক সমাজ সমস্যার উদ্বেগ ওঠার প্রচেষ্টায় যদি নিত্য-

নিম্নন থাকে তবে সামূহিক অগ্রগতি অনিবার্য। কিন্তু কখনো কখনো সমাজ 'যশ্ভবিষা ভবিষ্যতি'-নীতিতে গম্ভীলিকা-স্রোত গা ভাসায়—তখন তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় : অথবা ঘটনাচক্রে ঐ সময়ে যদি কোনো বহিরাগত-চিন্তাধারায় নতুন সমিধ্ সংগৃহীত হয় তখন অবশ্যই মানবসমাজে আবার নবজীবনের অস্কুরোদ্গম হয়। সৈয়দ ও লোদী যুগের অবশ্যই চিন্তাধারায় ভারত-ঐতিহ্য ডুবতে বসেছিল, এবং তখনই এক বহিরাগতের উৎসাহ-সমিধে তার রূপান্তর ঘটে। ভারতের ইতিহাসের সেই ক্রান্তিকারী ঘটনাটি হচ্ছে বাবরের ভারতগমন।

□



‘গ্যাংড-মূল’-এর দিন পূর্ব

সিংহাসনে	..	সম্রাট আকবর
সম্মুখে নতজানু অবস্থানে	..	শাহজাদা সেলিম
সেলিমের পিছনে নতজানু	..	শিপাহ-সালার ঘানসিহ (??)
দুটি হরিণের থাকখানে		কুরৌ
আকবরের নিচে		খুর্রম
খুর্রমের পিছনে		আবুল ফজল (??)

[মেট্রোপোলিটান মিউজিয়াম অফ আর্টস্, নিউ ইয়র্ক-এ রক্ষিত মূলচিত্রের অনুকরণে।]

راجا راجا راجا راجا راجا راجا



বাবুর ও হুমায়ুন

উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা

সময়কাল

বাবুরের জন্ম	1483
ভাস্কা-দা-গামার ভারতে পদার্পণ	1498
বাবুর কর্তৃক কাবুল জয়	1504
হুমায়ুনের জন্ম	1507
চিতোরের রাণা সঙ্গের আমল	1509-27
পতুগীজদের গোয়া অধিকার	1510
সিকান্দার লোদীর মৃত্যুতে ইব্রাহিমের অভিষেক	1517
পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবুরের জয়লাভ	1526
বাবুরের মৃত্যু ও হুমায়ুনের অভিষেক	1530
সুবেদার শের খাঁ কর্তৃক বঙ্গ বিজয়	1538
চৌসা যুদ্ধে হুমায়ুন পরাজিত, শেরশাহ সুলতান	1539
হুমায়ুনের হতরাজ্য পুনরুদ্ধার ও মৃত্যু	1555-56

“বদল যায়ে অগর মালি,
চমন হোতা নেহি খালি,
বাহারে ফিরিভি আতি হয়
বাহারে ফিরিভি আয়েগে ॥”*

তৈমুরের মারাত্মক আঘাতে ভূতলশায়ী ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্য তিল তিল করে শক্তি সঞ্চয় করে আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। সৈয়দ বংশীয়রা শব্দ মক্কারাই বানিয়ে গেছেন, লোদী বংশীয়রা সবে বানাতে শব্দ করেছিলেন অন্যান্য জাতের ইমারৎ—মসজিদ, প্রাসাদ, দুর্গ। সিকান্দার লোদী তো আগ্রার অনতিদূরে সেকেন্দ্রাবাদে নতুন বসতিও স্থাপন করলেন, বাদলগড়ে দুর্গ বানালেন; কিন্তু সিকান্দার-তনয় আবার রাজ্য খোয়ালেন সেই তৈমুর-বংশীয় বাবুরের হাতে। ফুলবাগিচার মালির পদ শূন্য হল। সৌভাগ্যক্রমে তৈমুর বংশীয় হলেও বাবুর-বাদশাহ ছিলেন অন্য জাতের মানুষ। তাই তাঁর পথরেখা ধরে ভারতে এল নতুন জমানা : মঙ্গল-এ-আজম।

* বদলে যখন যায় বাগানের মালি,
ফুল-বাগিচা হয় না তবু খালি,
ফাগুন ফিরে আঘাত হানে স্নারে
ফাগুন ফিরে আসবে বারে বারে ॥

মঙ্গল যুগের দুটি পর্যায়। প্রথমার্ধের স্থায়িত্ব মাত্র 13 বৎসর—পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবুরের জয়লাভ (1526) থেকে শের খাঁ হাতে হুমায়ুনের পরাজয় (1539)। দ্বিতীয়ার্ধ অতি দীর্ঘস্থায়ী—তিনশত বৎসর। ঐ তিনশত বছরও ঠিক সমান দৃভাগে বিভক্ত। প্রথম দেড়শ বছর হচ্ছে মঙ্গল জমানার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস : পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে (1556) কিশোর আকবরের তরফে বৈরাম খাঁর জয়লাভ থেকে আলমগীরের দেহাবসান (1707)। পরবর্তী দেড়শ বছর—আলমগীরের মৃত্যু (1707) থেকে তথাকথিত সিপাহী বিদ্রোহ-তক (1857) হচ্ছে মঙ্গলযুগের অবস্ফারী পরিচিতি। দুই মঙ্গল যুগের মাঝখানে রয়েছে শেরশাহ শব্দ এবং তাঁর বংশধরদের স্বল্পস্থায়ী 16 বছরের শাসনকাল। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাই বাবুর ও হুমায়ুনের রাজত্বকালকে একত্রে গ্রথিত করে একটি পৃথক পরিচ্ছেদ রচনা অনিবার্য হয়ে পড়ছে। দুই যুগের মধ্যবর্তী ঐ ষোল বছরটাকে যদি সংক্রমণের যুগ বলে উপেক্ষা করা যেত—অর্থাৎ সুলতানী জমানা থেকে মঙ্গল-এ-আজমে পদার্পণের প্রয়োজনে শেরশাহ শব্দকে যদি একটা পাঠান পাটোতন বলে ধরে নেওয়া যেত, তাহলে শেরের নামে একটি পৃথক পরিচ্ছেদ রচনার প্রয়োজন থাকত না। কিন্তু তা বাস্তব-সত্য

নয়। শেরশাহ্ শূরের ক্ষণিক আবির্ভাব নিশ্চয়ই সংক্রামণ-ধর্মী, কালের মাপে অতি-দীর্ঘস্থায়ী পাঠান ও মঙ্গল যুগের মাঝখানে তা অকিঞ্চিৎকর ; কিন্তু গ্রিষ্মা রাত্রি এবং দীর্ঘস্থায়ী দিবাভাগের মাঝখানে ক্ষণস্থায়ী সূর্যোদয়টাকে কি ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া যায়? শেরশাহ্ শূর ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যের ইতিহাসে সূর্যোদয়ের মতই ক্ষণস্থায়ী অথচ আশ্চর্য বর্ণাঢ্য পর্যায়।

সে যাই হোক, ঐতিহাসিক প্রয়োজনে বাবুর-হুমায়ূনের জন্য একটি পৃথক পরিচ্ছেদ আবশ্যিক হলেও তাঁদের সামগ্রিক স্থাপত্যকীর্তি লিপিবদ্ধ করতে দেখছি একটি অনুচ্ছেদই যথেষ্ট। তাই এই অবকাশে আমরা প্রবেশ্য মঙ্গল-যুগের একটা সার্বিক মূল্যায়নের চেষ্টা করব। স্কুলপাঠ্য ইতিহাস সচরাচর সাল-তারিখ সম্বন্ধিত মঙ্গল-বাদশাহদের লড়াই-কাজিয়া, রাজ্যবিস্তার, শাসন-ব্যবস্থা, রাজস্ব-আদায়-পদ্ধতির বিষয়ে ঠাসা। স্থাপত্যের মাধ্যমে ইতিহাস—যা নাকি আমাদের ‘বুল্-স্-আই’ তার দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টি হতে হলে ঐ মৌল-লক্ষ্য বেষ্টনকারী নানা-রঙের টাগেট-রিঙগুলোকে লক্ষ্য করতে হবে। অর্থাৎ, স্থাপত্যের পরিপূরক ললিতকলা—চিত্রশিল্প, সঙ্গীত এবং সর্বোপরি জ্ঞান-বিজ্ঞান-ইতিহাসের চর্চা।

জাহিরউদ্দীন বাবুর বিশ্ব-ইতিহাসে এক বিচিত্র চরিত্র। তার ধমনীতে যে রক্ত প্রবাহিত তা উভয় তরফেই মশীকুক্ষ—পিতৃকুলে তৈমুরলঙ এবং মাতৃকুলে চেঙ্গিস খান! অথচ আশ্চর্য আশ্রাতালার আজব কাণ্ড-কার-খানা—অঙ্গার-কুক্ষ স্লেটে মশীকুক্ষ পেন্সিলের স্পর্শে যে হরফ ফুটে উঠল তা ধবধবে সাদা! বাবুর-বাদ-শাহ্ চরিত্রে নৃশংসতার কোনো নাজির নেই। বিজয়ী রণনেতাকে অহৈতুকী হত্যার উৎসবে মেতে উঠতে দাঁখ না। উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি শূদ্ধ লাভ করে-ছিলেন তাতার ও মঙ্গোলীয় বিভীষিকার গুণগুণি-মাত্র : দুর্জয় সাহস, অসামান্য রণকুশলতা, অপারিসীম চরিত্রিক দার্দ্য। আর তার চেয়েও অবাক করা খবর—ঐ সঙ্গে তার চরিত্রে এসে মিশেছে দীপ্তবজ্রীর বিপরীত-ধর্মের আরেকটি অনুভবনা : পারসিক কবি-দার্শনিকের পেলব দৃষ্টিভঙ্গি, কাব্য-প্রতিভা, লিপিকুশলতা এবং প্রকৃতি-প্রেমিকতা। যে দীপ্তবজ্রীর পত্র-পুঞ্জের অসংখ্য রণক্ষেত্র দেখা গেছে কিম্বোহের বাণী, স্পর্ধিত অতিসম্পাত, তাকেই রণক্রান্ত সন্ধ্যায় ‘ফুলের পরিচয়ে আজ ওক দেখছি যেন গম্বুজ চিত্ররূপ, যে ছিল অজুর্ন-কিছরী মহারথী, গানের সাধন করছে সে আপনমনে একা নন্দনবনের ছায়ার অন্তরে গুণ গুণ

সুদরে।”

বাবুর ছিলেন চুগতাই তুর্কী। চুগতাই হচ্ছেন গ্র্যান্ড মোঙ্গল চেঙ্গিস খানের দ্বিতীয় পুত্র—তারই বংশধর হিসাবে বাবুর মাত্র এগারো বছর বয়সে পিতার দেহান্তে ‘ফরগনা’-র সুবেদার হয়ে পড়েন। ফরগনা হচ্ছে চীনা-তুর্কী-স্থানের একটি ক্ষুদ্র জনপদ ; কিন্তু ঐ নাবালকের পক্ষে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পিতৃধন রক্ষা করা সম্ভবপর হল না। আত্মীয়-স্বজনের দ্বারা বিভাঙিত বাবুর ভাগ্যবৈষণ্যে পথে নামলেন। আত্ম-জীবনীতে বাবুর বলছেন, ঐ সময়—তখন তাঁর বয়স মাত্র সতের—একবার তিনি পথপ্রান্তে এক বৃক্ষা গ্রাম-বাসিনীর পর্ণকুটীরে আশ্রয় নেন। বাবুরের আন্দাজ-মতো তখন সেই অতিবৃদ্ধার বয়স ছিল একশ এগারো বছর। কিশোরটির বংশপরিচয় পেয়ে বৃড়ি নানি বললে, ‘তুই যতদিন ইচ্ছে আমার ছাপ্রায় ছাঁপিয়ে থাকতে পারিস—কাকপক্ষীতে টের পাবে না। তুই তৈমুর-বংশের ছাওয়াল! তুই মেরি লাল! মেরি দিল-কাকলিজা!’

ঐ বৃদ্ধাই কিশোরের নির্বাপিতপ্রায় উচ্চাশা-বহিকে নিত্য-ফুৎকারে উজ্জীবিত করে তোলে। মধ্য-এশিয়ার অগ্নিবর্ষী সূর্য অস্তাচলে গেলে জোলচর্মা বৃদ্ধা ঐ কিশোরকে শোনাতে তার শৈশবের কিস্সা—তৈমুরলঙের হিন্দুস্থান-লুণ্ঠনের কাহিনী। বৃড়ি তখন নিতান্তই শিশু—সব কথা তার ভালো মনে পড়ে না—তবে অনেক অনেক কাহিনী সে প্রত্যক্ষদর্শীর জবানীতে শুনছে তার বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে। উঃ! সে কী ভয়ঙ্করী দৃশ্য! হাজার হাজার অশ্বারোহী উল্কার বেগে ছুটে চলেছে, তাদের হাতে রক্তরাঙা নাঙ্গা তলোয়ার ; তাদের অশ্বের খুঁরে খুঁরে আশ্মানতক্-ধুম্রজালের আঁধেরী, রণহস্তীর কলিজা-বিদীর্ণ করা বংশিত, মৃত্যুর মুখোমুখি মরণাহত সৈনিকের অন্তিম আত্নাদ। আর সেই ভয়ঙ্করী অমরাট্রির অন্ধকারে বিদ্যুৎচমকে মাঝে মাঝে দেখা যায় শোণিতসিক্ত আলা-ই-মুহল্লিখ হস্তে অশ্বারূঢ় তৈমুর রণক্ষেত্রের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছুটে চলেছেন কিয়ামতের রাখে মর্তিমান মহামৃত্যুর মতো!

চিরাগ-দীপিত আধো-অন্ধকারে সেই পর্ণকুটীরে অতিবৃদ্ধা কথাকোবিদ তার বলিরেখাঙ্কিত হাতটা কিশোরের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলত : দ্যাখ্, মেরে লাল! আজও সে-কথা ম্যাদ করলে আমার তামাম বদনে কাটা দিয়ে ওঠে!

কাটা বিশ্বতো কিশোর প্রোতাটির কলিজাতেও। সেই বিশ্বজয়ী তৈমুরের বংশধর, সেই সসাগরা ধরণীর

অধীশ্বর চৌগাস্ খান-এর অধঃস্তন পদব্ধ আজ নাঙ্গা ফকির!

ভাগ্যান্বেষী কিছু নওজোয়ানদের নিয়ে বাবুর ছোটখাটো একটি দল গড়লেন। এক উজ্জ্বল বিদ্রোহের সুযোগ তিনি একদিন আফগান-অধিপত্যকে পরাস্ত করে কাবুল অধিকার করলেন (1504)। বেশিদিন সিংহাসনে টিকতে পারলেন না কিন্তু। বছর আশ্টেকের ভিতরেই মৃত সুলতানের পুত্র তাঁকে পরাস্ত করে কাবুল পুনরুদ্ধার করল। বাবুর আবার নামলেন পথে।

এই সময়ে খুদার কুদ্রতে নিয়তি যেন বাবুরকে হিন্দুস্থানের দিকে আকৃষ্ট করল। দিল্লীতে তখন সুলতান ইব্রাহিম লোদী তক্ত-আসীন। ইব্রাহিমের দুই ওমরাহ—দৌলত খাঁ আর আলম খাঁ বাবুরকে গোপনে আক্রমণ করল ভারতে অভিযান নিয়ে আসতে। দৌলত খাঁর উদ্দেশ্য—প্রতিহিংসা; তার পুত্রকে ইব্রাহিম কঠিন শাস্তি দিয়েছিলেন। আর আলম খাঁর অন্তরে ছিল উচ্চাশা। কোনো ডাইনী বোধকারি তার কানে মন্ত্র দিয়ে গিয়েছিল : Thou shalt be King hereafter! (তুমি রাজা হবে!) তার আশা—বাবুর ইব্রাহিমকে হত্যা করে তাকেই মস্নদে বসিয়ে কাবুলে ফিরে যাবেন! মোটকথা, এই দুই বিশ্বাসঘাতকের আমন্ত্রণে বাবুর হিন্দুস্থান জয় করার একটা সুযোগ দেখতে পেলেন। সেই অতিবৃদ্ধ খোয়াবকে বাস্তবায়িত করতেই যেন—বাবুর দুর্বীর বেগে প্রবেশ করলেন পঞ্জাবে, দখল করলেন লাহোর (1524)। এতদিনে দৌলত ও আলমের হৃদয় হয়েছে, তারা সম্মুখে নিয়েছে বাবুর যদি ইব্রাহিমকে সিংহাসনচ্যুত করতে পারেন তাহলে নিজেই উঠে বসবেন দিল্লীর তক্ত-তাউসে! তাই এবার ওরা দুজন বাবুরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করল। বাধ্য হয়ে বাবুর ফিরে গেলেন কাবুলে।

কিন্তু ইতিমধ্যে মধ্য-এশিয়ার ব্যাঘ্র ‘ম্যান-ইটরে’ রূপান্তরিত! বাবুর বুঝেছেন—হিন্দুস্থান দখল করা অসম্ভব নয়! সৈন্যসামন্ত সাজিয়ে পরের বছরই তিনি ফিরে এলেন সেই খাইবার গিরিবর্ষ দিয়ে। পঞ্জাব পুনরায় দখল করলেন দৌলত ও আলমকে পদদস্ত করে। এর পরেই তাঁকে চরম সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে হল। দিল্লী অধিকার করতে হলে, পঞ্জাবের শাসনকর্তাকে নয়, পরাজিত করতে হবে দিল্লীশ্বর সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে।

লোদী বংশের গৌরবরাশি যে অস্তমিত সেটা মালুম হয়নি ইব্রাহিমের। তিনি আগন্তুকের বিরুদ্ধে বিশাল বাদশাহী ফৌজ একত্র করলেন ভারত-

ইতিহাসের সেই পীঠস্থানে পানিপথের রণক্ষেত্রে। একুশে জুলাই (1526) তারিখে সংঘটিত হল সেই ঐতিহাসিক ঘটনা : ‘দ্য ফাস্ট বাটল অব পানিপথ’!

আগন্তুকের আত্মজীবনীতে দেখছি, তাঁর হিসাব-মতো—বাবুরের সৈন্যসংখ্যা ছিল 12,000; অপরপক্ষে, দিল্লীশ্বর রণক্ষেত্রে সামিল করেছিলেন এক লক্ষ সোম্মা। কী-ভাবে এই অসম্বন্ধে জয়লাভ করেছিলেন তার বিস্তারিত বর্ণনা বাবুর তাঁর আত্মজীবনীতে দিয়েছেন। হয়তো অতিরঞ্জন আছে, কিন্তু তা-সত্ত্বেও এ বৃদ্ধের বাবুরের এক অসামান্য কীর্তি। ডক্টর কালীকিশোর দত্তের ভাষায়,² “এইভাবে উন্নততর রণকৌশলতা, এবং সৈন্যপতা, তদুপরি বন্দুকের ব্যবহারে বাবুর চূড়ান্ত-ভাবে জয়লাভ করলেন। লোদী সুলতান বৃদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ দিলেন। ঐ সঙ্গে তাঁর সৈন্যবাহিনীর শ্রেষ্ঠ বীর-বৃন্দও আত্মদান করল।”

বাবুর বিদ্রোহগতিতে অধিকার করলেন দিল্লী, আগ্রা।

আমরা সাধারণত ধরে নিই পানিপথের প্রথম যুদ্ধ-জয়েই মগলযুগের প্রতিষ্ঠা। সেটা সর্বৈব সত্য নয়—পানিপথের প্রথম যুদ্ধ সূচনা, সমাপ্তি নয়। কারণ ইব্রাহিম লোদী তখন এক অবক্ষয়ী সুলতানীযুগের নবদন্তহীন শেষ বংশধর। হিন্দুস্থানের উত্তর ও মধ্য অংশে তখন প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী বিভিন্ন রাজপুত নৃপতি। মেবারের রাণা সঙ্গের নেতৃত্বে মাড়বার, অম্বর, গোয়ালিয়র, আজমীর ও চান্দেরীর রাজন্যবর্গ এবার বাবুরের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে রুদ্ধে দাঁড়ালেন। কানুয়া যুদ্ধক্ষেত্রে এই সম্মিলিত রাজপুত বাহিনীকে পরাস্ত করেই, বাবুর হিন্দুস্থান বিজয় সম্পূর্ণ করলেন।

এত পরিশ্রমে এত রক্তক্ষয়ে অর্জিত হিন্দুস্থানের তক্ত-তাউসে বাবুর কিন্তু বেশিদিন আসীন থাকতে পারেননি। মাত্র সাতচল্লিশ বছর বয়সে তিনি দেহ রাখলেন (1530)। ঔর মৃত্যু নিয়ে একটি কিংবদন্তী আছে—নিশ্চয় শুনছেন আপনারা, যার মূল উৎস পর-বর্তী যুগের পণ্ডিত আব্দুল ফজলের প্রতিনিধিত্ব রচনা। বাবুরের জ্যেষ্ঠপুত্র শাহজাদা হুমায়ুন—তখন তিনি তেইশ বছরের নওজোয়ান, দুরারোগ্য ব্যাধির আক্রমণে শয্যালীন হয়ে পড়েন। বাবুর চিকিৎসার কোনো চেষ্টা করেননি—বালুঘাড়ি হাতে রোগীর শিয়রে বসে আছেন তবীব-ই-হাজিক, বিচক্ষণ হাকিম, দণ্ডে দণ্ডে ঔষধ পান করছেন : আর অদূরে বসে আছেন নিশ্চুপ ভায়াম হিন্দুস্থানের মালিক জাহিরউদ্দীন বাবুর। ক্রমে রোগীর অবস্থা সঙ্গীনতর হয়ে পড়ে।

একদিন সন্ধ্যায় হকিম-উল-মল্ক মাঝা নেড়ে উঠে চলে গেলেন : কলে গেলেন রোগীর উপর তখন আর কোনো কাজ করছে না—এখন আল্লাতালার নির্দেশ শান্ত চিত্তে মেনে নেওয়া ছাড়া গতান্বিত নেই!

বাবুর উঠে দাঁড়ালেন। অস্তাচলগাম্ভীর্য সূর্যের শেষ রশ্মির দিকে তাকিয়ে রইলেন। ঠিক তখনই জাম-ই-মসজিদে মিনারচূড়া থেকে ভেসে এল শাম-ওয়ত্তের নামাজের মুরাজ্জিন। বাবুর হাঁটু পেড়ে বসলেন মুরব্ব পুত্রের শিরে। অক্ষুণ্ণ মন্তোচ্ছারণের মতো কললেন, হে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ! তুমি তো সর্বজ্ঞ, তুমি সকলের পাপ ক্ষমা কর, তওবা কবুল কর! তবু যদি আমার কোন অজ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ একটি মৃত্যু অপরিহার্য হয়, তাহলে আমার প্রাণাধিক প্রিয় শাহজাদার পরিবর্তে আমাকে গ্রহণ কর! হুমায়ূনকে রোগমুক্ত করে আমাকে দাও ঐ রোগমন্ত্যর মুরাব্বকী!

আবুল ফজল বলছেন, আল্লাহ-র কী অপূর্ব মহিমা। এর পর থেকেই ক্রমশঃ ভালো হয়ে উঠলেন হুমায়ূন। এবং মাত্র তিনমাসের মধ্যে একই ব্যাধিতে জ্বিন-সামিন হলেন বাবুর-বাদশাহ। পরিপূর্ণ তৃপ্তির সঙ্গে তিনি বিদায় নিলেন দুনিয়া থেকে। যাবার আগে হুমায়ূনের হাত দুটি ধরে দিয়ে গেলেন আখির-ই-মুরাব্বকী : ‘আপজন! জাতিকরোধই কড় কড় সাম্রাজ্যের সব চেয়ে কড় শত্রু। তাই শেষ নির্দেশ দিয়ে যাই—তোমার ছোট ভাই কামরান, হিন্দাজ, আশ্কারী এবং বাহিন গুজবদানের শত অপরাধ ক্ষমা কর।’

বাবুরের মরদেহ প্রথমে আগ্রার আরামবাগে রাখিত হয়। তারই শেষ ইচ্ছানুসারে পরে তা কাবুলে নীত হয়। বাবুরের সমাধি হিন্দুস্থানে নেই। কাবুলে তাঁর সমাধি অনাড়ম্বর—কিন্তু এক অপূর্ব কাগিচা ঘেরা।

সাম্প্রতিককালের কোনো কোনো ঐতিহাসিক বাবুরের মৃত্যু-সংক্রান্ত ঐ অলৌকিক ঘটনাটি অস্বীকার করতে চান। এর মধ্য অলৌকিক কোনটা, তা তো আগ্রাসের মলমল হল না। ঘটনার অলৌকিকতা কিছু নেই, ব্যাক্সর থাকতে পারে। বাবুরের পক্ষে ঐ ধরনের প্রাণনা নৈসর্গিক, অনেক পিতাই সম্রাটের মৃত্যু-শিরের দাঁড়িয়ে এ-জগতের মঙ্গলোত্তি করে থাকেন; রোগে ভুগে তাঁর তিনমাসের মধ্যে মৃত্যুও ঐতিহাসিক নয়। ঘটনা দুটিকে কাকতালীর রূপে প্রমাণ করার কথা না অথচ কোনো নৈসর্গিক চিন্তাধারা, না সৌলিক পবিত্রতার অবকাশ!

বাবুর সম্প্রদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন দিল্লীশ্বররূপে। তাঁর স্থাপত্যকীর্তি বঙ্গসাম্রাজ্য। পলায়ন বিমানবাণীর

কাছে তিন-খিলানওয়াল্লা একটি ইটের মসজিদ নাকি তাঁরই আদেশে গড়া। এছাড়া আরও তিনটি মসজিদ তিনি নির্মাণ করিয়েছিলেন, সম্বলে, অবোধ্যায় এবং আগ্রার তদানীন্তন লোদী-কিল্লার ভিতর। আগ্রার চিনি-কা-রোজার কিছ্র উত্তরে ‘রামবাগে’ বাবুর নির্মিত ‘বাগ-ই-আফসান’-এর ধ্বংসস্তুপ এখনও দেখতে পাবেন। তাঁর আর একটি—কী কলব?—‘স্থাপত্য-কীর্তি’-ই আছে পানিপথে। কিন্তু সেকথা বলার আগে লিপিবদ্ধ করে যাই বাবুর বিশ্ব-ইতিহাসে চিরজীবী হয়ে আছেন শুধু হিন্দুস্থানে মৃগল-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবেই নয়, তাঁর আত্মজীবনী জন্য। চুগতাই-তুর্কী-ভাষায় লেখা তাঁর আত্মজীবনী নাকি এক অনবদ্য গ্রন্থ। আকবরের সভাসদ এবং বৈরাম খাঁর পুত্র আবদুর রহিম খান-ই-খানান্ সেটির ফারসী অনুবাদ করেন (1590)। পরে তার ইংরেজি অনুবাদ হয় (1826) এবং ফরাসী ভাষাতেও (1871)। এসব দুপ্রাপ্য গ্রন্থ জোগাড় করাই মৃগলিক; তবে মিসেস্ বিভারিজের অনুবাদটি প্রামাণিক গ্রন্থালয়ে পাবেন। সম্প্রতি নাকি একটি বাঙলা অনুবাদও হয়েছে। বাবুরের এই আত্মজীবনীতে তদানীন্তন ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক তথ্যই শুধু নয়, গাছ-পাখী-ফুল ইত্যাদির বিষয়ে তথ্যনিষ্ঠ নানান সংবাদও সেখানে সন্নিবিষ্ট। রচনার ভিতরে আমরা কোথাও একজন দার্শনিক, কোথাও কবি, কোথাও প্রকৃতি-প্রেমিক এবং সর্বত্র এক সুন্দরের পূজারীকে দেখতে পাই—অনুভব করি কেমন করে আকবর হয়ে পড়েছিলেন মানবপ্রেমী, শাহজাহাঁ সৌন্দর্য-দেবীর বেদীমূলে কেন রাজকোষ নিঃশেষিত করতেও পিছপাও হননি।

বাবুর প্রকৃতি-প্রেমিকের নিষ্ঠায় তাঁর দেখা নদ-নদী, পাহাড়-গিরিবন্ধ, গাছ-ফুল-ফল, কীট-পতঙ্গ-পশু-পক্ষীর নিখুঁত বর্ণনাই শুধু দেননি, উপযুক্ত চিত্রকরকে দিয়ে ছবি আঁকিয়ে তাঁর পান্ডুলিপিকে স্বেয়সম্পূর্ণ করেছেন। ক্রীতে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রাখা ষোড়শ শতাব্দীর একটি পুঁথি থেকে একখানি পৃষ্ঠা ‘বদস্তে’ মন্তে এখানে এঁকে দিয়েছি (চিত্র—7.1)। মূল চিত্রে যে অপূর্ব বর্ণসম্ভার তা সাদাকালো লাইন ব্রকে কিছুই খোঁজাটাই হয়নি। চিত্রকর হিসাবে আমার এসেও দায়ী। ফলে কোনো পক্ষী বিশারদ হয়তো আমার এ ছবি দেখে পাখীগর্দিকে চিন্তে পারবেন না। ভরসা এইটুকু যে, আমার বাঙালী পাঠককুলের মধ্যে চুগতাই-তুর্কী ভাষা জানেন কোটিকে গদ্যটিক—স্বয়ং মৃগলবা আলীসাহেবও স্বীকার করেছিলেন, জাভাটা তাঁর অজানা। তাই আশা করে আছি—আমার

ছবি দেখে কেউ হসফ করে বলতে পারবেন না—ব্রিটিশ মিউজিয়ামে-রাখা মূল পাণ্ডুলিপির ঐ দূর্বোধ্য পৃষ্ঠাটি একটি বাস্তব মস্কির মক্কারা কিনা!

পানিপথের যুদ্ধ, বিশেষ করে কান্দহার চড়ান্ত যুদ্ধে সম্মিলিত রাজপুত বাহিনীকে পরাস্ত করার পর বাবরের সেনাপতি—আমীর মালিকেরা তাঁকে অনুরোধ করেছিল একটি কীর্তিস্তম্ভ স্থাপনা করতে। ঠিক যেভাবে কুৎবউদ্দীন আইবক গড়েছিলেন কুৎব মিনার। বাবর নাকি প্রত্যন্তরে বলেছিলেন, ঠিক আছে। তাই করব—কিন্তু পাথর আর চুন-সুঁরকি দিয়ে মহাকালকে জয় করা যায় না, মোতকে (মৃত্যুকে) ফৌজ করার হিম্মৎ শূন্য জিন্দেগীর—জীবনই একমাত্র পারে মৃত্যুকে উপেক্ষা করতে। তাই স্থাপত্যকীর্তি সজীব হওয়া চাই!

আমীর মালিকেরা বিহ্বল হয়ে মৃত্যু তাকাতাকি করে।

বাবর বললেন, পানিপথ যুদ্ধক্ষেত্রে ঠিক যেখানে ইব্রাহিম লোদী অন্তিম শয়ানে শয়রেছিল তাঁকে কেন্দ্র-বিন্দু করে এক 'চাহর বাগ' বানাও। আম্রতক্ষেত্রে চতুঃখণ্ড কর চারটি সুসম বর্গক্ষেত্রে, আর তার ধারে ধারে বনে দাও গাছের চারা। পাথরের ইমারৎ জলঝড়ে ফেটে যায়, ভূমিকম্পে ভুতলশায়ী হয়, কিন্তু গাছের চারা মৃত্যুঞ্জয়ী। ওরা মৃত্যুর আগে ফুল ফোটাবে, ফল ধরাবে, বীজ ছড়াবে! তারপর মহাকালের নাকের সামনে নাকাড়া বাজিয়ে দলে দলে মরতে যাবে! সাথে সাথে দেখা দেবে অশ্রুর! গাছ মরে, বাগিচা মরে না। 'বদল যায়ে অ'গর মালি, চমন হোতা নেহি খালি; বাহারে ফিরিভি আতি হ'য়, বাহারে ফিরিভি আয়েগে ॥'

তাই আসে। পানিপথের সেই মৃত্যুঞ্জয়ী বাগিচা আজও সজীব, যদিও সাড়ে চারশ বছরে অনেক-অনেক মালি পদ্রুমানক্রমে বিদায় নিয়েছে। তুগলকাবাদ, জহানপনাহ, ফিরোজশাহ কোটলা তিল তিল করে ধূলায় মিশিয়ে যাচ্ছে, আর বছর বছর বাবর-বাদশাহর 'স্থাপত্যকীর্তি' নববর্ষের অশ্রুরোপ্সমে মহাকালের নাকের নজ্‌দিকে নাকাড়া বাজিয়ে যায়! প্রতি বছর শীতের হাওয়ায় সে ফুলবাগিচার শাখায় শাখায় নাচন লাগে, পাতাগুলি শিরশিরিয়ে-শিরশিরিয়ে করে পড়ে: কিন্তু তার 'শূন্য করে ভরে দেওয়ার' খেলা সাঙ্গ হয় না। প্রতি বসন্তে দেখা যায় তার ফলের বাহার বোরিয়ে এসেছে অন্তরল ছেড়ে!

দার্শনিক বাদশাহর সেই আদিম 'চাহরবাগ' শূন্য পানিপথেই থেমে থাকেনি; সে ছুটে গেছে এ মহান

উপলব্ধির এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। হুমায়ুন, আকবর, মনসাভের মক্কারা থেকে শুরু করে দীন-



চিত্র--7.1 বাবরের আকবরীকীর্তি একটি পৃষ্ঠা।

হতে-দীনের কুটির ঘিরে সে বেঁচে আছে। সেজেছে নুতন সাজে কাম্বোজের শালিমারে, নিশাদবাগে, চশমা-

সাহসীতে, এমন কি বাঙ্গালার অথবা নয় দিল্লীর পিকনিকস্পটে, গোনভিস্টের-মুখের বন্দাবন অথবা মৃদল গার্ডেন্সে।

হুমায়ূনের চরিত্র দোষে-গুণে মেশানো। দোষের চেয়ে গুণই বেশি। তিনি অহিংসেন্দ্রিয় এবং আমোদ-প্রিয়; কিন্তু বই পড়তে ভালোবাসতেন। তাঁর বাদশাহীর দুটি বৃদ্ধ। প্রথমার্ধে তিনি শব্দ লড়াই-কাছিয়াতেই স্তম্ভ ছিলেন। তারপর শেরশাহ শত্রুর হস্তে পরাজিত হয়ে কাবুল অঞ্চলে কাটিয়ে আসেন জীবনের পনেরো বছর। দুর্ঘটিনায় শেরশাহের অকাল-মৃত্যুর পর তাঁর বংশধরদের হাত থেকে হতরাজ্য পুনরায় উদ্ধার করে মাত্র ছয় মাস বৈতে ছিলেন। ফলে, স্বাধীনতা-কীর্তি কিছু ক্ষুদ্র বাবার মতো সময় ও সুযোগ তিনি পাননি। তবু দীনপন্যাহ-তে তিনি একটি নতুন নগরী পল্লব করেন, এমন যার চিহ্নমাত্র নেই। দ্বিতীয়-বার দিল্লীশ্বর হয়ে তিনি শেরশাহের অসমাপ্ত পুরান-কিন্জা কিছু ভাঙচুর করে গড়ে তোলেন। মেহেরোলী এলাকায় জামালি-কামালী মসজিদ—যা বাবুরের আমলে শব্দ হয়েছিল, সেটি সমাপ্ত করেন। জামালি হচ্ছে কাসী কবি শেষ ফজলুল্লাহ-র ছদ্মনাম। এ মসজিদে একটি মাত্র সুউচ্চ গম্বুজ, পশ্চিম প্রাচীরে পাঁচটি কুদ্দুস-কিন্জান, পিছনদিকে অরিয়ল-গবাক্ষ এবং কোণায় কোণায় অষ্টভুজ মিনার। ‘অরিয়ল-গবাক্ষ’ জিনিসটা কী, একটু ব্যাকস্ক কলা বোধহয় প্রয়োজন। দেওয়াল থেকে কাঁহিরে বেরিয়ে থাকা কোলা বারান্দার মতো অংশের উপর তৈরী করা গবাক্ষকে বলে অরিয়ল-গবাক্ষ। জয়পুরের হাওরাহালের পাশাপাশি জানালা-গুঁজি হয়তো প্রতিপটে ভেসে উঠবে আপনাদের। সে যাই হোক, বৃদ্ধলম্বাপত্যে জামালি-কামালী মসজিদ একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। প্রাসঙ্গ্যে বৃদ্ধের মসজিদ এবং কল্প-গম্বুজের অনেক কিছু উপাদান ও অনুভবনা গ্রহণ করেও এ ইমারৎ নিঃস্বয় সাহসার স্বেচ্ছাশ্রিত।

শেরশাহ শত্রু পুরান-কিন্জা নির্মাণে বৃথা হবার কিছুদিনের মধ্যেই মারা যান। হুমায়ূন ক্ষমতা দখলের পরে এই কিন্জাকে নিষ্ঠ রুচি অনুযায়ী চোঙ্গা সাজান। শেরশাহ-র প্রমোদভক্ষক তিনি গ্রন্থাগারে রূপান্তর করেন। হুমায়ূনের একটি নিঃস্বয় গাইবেরী ছিল-প্রতিদিন অপরাহ্নে তিনি সেখানে গিয়ে কিছু পাঠ করতেন : ধর্মগ্রন্থ, দর্শন কাব্য অথবা পিতৃদেবের অনেক আশঙ্কীবনী। এই গ্রন্থাগার থেকে একদিন সন্ধ্যার বন্ধন তিনি সোপান করে নিষ্ঠ দেয় আসছেন

তখন হঠাৎ শব্দে পেলেন অদ্রবর্তী কিন্জা-ই-খুদাহ মসজিদ মিনারে শাম-ওয়ার্ড মুম্বাঞ্জিনের আজান। ধর্মনিষ্ঠ হুমায়ূন তৎক্ষণাৎ সিঁড়ির উপরেই হাটু গেড়ে নামাজ পড়তে থাকেন। নামাজান্তে উঠে দাঁড়বার সময় তাঁর পা ফসকে যায়। ভূতলে গাড়িয়ে পড়েন হতভাগ্য সুলতান। এই পতনের ফলে তাঁর মৃত্যু হয়। হুমায়ূনের মৃত্যুর নয় বৎসর পরে তাঁর মহিষী হাজী বেগম হুমায়ূনের মক্কারাটি নির্মাণ শব্দ করেন। কিন্তু তার কথা আকবরী জমানাতে, এখানে নয়।

হুমায়ূনের দুর্দশার মূলে তাঁর অহিংসেন্দ্রিয় প্রতি আসক্তি, এবং লঘুচিন্তা ছাড়াও ছিল আর একটি হেতু : তাঁর আত্মজ্ঞানের আশ্রয়ী আদেশ! তিন ভাইকে তিনি কিছুতেই সন্তুষ্ট করতে পারেননি। তাদের প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিবৃত্ত করে ধন-দৌলত-ফৌজ সবই দিয়েছেন, আর তারা বারে বারে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে তন্ত-তাউস দখল করতে চেয়েছে। মজা হচ্ছে এই যে, প্রতিটি ক্ষেত্রে হুমায়ূন বিদ্রোহ দমন করেছেন, ভাইদের বন্দী করেছেন, এবং শেষ পর্যন্ত ক্ষমা করেছেন। আর প্রতিবারই মৃত্ত ভাইয়েরা দূরে সরে গিয়েই হেঁকেছে—‘ও কুমার তোর জনকে নেমেছি!’ এই মারাত্মক খেলার শেষ পরিণতি—যখন ঐ তিন ভাই মৃদল-পাঠান শেষ সংগ্রামে উদাসীন রইল! শেরশাহ-র হাতে পরাজিত হুমায়ূন একটি ভিস্তি-ওয়ালার বদান্যতায় কোনক্রমে গঙ্গা পার হয়ে প্রাণ নিয়ে পালালেন, তাঁর হারেমের সবাই আফগান-দের হাতে বন্দী হল, আর হুমায়ূনের তিন ভাই তিন প্রাদেশিক শাসনকর্তা দূরে দাঁড়িয়ে দেখল! হুমায়ূনের ভাগ্নি গুলবদন বেগমের^০ স্মৃতিচারণ পাঠে তাই মনে হয়—অহিংসেন্দ্রিয় সেবন নয়, প্রমোদপ্রিয়তা নয়, এমন কি সোপানশীর্ষ থেকে অতর্কিত পদম্বলনও নয়, হতভাগ্য হুমায়ূনের ভাগ্যবিড়ম্বনার মূলে তাঁর পিতার সেই শেষ অনুজ্ঞা, আখির-ই-মুবারকী—‘ভাই-দের সব অপরাধ ক্ষমা কর।’

বাবুর-বাদশাহ-র যে সাহিত্যপ্রীতি, প্রকৃতি-প্রেম-কথা, দার্শনিক-কবিসুলভ দৃষ্টি, হুমায়ূনের যে গ্রন্থা-গার-প্রীতি তাই পরবর্তী মৃদল-জমানাতে নানাভাবে শব্দ-প্রশংসা বিস্তার করে নবযুগের সূচনা করেছিল। বাবুরের এক ‘আমীরের’ রচনায় জানতে পারা যায়, ঐ স্বল্পকালের মধ্যেই বাবুর-বাদশাহ তাঁর ‘শাহ-রাং-ই-আব-নক’ (মুখ্যবাস্তুর, পৃষ্ঠ বিভাগ বা চীফ এন্টিনিয়ার পি. ডাব্লু. ডি) নির্দেশ দিয়েছেন দিল্লী ও আশ্রাণে রাজকোষের অর্ধে কিছু মৃত্ত নির্মাণ

করতে। আকবর তো বিদ্যাচর্চার জন্য বিখ্যাত, যদিও তিনি নিজে নাকি ছিলেন নিরক্ষর। তবু তাঁর সহন-শীলতায়, আগ্রহে ও উৎসাহে হিন্দু ও মুসলমান সাহিত্যিকদের প্রভূত বিকাশ ঘটে। আকবরের আমলে রচিত উল্লেখযোগ্য ইতিহাসগ্রন্থ হচ্ছে—মোল্লা দাউদ-এর ‘তারিখ-ই-আল্‌ফি’, আব্দুল-ফজল-এর ‘আইন-ই-আকবরী’ ও ‘আকবরনামাহ’; বারানি, নিজামউদ্দীন আহমেদ, ফৈজীর নানান গ্রন্থ। আকবরের আদেশে ফার্সীভাষায় অনুবাদিত হল মহাভারত : ‘ব্রজ-নামাহ’; বারানি চার বছরের পরিগ্রহে অনুবাদ করলেন রামায়ণের; হাজী ইব্রাহিম অরব বেদ এবং ফৈজী লীলাবতীর গণিতসূত্রগুলি। মোলানা শাহ্ মুহম্মদ শাহাবাদী কাশ্মীর রাজন্যবর্গের ইতিহাস এবং আবদুল রহিম খান, খান-ই-খানান বাবুরের আত্মজীবনীর ফার্সী অনুবাদ করলেন। বিখ্যাতদের ভাষাতেও আকবর ও জাহাঙ্গীরের জমানাতে রচিত হল নানান যুগান্তকারী গ্রন্থ—আগ্রানিবাসী সূরদাসের সূরসাগর, কাশীধামের ভুলসীদাস বিরচিত ‘ব্রাহ্মচারিত মানস’। সূর গোড় মুসকেও জন্ম নিচ্ছিল কৃষ্ণদাস কবিরাজের ‘চৈতন্য-চারিতামৃত’, বন্দাবন দাসের ‘চৈতন্য ভাগবৎ’, জয়ানন্দ এবং ত্রিলোচন দাসের ‘চৈতন্যমঙ্গল’, কাশীরাম দাসের ‘মহাভারত’, মুকুন্দরামের ‘কবিকঙ্কণ চণ্ডী’।

এই সব যুগান্তকারী গ্রন্থ যে যুগল অনুগ্রহে জন্মলাভ করেছে এমন আশাড়ে দাবী কেউ উপস্থাপিত করছে না; কিন্তু বাবুরের চিন্তার প্রসারতা আকবরের পরধর্মসহিষ্ণুতায় রূপান্তরিত না হলে, বিখ্যাতদের প্রতি অত্যাচার বন্ধ না হলে হয়তো সে বাতাবরণই রচিত হত না, যাতে এ-জাতীয় গ্রন্থ রচিত হবার উপযুক্ত ক্ষেত্র খুঁজে পায়।

যুগলযুগে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। পাঠান আমলে হারেমের ভিতর বিদ্যাচর্চার বিশেষ রেওয়াজ ছিল না; বিখ্যাতা কোনো মহিলা লেখকের সম্মান পাওয়াই ছিল দুষ্কর। তুলনায় যুগলযুগে হারেমের ভিতর রীতিমতো পড়াশুনোর চর্চা ছিল। বাবুরের কন্যা গুলবদন বেগমের ‘হুমায়ূন-জীবনীতে’ তার সূচনা, হুমায়ূনের ভাগ্নী-নেমী সালিমা সুলতানাতে তার বিকাশ এবং নূরজাহাঁ, মমতাজমহল, জাহানআরা, জেব-উন্নিহার লেখনীতে তার চরম উৎকর্ষ। এরা আরবী ফার্সী দুটি ভাষাতেই রচনা করেছেন। জেব-উন্নিসা বেগমের গ্রন্থাগারের সঞ্চয় নাকি ছিল বিস্ময়কর। এই যুগল-যুগেই হিন্দুদের ভিতর প্রচলিত নিষ্ঠুর সতীদাহ-প্রথা রদ করার প্রথম প্রচেষ্টা করা হয়। এদিক থেকে

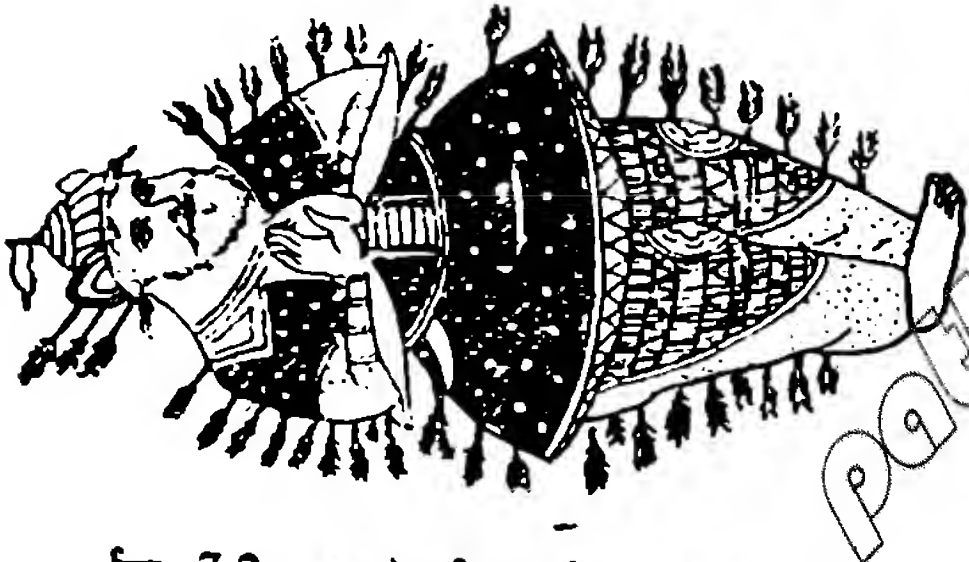
আকবর-বাদশাহ্ রাজ্য কামসাম্রাজ্যের পূর্বসূত্রী।

সম্প্রতি যে যুগলযুগে সার্থকতার যুগলযুগ উন্নীত হয়েছিল এ-কথা গুলীভন ব্রহ্মই জানেন। আব্দুল ফজল লিখেছেন, “আকবর-বাদশাহ্ দরবারে ছাত্রশ্রবণ করত ছিলেন, যারা তার হিন্দুস্থানের শ্রেষ্ঠ সংগীতকেশরী। আর তাঁর স্মরণ ছিলেন, উস্তাদদৌ-কি উস্তাদ গাজী মিল্ল অনসেন—যাঁর মতো সংগীত গত হাজার বছরের ভিতর হিন্দুস্থানে কেউ গায়নি।” সেই সংগীতচর্চা জাহাঙ্গীর ও শাহজাহাঁর জমানার ব্যবসন্তন রূপেই হয়েছিল; শুধু শেষ স্যাক-যুগল আলমগীর নাকি ‘positively discouraged music and placed a ban upon it’ (সম্প্রতি এক-বারে বরদাস্ত করতেন না, এবং তাঁর রাজত্বে গান গওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন)।

তারপর চিত্রাঙ্কন। আব্দুর-বাদশাহ্ ছাঁব ভাস-বাসতেন, তিনি হাঁরাট ও সমরকন্দ থেকে বহু চিত্র এদেশে নিয়ে এসেছিলেন। রোগশস্যার স্মৃতিত হুমায়ূনের যে সুন্দর ছবিখানি আছে, তা নাকি বাবুরের নির্দেশে কোনো পারস্যশিল্পীর আঁকা। হুমায়ূন তাঁর নির্বাসনকালে পারস্যে কলার পর কলি চিত্রাঙ্কন বিষয়ে ঝেঁতে থাকতেন। তখন পারস্যের দরবারে হাজির ছিলেন মীর সৈয়দ আলী, যাকে ক্যা হয় পূর্ব-ঋতুর ব্রাহ্মণের। হুমায়ূন নিজে তাঁর কাছে ছবি আঁকা শিখতেন। শুধু তাই নয়, দিল্লী পুন-বুদ্ধারের পরে তিনি তাঁর শিল্পদ্রু আবদুস-সামাদকে হিন্দুস্থানে নিয়ে আসেন। যে শতৃষ্ণি অক্ষর পরিচয়ের আয়োজনও করে উঠতে পারেন, তাকে এ পুরুর কাছে শিক্ষনবীশ করে দেন। এ শিক্ষা আকবরের পরবর্তী জীবনে প্রচণ্ড প্রভাব ফেলে। কতেপুর-সিঁড়ির বিভিন্ন মহলে আকবর জাগত যুগল আঁকিয়েছেন। এজন্য পারস্যদেশ থেকে অনেক বিখ্যাত চিত্রকরকে তিনি আনিয়েছিলেন। মীর সৈয়দ আলী ও আবদুস-সামাদ ছাড়াও—কসরুদ্-বেগ, কসরৌ কুলী, জামসেদ প্রভৃতি। তাঁরা পারস্যরীতিতে ফ্রেসকো আঁকতেন। আর এদের পারস্যশিল্প আকবর নিয়োগ করেছিলেন হিন্দুস্থানের সেরা চিত্রশিল্পীদের—কসওয়াল, লাল, কেশব, মুকুন্দ, হরিকেশী, দাস-কণ্ড প্রভৃতিদের। এই দুই শিল্পভাবন থেকে জন্ম নিল ঐ মিশ্ররীতি : যুগল পেইন্টিং! বর্তমান অক্ষ-দের, এদের প্রচীর চিত্রগুলি অধিকাংশই অকলুষ। কিছ্, কিছ্, নাকি নষ্ট করেছিলেন যমজ আলমগীর স্বর ‘Under his orders the figures in Akbar’s mausoleum of Sikandra were whitewashed

(তার আদেশে আকবরের সমাধিসৌধের প্রাচীরচিত্র-
গুদালি চুনকাম করে ঢেকে দেওয়া হয়)" অথচ আশ্চর্য!
এই আলমগীরের প্রপিতামহ আকবর বলেছিলেন,
"আমার তো মনে হয়, কোনো চিত্রশিল্পীর পক্ষে
পরমেশ্বরের মহিমা উপলব্ধি করার একটা বিশেষ
সুযোগ আছে। কারণ সে যখন জীবন্ত কোনকিছুর
আঁকে, আর তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি আপ্রাণ চেষ্টায়
নিখুঁতভাবে রূপান্তরিত করেও তাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে
পারে না, তখন সে উপলব্ধি করে, সেই মহান সর্বব্যাপী
সত্তার অস্তিত্ব—একমাত্র যিনি 'জীবনকাঠি'-র অধি-
কারী। এভাবেই শিল্পী পরমজ্ঞানের শেষতীরে
উপনীত হয়।"

সম্রাট আকবর মীর সৈয়দ আলীকে দিয়ে বহু ছবি
আঁকিয়ে, স্বাদশখণ্ডে আমীর হামজার জীবনী রচনা
করান। এই গ্রন্থের নাম 'হামজানাма'। এ-ছাড়া
চৌপদসনামা, জায়ফরনামা, আকবরনামা, মহাভারত,



চিত্র-7.2 মৃগল-শৈলীতে ভীষ্মের শরণশয়া।

নল-দময়ন্তী কথা, প্রভৃতি বহু গ্রন্থে বিখ্যাত চিত্রকর-
দের দিয়ে ছবি আঁকান। মৃগল-স্টাইলে আঁকা এই-
সব চিত্রে "সেকালের যুদ্ধের উপকরণ, যুদ্ধাস্ত্র, কামান-
কাহী উট, গরুর গাড়ী, হাতী, ঘোড়া, বাদশাহী শিবিরের
সাজসজ্জা, দুর্গের ভিতরের ও বাহিরের চিত্র, সৈন্য,
শিবির-স্বর্বাঙ্গিণী যুদ্ধের বীভৎসতা অতি নিপুণ-
ভাবে আমাদের কাছে উপস্থিত করা হয়েছে। কী
অমানুষিক ঐর্ষ্য নিয়ে তারা পাহাড়ের প্রতিটি পাথর,
গাছের প্রতিটি পাতা, দুর্গের ভিতরে উল্কাশিখর
মহাসাগর এঁকেছেন তা স্মিথে বৃষ্টিবার নয়। কিন্তু
ছবিগুলিতে পরিপ্রেক্ষিতের অভাব সকলেরই নজরে
পড়ে। যিনি ছবির সামনের দিকে দাঁড়িয়ে আছেন
এবং যারা বহুদূরে দুর্গের মাঝে নিহতকক্ষে বসে
মণ্ডলা করছেন তাঁদের সকলকেই আঁকা হয়েছে সমান
মাপে।"^{১০}

এই প্রসঙ্গে সম্রাট পশ্চিমখণ্ডে পরিপ্রেক্ষিতের

সুত্রগুলি যিনি আবিষ্কার করেন সেই ফিলিপ্পো
(Filippo Brunelleschi) মৃত্যু হয়েছে আকবরের
জন্মের বিরানন্দই বছর পূর্বে এবং ফিলিপ্পো সূত্র-
গুলি যিনি নিখুঁতভাবে লিপিবদ্ধ করেন সেই লেঅ-
নার্দো-দা-ভিঞ্চির মৃত্যু হয়েছে আকবরের জন্মের তেইশ
বছর পূর্বে। অর্থাৎ আকবরের সমসময়ে যুরোপীয়
রেনেসাঁ শিল্পীরা নিখুঁত পরিপ্রেক্ষিতে ছবি আঁকতেন।
মৃগলযুগের চিত্রশিল্পে তার প্রভাব দেখতে পাই না,
যদিও পারস্য, সিরিয়ার পথে যুরোপের সঙ্গে বাণিজ্য
তখন অব্যাহত ছিল। অপরপক্ষে, মৃগল-শৈলীতে হিন্দু
ও পারসিক চিন্তা-ভাবনা সুন্দরভাবে মিশে গেছে। যেমন
উল্লেখ করা চলে, 'হামজানাмаয়' 'ভীষ্মের শরণশয়া' চিত্র-
খানি। এখানে পিতামহ ভীষ্মকে দেখলে মনে হয়
তিনি বৃষ্টি এক মৃগল সেনাপতি। তাঁর পোষাক পরি-
চ্ছদ, বর্ম-শিরস্ত্রাণ সবই মৃগলযুগের।

বাদশাহদের ছবি আঁকাও এক বাদশাহী বিড়ম্বনা
ছিল। বাদশাহ দরবারে বসলে, শিল্পীকে দরবারের
কায়দাকানুন মেনে বহু দূরে বসে ছবি আঁকতে হত।
পোট্রেট আঁকতে হলে যেভাবে 'সিটিং' দিতে হয়, তা
বাদশাহীরা কখনই দিতেন না। স্পেনের রাজা ফিলিপ
যেভাবে শিল্পী ভেলাস্কেজকে (Velasquez. D)
অথবা ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম হেনরী যেভাবে শিল্পী
হলবেনকে (Holbein. H) সিটিং দিয়েছেন, সেভাবে
কোনও গ্র্যান্ড-মৃগল নিজ প্রতিকৃতি আঁকাননি। তা
সত্ত্বেও আমরা অবদ্য সব পোট্রেট পেয়েছি—বাবুর
থেকে আলমগীর, প্রত্যেকের। তার চেয়েও অবা-করা
খবর বেগম-সাহেবাদের আবক্ষ চিত্রগুলি। অধিকাংশ
ক্ষেত্রে দর্পণে ক্ষণকালের জন্য প্রতিবিম্ব দেখার সুযোগ
শিল্পীকে দেওয়া হত। তাই সন্দেহ হয়—মমতাজ,
নূরজাহাঁ, জাহানারা বা জেব-উন্-নিসার যে-সব মিনিয়-
চার দেখতে পাই তার সঙ্গে ঐ-সব বাস্তব মহিলাদের
কতদূর সাদৃশ্য আছে। হয়তো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই
শিল্পী নিজ কল্পনায় সৌন্দর্য আরোপ করেছেন।
সম্ভবতঃ একমাত্র ব্যতিক্রম সাম্রাজ্ঞী নূরজাহাঁ, কারণ
তিনি মাঝে মাঝে প্রকাশ্য দরবারে উপস্থিত হতেন।

জাহাঙ্গীর ছিলেন চিত্রশিল্প বিষয়ে এক 'কনো-
শার'—পরম সমঝদার—দিদাবর! তিনি পারস্য থেকে
তাঁর আমলের শ্রেষ্ঠ চিত্রকরদের সসম্মানে ভারত
ভূখণ্ডে নিয়ে আসেন : হীরাতের আগা রেজা ও তাঁর
পুত্র আবদুল হাসান, সমরকন্দের মুহম্মদ নাজীর ও
মুরাদ এবং উস্তাদ মনশূর। ওদের সমসাময়িক হিন্দু
চিত্রশিল্পীরা হচ্ছেন : বিশেন দাস, মনোহর, গোবর্ধন
প্রভৃতি। এঁরা অধিকাংশই হস্তদস্তের উপর মিনিয়-

চার কাজ করেছেন। প্রতিকৃতি চিত্র, প্রাকৃতিক দৃশ্য, হাতী, ঘোড়া, উট ও হরিণ এবং নানান জাতের পাখী। পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী বলছেন, মৃগল-শৈলীর চিত্রে “পাখী-গর্জিলের আকৃতি ও তাদের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে প্রতিটি পালকের সূক্ষ্মতম অংশগর্জিলও আঁকা হয়েছে নিখুঁত-ভাবে, কিন্তু তাতে পাখীর দেহের নরম তুলতুলে ভাবটির হানি হয়নি মোটেও।”^{১১}

জাহাঙ্গীরের সময়ে স্যার টমাস রো এদেশে আসেন। সম্রাট চিত্রশিল্পের বিষয়ে উৎসাহী জেনে কিছু কিছু ভালো জাতের পাশ্চাত্যচিত্র তাঁকে উপহার দেন। সম্ভবত এই সূত্রেই ভারতীয় চিত্রকরেরা নিখুঁত পরিপ্রেক্ষিতের হিসাবটি ধরতে পারলেন, কারণ পরবর্তী মৃগল-চিত্রে পরিপ্রেক্ষিতের চূড়ান্ত অনেক কম নজরে পড়ে।

অপরপক্ষে, এই যুগ থেকে পশ্চিমখন্ডও ভারতীয়, বিশেষ করে মৃগল শৈলীর সঙ্গে পরিচিত হয়। নানা দেশের বণিকের মাধ্যমে মৃগল-চিত্রকলা তদানীন্তন সভ্যপৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। জাহাঙ্গীর ও শাহজাহাঁর সমসাময়িক বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী ‘রেমব্রান্ট’ মৃগল-চিত্রের একজন বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। লন্ডন ও ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রেমব্রান্টের যে ছবিগর্জিল আছে তার অনেকগর্জিলেই মৃগল-শৈলীর প্রভাব পড়েছে। এমন-কি তিনি আকবরের একটি ছবিও আঁকেন—সেটি বর্তমানে বার্লিন মিউজিয়ামে আছে। পরবর্তীকালের অস্ট্রিয়ার রানী মারিয়া থেরেসার চিত্র-সংগ্রহে অন্তত দুইশতখানি মৃগল মিনিয়েচার ছিল।

স্থাপত্যও যেমন চিত্রশিল্পেও তেমন—শাহজাহাঁর যুগে সূর্য পশ্চিমে ঢলেছে। শিল্পী পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর ভাষায়—“সম্রাট শাহজাহান স্থাপত্য-শিল্প স্রষ্টা হিসাবে পৃথিবীময় খ্যাতির অধিকারী; সেজন্যই বোধহয় চিত্র-শিল্পের উপর তেমন নজর দিতে না পারায় মোগল চিত্র-কলা তাঁর সময় থেকেই প্রাণময়তা হারাতে থাকে। আকবরের সময়ে চিত্রের যে সজীবতা ছিল, ধীরে ধীরে তা নষ্ট হতে থাকে। শাহজাহান খুবই জাঁকজমক পছন্দ

করতেন, এজন্য তাঁর সময়ের ছবিগর্জিলেও একটা জাঁকজমকের ভাব সর্বত্র বর্তমান। ছবিতে সোনাগী রঙের এত ছড়ানো দেখা যায় যে, ছবির ছাব্বি ঘুচে গিয়ে শুধুমাত্র কারুকার্যই সার হয়ে ওঠে।”^{১২}

এই বংশানুক্রমিক ঐতিহ্যে বর্ণনাকাপাত ঘটল শেষ গ্র্যান্ড-মৃগল আলমগীরের জমানার। তাঁর যে করাটি প্রতিকৃতি পাওয়া যায় তার অধিকাংশই সম্রাটকে না জানিয়ে আঁকা! অথচ এই আলমগীরই নাকি—জানি, আপনাদের বিশ্বাস করা কঠিন হবে—একজন চিত্রকরকে নিয়োগ করেছিলেন কারাগারে বন্দী শাহজাদা মুহম্মদের চিত্র প্রতি মাসে একে এনে বাদশাহকে দেখাতে। সম্রাট স্বয়ং কারাগার পরিদর্শনে আনতুলত, অথচ কোতূহলী মানুষ্টা জানতে চায়—তার কিত্তোহী পুত্র কেমন করে ক্ষান্ত হচ্ছে কারাকঙ্কের নিভূতে ভিল তিল করে।

আলমগীরের পরবর্তী মৃগল বাদশাহের দল ইতিহাসকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে চলেছে আরও দেড়শ বছর—ক্রমাগত দ্রাবিড়ত্যা, পিতৃহত্যা, স্বজনহত্যা, ষড়যন্ত্র আর বিলাসের স্রোতে। স্যার যদুনাথের অনুসরণে সেই ‘লেটার মৃগলস্’-দের বিষয়ে আলোচনার কোনো অবকাশ এখানে নেই। এমন কি শেষ গ্র্যান্ড-মৃগলও এ আলোচনায় উপেক্ষিত হবার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। তাই মৃগলযুগের ইতিহাসে ঔরঙ্গজীব বিশিষ্টস্থান অধিকার করলেও—ভৌগোলিক বিচায়ে আলমগীরের সাম্রাজ্যসীমা স্ফীতদের কেন্দ্রের মতো বিস্তারোন্মুখ বিস্তার লাভ করা সত্ত্বেও এ-গ্রন্থে ঔরঙ্গজীব উপেক্ষিত।

ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যের নিরিখে মহিউদ্দীন মহম্মদ ঔরঙ্গজীব আলমগীর হচ্ছেন গালিবের ভাষায় :

চিরাগ-এ মদহ হুঁ মৈ বেজবান্ গোর-এ গুরীবা-কা।*

□

* নৈঃশব্দ-ঘেরা গোরস্থানে আমি এক নিভে যাওয়া উপেক্ষিত প্রতীক।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ইব্রাহিম

উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা

সময়কাল (খ্রিঃ)

ফরিদের জন্ম	1472
বিমাতার অত্যাচারে গৃহত্যাগ	1514
বাহর খাঁ লোহানী কর্তৃক শের খাঁ খেতাব	1522
লাদ-মালিককে বিবাহ ও চুনার দুর্গপাড	1530
পিতার জন্য মক্কারা নির্মাণ (সাসারাম)	1535
নিজের জন্য মক্কারা নির্মাণ (সাসারাম)	1536-38
শের খাঁ কর্তৃক বন্দীবিজয়	1536
বন্নার যুদ্ধে হুমায়ুন পরাজিত ; শের দিল্লীশ্বর	1539
গ্র্যান্ড-ট্রান্স-রোড, পুরানা কিল্লা নির্মাণ	1539-44
কলিঙ্গর-দুর্গে দুর্ঘটনার নিহত	1545

সামনেই খাইবার গিরিক্ষেত্র উপলব্ধির বিসর্পিত
বিপদসঙ্কুল পথ। এ-পথে দলে ভারী হয়ে যাতায়াত
করাই বাঞ্ছনীয়। তাই সরাইখানার ও-প্রান্তে ঐ যে প্রোট
লোকটা বসে আগুন পোহাচ্ছে তার সঙ্গে যেচে আলাপ
করল ইব্রাহিম, আপনিও হিন্দুস্থানে চলেছেন নাকি ?

লোকটা উঠে দাঁড়ায়। মাজা বড়কিয়ে সালাম
করে বলে, জী হাঁ, মেহেরবান। এ সড়ক বহুৎ খতর-
নাখ্ হুজুর ; আপনি যদি এংরাজ না হন, তাহলে
কাল সকালে আমরা এককাটা বাটা করব।

সেটাই ইব্রাহিমের মনোগত বাসনা। মূখে স্বীকার
করল না যদিও। বরং জিজ্ঞাসা করল, হিন্দুস্থানে
খ্রিস্টদার রাহ্ জান-পহ্চান কেউ আছে ? না-হুস
সুলতানী ফৌজে নোকারি মেলা মৃগ্গকিল-কি-বাং।

লোকটা হেসে কস্গে, না হুজুর, বাল্-কি বাপ-
দাদা আমাকে সমসের ঘোরাতে শেখায়নি, আমার
হাঠিরার শ্রফ্ ছেনি-হাতুড়ি।

ওহ্ ! রাজমিস্ত্রি ! ইব্রাহিম আপসে একদাপ
নেমে আসে—‘আপ্’-সে ‘তুম্’-এ। জানতে চায়, তোমার
সঙ্গে ওটি কে ? কেটা ?

লোকটা তার পার্শ্ববর্তী সতের বছরের জোয়ান
ছাওয়ালের পাঞ্জেরে বেয়কা একটা খোঁচা মেয়ে বলে,
সেলাম কর ! বে-জকুফ্ !

ছেলেটা উবু হয়ে বসে আগুন পোহাচ্ছিল।
আফ্গানিস্থানের হাড়-কাঁপানো জাড়া। বাপজানের
দিকে একনজর হিরণ-দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে দেখে।
অজানা-অচেনা ইনসানটোকে খাম্কা সেলাম করতে
হবে কেন সেটা ঠাহর হয় না। বে-তরিবৎও হয় না
তা বলে। দায়সারা একটা সেলাম ঠুকে গৌজ হয়ে বসে
থাকে।

ইব্রাহিম ওর কাঁচ দেওদার চারার মতো ঝড়ু মজবুৎ
দেহটা একনজরে দেখে নিয়ে জানতে চায়, তুমিও বড়ি
রাজমিস্ত্রি ?

বাপই জবাব দেয় তার হয়ে, জী হাঁ, খোদাব-দ্।
এই বয়সেই ওর দারুণ এলেম।

—তাই নাকি ? কী নাম হে তোমার ? —ছেলে-
টাকেই প্রশ্ন করে ইব্রাহিম।

—আলিওয়াল খান।

—মক্কারা বানাতে জান ? —ইব্রাহিমের অহৈতুকী
কৌতুহল।

কি-জানি কেন হঠাৎ অপমানিত বোধ করল
ছেলেটা। প্রাণপ্রশ্ন করে বসে, কেন ? বানাবেন ? এই
খাইবার-এ ?

ইব্রাহিম রাগ করল না। হেসে বলল, হ্যাঁ। এখন
নয়, খাইবারেও নয়, বেশ কয়েক বছর পরে। আমার

নাম ইব্রাহিম শূরী, আমি সেরাখেন্ কুন্সিয়ার আফ-
গান—এ আমার ছেলে মিঞা হাসান শূরী। মনে
থাকবে? আমিও ঐ আজীব-দেশ হিন্দুস্থানে চলেছি
তগ্দিরের খেন্ দেখতে, যেমন তোমার বাপজান চলেছে
তোমাকে নিয়ে। যদি কোনদিন শুনতে পাও আমি
জায়গীরদার বা তার চেয়ে বড় কিছ্ হয়েছি, তখন
আমার সঙ্গে মূল্যাকাং করবে, কেমন? দেখব, তুমি
কেমন মক্‌বারা বানাতে শিখেছ।

আলিওয়াল এবার যে সেলামটা করল সেটা
অকৃত্রিম। বললে, যাদ্ থাকবে খোদাবন্দ।

তারপর বহু জল বহে গেছে সিঁধু দিয়ে। এবং
যমুনা দিয়ে। আলিওয়ালের আত্মজ্ঞান ঐতিহাসিক
দিল্লী নগরীতে উপনীত হয়ে আদৌ কোনো ইমারৎ
বানিয়েছিল কিনা ইতিহাস সে-কথা লিখে রাখতে
ভুলেছে—সেটা ইতিহাসের খাতও নয়—ঐ আলিওয়াল-
দের কান্ড-কারখানা স্মরণে রাখা। কিন্তু ইব্রাহিম
জায়গীরদার হয়েছিল। তার কবরের উপর অবশ্য
মক্‌বারা বানানো হয়নি। তার সেদিনকার সেই নাবা-
লক পুত্র মিঞা হাসানও উত্তরাধিকার সূত্রে জায়গীর-
দার হয়েছে—বিহারে; সাহাবাদ পরগণায়, সাসারামে।
এখন মিঞা হাসান নিজেই প্রৌড়। তার তিন বেগম,
কনিষ্ঠাটি অবশ্য ক্রীতদাসী। তার গর্ভে জন্মগ্রহণ
করেছে দু'টি পুত্র : সুলেমান ও নিজাম। এবং বড়ি-
বেগমের পুত্র এ পরিচ্ছেদের নায়ক : ফরিদ। জন্ম :
1472 খ্রীষ্টাব্দ।

ফরিদের জীবনের সঙ্গে বেশ কিছুটা মিল আছে
বাবুর-বাদশাহ্-র। দুজনেই নিতান্ত বাউন্ডুলের বেশে
রংগমণ্ডে আবির্ভূত হয়েছিলেন 'ইনসানিয়াৎ' নাটকের
প্রথম দৃশ্যে এবং শূদ্‌মাত্র নিজ হিম্মতের পিঠে সওয়ার
হয়ে পশুমাষকের শেষদৃশ্যে দেখা গেল নায়ক তামাম্
হিন্দুস্থানের তক্ত-ই-সুলেমানে আসীন! বাবুরের
জীব-এ তবু একজোড়া অচল আখুঁতি ছিল—তার
খানদানী বংশ পরিচয়, পিতৃকুলে তৈমুর ও মাতৃকুলে
চেরিংস্—ফরিদের তাও ছিল না। বিলকুল নাপা
ফকির! বরং বলব, ফরিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সাদৃশ্য
পরবর্তী জমানার মহারাজ্য কুলতিলক শিবাজীর।
দু-জনেই বাল্যে, কৈশোরে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন মায়ের
কাছে—যে মা তাদের বাপের কাছে উপেক্ষিত। অব-
হেলিতা, প্রায়-পরিভ্রান্ত!

ফরিদের মায়ের অপরাধটা অবশ্য গুরুতর : তার
যৌবন চলে গেছে। সাসারামের জায়গীরদার তার
প্রধানা বেগম সন্নিফার* পরিবর্তে যৌবনবতী দাসীপত্নী
কানিজার আঁচলধরা। বড়ুতাসা-জওয়ানী-জরু!

সংসারে নিত্য ঠিগ দিন ঝাট-ঝামেলা লেগেই
আছে। জায়গীরদারের দৌলতখানার একান্তে এক
অন্ধ কুটুন্নিয়ত দিন গুজরান করে ফরিদ-জননী বড়ি-
বেগম; আর পাঁচ-বাঁদী-পরিবর্তা যৌবনবতী কানিজার
বিস্বাস-বাসনের আদি-অন্ত নেই। শেষমেশ মনের ক্ষেদে
ফরিদ একদিন গৃহত্যাগ করল। হাসান পুত্রকে ছেড়ে
বললে, সেই যাচ্ছই যখন, তখন তোমার ঐ আত্মজ্ঞান-
টাকেও সঙ্গে নিয়ে যাও না বাপু!

অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি বাপের মূখের উপর ফেলে উনিশ
বছরের ছাওয়াল বললে, তাই যাব। ঠিক মাথা গুঁজবার
মতো একটা গরীবখানার এন্তেজাম করতে পারলেই
এ দোজখ্ থেকে আত্মজ্ঞানকে উঠিয়ে নিয়ে যাব।

শুনে হাসান ভুঁড়ি-দুলিয়ে হাসল। ব্যাপ্তরে যে
ফারসী বয়েংটা ঝড়ল তার বিশুদ্ধ কঙ্গানুবাদ :
'থাকল পরান সয়ে/ভান্দরমাসে ভাত দেব তোর কিল্লের
ঝোল দিয়ে।'

ফরিদ নিরঙ্কর ছিল না জালালউদ্দীন আকবরের
মতো। আরবী জানতো, ফারসীতে তো সে আলিম।
গুলিস্তা, বৃস্তা এবং সিকান্দার-নামাহ্ তার আদ্যন্ত
কণ্ঠস্থ। তবু প্রথম কিছুদিন তাকে রীতিমতো
মাথা খুঁড়ে মরতে হয়েছে রোজগারের ধান্দায়। কান্নিক
শ্রম করেছে, মাটি কুপিয়েছে, এমন কি মাঝে কিছুদিন
দস্যবৃত্তি। শেষ পর্বন্ত বিহারের সুলতান বাহার
খাঁ লোহানীর কিল্লায় নোক্‌রি জুটল। বাহার খাঁ
তার নাবালক পুত্র জালাল খাঁর জন্য ওকে 'আতালিখ্'
নিযুক্ত করলেন। এই গৃহশিক্ষকতার কালেই ফরিদকে
একবার একটি 'নাহর' আক্রমণ করে এবং ফরিদ তলো-
য়ারের এক কোপে ব্যাঘ্রপ্রবর্তিকে বধ করেন। বিহার
অধিপতি লোহানী তার পুত্রের গৃহশিক্ষককে ঐ
খেতাবটি দিয়েছিলেন : শের খান্।

কিন্তু বেশিদিন এ নোক্‌রি শের খাঁর কিস্মতে
বরদাস্ত্ হল না। কে কান-ভাঙানি দিল এ-নিরে
ঐতিহাসিকেরা একমত নন—হাসানও হতে পারে।
মোটকথা, নোক্‌রিতে ইস্তাফা দিয়ে শের খাঁ আবার
নামজ পড়ে। এই সময় সে কিছুদিন বাবুর-বাদশাহ্-র
ফৌজের চাকরি করে।

এর পরেই আশ্‌মান ফুড়ে কিস্মতী-হুরী নেমে
এল শেরের হাতে ধরা দিতে। কাশীর কাছে চুনার
কিল্লার অধিপতি তাজ খাঁকে তারই বৃকপুত্র ইত্য

* ইতিহাস হাড্ডে ফরিদের গড়'ধারিণীর নাম খুঁজে পাইনি।
কাহিনীর খাতেরে 'সন্নিফা' ও 'কানিজা' নাম দু'টি চান
করেছি। 'সন্নিফা' মানে সংসংলগ্নতা, 'কানিজা' তার বিপরী-
তার্থবোধক।

করে বসল। সদাশিব বা লাদ-মালিকা তার এক বিশ্বস্ত অনুচরকে পাঠিয়ে দিল শের খাঁর কাছে সপত্নীপুত্রের হাত থেকে তাকে রক্ষা করার আর্জি সমেত। শের সৈন্য চুনারে উপস্থিত হয়ে উদ্ধার করলেন লাদ-মালিকাকে। কৃতজ্ঞ মেয়েটি উদ্ধারকারীর হাতে কিল্লাসমেত তুলে দিলেন কিল্লাদারগণকে!

নিকা সেয়ে মধুবাঈনী-অন্তে শের ফিরে এসে আসারামে। এতদিনে মায়ের জন্য সে একটা মাথা গোঁজার আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে পেরেছে। আসারামের সেই শ্রুগ জায়গীরদারের চোখে-চোখে-রেখে সমান মেকদারে বাঁচিৎ করার হুকুম হইয়েছে চুনার কিল্লাদার কিল্লাদার।

পত্রকে দেখে তাম্জব বনে গেল আসারামের জায়গীরদার মিঞা হাসান। বললে, কা-বাং? এ্যাঈন্দিন পরে কী মনে করে?

ফরিদ চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। এ দরবার কক্ষের প্রতিটি প্রস্তরখন্ড তার বাণ্যাম্বুতি বিজরিত। আশ্বাজান রীতিমতো বড়ডা বনে গেছেন এই ক-বছরে। মেজাজ কিন্তু ঠিক সেই রকমই বেসরিক। ফরিদ বললে, আশ্বাজানকে নিয়ে যেতে এসেছি; তাঁকে ডেকে দিন।

ছিলে-খোলা ধনুকের মতো হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে পড়ে হাসান। বললে, আশ্বা! তোর আশ্বা! তাকে এ্যাঈন্দিনে মনে পড়েছে বদ্বি? নিরে মারি? আর!

এগিয়ে এসে খপ্প করে চেপে ধরল জোয়ান ছেলের হাত। হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেল অন্দরে—হাক্কেমের দিকে। সিঁড়ির নিচে সেই অতি পরিচিত মায়ের অশ্বকুটুর্কিতে নয় কিন্তু—হারামসারার একান্তে এনে একটা শিউলি গাছের দিকে তর্জনী তুলে বললে, ঐ তোর আশ্বাজান! যা, নিয়ে যা এবার!

এতক্ষণে নজর হল—শিউলি গাছটার নিচে একটা চৌকো পাথর। তার উপর একরাশ শিউলিফুল করে পড়েছে।

অন্তরের অন্তঃস্থলে তার-সানাইয়ের একটা কক্ষার! সাহিরে তার কোনো বহিঃপ্রকাশ হল না কিন্তু। দাঁত দিয়ে নিচেকার ঠোঁটটা কামড়ে বজ্র-হাতের মতো দাঁড়িয়ে রইল ফরিদ। এতক্ষণ অন্তঃ-পদ্রিকার দল ভীড় করে এসেছে রঙ্গ দেখতে। ওড়নার ফাঁক দিয়ে দেখছে ওদের বাপ-বেটাকে। ওদের অনেককেই ফরিদ চেনে না—সে গৃহত্যাগ করার পরে ওরা এ-হাক্কেমের নয়া-আমদানী। বৃদ্ধ হাসানের নয়া-পুড়িয়া! তা সে-সব দিকে ফরিদের নজরই পড়ল

না...সে শব্দ তাম্জব বনে ভাবছিল : কী বে-সরম কী বাং! জায়গীরদারের বড়ি-বেগমের কবরের উপর একটা আচ্ছাদনও দেওয়া যায়নি! রোদে জলে সমানে পুড়ছে, ভিজছে...

—কই? উঠিয়ে নিয়ে যা! —বাংগ করলে বাপ।

ছেলে মূখ তুলে তাকালো। বাপের চোখে-চোখে রেখে একই কথার পুনরাবৃত্তি করল : তাই যাব! ঠুর মাথা গুঁজবার মতো একটা মক্‌বারা বানিয়ে এ দোজখ থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাব।

এরপর রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে ফরিদ আকণ্ঠ নিম্নমুখ হয়ে পড়ে। তিল তিল করে সে সঞ্চয় করতে থাকে ক্ষমতা ও ধনসম্পদ। মায়ের জন্য মক্‌বারা বানানোর কথা যে তার মনে ছিল না তা নয়, কিন্তু সময় ও সুযোগ হয়নি। সেটা হয়ে গেল নিতান্ত ঘটনাচক্রে। একজন সুবাদবহ চুনার কিল্লাদার একদিন শের খাঁকে শুনিয়ে গেল এক বিচিত্র কিস্সা—আসারামের জায়গীরদারের দরবারের একটি ঘটনা :

একদিন মিঞা হাসানের দরবারে এক বৃদ্ধ আফগান এসে হাজির। এক মাথা সফেদ চুল, এক বুক সফেদ দাড়ি। জায়গীরদারের মীর-মুনশী তাকে হুকুমেরে সামিল করে বললে, ইনিই আসারামের জায়গীরদার : তোমার আর্জি হুকুমেরে পেশ কর, ভয় নেই।

লোকটা আত্মমি নত হয়ে এক খান্দানী সালাম ঝাড়ল। বিনয়ে বিগলিত হয়ে বললে, আদাব অর্জ, মেহেরবান! আমার একটি প্রশ্ন আছে খোদাবন্দ!

হাসান মোঁচে চাড়া দিয়ে বললে, বেশক! অভয় দিলাম। পেশ কর তোমার প্রশ্ন?

—সে আজ প্রায় দ-কুড়ি বছর আগেকার কথা। আপনি, হুকুমের, তখন আপনার আশ্বাজান—তাঁর শও সাল বেহেস্ত-বাস মঞ্জুর হোক—ইব্রাহিম মিঞার হাত ধরে আফগান রাজ্য থেকে হিন্দুস্থানে আসছিলেন। খাইবার পাস যেদিন আপনারা অতিক্রম করেন, তার পূর্বদিনের শাম-ওয়ন্ত-এর কথা আপনার ম্যাদ হয় গরীবপরবর?

হাসান তাম্জব। বৃদ্ধকে একবার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললে, কেন বলতো হে?

—সেদিন আপনার সরিফ আশ্বাজান—তাঁর হাজার বরিষ বেহেস্ত-বাস মঞ্জুর হোক—এই বান্দাকে ফরমায়েশ করেছিলেন, হুকুমজারী করেছিলেন—তিনি যদি কোনোদিন হিন্দুস্থানে জায়গীরদার হতে পারেন, তাহলে আমি তাঁর দরবারে এস্তালা দেব। তিনি আমাকে দিয়ে তাঁর মক্‌বারা বানাবেন। আপ-

নার টেংরির গদা, বাগদা-কী-বাগদা এ নফরের নাম, আলিওয়াল খান।

হাসান দীর্ঘসময় নিম্নলিখিত নেচে তার কণ্ঠকূহরে একটি পাখির পালক প্রবিষ্ট করাতে ব্যাপ্ত রইল। আলিওয়াল ধৈর্য হারালো না—দু-কুড়ি বছরের তুলনায় হাসানের নীরবতা দীর্ঘস্থায়ী নয়, সে অপেক্ষা করল। অবশেষে সোজা হয়ে বসে হাসান বলল, আমার আশ্বাজান কোথায় ফোঁত হয়েছেন তা আমি জানি না। আর তা-ছাড়া আমার অত পরস্যাও নেই যে, মথ করে তাঁর জন্য মক্কারা বানাবো। তুমি এখন আসতে পার।

এবার লোকটাই দীর্ঘসময় একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল হাসানের দিকে। বেচারী বোধকরি অনেক আশা নিয়ে দিল্লী থেকে এতটা পথ হাঁটিতে হাঁটিতে এসেছে। তাই হঠাৎ একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসল : মাফ করবেন, আপনি পাঠান তো?

সরল প্রশ্ন। হয়তো সরল নয়। কিন্তু সেজন্য সাসারামের জায়গীরদারের দরবারে তার যে শাস্তির বিধান হয়েছিল, সেটাও লঘুপাপে গুরুদণ্ড!

—এই কিস্‌সাই চুনার দুর্গে এসে সবিম্বতাবে শোনালো সংবাদবহ, হাসান পদতকে। কথাটা শুনে ল্যাফিয়ে উঠল শের। বললে, উস্তাদ আলিওয়াল খান? সেই যে রাজমিস্ত্রি দিল্লীর নিজামউদ্দীন আউলিয়া চক্রে—

হ্যাঁ, সেই লোকই বটে। তখনই পাইক ছুটল লোকটাকে পাকড়াও করতে। চুনার থেকে সাসারাম অশ্বারোহীর কাছে একদিনের পথ। পাইককে বলা হয়েছিল মিস্ত্রিকে ধরে আনতে, সে বেঁধে নিয়ে এল বৃন্দ রাজমিস্ত্রিকে। নিজের বুদ্ধিমতো! শের খাঁর আশ্বাজানকে কমবস্ত্রটা জিজ্ঞাসা করেছে, তিনি পাঠান কিনা! এবার জেনে যাক তার জবাব!

এল মানুষটা। বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে। শের খাঁকে কুর্নিশ করে বললে, হুজুর তলব করেছেন?

কিল্লাদার আসন ত্যাগ করে এগিয়ে এল। বৃন্দে বসে থাকা হাতদুটি ধরে বললে, তুমিই উস্তাদ আলিওয়াল খান? হজরৎ নিজামউদ্দীন আউলিয়ার দরগায়—

লোকটা আবার আঁতুনি নত হয়ে আদাব জানালো। বললে, হুজুর তাহলে দেখেছেন আমার হাতের কাজ?

—না উস্তাদ, দেখিনি। এ জিন্দেগীতে আমি কখনও দিল্লী যাইনি। বাবার ইচ্ছে আছে। গেলে, তোমার হাতের কাজ নিশ্চয়ই খুঁটিয়ে দেখব। কিন্তু তোমার নাম আমি শুনেছি। আমার বড়-আশ্বা

তোমাকে যে ফরমায়েশ করেছিলেন সেই কাজটা মূল-ত্বাব আছে। সেদিন, মূল-নিজ-কি-বাং এই যে, তিনি যে নিজেকে কোথায় কুরবানি করেছেন ও আমর কেউ জানি না। বল-কি, আমার আশ্বাজান কোথায় শূন্যে আছেন তা আমি জানি। তুমি আমার মনের জন্যে একটা উপযুক্ত মক্কারা বানিয়ে দেবে? এ সাসারামেই? তৎকার জন্য পরোয়া নেই।

তৃতীয়বার কুর্নিশ করে আলিওয়াল সৎকপে শূন্য বললে, বে-ফিকর রাহিরে জনাব!

আলিওয়াল শূন্য করল শের খাঁর মনের মক্কারা। শের তখন ছুটেছে সোড় জয় করতে। তালিয়ারগাড়ির (আধুনিক সাহেবসজ্জা) প্রচলিত পথে নয়; শের জানে—সে-পথে শত্রুপক্ষ ওর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত। বরং এক ঘুর পথে। সেই অতর্কিত আক্রমণে বিব্রত হয়ে গেল গোড়াধিপতি মাহমুদশাহ-র বাহিনী। বহু উপটোকন দিয়ে মাহমুদ শেরের বশ্যতা স্বীকার করে নিল।

গোড়-বিজয় ফতে করে বহু ধন-দৌলত হাতীর পিঠে চাপিয়ে শের সগৌরবে ফিরে এল সাসারামে। এসে সংবাদ পেল, ইতোমধ্যে আলিওয়াল সমান্ত করেছে তার মনের মক্কারা। এ সৎকপ পেল আর একটি দুঃসংবাদ—সাসারামের জায়গীরদার, মিস্ত্রি হাসান, নাকি এ-কয়মাস ক্রমাগত তড়পাচ্ছে—দেখব সে চুহাকা-বাচ্চা কত বড় শের খাঁ! আমার কিল্লার ভিতর থেকে আমার বিকির কফিন সে উঠিয়ে নিয়ে যাবে! জান্ থাকতে নয়!

দুঃসংবাদে বে-দিল হল না শের। বললে—হাসান-হুসেনের সে লড়াই-কাজিয়ার কথা পরে হবে। আপাতত চল আলিওয়াল—দেখি, তুমি কেমন মক্কারা বানিয়েছ।

দেখে মুগ্ধ হল শের। লোদী-সৈয়দী শৈলীতে বানানো অষ্টভুজাকৃতি ইমারৎ। অপূর্ব গুপ্তদেহ হাতে এলমদারী কাজ। বললে, একটা কথা আলি-ওয়াল, ছদ্মকায় একটু বেশি বড় হয়ে গেছে না?

সফেদ দাঁড়িতে হাত বুলায়ে বৃন্দ স্বপত্তি বললে, জী হাঁ হুজুর। বে-হুসিয়ারী পলং নয়, ওটা ইচ্ছে করেই বড় করেছি। বৈশ্ব-সাহেব আছ কবছর সাসারামের রোদে কলসেছেন! কেমনে ছাউনি ছিল না তো! তাই রোশনাই আর ঠাণ্ড বরদাস্ত হবে না।

—বেশক! কথাটা আমার মনে ছিল না। হ্যাঁ ঠিক কথা! মক্কারা বানাতে বড় দেবী করে ফেলেছি। কিন্তু সন্দেহ তুমি একটা বানিয়েছ কেন? পাশ্চ-

পাশি দূটো হবার কথা যে!

তৎক্ষণাৎ সম্মুখে নিল উদ্গাদ। কললে, সারিফ
ফাৎ, খোদাবন্দ! ওটা এ বাস্তবই পল্লী! ও-কথাটা
আবার আমার মাদ ছিল না। খায়ের, বাস্তব হবেন
না, এখনই শব্দে দিচ্ছি।

শের এদিকে বলিফা। বাপের কাছ সে আদৌ
পেল না দরবার করতে। বরং ধরে পড়ল সাসারাম
জাম-ই-মসজিদে বড়া-ইমাম সাককে। অশীতিপর
বৃদ্ধ বড়া-ইমাম নিজেই পাকড়াও করে নিয়ে এলেন
মিঞা হাসানকে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাসানকে আসতে
হল—করু সাসারাম শহরের চৌহদ্দীতে সে নবাব,
কিন্তু শরিয়তী শাসনে বড়া-ইমাম সাব-এর প্রজ্ঞা। এল,
অব স্নেহ এক কড়ারে—বিজ্ঞানের কফিন সে ঠাই-
কল হতে দেবে না কিছুতেই।

বড়া-ইমাম মিঞা হাসানকে সঙ্গে নিয়ে মক্কারাটা
ঘুরে ঘুরে দেখালেন। মোটা সাসারামে এমন ইমারৎ
একখানাও নেই! শের খাঁ নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইল স্মার-
প্রান্তে। মূখে তার রা নেই। সব দেখেভাল খতম
করে মিঞা হাসান একটা জবর প্রশ্ন পেশ করল বড়া-
ইমামকে : একটা কথা মালুম হল না। সম্ভব দূটো
কেন?

বড়া-ইমাম ঠা ঠা করে হাসল। দাড়ি চুমড়ালো,
ডসবি ঘোরালো, চোখ পিটিপটি করল, কিন্তু জবাব
দিল না।

হাসান বিরক্ত হয়ে কললে, কি হল? জবাব
দিচ্ছেন না যে বড়? সম্ভব দূ-দূটো কেন? ও
চুহা-কা-বাজাটার একটাই তো আম্মা?

বড়া-ইমাম এতক্ষণে জবাব দিল—এটা নেহাৎ
বে-অকুফের মতো কথা বলছে মিঞা হাসান! কী জবাব
দেব? উপহাস ছাওয়া কখনো শব্দ, মায়ের মক্কারা
কনর? বাপকে সাদ দিয়ে? তুমি দেখে নিও জাম-
পীরদার, তোমার এই করিম একদিন তোমার হিন্দু-
স্বামীর তক্ত-তোসে করবে। তখন কাঁহা-কাঁহা
বলুক থেকে মনুষ্যজন ভীড় করে দেখতে আসবে—
শাহ-রেন-শাহ শেরশাহ শহরের আম্মাজানের মক্-
কার! কিছু বুঝল?

হাসান তখন ন-সান : কিল্কুল—হাঁ!

হঠাৎ পড়ের দিকে ফিরে হৃৎকর দিয়ে ওঠে, এয়াই
বে-অকুফ! বড়া-ইমাম সাব বা কলছেন তা হক-ফাৎ?
ঐ বা-দিকের সম্ভবীটো তোর কপের?

শের আম্মাজানের দিকে ফিরে স্বপ্নভঙ্গি করে,
বড়া-ইমাম সাব তোমার জিন্দগীতে বে-হক ফাৎ কখনও
কলছেন? তবে বা-দিকেরটা নয়, ওটা মায়ের। ডান-

দিকেরটা আমার আম্মাজানের।

হাসান এক গাল হেসে বলে, বাস! তা হলে
হাসান-হুসেনের কাজিয়া খতম! তুইই ফতে করে-
ছিস। আর বাবদর! বাপ-বেটোয় ধরাধরি করে তোর
আম্মাজানের কফিনটা বহে নিয়ে আসি।

শের তার বাপের হাটু দূটো ছুয়ে কললে,
গোস্টাকি যদি কিছু করে থাকি, তওবা মকুব করে
দাও। আম্মাজান! কাঁধ দিতে হবে না তোমাকে,
তুমি স্নেহ হুকুম দাও! মায়ের কফিন একাই বহে
নিষে আসার হিম্মৎ রাখে তোমার এই অযোগ্য বাবদা।

হাসান ওর পিঠে একটা বিরশি-সিক্কা থাম্পড়
মেরে কললে, তা তুই পারিস! চুহা-কা-বাজা হলে কি
হয়, তুই নিজে যে শের।

শের খাঁ যে কালবৈশাখী মেঘের মতো ঈশান-
কোণে দিন দিন স্ফীত হচ্ছে এটা মালুম হতে দেবী
হল না হিন্দু স্থানের তদানীন্তন মালিক বাবদর-তনয়
হুমায়ূনের। নিটে-গাছটি মূড়িয়ে দেওয়া চাই।
হুমায়ূন দিল্লী থেকে বাদশাহী ফৌজ নিয়ে এসে
অবরোধ করল চুনার কিল্লা। কিন্তু শের অতি
বলিষ্ঠ—এ আশঙ্কা তার ছিলই। তাই স্ত্রী-পুত্রদের
আগেই স্থানান্তরিত করেছে, অনেক দিনের রসদ
মজুত রেখেছে। আর কিল্লা-রক্ষার দায়-দায়িত্ব
একজন বিশ্বস্ত সিপাহসালারকে সমর্পণ করে দিয়ে নিজে
থেকেছে দুর্গের বাইরে। ঐতিহাসিকেরা কলছেন,
এখানেই হুমায়ূনের দাবার চাল এড়িয়ে গিয়েছিল
শের—ঘোড়ার আড়াই-পায়ের ডিঙি-মারা চালে। চুনার
কিল্লা অবরোধ করে যে কয় মাস হুমায়ূন শক্তি-
কর করলেন, সেই কয় মাস দুর্গের বাহিরে অবস্থিত
শের খাঁ ক্রমাগত শক্তি বৃদ্ধি করে গেল।

সেই বছরই সাহাবাদ পরগণায় অনাবৃষ্টিজনিত
দারুণ দুর্ভিক্ষ হয়। বিচক্ষণ প্রশাসক শের খাঁ সেই
বৃদ্ধ স্বপ্নভঙ্গিবিদকে ডেকে কললেন, আলিওয়াল, এবার
আমার নিজের জন্য একটা মক্কারা বানাও। শব্দ
ইমারৎ নয়, তৈরী করতে হবে প্রকাণ্ড এক তালো—
তার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে ঐ মক্কারা, স্বর্গের
মতো। দেখলে মনে হবে—নিজ প্রতিবিশ্বের দিকে
ডাকিয়ে নিশ্চুপ ধ্যান করছে : নাগিস্!

--নাগিস্, হুজুর?

হ্যাঁ, নাগিস্। তুমি দেখেছ সে ফুল?

মাথা চুলকে আলিওয়াল কললে, হয় তো দেখেছি
খোদাবন্দ। ওয়ার্না কেউ পহুচানিয়ে দেয়নি।

শের কললেন, ম্যাসিডোনিয়ার দিগ্বিজয়ী শাহ-

য়েন-শাহ্ সেকেদারশাহ্-র নাম শুনেন?

আলিওয়াল এবার স্পষ্টই মাথা নাড়ে। নামটা তার অজানা।

—তাদের দেশে একটি সুন্দর উপকথা আছে—নাগিস ফুল নিজের মহম্মতে বাওরা! দরিয়া-কিনারে ফোটে সেই ফুল—নারিসশাস্, দুনিয়াকে সে চেনে না, তার প্যার শব্দ প্রতিবিন্দুর প্রতি। পারবে?

আলিওয়াল তাক্সব বনল জঙ্গী জওয়ানের এ জাতীয় কাব্যোচ্ছ্বাসে। শব্দ বলল, পারব হুজুরালী।

ফিরে যাবার জন্য পা বাড়তেই শের তাকে ফিরে ডাকলেন। বললেন, শোন আলিওয়াল, ভিতরের কথাটা খুলে বলি! কাব্য নয়, নিতান্ত কেজো ভূমিক! এই মক্কারার পরিকল্পনায়। প্রকাণ্ড তালিও যদি বানাও তাহলে একসঙ্গে দু-পাঁচ হাজার মেহনতি মানুষ ওখানে কাজ করতে পারবে, ঘেঁষাঘেঁষি হবে না। দিঘীর চারপাশ ঘিরে বানাও অস্থায়ী ছাপবা। ওখানেই এসে আশ্রয় নেবে পাঁচ-গায়ের তুখা-মানুষ—জরু, গরু, বালবাচ্চা নিয়ে। কাটিয়ে দেবে গোটা বছরটা—সেই পরের বছর ইস্তক, যতদিন না গোদা-তালি এদের দুঃখে আশমান ভেঙে অব্যবহার্য কাঁদবেন! দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ইনসানিয়াতের জন্য আমি রাজ-শস্যভান্ডার খুলে দেব—লোকিন, হুশিয়ার! তুখ্ যেন মানুষকে ভিখ্ মাওতে না শেখায়! পাসিনার বিনিময়ে মেহনতি মানুষকে কুদার অন্ন দেব আমি। বুঝলে?

সগ্রন্থ আলিওয়ালের চোখ দুটি সজল হয়ে উঠেছিল। আভূমি নত হয়ে সে কুনিশ করেছিল শব্দ।

এর পরই বজ্রার যুদ্ধ। মঙ্গল-পাঠানের বৈরত-সময়। এ-যুদ্ধে চূড়ান্ত হার হল হুমায়ূনের। তিনি শেষবারের মতো ডাইদের কাছে দূত পাঠালেন সাহায্য চেয়ে। তিন প্রাদেশিক শাসনকর্তা যথারীতি যুদ্ধ ফিরিয়ে রইলেন। যুদ্ধের কাছাকাছি শেরের হাতে কিছুমত হয়ে গেল তাঁর বাহিনী। অধিকাংশ সৈন্যের সম্মিল সমাধি হল গঙ্গা পার হতে গিয়ে। হুমায়ূন এক অখ্যাত ভিস্তিওয়ালার অনুগ্রহে তার ভিস্তি আঁকড়ে গঙ্গা পার হয়ে পালালেন। এই প্রসঙ্গে প্রামাণিক ইতিহাসের একটি অনুচ্ছেদ অনুবাদ করে শোনাই। তাতে শেরশাহ্-র চরিত্রে কিছুটা আলোকপাত হবে :^{*}

“ঐতিহাসিক এম্বিকনের অনুমান হুমায়ূনের আট হাজার সৈন্য হত হয় : অর্ধেক প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অর্ধেক গঙ্গা গর্ভে। হুমায়ূনের হারের প্রতি শের খাঁর ব্যবহার এই পর্যায়ে শেরশাহ্-র চরিত্রে একটি অপূর্ণ আলোকপাত করে। যুদ্ধে হার হয়েছে জেনে

যখন হুমায়ূনের বাহিনী অন্যান্য বাহিন্যের নিয়ে পর্দার বাহিরে বোঁক্রে এলেন, তখন শের খাঁ সম্মানে অম্বপুষ্ট থেকে অবরোধ করে তাঁদের সম্রাট আভি-বাদন করেন। তৎক্ষণাৎ তাঁর নকীবকে ছেকে ফেলল করতে আদেশ করলেন—কোনো আকস্মিক বেস হুজুর মাহলাবন্দের প্রতি কোনকর অসম্মানসূচক আচরণ না করে। করলে, তাকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে। শের খাঁর এমনই দাপট ছিল যে, বিজিতের হারের বিজয়ীদের লুণ্ঠের সম্পদরূপে চিহ্নিত হওয়ার চিহ্ন-চরিত প্রথা সত্ত্বেও এ-ক্ষেত্রে কোনো আকস্মিক সহস করোনি বান্দনীদের গাচস্পর্শ করতে। সম্রাট পূর্বেই ঐ হতভাগ্য মাহলাবন্দকে শের খাঁর হারের শোঁছে দেওয়া হল, এবং যথোপযুক্ত পান-হারের জরোজেন করা হল।”

এই প্রসঙ্গে আরও স্মরণীয় : এই জৈন্যর বান্দন বছর পরে আকবর-শাহ্ একটি কদম্বী কর্তৃক জারী করেন। পরাজিত শব্দদের স্ত্রী-কন্যাদের উপর কোনো মুগলসৈন্য কোনো রকম অত্যাচার করলে তার কঠিন শাস্তি হবে। শব্দটা ইতিহাসের হারের কক্ষে লাগতে পারে—শের ও আকবরের চরিত্রের তুলনামূলক সমালোচনার সময়। স্থাপত্যের হারেরও কক্ষে লাগতে পারে—শের ও আকবরের স্থাপত্যে একটা আশ্চর্য পৌরুষের ব্যঙ্গনা আছে : সেই ইমরুদ্দৌলি যেন সোজায়ে ঘোষণা করতে চায়, তাদের জন্য ঐ জাতের কাপুরুষতার—পরাজিত সৈন্যদের স্ত্রী-কন্যাদের উপর পার্শ্বিক অত্যাচারে সম্মিল হতে পারে না।

যুদ্ধান্তে বিজয়ী শের ফিরে এলেন মাসারুমে। দেখলেন, সদ্যসম্পন্ন নিজের সমাধিসৌধ। স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। বললেন, আলিওয়াল! তুমি কাম্বস করেছ! যে মক্কারা তুমি বানিয়েছ তা আমার হিন্দু-স্থানে অভূতপূর্ব! বল, কী ইনাম চাও?

আলিওয়াল ভিনয়র কুনিশ করে বললে, খেদ-বন্দ যে খুশ্ হয়েছেন, এই তো আমার ইনাম!

—শোন আলিওয়াল! আমি কিয়ী চলেছি; হরতো আমার হিন্দু-স্থানের ওড়-ই-মুন্সেয়নে অসীন হবে। তাহলে দিল্লীতে অনেক, অনেক, অনেক ইমরুদ্দৌলি বানাবো আমি! যে কাজে কেউ কোনোদিন হাত দিতে সাহস পায়নি, আল্লাউদ্দীন খিলজির সেই অবসান

* আবুল ফজলের মতে (আকবরনামা Part I, P. 343) এই বাহিনী হলেন হাজার বোঁক্রে; অর্থাৎ অকস্মিক হতে তিনি বোঁক্রে বোঁক্রে। অর্থাৎ হুমায়ূন তখনও আকবর-জননীকে বিবাহ করেননি।

'আল্লাই মিনার' গোধে শেষ করব! আসবে তুমি আমার সঙ্গে?

আলিওয়াল নির্বাক।

—কী? কুংব মিনারকে ছাপিয়ে যাবার হিম্মৎ আছে তোমার?

যেন পোপ প্রসন্ন করছেন মিক্সোজেলোকে—
অসমাপ্ত সেন্ট পীটার্স গীর্জা শেষ করার হিম্মৎ আছে তোমার?

অশ্রুশ্রুত আলিওয়াল শূন্য বললে. পঁচাশ-
বরিষ পহিলে এ পদকার কেন দিলেন না শাহ-য়েন-
শাহ!

শাহ-য়েন-শাহ! এ সম্বোধন এখনও কেউ
করেনি বঙ্গারমুখ-বিজয়ী নগণ্য শের খাঁকে। আলি-
ওয়াল শিল্পী—শিল্পীরা না সমকালের চেয়ে দূ-কদম
এগিয়ে গিয়ে ভবিষ্যৎকে দেখতে পার? বিচলিত
হলেন শের।

আলিওয়াল তখনও বলে চলেছে, আমার জমানা
খতম হয়েছে গরীবপরবর! সাড়ে তিন কুড়ি বরিষ
উম্মর হল আমার! এই সাসারামেই জিন্দেগির বাকি
কটা দিন গুজরান করতে চাই!

শের বললেন, বেশ, তবে তাই হোক। তাহলে
এই সাসারামেই বানাও আর একটা মক্‌বারা—তোমার
পসন্দ মোতাবেক।

আলিওয়াল একটু অবাক হল। ইতস্তত করে
কললে, পিতামাতার মক্‌বারা বানিয়েছেন, জগুয়ানী না
খোয়াতেই নিজেরা বানিয়েছেন ভূখা-মানুষদের মূখ-
চেয়ে। কিন্তু একর কার মক্‌বারা বানাবেন খোদা-
কদ্? শাহজাদারা যে নিতান্ত নাবালক।

শের হেসে কললেন, সে যে কে, তা তোমাকে
এখনই করতে পারছি না উস্তাদ। মক্‌বারা খতম কর,
তারপর কলব—তার মালিকানা কর।

কর হল আলিওয়াল। পুনরায় ইতস্তত করে
কলল, গোস্‌তাকি মাফ করবেন জাহাঁপনা! আপনার
আম্বাডানের মক্‌কারা বানিয়েছি; —দুতমুদল, উম্মত-
শির. জায়গীরদারের চরিত্র সে ইমারতে প্রতিকলিত।
আপনার মক্‌কারা আপনারই মতো ধরা-ছোঁয়ার
বাইরে—আব্বানিম্মন! আপনি নিজেই বলেছেন, সে
'নার্গিস'। জেঁকিন অব...

হক বাৎ! শের খাঁর মালুম হল শিল্পীর
সমসয়টা। মক্‌কারা তার স্থাপত্য-বৈচিত্র্যের ভিতর
দিরে উৎসর্গীত-প্রাণের স্বাক্ষর রাখতে চায়। কার
সম্মানসৌখ বন্ধিতে হবে না? জানসে ওর ধ্যানের
দৃষ্টিতে কেমন করে ধরা দেবে সে ইমারৎ? শের

বললেন. কাছে এস আলিওয়াল—তোমার কানে কানে
বলব।

সভয়ে এগিয়ে এল বৃদ্ধ শিল্পী। শের অন্ত-
কণ্ঠে বললেন, হুঁশিয়ার! তার কথা কেউ জানে না।
মায় বেগম সাহেবা পর্যন্ত নন্! তার নামটা তোমাকে
এখনই বলতে পারছি না, তবে এইটুকু জেনে রাখ :

সে আমার দিল্‌কা কলিজা! যার জন্য বলতে পারি :

অগ্র আন তুর্ক-ই সিরাজী

বদস্ত্ আদ দিল্-ই-মারা।

ব্-খাল্-ই হিন্দো ওশ্ বখ্‌শম্

সমরখন্দ-ওরা-বুখারারা ॥*

বজ্রাহত হয়ে গেল বৃদ্ধ ওস্তাদ। একী কথা!
শের খাঁর জীবনে যে এমন একটি অনদ্ঘাটিত অধ্যায়
আছে—তিনি যে এমন এক সুন্দরী সাকীর মহিম্বতে
দিওয়ানা তা তো কাক-পক্ষীতেও কখনও আন্দাজ
করেনি।

ইতিহাস এগিয়ে চলেছে।

হুমায়ুন তখন গাঙ্গেয় উপত্যকা পার হয়ে, সিংধু
পার হয়ে, খাইবার পাস্ দিয়ে কাবুলের পথে পালা-
চ্ছেন, যেন তাঁকে বাঘে তাড়া করেছে! তাঁর হারেম
পড়ে আছে শের খাঁর হেপাজতে। আর সাহাবাদ
জেলার সেই নগণ্য জায়গীরদার চলেছেন দিল্লীর পথে।
এলাহাবাদ, জৌনপুর, অপরূপা আগ্রা, লা-জবাব
দেহ্লি! অবশেষে তামাম হিন্দুস্থানের তক্ত-তৌস!
অপ্রতিরোধ্য শের খাঁর শেষ সাফল্য!

না, ভুল বললাম! শেরের শেষ সাফল্য সেটাই নয়,
সেই তো সবে শুরু! দিল্লীর তক্ত-ই-সুলেমানে তো
বসেছেন কত শত বাদশাহ্—যুগে যুগে, শতাব্দীর পর
শতাব্দী ধরে। শের তো সে শতনরীর অন্যতম মূর্ত্তা-
দানাটি নন—তিনি তার মধ্যমাণ : কৌমুভ।

মাত্র পাঁচ বছর দিল্লীশ্বর ছিলেন এই আশ্চর্য
সুলতান : শেরশাহ্ শূর। তুলনায় আকবর ছিলেন
49 বছর, শাহজাহাঁ 31 বছর, আলমগীর 49 বছর।
অথচ এই পাঁচ বছরে শেরশাহ্ যে স্থাপত্যকীর্তি
ও পুরাকীর্তি রেখে গেছেন তা শূন্য বিস্ময়কর নয়,
তা ঐন্দুজালিক! পুরানা কিল্লার অসংখ্য ইমারৎ,
বিশেষ করে তার অভ্যন্তরস্থ কিল্লা-ই-খুন্‌হা
মসজিদ। পঞ্জাবে কিল্লাম নদীর তীরে রোহতাস

* তুর্কী-দেশের সুন্দরী সে আমার সাকী সিরাজী
যাতার লাগি বাওরা হল হাজার হাজী কাজী,
যার কপালের প্রমর-কালো তিল-এর তরে বান্দা
সমরখন্দ আর বুখারাগাও বিকিয়ে দিতে খুব রাজী ॥
(হাফিজ)

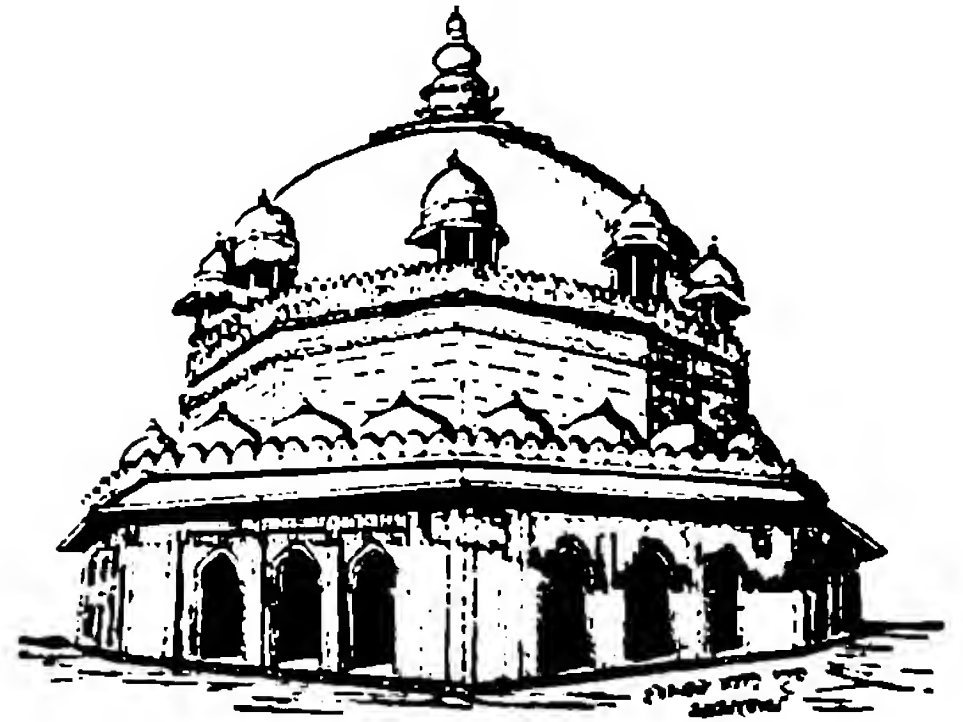
দুর্গ। আর সবার উপরে—না, অসমাপ্ত আলাই মিনার শেষ করেননি, তবে তার চেয়েও বড় কীর্তি গড়ে গেছেন। তিন পুরুষ ধরে গড়া কুৎব মিনারের চেয়েও বড় মিনার বানাবার স্পর্ধায় ঐ একই চক্রে বৃহত্তর মিনার বানাবার স্বপ্ন দেখেছিলেন সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী। একতলার বেশি তা গাঁথা যায়নি। রাবণের অসমাপ্ত সিঁড়ির মতো হাড়-পাঁজরা বার করে সে পড়ে আছে কয়েক শতাব্দী। প্রথম যৌবনের দার্টে সেটাকেই গেঁথে তুলবার স্বপ্ন দেখেছিলেন শের খাঁ। কিন্তু তত্ত্ব-তোসে আসীন হয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিটাই গেল বদলে। তাই গড়ে তুললেন অপর একটি স্থাপত্যকীর্তি, যা কুৎব কেন, আলাই মিনারের দৃঃস্বপ্নকেও পিছনে ফেলে গেছে : সোনার গাঁও থেকে লাহোর পর্যন্ত বিস্তৃত বাদশাহী সড়ক—গ্র্যান্ড-ট্রাঙ্ক-রোড। প্রতি পাঁচ-দশ কিলোমিটার অন্তর তৈরী করালেন আশ্রয়ের জন্য সরাইখানা, পানীয়ের জন্য কূপ-তলাও-বাওলী, উপাসনার জন্য মসজিদ। মাঝে মাঝে নিঃসঙ্গ মিনার—‘অবজারভেশন টাওয়ার’। আর দ্রুতগামী অশ্বারোহীর মারফতে ঘোড়ার ‘ডাক’। তাদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবধানে আস্তাবল, অশ্বের আহাৰ্য, বদলী ডাকবাহী, ডাকঘর। সব কিছুর শূন্য ও শেষ মাত্র পাঁচ বছরে !

শেরশাহ্‌র স্থাপত্যকীর্তি ত্রিধারায়। ভৌগোলিক বিচারে। প্রথমতঃ, সাসারামে গুটিতিনেক মক্‌বারা, যার প্রধানতম হচ্ছে তাঁর নিজের সমাধিসৌধ। দ্বিতীয়তঃ, রাজধানী দিল্লীতে পুরানা কিল্লার অভ্যন্তরে অনেকগুলি ইমারৎ, যার সামান্যই আঙ্গুঠিকে আছে। তৃতীয়তঃ, বঙ্গাল-মূলক থেকে পঞ্জাব-তক্‌ শাহী-সড়ক-এর ধারে ধারে গণনাতীত স্থাপত্য-কীর্তি—যেখানে স্থাপত্যকে ছাপিয়ে উঠেছে প্রয়োজনের তাগিদ।

সাসারাম পর্যায়ে যাবতীয় কীর্তির মূল নিয়ামক সেই বিশ্বকীর্তি স্থপতি : আলিওয়াল খান। সে তিনটি ইমারতের মূল ছন্দ একটি সমবাহুর অষ্টভুজ। ইতিপূর্বেই আমরা দেখেছি—এই প্ল্যানিং একটি দীর্ঘ-ঘরানার বিবর্তনধারায় পুষ্ট। জেরুসালেমের ‘কুবেৎ-এস সাক্‌কারাই’ (ডোম-অব-দ্য রক) আছে তার উৎসমূলে। হিন্দুস্থানে সেই প্ল্যানিং-এর প্রথম প্রয়োগ খান-ই-জাহান ডিলাগানীর মক্‌বারায় (1370)। তারপর মুব্বারকশাহ্‌ সৈয়দ (1434), মুহম্মদশাহ্‌ সৈয়দ (1444), এবং সিকান্দার লোদী (1517) অতিক্রম করে আমরা উপনীত হই সাসারাম পর্যায়ে।

অষ্টভুজাকৃতি ইমারতের এই ধারাবাহিকতার ইতিহাসে আলিওয়াল খান একটি সোপান মাত্র। আমরা দেখেছি, সেই সোপান অতিক্রম করে এ চিন্তা কীভাবে উপনীত হয়েছে দিশা খাঁ, আদম খাঁ, এমন কি জোব চার্ণকের সমাধিসৌধে। আলিওয়ালের প্রথম কীর্তি—হাসান মিনার কবর হয় তো একটি কুজাতের সোপান : ল্যান্ডিং। কিন্তু তাঁর পরবর্তী কীর্তিটি ‘ল্যান্ডিং’ নয়, ‘ল্যান্ডমার্ক’। শেরশাহ্‌র সমাধি।

সাসারাম পর্যায়ের প্রথম মক্‌বারার মনে হয় আলিওয়াল যেন তখনো নিজেকে ঝুঁজে পাননি। তবু তাঁর স্বকীয়তার অভাব নেই কোনো। আলিওয়াল ছম্ভাটাকে সম্প্রসারিত করেছেন, ছত্রীগুলিকে বসিয়েছেন ছম্ভা থেকে অনেকটা উচুতে, একটা আটকোণা পাঁচিল তুলে (চিত্র—8.1)। ইমারৎ বিস্তার ও



চিত্র—8.1 হাসানশাহ্‌ শূরের সমাধি (সাসারাম)।

উচ্চতার সূক্ষ্ম ছন্দের অনুপাতে সুদৃশ্য। ছম্ভা ও প্রাচীরের মধ্যে ভূমি-নকশায় যে প্রশস্ত স্থানটা রাখা হয়েছে, সেখানে চার-আটে বহিঃশটো ছোট-ছোট গম্বুজ বানিয়ে একটা নয়নাভিরাম স্নিগ্ধতা আনা হয়েছে। খিলানগুলি দু-পদায় গাঁথার জন্য নিম্নমুখে একটা বাড়তি অলঙ্করণ পাওয়া গেছে, যা উর্বাঙ্গের ঐ গম্বুজ অলঙ্করণকে ব্যালেন্স করেছে। ইমারৎ-কুর্সি বা স্নিগ্ধ অনেক কমিয়ে আনা হয়েছে।

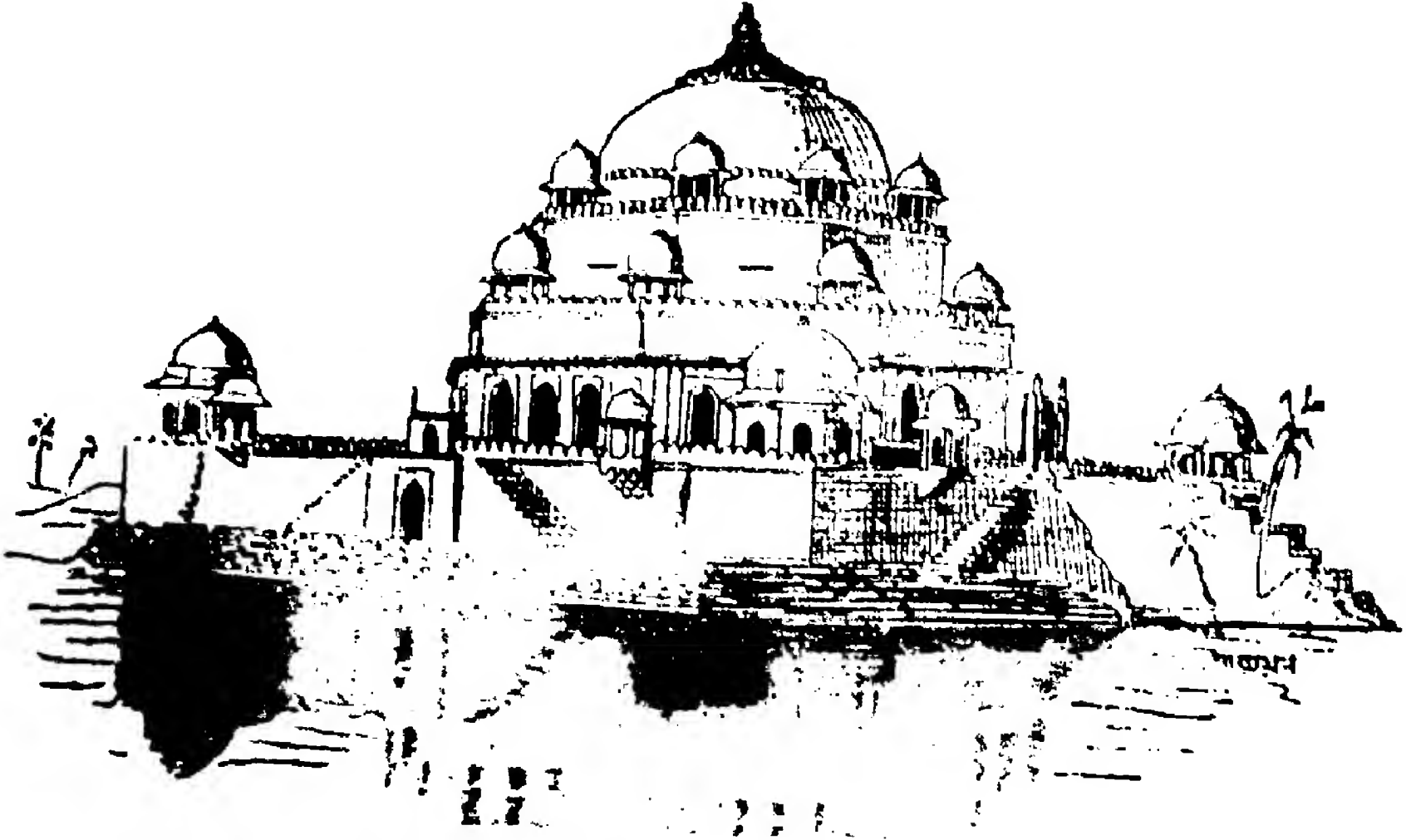
মাত্র চার বছর পরে আলিওয়ালের হাতের কাজ দেখে মনে পড়ে যেন ‘স্টিল-লাইক’-আঁকা স্থপতিত্ব রেখে পিকাসো বসেছেন ‘গুয়েনিক্স’ অঁকতে ! আলিওয়ালের এ কীর্তি শূন্য লিটল আর কামালই নয়, তা লা-জবাব ! পার্সি ব্রাউন বলছেন, “It is a class by itself, for it is one of the grandest and most imaginative architectural conceptions

in the whole of India." (এ একটি অনন্দকরনীয় শৈলী, সমগ্র ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্তি—কী পরিকল্পনায়, কী তার মহিমময় রূপায়ণে)। শুব্ব তাই নয়, দেখছি তার কালজয়ী গ্রন্থের প্রচ্ছদপটে কুব্ব মিনার, বুলন্দ-সরওয়াজা, বিজাপুরের গোল-গম্বুজ, এমন কি স্বয়ং তাজমহলকে উপেক্ষা করে পার্সি ব্লাউন ঠাই দিয়েছেন ঐ আলিওয়ালার স্বপ্নকে—হুদের জলে প্রতিফলিত শেরশাহ শুরের মক্কার আলোকচিত্র প্রচ্ছদপটে আসন পেড়েছে।

ইমারৎটি একটি বর্গক্ষেত্র-আকারের দীর্ঘিকার কেন্দ্রস্থলে শ্বীপের মতো নির্মিত। অমৃতসরের পর-বর্তীকালের স্বর্ণমন্দির ব্যতিরেকে এ পরিকল্পনা অন্য কোনো উল্লেখযোগ্য ভারতীয় স্থাপত্যকীর্তিতে দেখেছি বলে মনে করতে পারছি না। পদ্মকিরণী অতি

শোভিত ছাদ-পাচিল (parapet)। এবং আটটি ছতী। এর পরের তলায় আবার একটি খাড়া প্রাচীর ইমারৎকে বেষ্টিত করেছে, যাতে হাসান মক্কার ছাপ। তার উপর পুনরায় আটটি ছতী। লক্ষণীয়, মদ্বারকশাহ সৈয়দের সমাধিসৌধে (চিত্র-6.1) ছতীগুলি মনে হয় মূল গম্বুজের উপরে হুঁমড়ি খেয়ে পড়েছে। এখানে সে দোষ হয়নি, যদিচ শেরশাহর ক্ষেত্রে ছতী-সংখ্যা স্মিগ্ধগণিত। তার হেতু : ঘোলোটি ছতী মূল গম্বুজকে বেষ্টিত করেছে দুটি আনুভূমিক তলে এবং গম্বুজের আকার এত বড় যে, ছতীরা ভীড় করে তার মহিমা কল্প করতে পারেনি।

গম্বুজটি প্রকান্ড। নির্মাণকালে ছিল তামাম হিন্দুস্থানে বৃহত্তম—ব্যাসে ও উচ্চতায়। ব্যাস 20 মিটার, উচ্চতা 27.5 মিটার। সেকেন্দারশাহর মক্কার



চিত্র-8.2 শেরশাহ শুরের মক্কারা (মাসারাম)।

কিলাস—এক এক দিকে 427 মিটার। পাড় বরাবর ঘুরে এলে প্রায় পৌনে দুই কিলোমিটার হাটা হয়ে যায়। কেন্দ্রস্থ ইমারতের কিস্তার 76 মিটার, উচ্চতা 46 মিটার। ইমারতে পাঁচটি তল—সর্বনিম্নে দিঘীর বুক থেকে শ্বীপের মতো জেগে উঠেছে এক বর্গক্ষেত্র-আকারের ভিত্তিমূল বা মোকাম-কুর্সি। তারক ঘিরে একটি চতুষ্কোণ সদৃশ প্রাচীর, যার চার কোণায় অষ্ট-ভুজ ছতী। ছতীর তল হচ্ছে—মূল সৌধের অষ্টভুজ অলিন্দ, যার প্রতিটি দিকে দুই-খাম্বার মাকখানে সোদা শৈলীতে নির্মিত তিস-তিনটি খিলান। উপরে অপ্রাপ্ত হুজা। তার উপর কুজর (battlement)।

থেকে হুমায়ুন্স টেম্ব. তাজমহল পার হয়ে সফদরজঙ মক্কারা পর্যন্ত প্রতিটি বৃহদাকার গম্বুজের সপো এর পার্থক্য এই যে, এটি 'ডব্লু ডোম' নয়। এখানে আলিওয়াল এক মৌলিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। একটি নির্দিষ্ট সীমারেখার চেয়ে বড় জাতের গম্বুজের ক্ষেত্রে দৃ-পদ্য বানানোর কায়দা প্রায় সর্বজনস্বীকৃত। স্থপতি মনে করেন, না হলে ভিতরে দাঁড়ানো দর্শকের পক্ষে রসভাস ঘটে। সমাধিকক্ষের ভিতরে দৃ-ভাষ্যমান দর্শকের মনে হয় গম্বুজ অন্ধকারে মিশে গেছে। আলিওয়াল সব জেনে বুঝে তবুও 'সিগল-ডোম' বানালেন। ঐ অনুভূতির হাত থেকে দর্শকে মূর্তি

দিতে গম্বুজের ভিতরে আলো আসার এক বিচিত্র ব্যবস্থা করলেন। যা অভূতপূর্ব এবং ভবিষ্যতেও অনুকরণ করা হয়নি। প্রয়োগবিদ্যায় তার পরিচয়- 'ট্রিফোরিয়াম আর্কেড-জালিকায় মস্কিকোষ নির্মাণ করে। সেটা যে কী, তা একে দেখাতে গেলে বিস্তর আঁক-জোক করতে হবে। কখনো সাসারাম গেলে সেটা বরং স্বচক্ষেই দেখবেন।

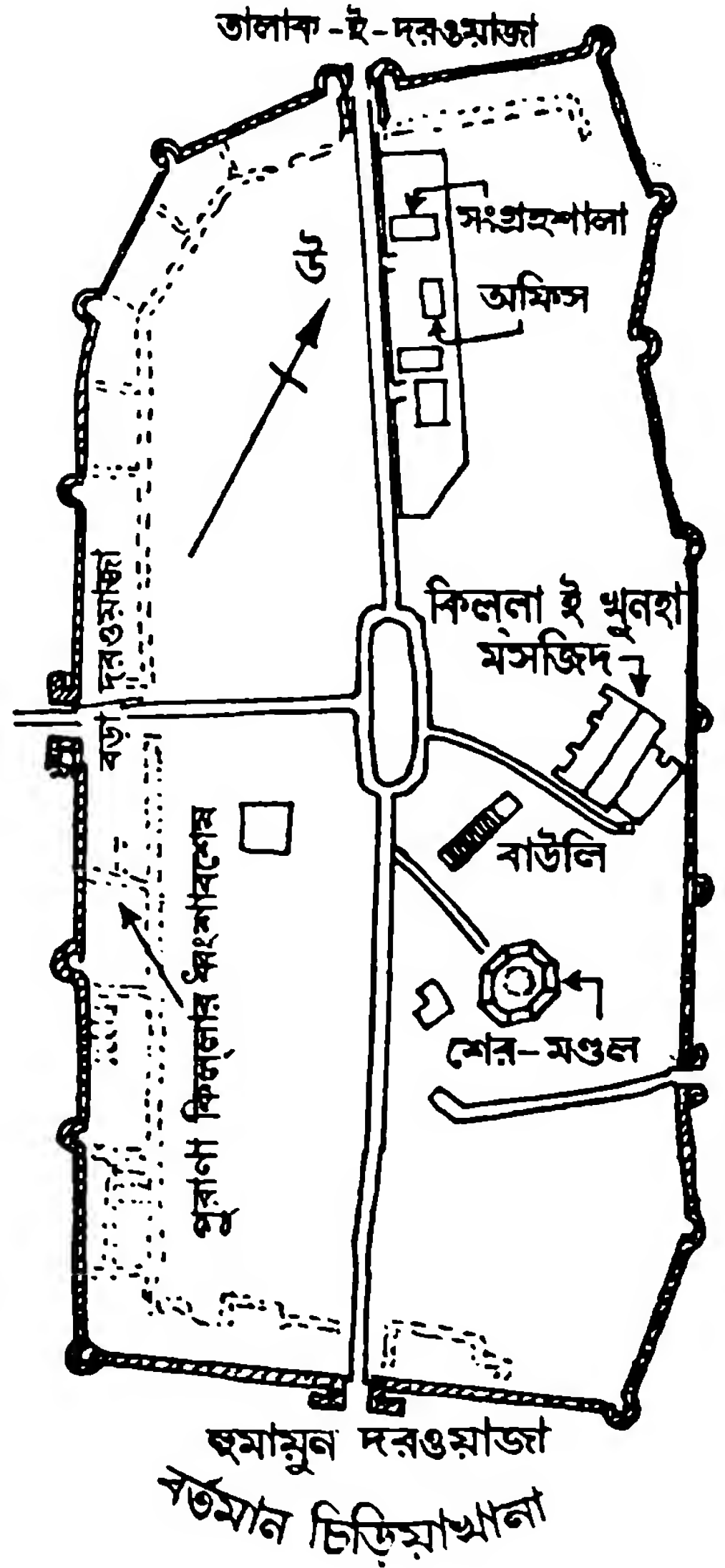
অনুমান হয় নির্মাণ সময়ে গম্বুজটা নীলরঙের আস্তরে ঢাকা ছিল—সে আস্তর ধূসে-মুছে নিঃশেষ হয়ে গেছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, প্রাথমিক পর্যায়ে ভূমি-নকশায় পশ্চিমদিক নিরূপণে কিছু ভুল হয়েছিল। বনিয়াদের কাজ শেষ করার পর এ চুটি আলি-ওয়ালের নজরে পড়ে। ইসলামী ঐতিহ্যে কিব্বা-চিহ্নিত মিহরাব নিখুঁত পশ্চিমে থাকা চাই। আলি-ওয়াল এই আট ডিগ্রির গল্টি উপরাংশে চমৎকার-ভাবে শূন্যে নিয়েছেন। এমন কি ভূমিনকশা বা প্লানে চুটিটাকে মনে হয় স্থপতিবিদের একটি সজ্ঞান-কৃত প্যাটার্ন বদ্বি।

দিল্লী মহানগরীতে শেরশাহের স্থাপত্যকীর্তি : পুরানা কিল্লা (চিত্র-৪.৩) বা ষষ্ঠ দিল্লী নগরী। সে স্থাপত্যকীর্তি দেখতে আজকের দিনের ট্যুরিস্ট য়ার-কি-না-য়। নেহাৎ একজিবিশন গ্রাউন্ডে কোনো আস্তর্জাতিক প্রদর্শনী হলে, অথবা চিড়িয়াখানা দেখার ইচ্ছা হলে যাত্রীরা ও-পাড়ায় পা মাড়ায়। যদি যান : দেখবেন, কঙ্কালসার কিছু ধ্বংসস্তুপ। হুমায়ূন পরবর্তী জমানাতে, শেরশাহের মৃত্যুর পর সিংহাসন দখল করে এই কিল্লার অনেকগুলি শের-শাহী ইমারৎ ধ্বংস করে নতুন মোকাম বানান। আশ্চর্যের কথা, তার একখানিও অক্ষত নেই। অথচ শেরশাহের যে দুটি ইমারৎ তিনি আদালত ভেঙে ফেলেননি সে দুটিই টিকে আছে—কিল্লা-ই-খুনহা মসজিদ ও শেরমণ্ডল।

পুরানা কিল্লা প্রায় উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। তিন-দিকে তিনটি প্রবেশদ্বার। কেন্দ্রস্থ বড়া-দরওয়াজা ওরফে শেরশাহী দরওয়াজাই বর্তমানে প্রবেশ পথ। দিল্লী-চিড়িয়াখানার প্রায় সই-সই। সুউচ্চ প্রাচীরের ভিতর দিকে যে হর্মিরাজী ছিল তা অধিকাংশই ভেঙে পড়েছে।

'পুরানা কিল্লা' নামটা কি-করে এসেছে জানি না ; বোধকরি তার উদ্দেশ্য জানানো যে, এটি 'লাল-কিল্লা'র অপেক্ষা পুরাতন। কিন্তু আসলে এই কিল্লাটি অতি প্রাচীন যুগের স্মৃতিবাহী ভূখণ্ডের উপর নির্মিত। এখানে খননকালে শূন্য খ্রীষ্ট-

পূর্বাব্দের নয়. প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন খুঁজে পেয়ে-ছেন পুরাতত্ত্ব বিভাগ। দিল্লী নগরীর এই অংশেই ছিল মহাতারতীয় যুগের ইন্দ্রপ্রস্থ, এমন অনুমান করা হয়। সেই পৌরাণিক যুগের, প্রাগৈতিহাসিক



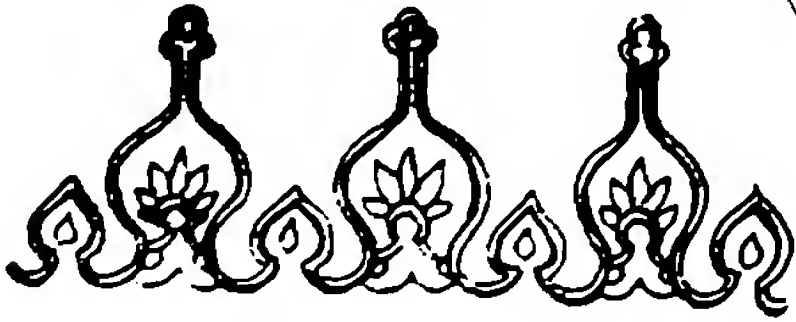
চিত্র-৪.৩ পুরানা কিল্লার ভূমি-নকশা (দিল্লী)।

যুগের পুরাতত্ত্ব বিষয়ে যদি আপনার কৌতূহল থাকে তবে চিত্র-৪.৩-তে চিহ্নিত সংগ্রহশালাটি খুঁটিয়ে দেখতে পারেন। খনন-কালে সংগৃহীত অনেক কিছু

নির্দর্শন ওখানে সংরক্ষিত, আলোক চিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শিত।

শেরশাহ-উল নামে মোকামটি শেরশাহী আমলের। অষ্টভুজাকৃতি মিনার ইমারৎ। দুটি সোপান শ্রেণী আছে। শেরশাহর আমলে এটি সম্ভবত সন্ন্যাসীদের অবসরস্থাপনের জন্য ব্যবহৃত হত। হুমায়ুন সেটিকে তার গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত করেন। এখানেই সোপান থেকে অবতরণকালে হুমায়ুনের দেহান্ত হয়।

পূর্বপ্রান্তে শের নির্মিত কিল্লা-ই-খুনহা মসজিদ। সন্ন্যাসীদের প্রার্থনামন্ডল—এক যুগের অবসান ও নতুন যুগের সূচনার দ্যোতক। ভূমি-নকশায় আরজক্ষেত্র—48 মিটার X 13.7 মিটার। উচ্চতা 33.33 মিটার। মসজিদের প্রবেশদ্বারটি লক্ষ্য করে দেখুন—খিলানগুলি দু-পর্দার নির্মিত। বাহিরে ইমারতের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতার অনুপাতে বিশালকায় খিলান। তার কিনার-বরাবর সেই তুগলকী পশ্ম-কুড়ির নকশা, আর ভিতরে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় প্রবেশদ্বার। বিষয়টি নিয়ে বুলন্দ দরওয়াজা পর্যবেক্ষণের সময় আলোচনা করা যাবে। আপাতত শুধু বলব, এখানকার এই কারদাটি পরবর্তী যুগের অনেক-অনেক দু-পর্দার খিলানে অনুকৃত—সেকেন্দ্রা, বুলন্দ দরওয়াজা, জাম-ই-মসজিদ ও তাজমহল। আরও দেখুন, এখানে কিছ, হিন্দু ‘মোটিভ’ অনুপ্রবেশ করেছে। প্রাক-আকবরী ইসলামী স্থাপত্যে যা দেখতে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম না আদৌ। প্রবেশ-খিলানের



চিত্র-8.4 কিল্লা-ই-খুনহা মসজিদে নকশা।

উপর ঐ অরিয়ল-গবাক্ষটি হিন্দু-শৈলীর কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। পরবর্তী যুগে আকবরের পদাঙ্ক অনুসরণ করে অনেকেই এ-জাতীয় গবাক্ষ বানিয়েছেন। আগ্রার জাহাঙ্গীরী মহলে, ফতেপুর-সিক্রির অনেক-অনেক মোকামে একে দেখতে পাবেন—জয়পুর, যোধপুরে হো বরেন্দ্র। হুম্মা হিন্দু-স্টাইলের। স্তম্ভ-গুলির পাদদেশে যে আলিম্পন-নকশা তরত পারসিক ডিজাইনের সঙ্গে অজস্র-আম্পনার মিশ্রণী হয়েছে (চিত্র-8.4)। সম্মুখদণ্ডে খিলানের স্প্যান্ডেল (Spandrel) জোড়া-পাশের নকশা; মিহরাবের উপরেও অনুরূপ জোড়াপশ্ম। মিহরাবের সম্মুখস্থ

চার-দিকুনে আর্চিট প্রায়স্তম্ভ (pilaster) যে অলঙ্করণ তাও আমরা সচরাচর কোনো মসজিদে দেখিনি—কুওতুল মসজিদ বাদে (যেখানে হিন্দু স্তম্ভই ব্যবহৃত)। সেগুলি জৈন-মন্দিরের প্রায়-স্তম্ভের সঙ্গে বেশ মিল খায়। অথচ ঠিক তার পাশ-ঘেঁষেই খাড়াভাবে রয়েছে কুরান-সরিফের ক্যালিগ্রাফী। বাহিরের দিক থেকে প্রবেশ পথের দু-পাশে দেওয়াল সহ-সহ ছাঁট মিনারিকাকে লক্ষ্য করেছেন? যা উপরে গিয়ে গুলদস্তায় রূপান্তরিত। একটু নজর করে দেখুন দিকি—ওর গায়ে ঐ খাঁজ-কাটা নকশাটা যেন চেনা-চেনা, নয়? ঠিকই ধরেছেন। ওটা দেখেছেন কুৎব মিনার-এ। যাকে আলী-সাহেব বলেছিলেন ‘বাঁশী’। অরিয়ল গবাক্ষকে ঘিরে যে জালিকাজ তা-ও পরবর্তীকালে নানান নতুন ছন্দে বিবর্তিত হয়েছে—ইতমদ্ উদ্দৌলায়, সেলিম চিস্তির দরগায়, এমন কি তাজ-এ। দিল্লী পরিক্রমাকালে এই ক্ষুদ্র ইমারৎটি স্বতই উপেক্ষিত থেকে যায়—কিন্তু আপনি যদি স্থাপত্যের ছাত্র হন, তাহলে বলব—ও-তীর্থে একবার হাজিরা দিয়ে যাবেন। হোক ছোট, এই উপেক্ষিত স্থাপত্যকীর্তি দুটি কারণে স্মরণীয়। এক : এখানে শেরশাহ শুর এমন কতকগুলি বীজ বপন করেছিলেন যা অন্যতম মহীরুহে বিকশিত হয়েছে। দুই : আকবর-বাদশাহর যে অতি অদ্ভুত পরীক্ষা—হিন্দু ও ইসলামী স্থাপত্যের সহাবস্থান, তা কি সর্বপ্রথম রূপ পরিগ্রহ করতে শুরু করেছিল শেরশাহ শুরের ধ্যানে? আরও কিছুটা সময় পেলে তিনি কি একটা ফতে-পুর-সিক্রি বানাতেন?

মাত্র পাঁচ বছরের ভিতর কেমন করে এত এত কাণ্ড করে ফেললেন? কেমন করে বুঝলেন—কুৎব মিনারকে অতিক্রম-করা-কীর্তি আলাই মিনার নয়, গ্র্যান্ড-ট্রাঙ্ক-রোড! উচ্চতায় শুর দাটের বাজনা, বিস্তারের মহাবতের। দু-আড়াই হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ সোনারগাঁও-পঞ্জাব শাহী সড়ক কুৎব-এর 273 ফুট উচ্চতাকে অনেক অনেক পিছনে ফেলে গেছে। আজ পাঁচশ’ মানুষ যদি দৈনিক কুৎব দেখতে যায়, তাহলে পাঁচ লাখ লোক ব্যবহার করে গ্র্যান্ড-ট্রাঙ্ক-রোড। কুৎব একটা দিগ্বিজয়ীর আশ্রয়-ছাঁটের দম্ভ, শাহী সড়ক এক পিতৃপ্রতিম রাষ্ট্রনায়কের দরদেব দান।

সাসারামের সেই নগণ্য যুবক ফরিদ কোন মন্তব্যে দিল্লীর তত্ত্ব-ই-সুন্নেমানে আসীন হয়ে এই ইম্প্রাজাল সমালোচনা করল? জবাব মিলবে সুফী পণ্ডিত জালালের জাযায় :

আন্ নিশান্ এ-দৌদ্ এ হিন্দুস্থানী-বদদ্।
কি জহদ অজ্ খার ও দিওয়ানা শবদ ॥*

কলিঙ্গর দুর্গ আক্রমণের সময় এক দুর্ঘটনায় এই অনন্যসাধারণ সুলতানের মৃত্যু হয়। বারুদের স্তূপে হঠাৎ আগুন ধরে যাওয়ায় এই দুর্ঘটনা। বিস্ফোরণ-মাত্র মৃত্যু হয়নি শের-এর। অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় জীবিত ছিলেন তিনটি দিন। দুর্গের পতন হয়েছে জানবার পরে তৃপ্তির সঙ্গে শেষ নিঃশ্বাস ফেলে-ছিলেন। পাঁচ দিনের দিন কলিঙ্গর কিল্লায় এসে উপনীত হলেন শাহজাদা—যিনি ইসলাম খাঁ নামে দিল্লীর পরবর্তী সুলতান। সদ্য-বিজিত কলিঙ্গর দুর্গে অনাড়ম্বর অভিষেক সেরে ইসলাম খাঁ প্রাক্তন দিল্লীশ্বরের মরদেহ নিয়ে রওনা দিলেন সাসারামের দিকে।

ইতোমধ্যে উস্তাদ আলিওয়াল খাঁ নির্দেশ মতো শেষ করেছে সেই তৃতীয় মক্কারাটি। অথচ সেটি শূন্যগর্ভ। এ পাঁচ-বছরে দিল্লীশ্বরের সাক্ষাৎ পায়নি শিল্পী। তাই জেনে নেওয়া হয়নি—কে সেই শাহ-য়েন-শাহর গোপন প্রেমের পাণ্ডী।

বিরাট শোকযাত্রার মিছিল এসে সামিল হল সাসারামে। সারা সাহাবাদের মানুষ ছুটে এল তাদের অতি-আপনজনকে শেষ-দেখা দেখতে। সেই জন-সমুদ্রের একান্তে অন্তবাসীর মতো দাঁড়িয়েছিল আলিওয়াল। এ কয় বছরে সে আরও বড়িয়ে গেছে। মনে মনে কলিছিল—প্রভু, এ কী বিড়ম্বনার মধ্যে তুমি ফেলে গেলে আমাকে! মক্কারা বানিয়েছি, অথচ তার মালিকানা কার তা জানি না।

এই শেষ বয়সে অকৃতদার আলিওয়াল কি আল্লা-তালার নাম ভুলে গিয়ে চিরাগ হাতে পথে পথে ফিরবে খুঁজতে—কে হতে পারে সেই অসামান্য সুন্দরী, যার কপোলের ভ্রমরকালো তিলের বিনিময়ে তামাম হিন্দু-স্থানী শাহ-য়েন-শাহ সমরখন্দ-বুখারারাও বিলিয়ে দিতে পেছপাও নন।

সুলতানী সেপাই এসে ওর হাত চেপে ধরল। বললে, ওস্তাদজী, স্বয়ং সুলতান তোমাকে তলব করেছেন। তুরন্ত চলে এস।

বিহ্বল আলিওয়াল এসে দাঁড়ালো নয়া-সুলতান ইসলামশাহ শরের সম্মুখে। আড়ম্ব নত হয়ে তিন বার কুর্নিশ করল। ইসলামশাহ বললেন, উস্তাদজী!

সমস্ত দার-দারিফ তোমার। আশ্বাজানের ককিন সমাধিস্থ কর।

বৃন্দ ওস্তাদ হুকুম তামিল করল। শোকযাত্রার পুরোভাগে নির্দেশ দিতে দিতে সে নিরে গেল সম্রাটের মরদেহ মক্কারা ভূগর্ভে। সেই আকস্মিক আশ্চর্য ইয়ারতের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল না। নতনেত্র নিজ প্রতিবিশ্বের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ঠান্ন। নব্বই ছুই-ছুই বড়-ইমাম সাহেব মিন্দারের উপর উঠে খুৎবা পাঠ করলেন। হাজার হাজার মানুষ নত-জানু হল।

অনুষ্ঠান শেষে ইসলামশাহ যখন আলিওয়ালকে পারিশ্রমিক দিতে গেলেন তখন তিন পা পিছিয়ে গেল লোকটা। হাত দুটি জোড় করে করলে, ইমান-ইনসাফের মালিক! আপনাদের নিমক খেয়েই বেঁচে আছি। কিন্তু আজকের এ-কাজের জন্য আত্মকে কোনো খিলাং দেবেন না খোদাবন্দ। এ বন্দার এটাই ছিল শেষ কর্তব্য।

ইসলাম বললেন, তুমি এখানেই থাকবে উস্তাদজী! আশ্বাজান নির্দেশ দিয়ে গেছেন, একজন-কার মক্কারাগুলির দেখভাল, মেরামতির সব দার-দারিফ তোমার। সেজন্য তামাম-জিন্দেগি তুমি একই হারে মাসোয়ারা পেয়ে বাবে।

অগ্রসজল চোখে বৃন্দ কোনরকমে সাইস সঞ্চয় করে বললে, গোস্তার্কি মাফ করবেন জাহাপনা, আপ-নার আশ্বাজান—তার লাখ-লাখ বরিষ্ কেহেস্ত-বাস মঞ্জুর হোক—হুকুম দিয়েছিলেন, আরও একটি মক্-বারা এই সাসারামেই কনাতে। সেটি শেষ হয়েছে, কিন্তু তার মালিকানা কার সেটা এ বন্দাকে তিনি বলে যাননি।

ইসলাম অতি দঃখেও হেসে ফেলে। বলে, সে কি হে? তুমি জান না? আমরা তো অনেক দিন থেকেই জানি। বাদশাহী খেয়াল! শাহ-য়েন-শাহ ঐ তিন-নম্বর মক্কারাটা বানিয়েছিলেন তার জমানার শ্রেষ্ঠ স্থপতিবিদের জন্য। ...কী? চেন লোকটাকে? তার নাম : উস্তাদ আলিওয়াল খান!

বজ্রাহত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বৃন্দ। কুর্নিশ করতে, কৃতজ্ঞতা জানাতে ভুল হয়ে গেল তার। এ কি বিশ্বাস? মহামহিম দিল্লীশ্বর...অভিকর্দ্র কীট আলিওয়াল...সেই রহস্যজন রসিকতা...বু-খাল্-ই হিন্দো ওশ্ বখ্শম্ সমরখন্দ-ওয়া-বুখারারা!

দু-হাতে মুখ ঢেকে বর বর করে কেঁদে ফেলল বৃন্দ শিল্পী!

* হিন্দুস্থানের অন্তরায়ার প্রকৃত পরিচয় যখন কেউ পায়, তখন তার নাওয়া-খাওয়া ঘটে যায়। সুপ্তোষিত মানুষটা বেবাক উন্মাদ হয়ে যায়।

গ্র্যান্ড-ট্রাঙ্ক-রোড ধরে যদি কখনো পশ্চিমে যান—
আল্লার দোহাই—একবার গাড়ি থামাবেন সামারামে।
কাউকে জিজ্ঞাসা করতে হবে না, নজরে পড়বেই শের-
শাহ্ শ্বরের প্রকাণ্ড সমাধি। কাকচক্ৰ নির্মল জল
নয়, সবুজ শ্যঙলা-গোলা ঘোলা পানি। নীল-আস্তর
করা গম্বুজটোর হাড়-পাঁজড়া বেরিয়ে গেছে। তা হোক,
তবু অজ্ঞও সেই মনোচেতন্য ইমারৎ একদৃষ্টে তাকিয়ে
আছে—দেখছে, নিজের প্রতিবিম্বটাকে। শের রসিকতা
করে বলেছিলেন, এ ইমারৎ নার্সিস্! সত্যিই, প্রতি-
বিম্বের দিকে নিবন্ধদৃষ্টি ঐ কঙ্কালসার ইমারৎকে
দেখে নার্সিসাস্ ফুলের সেই আশ্চর্যতমূলক গ্রীক
উপকথাটিই মনে পড়ে বাবে আপনার। কিন্তু, না!
সেটাই কেষাকরি ওর শেষ কথা নয়। নার্সিসাস্ নিজ
প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে ভাবছে কিন্তু আন জনের
কথা—একটা ভুলে-যাওয়া মূখের আদল! যে বৃষস্কন্ধ
মানুষটা ওকে চিনতে পেরেছিল, যে বলেছিল : তুমি
নার্সিস্!

অরপর চারশ বছর কেটে গেছে। তেমন দরদী
সমকালর আর কেউ আসেনি এ ফুলবাগিচার। কোথায়
হারিরে ফেল সেই মানুষটা? কেচরী জানে না, সে
লীন হয়ে আছে ওরই অন্তরতম হয়ে :

হজারো সালসে নার্সিস্
আপনা বে-নরী-পর রোতী হৈ।
—বড়ী মদুকিল-সে হোতী হৈ
চমনসে দিদাবর পৈদা ॥*

অদূরেই মিক্স হাসান শ্বরের মক্কারা। বড়া-
ইমাম সাব জিন্দেগির বে-হক বাৎ করেননি! তাঁর
দোহাই—চলুন দেখে আসি সেই দামাল ছেলে ফরিদের
কপ-মারের কবর। শেরশাহ্‌র দাপটে শের-বক্‌রি
নাকি একঘাটে পানি পিঁত। হলফ নিয়ে হক্-বেহক্
কবুল করতে পারব না; কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য
করেছেন? ওদের শরনের ভূপিটা? ঐ দেখুন—
জেদী এক রোখা মিক্স হাসানকে সে শব্দইয়েছে ডান-
দিকের কবরটায়, তার আশ্রয়জানের কলিজা সই-সই
করে। যা আছে পশ্চিমে, পশ্চিমদিকে পাশ ফিরে।
স্বপ্ন তার পিছনে—ঐ পশ্চিমে ফিরেই। তার মানে?
জীবিতকালে যৌবনোত্তীর্ণা যে সরিফা ছিলেন জায়-

* হাজার বছর ধরে নার্সিস
অলিন্দা সৌন্দর্য-পশরা নিয়ে কলিত।
(ও জায়) এ বাগিচার দরদী সমকালর
এক অতি সুসজ্জিত কলিত।
(বে-নরী অতুলনীর সৌন্দর্য : চমন কলসমগান;
দিশের প্রকট সমকালর, connaisseur)।

গীরদারের করুণার ভিখারিণী, আজ তিনিই আছেন
মুখ ফিরিয়ে, আর তার পিঠের দিকে বাপ আছে মায়ের
দিকে ফিরে।

এখানেই সামারাম দেখা শেষ করবেন না যেন।
খোদ শেরের দোহাই—চলুন দেখে আসি তাঁর দিল্‌কা
কলিজাকে। রিক্সা-ওয়ালা, ভার্জি-ওয়ালা, পথচল্‌তি
মানুষজনকে ক্রমান্বয়ে জিজ্ঞাসা করতে থাকুন—কেউ
না কেউ হৃদিস্ বাৎলে দেবেই। দেখিয়ে দেবে দূর
থেকে, ঘন কাঁটাগুল্মে আপাদমস্তক ঢাকা একটি চুন-
বালি-খসা উপেক্ষিত ধ্বংসস্তূপ। পুরাতত্ত্ব বিভাগের
কোনো তা-বড় তা-বড় 'দিদাবর' যে এ দিগড়ে আসেননি
তা 'চামনের' হাল দেখলেই বোঝা যায়। কোন্ এক নাম-
না-জানা আলিওয়ালের কবর।

‘বহু কোন্ থা? ক্যা মালুম। কোই ছোটো-
মোটো মনসবদার, ইয়ে সিপাহ্‌সালার হোগা সায়েদ।
মুখে না মালুম’—স্থানীয় লোকটা পাশ কাটাবে।

আজ্ঞে না, মীর মহম্মদ আলিওয়াল খাঁর হক্-
হৃদিস্ আমিও জানি না। অতি ভাসা-ভাসা কিছু
ঐতিহাসিক তথ্যকে মূলধন করে, মনগড়া সংলাপ
ফেঁদে এ কিস্সা পয়দা করেছে। তবু বিশ্বাস করুন,
ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখকের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য-
গণ্ডির বাইরে আমি একবারও পদার্পণ করিনি।
শেরশাহ্‌ শ্বর অথবা তাঁর জমানার শ্রেষ্ঠ স্থপতিবিদ
আলিওয়ালের ইতিহাসকে আমি সজ্ঞানে বিকৃত করিনি
একটি।

অম্বিতীয় কুৎব মিনারের মূল স্থপতিবিদ কোন
হতভাগ্য—সে-কথা জানিয়ে কুৎবের গায়ে কোনো ফলক
লাগাবার কথা খেয়াল হয়নি আইবক-ইল্‌তুৎমিস্-
আলাউদ্দীনের; বুলন্দ-দরওয়াজার ঐ আকাশচুম্বী
দাড়া জন্ম নিয়েছিল কোন্ বিশ্রুতকীর্তি স্থপতির
ধ্যানে সে-কথা উল্লেখ করার কোনো প্রয়োজন বোধ
করেননি জনদরদী স্বয়ং আকবর-বাদশাহ্‌ তাঁর দ-
হাজার একশ' ছিন্নাশি পৃষ্ঠার জীবনীতে। তাজ-
মহলের নির্মাণ-ইতিহাসে নিখুঁত হিসাব খুঁজে
পাবেন : কত হাজার কতশ' কত চুনী-প্রবাল-পাল্লা-
ল্যাপিসলাজুর্জি ব্যবহার করা হয়েছে এ ইমারতে।
কিন্তু পরিকল্পনাকার? সেখানে লেখা আছে :
'কাগজ-নক্‌শায়ে-মক্‌কারা হর-এক উস্তাদ-মে' আআ-
জদাদ। চুন-ইক নক্‌শা-পসন্দ আলিচা হজরৎ'
—বাস্! এটুকুই। অর্থাৎ গেলারাজ-টেন্ডারে সাড়া
দিতে কাবুল-কান্দাহার-ইরান-তুরান থেকে হরেক
উস্তাদ কাগজের নক্‌শায় টেন্ডার দাখিল করলেন এবং
তার শ্রুতির বোঝে-বোঝে একখানি বিশেষ-নক্‌শা পছন্দ

করজেন আলিচা হজরৎ, কিনা শাহজাহাঁ! কিন্তু কার নকশা? কে সে? কে দেখেছিল বিনদ্র ত্রিষামা-যামিনীর শেষ প্রহরে তাঁর ধ্যানের দৃষ্টিতে সেই মর্মর স্বপ্ন,—সবার আগে, সবার অগোচরে? সেই মীর মুহম্মদ উস্তাদো-কি-উস্তাদ গাজী মিঞা ‘এ্যানন’-এর পিতৃদত্ত নামটা ইতিহাসে লিখে রাখতে ভুল হয়ে গেল বেগম-বিরহাতুর আলিচা হজরৎ—শাহজাহাঁর!

এই হচ্ছে দখিনী ভারতজননীর সহস্রাব্দীকাপী ললাটে-লিখন! ভারতীয় ভাবনার স্থূলদৃষ্টিতে—মাথা নিচু করে স্বীকার করতে হবে—স্ট্রীলোক আর স্থপতির এক দর। এ তোমার এ আমার পাপ! স্থপতি পয়দা করে ইমারৎ, স্ট্রীলোক : ওয়ারিশ্। তাই শাহ-য়েন-শাহ জাহাঙ্গীর তাঁর অতবড় আত্ম-জীবনীতে গর্ভধারণী জননীর নামটা পর্ষদে উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করেননি। তাই রোমের সেন্ট পীটস্ গীর্জার প্রতিটি আর্কিটেক্টের স্বাক্ষরিত ‘রিভাইজড্-প্ল্যান’ ইতিহাস বৃকে করে ধরে রাখে—রামান্টি-রাফায়েল-মিকেলান্জেলোর, আর কুৎব-বুলন্দ-

তাজের স্থপতির নাম বে-হদিশ্ না-পাস্ত!

তাই হয়তো আপনার মনে হবে—সেই দখিনী ভারতজননীর কণ্ঠে গ্রান্ড-ট্রান্স্ক-রোডের শতনরী দুলিয়ে দিয়েছেন বলেই নয়, দাঁড়ক-পাঁড়িত সাহা-বাদবাসীর অল্প জোগাতে নিজ মক্কারার বিচিত্র প্ল্যানিং রূপায়িত করার জন্যই শব্দ নয়—কিহরের জন-পদপ্রাপ্তে ঐ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মক্কারাটি বানিয়ে শিল্পের উপর শিল্পীর মর্বাদা স্বীকার করেছেন বলেই স্বল্প-দিনের সম্রাট শেরশাহ শূর ভারতের ইতিহাসে অনন্য, একমাত্র সুদূর্লভ ব্যক্তিত্ব : লাজবাব!

: বড়া মর্শকিল্-সে হোতি হয় চমকমে দিলাবর পয়দা!

কণ্টকগুম্বাত সেই ভাস্কর্যের পুঁতিসম্মত পরিবেশে দাঁড়িয়ে কোনো অস্তস্বর্ষউদ্ভাসিত সম্মত হঠাৎ হয়তো আপনার মনে হবে—না. শাহজাহাঁ নয়, একমাত্র শেরশাহ শূরের প্রতিই ঐ পংক্তিটা সূত্রবৃত্ত :
‘—তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ!’

□



চিত্র—8.5 শেরশাহ শূরের সম্ভাব্য আলোচনা।

আলমুত

ঘটনা	সময়কাল	ঘটনা	সময়কাল
আকবরের জন্ম	.. Oct, 1542	ফতেপুর-সিদ্ধি নির্মাণ	.. 1569-70
হুসেইন বেককে বিবাহ	.. Nov, '51	গুজরাট অভিযানে যাত্রা	.. July, '72
আকবরের অভিষেক	.. Feb, '56	প্রত্যাবর্তন, বুলন্দ-শরওয়ারজা	.. 1573
পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ	.. Nov, '56	আব্দুল ফজলের দরবার-প্রবেশ	.. 1575
আবদুল্লাহ-তনয়কে বিবাহ	.. 1557	টোডরমল দেওয়ান নিযুক্ত	.. 1575
নদীপথে আত্মদর্শন	.. Dec, '58	হল্দিঘাটের যুদ্ধ	.. June, '76
কৈয়াম বিতাড়িত	.. Jan, '61	আকবরের নতুন জীবনদর্শন	.. 1576-79
মলোয়ার রণজয়ী মৃত্যু	.. Mar, '61	ইবাদতখানা সর্বধর্মের জন্য উন্মুক্ত	.. Oct, '78
অম্বর রাজকুমারীকে বিবাহ	.. Feb, '62	ভারতে প্রথম আদমসুমারী	.. 1579 (?)
অংক ও আখম খাঁর মৃত্যু	.. June, '62	দীন-ইলাহি ধর্ম প্রবর্তন	.. 1582
জিজিয়া-কর কন	.. Mar, '64	এলাহাবাদ-অভিযান	.. 1583
নদর চৈন-এর পতন	.. Oct, '64	লাহোরে রাজধানী স্থানান্তরিত	.. 1585
বালেশ্বর-কুমারীকে বিবাহ	.. Sep, '65	ফৈজির মৃত্যু	.. 1595
আল্লা-কিল্লায় ভিত্তিস্থাপন	.. 1565	সেলিমের বিদ্রোহ, আব্দুল ফজলকে হত্যা	.. 1602
সেলিমের জন্ম	.. Aug, '69	পিতাপুত্র পুনর্মিলন	.. 1604
হুমায়ূনের জন্ম	.. June, '70	আকবরের মৃত্যু	.. 1605

বাদশাহী জমানায় বিবাহের উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ : রাজনৈতিক প্রয়োজনে ও উত্তরাধিকারার্থে। জৈবিক প্রয়োজনে বিবাহিত-পত্নী নিতান্ত 'অধিকন্তু ন দোষায়'; কারণ হারেসে সে উপকরণ পর্যাপ্ত। এই বাতাবরণে এক বিচিত্র ব্যতিক্রম আকবর-জননীর বিবাহ—তিনি প্রেম পড়ে বিয়ে করেছিলেন।

হুমায়ূনকে তখন বাঘে তাল্লা করেছে! শের খাঁর হস্তে পরাজিত আবদুল-তনয় এসে তাঁর গাড়লেন সিন্ধু নদের তীরে এক অখ্যাত গ্রাম 'রোহরি'-তে। হুমায়ূনের দুই বেগম—বেগা বেগম ও হাজী বেগম তখনো শের খাঁর অধীনে বন্দিনী; যদিও হুমায়ূন তখনও হয়তো জানেন না যে, শের তাঁদের যথোচিত মর্যাদার সঙ্গে আপন হারেসে আতিথ্যসেবা করছেন; আঁচরেই তিনি সম্মানে তাঁদের ফেরত পাঠাবেন। সৈন্যসামন্তদের সেই রোহরি-গ্রামের অস্থায়ী ছাউনিতে রেখে একজন মাত্র দেহরক্ষীকে সঙ্গে নিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে হুমায়ূন ছুটেছেন 'পাতাড়', সিন্ধু নদের অববাহিকা ধরে প্রায় একশ' মাইল দক্ষিণে। সেখানে তাঁর ছোট ভাই মীর

হিন্দালের আস্তানা—যে ভাইকে তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন, এবং যে ভাই তাঁর চরম বিপদের সময় মৃত্যু ফিরিয়ে ছিল। সেখানেই হিন্দালের ছাউনিতে চার চক্ষুর প্রথম মিলন। হুমায়ূনের বয়স তখন তেত্রিশ পার হয়েছে আর হামিদা বানু বেগম মাত্র চৌদ্দ বছরের কিশোরী। বানু বেগমের আশ্বাজান মীর বাবা দোস্ত ছিলেন হিন্দালের একজন উচ্চপদস্থ সিপাহ-সালার—জাতে ইরানী। হুমায়ূন আকৃষ্ট হলেন অক্ষুণ্ট পশ্মকোরকের মতো ঐ অনাঘাতা ইরানী কিশোরীর সৌন্দর্যে। আশ্চর্য! বানু বেগমও মৃত্যু হলে এই প্রায়-প্রৌঢ় পরাজিত প্রান্তন সুলতানকে প্রত্যক্ষ করে। মীর বাবা দোস্ত এবং তাঁর পত্নীর ঘোরতর আপত্তি ছিল; থাকতেই পারে—হুমায়ূন পরাজিত, পলাতক, যে-কোনো মর্হুর্তে শের খাঁর গুপ্ত-ধাতক তাঁকে হত্যা করতে পারে। তাছাড়া দুজনের বয়সেও যথেষ্ট ফারাক; কিন্তু দেখা গেল ওরা দুজনেই সঙ্কল্পে দৃঢ়। গুসলীম-বিবাহে ধর্মতঃ পিতামাতার ইচ্ছা-আনুজ্ঞা বা অনুমতি অবান্তর—মিঞা-বিবি রাজী,

তো ক্যা করেরা কাজী?' হুমায়ূন অনাটিকালম্বেই বান্দ বেগমকে বিবাহ করলেন (14 Aug, 1541)। ফলে, হিন্দালের আশ্রয় ত্যাগ করতে হল তাঁকে।

প্রায় বছরখানেক হুমায়ূন মিথ্যা আশ্বাসের মোহে মাড়ওয়ার-যোধপুরে ছোটোছোটো করলেন। রাজপুত রাজন্যবর্গকে দোষ দেওয়াও চলে না; তত্ত-তাউসে আসীন হয়েই শেরশাহ্ এমন দৃঢ়মুদ্রাটতে শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন যে, সমগ্র রাজপুতানা সম্মুখে নিয়োছিল তখন হুমায়ূনকে সমর্থন করা হবে নিতান্ত বড়বাকি। হুমায়ূনের অনুগামীরা একে একে সরে পড়তে থাকে। যে-কোনো দিন তিনি শেরের গদুস্ত-হসীসীমূনের হাতে খুন হয়ে যেতে পারেন! পূর্ণগর্ভা বেগম-সাহেবাকে নিয়ে হুমায়ূন যোদিন অমরকোটে হাজির হলেন সেদিন তামাম হিন্দুস্থানের প্রাক্তন-মালিকের সহচর মাত্র নয়জন।^১ অমরকোটের রাজা সংবাদ পেলেন, বাবুর-বাদশাহ্ পুত্রবধু পান্থশালায় প্রসবেদনায় কাতর। তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁদের আহবান জানানেন দুর্গমধ্যে। শেরশাহ্-র ভয়ে অমাত্যবর্গ নিষেধ করেছিল, রাজা কর্ণপাত করেননি। সেখানেই হামিদা বান্দ বেগমের গর্ভে জন্ম নিলেন ভারতীতিহাসের সেই বিস্ময়কর পুরুষটি।

হামিদা বান্দ বেগম পরবর্তীকালে আকবরের হারেম প্রচণ্ড প্রভাব ফেলেছেন। হুমায়ূনের অপরা মহিষী হাজী বেগম ছিলেন একটু আত্মনিমগ্না। কিন্তু এ-সব কথা বলার পূর্বে প্রবেশ্য আকবর-জমানায় হারেম-ভুক্ত কয়েকজন প্রধানা মহিলার হক-হাদিশ্ এখানে লিপিবদ্ধ করতে চাই। ইতিহাসে মহিলাবন্দ স্বতই উপেক্ষিত। আগেই বলেছি, জাহাঙ্গীর তাঁর সুদীর্ঘ আত্মজীবনীতে গর্ভধারিণী জননীর নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেননি! জাহাঙ্গীরের পূর্বে আকবর-বাদশাহ্-র যে যমজ-সন্তান হয়েছিল—যার মাত্র এক-মাস বয়সে মারা না গেলে হয়তো হিন্দুস্থানের তত্ত-তাউসে আসীন হত, তারা যে কার গর্ভজাত তার হাদিশ্ আমি আজও সঠিকভাবে উদ্ধার করতে পারিনি। ফতেপুর-সিক্রি ও আগ্রার জেনানা-মহালে ইমারৎ-গদালিকে সনাক্ত করার প্রয়োজনে ইতিহাস তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি এবং বারে বারে বড়বক্ বনোছি। 'মরিয়াম' নাম দুজনের—আকবরের মা ও পত্নী: ফলে গলৎ হতেই পারে। আপনারাও যাতে আমার মতো বে-ওকুফ্ না বনেন, তাই 'আকবর-স্থাপত্য' নাটকে জেনানা-মহালের কুশীলবদের প্রথমেই সনাক্ত করে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

হাজী বেগম : হুমায়ূনের মহিষী, শিখি শেরশাহ্-র হাতে বন্দী ও পরে বড় হন। হুমায়ূন-সমাধি এঁরই স্ত্রীধনে নির্মিত। পরে হীন হজ করেন। মক্কা থেকে ফিরে 1582 সালে মারা যান। আকবর এঁকে মাতৃজ্ঞানে শ্রদ্ধা করলেন।

হামিদা বান্দ বেগম : মীর বাবা দোস্ট্ ওয়ফে আলি আকবর জামির কন্যা এবং আকবরের গর্ভধারিণী জননী। হুমায়ূন মক্কার এঁর সমাধি। হারেমের তাঁর পরিচর 'মরিয়াম মকানী' (বীশুজননীর সমতুল্য)। ফতেপুর-সিক্রিতে 'সুন্দহারা মকামে' থাকতেন। আকবরের মৃত্যুর মাত্র একবছর আগে মারা যান।

বেগা বেগম : হুমায়ূনের অপরা মহিষী। হুমায়ূন-সমাধিতে এঁর কবর।

গুলবদন বেগম : বাবুরের কন্যা, অর্থাৎ আকবরের পিসি। হামিদার চেয়ে দু-চার বছরের বড়: হামিদার অন্তরঙ্গ বান্ধবী, একই সঙ্গে থাকতেন। ফার্সিতে আলিম, অত্যন্ত বিদূষী। হুমায়ূনের প্রামাণিক জীবনী 'হুমায়ূন-নামা' রচনা করেছেন: মিসেস্ বিভারিকৃত তার অনুবাদ আছে। 'সুন্দহারা মকামে' প্রায়শই থাকতেন। বিরাশী বছর বয়সে, আকবরের মৃত্যুর মাত্র দু-বছর পূর্বে এঁর এন্তেকাল হয়।

রুখিয়া বেগম : হুমায়ূনের দ্রাভা হিন্দালের কন্যা। আকবরের প্রথম স্ত্রী। বিবাহ : 1551; গ্রন্থ-কারের অনুমানে ফতেপুর-সিক্রিতে তথাকথিত বীরবল-প্রাসাদে থাকতেন। তার পূর্বে, অর্থাৎ ঐ মহল তৈরী হবার পূর্বে, 'তুর্কি-সুলতানা' মহলে থাকতেন। নিঃসন্তান। শাহ-জাহাঁকে মানুষ করেন।

সালিমা বেগম : আবদাল্লা খান মৃগল (যিনি ছিলেন হুমায়ূনদ্রাভা কামরানের শ্যালক)-এর কন্যা। আকবরের দ্বিতীয়া মহিষী। বিবাহ : 1557। গ্রন্থকারের অনুমান—ইনিও বীরবল-প্রাসাদের অপরাংশে থাকতেন। ইনি মুরাদের জননী।

মরিয়াম জামানী : আকবরের প্রধানা মহিষী। বিবাহ : 1562; অম্বররাজ ভারমলের কন্যা ও জাহাঙ্গীরের গর্ভধারিণী জননী। কন্যার পিতামাতার উদ্যোগে কোনো হিন্দু কুমারীর এই প্রথম উল্লেখযোগ্য মুসলমান বিবাহ। ফতেপুর-সিক্রিতে যোধপুরী প্যাঙ্কসে থাকতেন।

সালিমা সুলতানা : হুমায়ূনের ভাগিনেরী, ফার্সী-কবি। কয়েকটি ফার্সি কাব্যের রচয়িতা।

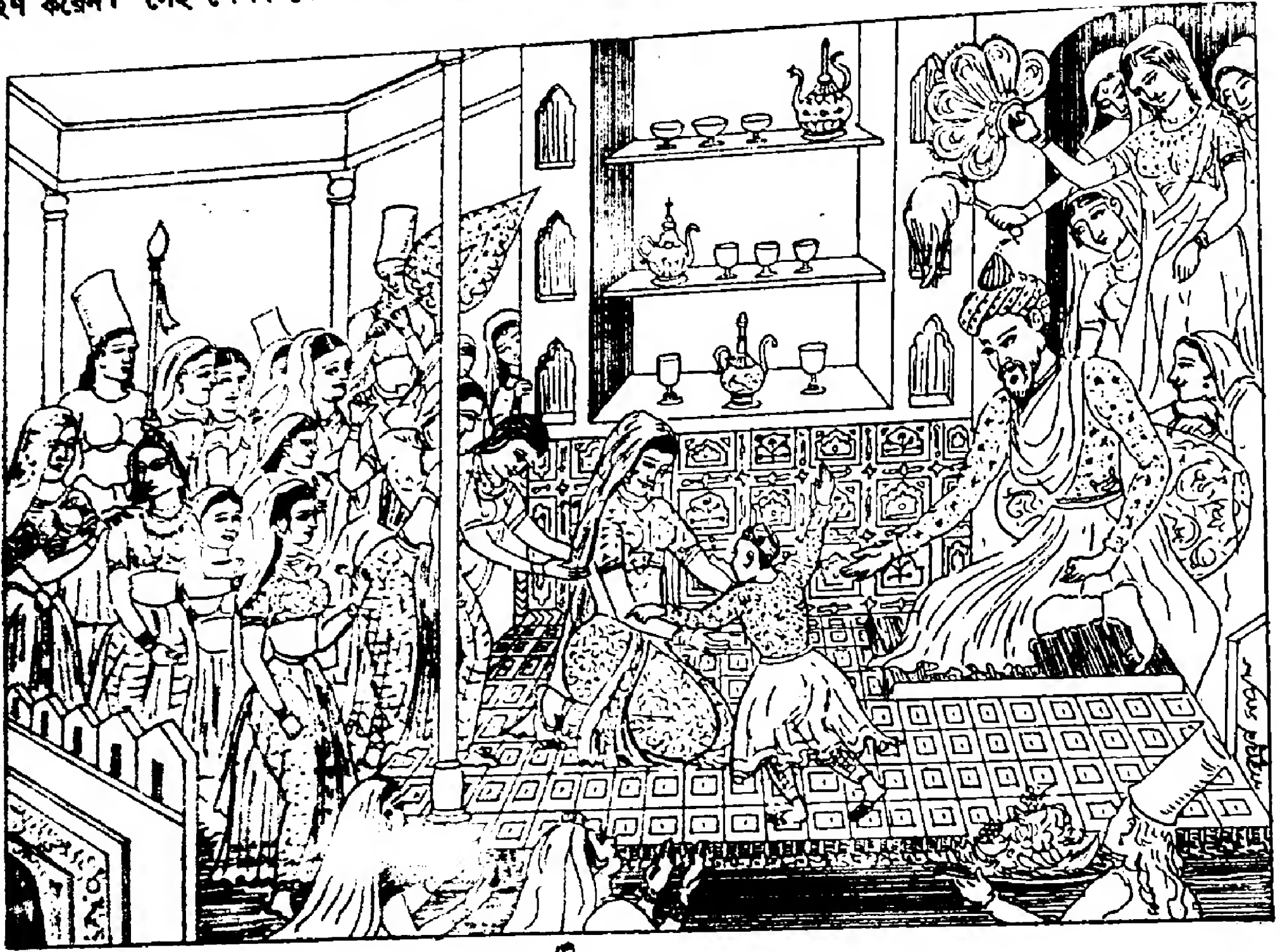
আকবর কতগুলি বিবাহ করেছিলেন এ-বিষয়ে ঐতিহাসিকেরা একমত নন। কেউ বলেন সাত, কেউ বলেন বেশি। প্রধানা করেকজনের কথাই শব্দ বলা হল।

শিশু আকবরকে তার খুড়ীমা সুলতানা বেগমের (হুমায়ূনপ্রাতা আশ্কারীর পত্নী) হেপাজতে রেখে হামিদা বানু তাঁর স্বামীর সঙ্গে পলাতকজীবনে অংশগ্রহণ করেন। সেই শৈশব থেকেই আকবরের জীবনে

কথা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি (চিত্র—6.5)।

শিশু আকবরের জীবনের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করব, যদিও তা আপাত-বাহুল্য। এসব তথ্য সাধারণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না ; তাছাড়া আংকা ও আধম খাঁর সমাধিসৌধ দর্শনকালে তথ্যগুলি আমাদের রসোপলব্ধিতে সাহায্য করতে পারে।

শিশু আকবর ততদিনে আশ্কারীর পরিবার থেকে কামরানের হেপাজতে এসেছেন। তখন তাঁর



চিত্র—9.1 শিশু আকবর ও জননার পুনর্মিলন।

[আকবর-নামার মূল-পেইন্টিং অনুসরণে আঁকিত। স্বীকার্য : যে কপি থেকে এঁকেছি তাতে হুমায়ূন, কান-কোম ও আকবর কতটি অন্যান্য চরিত্র ক্রমশঃ অস্পষ্ট। ফলে কল্পনার আগ্রসে সেগুলি মূল-শৈলীতে পাদপূরণ করেছি।]

অঁকিত হয়ে পড়েন তিনজন কবি, বাদির প্রসঙ্গ আলোচনা করতে হবে আকবরী-স্বাপ্নতো ; এঁদের দুজন যতেন আকবরের খাইলা ; বাদির বৃক্কের দৃশ থেকে আকবর হুমায়ূন-প্রাতা আপা এক জীজী আপা। আর তৃতীয় জন বীর সামসউদ্দীন গজনারিত, কীজীর স্বামী, বাদিক আমর পুর তাঁর উপাধি আংকা খান নামে অভিহিত করব। প্রসঙ্গতঃ কাল রাশি, মাহমুদ আপার পুত্রের নাম আমর খান, বীর সমাধিসৌধের

করস মাত্র চার। হঠাৎ সংবাদ এল কাবুলযুদ্ধে নাকি হুমায়ূন হত। কামরান তৎক্ষণাৎ সিম্বান্তে এলেন—হুমায়ূনের যা-কিছু আছে হাতাতে হবে। শিশু আকবরকে বন্দী করে কামরান ঘোষণা করলেন, তিনিই বাবুর-কাদ্শার অবশিষ্ট সন্তানদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ, ফলে হিন্দুস্থানের তত্ত-তাউসের হক্ হিস্যাদার। হুমায়ূন বাস্ঠবে আহত হয়েছিলেন মাত্র ; মাস দুয়েকের মধ্যে সুস্থ হয়ে সৈন্য এসে উপস্থিত হলেন। কামরানের

কিল্‌জা আক্রমণের উদ্যোগ করতেই নজরে পড়ল দুর্গ-প্রাকারের সর্বোচ্চস্থানে দাঁড়-দিয়ে বাঁধা আছে একটি শিশু, আর তাকে এক হাতে জাপটে ধরে 'অপর হাত নেড়ে নেড়ে একটি মহিলা কী-যেন চিৎকার করে বলছে। ইতিপূর্বেই কামান দাগার হুকুম হয়েছিল। হুমায়ূন ছুটে গিয়ে কামানের মুখ ঘুরিয়ে দিলেন। অগ্নিস্পর্শে কামান গর্জে উঠল ঠিকই, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। বলা যায়, প্রায় অলৌকিকভাবে রক্ষিত হল শিশু আকবরের প্রাণ। আকবরকে আড়াল করে এবং মৃত্যুকে তুচ্ছ করে যে মহিলা কামান দাগতে নিষেধ করেছিলেন তিনি ঐ শিশুর ধাইমা : মাহমুদা আঙ্গা।^২

তবু যুদ্ধ হল। কামরানের 'ও কুমারী তোর জলকে নেমেছি' খেলায় এবারও হার হল। জান-মান নিয়ে তিনি খিড়কি দরজা দিয়ে পালাবার পর হুমায়ূন কিল্‌জা ফতে করলেন।

এর পরেই ঘটল দ্বিতীয় একটি কৌতুককর ঘটনা। আকবর ও তার মায়ের পুনর্মিলন।

মাত্র একবছর বয়সে আকবর মাকে ছেড়ে অন্যত্র মানুষ। হারেমে মহিলাবৃন্দের কৌতূহল হল জানতে যে, আকবর তার অদেখা মাকে ঠিকমতো চিনে নিতে পারে কিনা। আবদুল ফজল বলছেন^৩, হারেমে একটি কামরায় দশ পনের জন সমবয়সী ঔরং প্রায় একই রকম সাজ-পোষাক পরে বসেছিলেন। হামিদা বানুর মাথায় তাজ বা পরিধানে অন্য কিছু ছিল না, যাতে তাঁকে হুমায়ূন-মহিষী বলে সনাক্ত করা যায়। মাহমুদা আঙ্গা শিশু আকবরকে হাত ধরে সেখানে পৌঁছে দিয়ে বললেন, ঐ ঔদের মধ্যে তোমার আম্মাজান বসে আছেন, খুঁজে নাও দিকিন!

কঠিন পরীক্ষা। চার বছরের শিশু, মাকে খুঁজিয়েছে মাত্র এক-বছর বয়সে। ফটো দেখেই কখনো, গল্প শুনেছে মাত্র। অথচ একঘর মহিলার সম্মুখে নিজের মাকে না চিনতে পারাও যে বড় লজ্জার—সে বোধটুকুও হয়েছে তার। ডগর দুটি চোখ মেলে বালক একবার দেখে নিল গোল-হয়ে বসা মহিলাবৃন্দকে। তারপর ম্যাগনেটিক-কম্পাস যেমন দুলাতে দুলাতে এক সময়ে থেমে যায়, ঠিক সেইভাবে স্থির লক্ষ্যে তাকালো একটি অসামান্য সূন্দরীর দিকে। এক ছুটে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর বৃকে। কাঁচুঙ্গীর উপর মুখটা চেপে ধরে বজ্জলে, তুমিই আমার মা! তাই না?

বানু বেগম ওর মুখটা চুমায় চুমায় ভরিয়ে দিয়ে বললেন, কেমন করে চিন্‌লি ষোকা?

কেমন করে চিনলেন আকবর? আবদুল ফজলের ব্যাখ্যা : এ হচ্ছে ডাবিয়াৎ বাদশা, দীন-ইলাহীর হবু

প্রবর্তক জালালউদ্দীন আকবরের 'গুংগা' ঘোষণা। তিনি এতই অভিভূত সে, তাঁর জীবনীর ঐ পৃষ্ঠায় একটি ছবিও যোগ করেছেন (চিত্র-৭.১)। ঘটনা যদি সত্য হয়, তা হলে এটাকে অলৌকিক বলে মনে করার কিছু নেই। পোষাক পরিচ্ছদ একরকম হলেও পুত্র-স্নেহবাণিতা জননীর অন্তরেও যে চৌম্বকশক্তি সঞ্চারিত হয়েছিল তা কি তাঁর মুখে রেখাপাত করেনি?

এই প্রসঙ্গে গানে পড়ছে, পরিণত কয়সে ম্বরং আকবরও একটি অশ্রুত পরীক্ষা করেছিলেন—চারবছর বয়সে শিশুর মানসিকতা তোল করতে। সে-কথা কল, ফতেপুর-সিক্রিতে, আকবর নির্মিত 'গুংগা-মহলের প্রসঙ্গে। আমি ভুলে গেলে, আপনারা আম্মাকে মনে করিয়ে দেবেন।

শেরশাহ-র অযোগ্য বংশধরদের হাত থেকে হুমায়ূন তাঁর হতরাজ্য উদ্ধার করে যখন দিল্লীতে পুনরায় প্রবেশ করলেন (July, 1555) তখন আকবরের বয়স তের। আর বোদিন পুরানা কিল্‌জায় সিঁড়ি থেকে পড়ে মারা গেলেন সে সময় আকবর বৈরাম খাঁর হেপা-জতে পঞ্জাবে। হুমায়ূন যে মারা গেছেন এ খবর সংজ্ঞাপনে রাখা হল। দ্রুতগামী গুস্তচর ছুটে বৈরামকে গোপনে সংবাদ দিতে; আর প্রতিদিন সকালে পুরানা কিল্‌জার দেওয়ানী-আমের করোকর তাজ পরে, জোন্ডা জড়িয়ে কৃষ্ণ হুমায়ূন প্রজাবৃন্দকে আশীর্বাদ করে গেলেন। লোকটার নাম মোল্লা বক্শি—তার একমাত্র গুণ, তাকে দেখতে হুবহু হুমায়ূনের মতো!

বৈরাম খাঁ এক অসামান্য চরিত্র। আকবরের প্রথম জীবনের ইতিহাসে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে (1556) আদিলশাহ শূরের মন্ত্রী হঠাৎ-সুলতান হিমুকে পরাস্ত করে বৈরামই আকবরের বাদশাহীর সূচনা করেন। তিনিই তাঁর অভিষেকের যাকতীয় আয়োজন করেন।

আকবর তের-চৌদ্দ বছর বয়সে বাদশা হলেন। বৈরাম তাঁর অভিভাবক। কিন্তু বছর পাঁচেকের মধ্যেই বৈরামের সঙ্গে কিশোর আকবরের মতপার্থক্য দেখা দিল। বিরোধের নয়টি হেতু দেখিয়েছেন আকবর-জমানার প্রামাণিক ইতিহাসকার।^৪ কিন্তু সে-সব ইতিহাস আমাদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। আকবর বৈরামকে একটি ব্যক্তিগত চিঠি লিখে তাঁকে মক্কা-তীর্থে রওনা হবার পরামর্শ দিলেন। ঐ পত্রেও তিনি বৈরামকে 'খান-বাবা' বলে পিতৃ-সম্বোধন করেছেন এবং যথেষ্ট মর্যাদা দিয়েছেন। বৈরাম স্বীকৃত হলে মক্কা যাওয়ার আয়োজন করতে থাকেন; হঠাৎ সামান্য জ্বর বোকা-বৃকিতে বৈরামের মৃত্যু বজলার এবং তিনি বিদ্রোহ করে

যেসেন। আকবর এ বিদ্রোহ দমন করে বৈরামকে বন্দী করেন। কিন্তু তিনি তাঁকে পুনরায় সমস্মানে মৃতি দিয়ে মক্কায় চলে যাওয়ার পরামর্শ দেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ মক্কা যাবার পথে অততায়ীর ছুরিকায় বৈরাম নিহত হন। এ কাজে আকবরের কোনো হাত ছিল না। বরং তিনি বৈরামের স্ত্রী-পুত্রকে ফিরিয়ে আনেন। বৈরাম পুত্রই সুবিখ্যাত পণ্ডিত আবদুর রহিম খান-ই-খানান, যিনি বাবরের চুগতাই তুর্কীতে লেখা আত্মজীবনী সহজবোধ্য ফার্সীতে অনুবাদ করেন এবং যার সমাধি আমরা খুঁটিয়ে দেখব একটি বিশেষ কারণে।

বৈরাম-বিতাড়ন নাটকের নেপথ্যে যে চক্রান্ত হয়েছিল তার প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ দুটি চরিত্র আমাদের অপরিচিত নন—মাহমুদ আগা এবং তাঁর পুত্র আধম খান। মাহমুদ আগা সম্রাটকে প্রাণাধিক ভালোবাসতেন ; তাঁর বিশ্বস্ততার বিষয়ে কেউ কোনদিন সন্দেহ প্রকাশ করেননি। কিন্তু তাঁর একটা চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ছিল—বাদশাহী রাজনীতির জটিল ঘূর্ণাবর্তে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার উগ্র বাসনা। নিশ্চয়ই তার বনিয়াদে ছিল উচ্চাশা ; কিন্তু তা আকবরকে অতিক্রম করে নয়। অপরপক্ষে মাহমুদ আগার পুত্র আধম খান ছিল বে-পরোয়া, মৃশকিল-পসন্দ, অসম সাহসিক বোম্বা অথচ ইন্দুরাসক্ত, নীতিজ্ঞানহীন এবং নিষ্ঠুর। তাঁদের প্রসঙ্গে এখনই আসব।

ইতোমধ্যে—অর্থাৎ বৈরাম-বিতাড়নের পূর্বসূর্যেই একসময় আকবর ষমুনা বেয়ে কজরাচেপে এসে হাজির হলেন আগ্রায় (Oct, 1558)। তখনও আগ্রা-কিল্লার পরদা হয়নি : উনি এসে উঠলেন সিকান্দার লোদী নির্মিত ‘বাক্সগড়’ দুর্গে। এখান থেকেই তিনি গোয়ালিয়র, মালোয়া, রণথম্ভোর প্রভৃতি অভিযানের আয়োজন করেন।

বৈরামের বিদ্রোহের সময় আকবরকে বাধ্য হয়ে দিল্লীতে ফিরে আসতে হয়। তিন-চার জনকে উনি পর পর প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করলেন : এমন কি ম্বয়ং মাহমুদ আগাকেও কিছুদিন, বোখড়াবে। কিন্তু মনোমত হল না। বৈরামের শূন্যস্থান পূর্ণ করার মতো উপযুক্ত লোক পাওয়া কঠিন। মাহমুদ আগা চেরে-ছিঙ্গেন, আকবর তাঁর পুত্র আধম খাঁকে ঐ উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করুন। কিন্তু আকবর ঐ বে-দরদী জঙ্গী মানুসটির হাতে তামাম হিন্দুস্থানের শাসনদায়িত্ব দিতে স্বীকৃত হলেন না। পরিবর্তে জীজী আগার স্বামী গজ্জনবীকে করলেন ‘আংকা খান’ অর্থাৎ চীফ সেক্রেটারী। আধমকেও বঞ্চিত করলেন না তা বরং তাকে সেনাপতি করে পাঠিয়ে দিলেন মালোয়া জয় করতে।

মালোয়ার তদানীন্তন অধিপতি বাজ বাহাদুর সে-আমসের হিন্দুস্থানে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। শৌর্য-বীর্যের জন্য নয়, সম্পূর্ণ অন্য কারণে। কারও কারও মতে সঙ্গীতসম্রাট তানসেনের তিনি পূর্ব-সূরী—এমনই ভারত-বিখ্যাত সূর্যশ ছিল তাঁর সঙ্গীত জগতে। আকবরী দরবারে তখনও সঙ্গীত প্রবেশ করেনি, তানসেন অনাগত, সেই প্রাক-তানসেনী জমানায় বাজ বাহাদুর গীতভারতীর বরপুত্র। তাঁর দরবারে সেনাপতির চেয়ে সঙ্গীতজ্ঞের কদর বেশি। আর সবার চেয়ে খ্যাতি ছিল এক অসামান্য বাঈজীর : রূপমতী!

অনিন্দ্যসুন্দরী রূপসী এবং অসামান্য গায়িকা। বাজ বাহাদুর নাকি তার মহম্মতে বাওরা। বাঈজী কিন্তু হারমে থাকতে রাজী হয়নি ; নগরপ্রান্তের নির্জন নদীতীরে নিভৃত মঞ্জিলে বাস করত সে। মধ্যরাতে সহসা সেখানে আবির্ভূত হতেন বাজ বাহাদুর, দরবারী-কানাড়া শুনবার বাসনা হলে ; অথবা শেষ রাতে—রামকেলীর আকর্ষণে। কারণটা বড়ই বিচিত্র—দুজনেরই বিশ্বাস : বিরহ নাকি শূন্য মহম্মতেরই নয়, সঙ্গীতেরও অন্যতম উপজীব্য!

এ-হেন কিম্বদন্তি রাজ্যে বাদশাহী ফৌজ নিয়ে বীরদর্পে আবির্ভূত হল আধম খাঁ আর পীর মহম্মদ—যেন কুমোরের দোকানে জোড়া বলিবর্দ! বাজ বাহাদুর তানপুরা-বীণা-রবাবের ভিতর থেকে কোনোক্রমে খুঁজে বার করলেন তাঁর মরিচাধরা তলোয়ারখানা। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। ধন-দৌলত, ইমান-ইজ্জৎ বিসর্জন দিয়ে পালিয়ে গেলেন খান্দেশের দিকে।

বিজয়োন্মত্ত আধম আর পীর মহম্মদ মালোয়ায় যে অকথ্য অত্যাচার চালালো তার বর্ণনা দিয়ে গেছেন প্রত্যক্ষদর্শী ঐতিহাসিক “ওরা দুজন বসেছিল সুউচ্চ মণ্ডের উপর, আর হতভাগ্য মালোয়াবাসীদের সার দিয়ে নিয়ে আসা হাচ্ছিল কুরবানী করতে। মৃত্যুভয়ে ভীত আত্ম নরনারীর চীৎকার শুনে ওরা দুজন হাসি-মশ্কারা করছিল। শেখ-সৈয়দদেরও নিষ্কৃতি মেলেনি।

আধম হুকুম জারি করে রেখেছিল—মুগলসৈন্য মালোয়ার যৌবনবতীদের ইচ্ছামতো দখল করতে পারে, শূন্য যদি রূপমতীকে জীবন্ত ধরতে পারা যায় তাহলে কেউ তার গাত্রস্পর্শ করবে না। তাকে পেঁপে দিতে হবে ম্বয়ং সিপাহ-সালারের শিবিরে।

হত্যা-উৎসব শেষ হল রাণির তৃতীয় যামে। ক্রান্ত অবসর রক্তমাখা অধম শয়্যাগ্রহণের উপক্রম করছে, ঠিক তখনই এসে জবর খবর : রূপমতীকে জিন্দা পাওয়া গেছে!

উৎসাহে চারপাইয়ের উপর উঠে বসল আধম : তব
লাও বহু ছুঁকরিকো !

দুই মৃগলসৈন্য দুই বাহুদল ধরে নিয়ে এল
বন্দিদানীকে। রূপমতীর ঘাঘরা ছিন্নভিন্ন, ওড়না খসে
গেছে, কাঁচুলি স্থানচ্যুত। তার কপালে রক্তের ধারা।
আধম অবাক বিস্ময়ে দেখছিল তাকে—একই অঙ্গে এত
রূপ !

কে-যেন বলেছিল—পানের পিক যখন ওর কণ্ঠ-
নালী দিয়ে নামে তখন ঐ কোকিলকণ্ঠীর কণ্ঠ নাকি
রক্তিম হয়ে ওঠে। আধমের মনে হল, কথাটা
হয় তো মিথ্যা নয়।

বন্দিদানীকে সিপাহ-সালারের সম্মুখে রেখে দুই
সৈনিক কুর্নিশ করে নিষ্কান্ত হল।

শিবির নির্জন হলে নতনৈ বন্দিদানী তার হরিণ
নয়ন দুটি তুলে একবার তাকালো সেনাপতির দিকে।
সে দৃষ্টিতে মৃত্যুভয়ের আর্তি নেই কিন্তু। আধম
বললে, তোমারই নাম রূপমতী ?

প্রথা মারফিক আদাব জানালো বাঈজী। যার নীরব
ভাষ : জী হাঁ, খোদাবন্দ !

গোঁফে চাড়া দিয়ে আধম বললে, শোন বাঈজী !
বেয়াদবী আমার বিলকুল লা-পসন্দ। রাতে যাকে
আমার বিছানায় উঠে বসার অধিকার দিই তার সতী-
পনা আমার বরদাস্ত হয় না। বেচাল দেখলে তোমার
ঐ কাঁচুলী-খসা বকের উপত্যকায় এই ছোরাখানি
আমূল বিশ্ব করে দিতে আমার হাত কাঁপবে না।

কিছু বদলে ?

রূপমতী একটি কুর্নিশ করে অস্ফুটে বললে,

‘বকুল-এ চুন মনীগর খাতিরং

খুশনুদ মী গরদদ।

বজায় মিন্নং ওয়ালি টেঘ-ই-তু দন

আলদ মী গরখুদ ॥*

কিছু বদলেন ?

আধম ফাসী না জানে তা নয়, কিন্তু কাব্যমাধুর্য
শিরস্চাগ ভেদ করে ওর মগজে প্রবেশ করতে পারল
না। বললে, সোজা ভাষায় বল, কী বলতে চাও ?

—সোজা ভাষায় তার অর্থ—আপনার শারীন্-
জবানে আমি বে-হুঁস ! কিন্তু খোদাবন্দ ! আমি
বাকিরা নই, বাঈজী, সুরং আর জওয়ানি নিয়েই
আমার মহন্বতের বেসাতি। আর জ্ঞানি গাইতে, নাচতে,

* ‘খুন-খারাবির রঙ-ডামাশায় খেলতে হোলা চাও ?
খুশ হবে কি গুপ্তখানা বিধলে বকে ? দাও !
তোমার খুশেই হই খুশিয়াল, ডয় শখ মোর দিলে
খুন-কলশেক লিন্ত হবে তোমার ছোরাটাও ॥’

সুর ও সুরার ডানমতীতে কেহনু পয়দা করত !
তাঁই আমি তানতে চাইছি মৃগল সেনাপতির ‘অতি-
রুচিটা কী-জাতের ? মালোয়ার রাজ্যের শ্রেষ্ঠ নটী
রূপমতীকে তার স্বমহিমার পেতে চান, না কি রক্ত-
মাখা একটা বিবস্ত্রা নারীদেহ দর্শন করতে চান ?

মৃত্যুর মৃত্যুমুখ দাঁড়িয়ে কোনো মরমানুষের
মুখে এমন মর্মান্তিক স্পষ্টভাব কখনো শোনেনি অধম।
সবিস্ময়ে বললে, তুমি খুশ-দিলে আমাকে গান
শোনাবে ? নাচ দেখাবে ?

খিলখিলিয়ে হেসে উঠল রক্তক্ষরী নটী। বললে,
এইমাত্র কি বললাম, শুনলেন না ? আপনার খিদ্মত-
গারদের বলুন না নিয়ে আসতে—ঘুঙ্ঘট, তানপুরা,
বাঁয়া-তব্লা—আমি এই জঙ্গীছাউনিতেই কেহনু
পয়দা করব !

আধম বললে, বহুং খুব ! এখানে নয়। কাল
সূর্যাস্তকালে তোমার মঞ্জিলে যাব, দেখব মেহমানকে
কেমন আদর-আশায়ন করতে পার। গান শুনব,
নাচ দেখব, আর...

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে পাদপূরণ করল বাঈজী,
সিরাজি পান করব, আর...

আর ?

আভূমি নত হয়ে আদাব জানাবার অছিলায় মুখ
লুকিয়ে বাঈজী অস্ফুটে বললে, আর পরখ করে
দেখব, সেটা কী জিনিস, যা সিরাজির চেয়েও নেশা
ধরায় !

বাকপটু বাঈজীর সঙ্গে রসালাপ দীর্ঘতর
করার হিম্মৎ নেই কস্তুতান্তিক অধম আধমের।
প্রহরীকে ডেকে বললে, একে এর ডেরায় পৌঁছে দিয়ে
আয়। লেकिन হুশিয়ার, সেখান থেকে পালাতে না
পারে।

পরদিন শোণিতপিচ্ছিল মালোয়ার রাজপথে ঘোড়া
ছুটিয়ে মৃগল সেনাপতি এসে উপস্থিত হল বাঈজীর
মঞ্জিলে। আজ আর তার জঙ্গীপোষাক নয়, সাখা
অভিসারে সিপাহ-সালারের জামদার আশুরাখার
আতরের সুবাস, মোঁচ-এর প্রান্ত মোম দিয়ে পাকানো।
দেউড়িতে যে প্রহরী ছিল সে এগিয়ে এসে ধরল
ঘোড়ার লাগাম। বাঁদী চিরাগ-হাতে পথ দেখিয়ে নিয়ে
চলল অন্দর মহলে, মমর-অলিন্দের শেষ প্রান্তে রাজ-
নটীর খাশ-কামরায়। বিধবস্ত নগরীর কোন্ মসজিদ
মিনার থেকে ভেসে আসছে শাম-ওয়াক্তের আজান-যেন
প্রিয়জনবিরহে কোন হতভাগোর বিলাপধ্বনি। পূর্ব-
বর্তিনী হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো ; কুর্নিশ করে নিঃশব্দে
তুলে ধরল একটি স্ভারপথের রেশমী পর্দা। ডান হাত-

খানা বাড়িয়ে দেয় ঘরের দিকে, বার অর্ধ : তসলিম রাখিয়ে।

সত্যক আখম খাঁর কেমন যেন মনে হল—এমনটা হবার কথা নয়, এতটা আপ্যায়ন, এতটা অভ্যর্থনা! ষষ্ঠ-ইন্দিরের নির্দেশে কোমরবন্ধ থেকে সমসের-খানা টেনে বার করল সে, স্মারপথে মাথা গলানোর পূর্বে। তার কেবলই মনে হচ্ছে, কোথায় কী-যেন একটা বিস্ময় তার জন্য ওৎ পেতে প্রতীক্ষা করছে!

না কক্ষের অভ্যন্তরে নেই কোনো প্রতীক্ষারত গুপ্তঘাতক। চৌকি সাদা-কালো মার্বেলের মেঝে, যেন দাবার ছক। নির্জন কক্ষের কেন্দ্রস্থলে চন্দন-কাঠের প্রকাণ্ড পালঙ্কে রূপমতী শায়িতা। তার ভিগলিটো দেখে চমকে উঠল আখম।

বাউজীর সর্বাঙ্গ আবৃত করে রাখা আছে একটি অস্বচ্ছ রেশমী চীনাংশুক—তাজা-খুনের বরণ, ঠিক ঐ পশ্চিম আকাশটার মত লালে লাল! যেন কাফন! পালঙ্কের ধারে পাশাপাশি দুটি মেজ। একটিতে ভূঙ্গার, চব্বক, সিরাজি, ভবক-দেওয়া সুগন্ধী পান, রেকাবিতে একজোড়া গোল্ডে মালা। সেটি মেহমানের প্রতীক্ষার প্রহর গুণছে। পাশের মেজ-এ ঠেশ্ দিয়ে রাখা আছে একটি প্রকাণ্ড তানপুরা, তার তারগুলো ছেঁড়া, আর সেই ছেঁড়া তারের গায়ে জড়ানো একখণ্ড কুন্ডলী-কাসকে মৃত্তোর মতো ভুগুরী হরকে কী-যেন জেগে!

বৃকটে আর বাকি রইল না কিছু! তবু হাত বাড়িয়ে সন্নিবে দিল আচ্ছাদনটা। রাজনর্তকীর মূখে মৃত্যুবন্দ্যুর কোনো স্বাক্ষর নেই। সে মূখে বিশ্ব-কিছিরিনীর হাসি।*

তানপুরার তারে জড়ানো চিঠিখানা তুলে নিল। বৃকটে অসংখ্য হর না—এটা তার জন্য নয়, সেই পল্লভক মালোয়ার-রাজের উদ্দেশ্যে ঝাঁজীর শেষ সম্ভাষণ—সেই যে পালঙ্কটা অমন সুন্দরীকে হারেম-জাত করিনি, বিবাহ-সঙ্গীতের দোহাই পেড়ে!

কিন্তু আখম খাঁর নীতিজ্ঞান অত প্রখর নয়—পরের পদ পড়তে তার সরস নেই কোনো। পড়ল, কিন্তু অর্থগ্রহণ হয় না কিছু!

“তুমি কো দারিনরাক গরদেদর্সে কুরসং নহী,
সবসে উলকত সতী মকাসেহি মতপং না সতী।
সে তুমজারি হু, রতী মোরে জিয়ে স্মা কম হু;
তুম মোরে হো কে রতী, য়ে মেগী কিস মং না সতী।
তুম মূখে কুলান্তি জায়ে, যে হক হৈ তুমকো,
সেরী বাত ঠের হৈ, সৈ তো মতকো কি হৈ ॥”

মালোয়ার নৃশংস খিয়নৎ-এর কথা আকবর বাদশার কানে উঠল। শূনে বাদশা শূদ্র সংক্ষেপে বললেন, বাহিনী সাজাও। আমি এখনই মালোয়া যাব।

শিউরে উঠল মাহম আঙ্গা। আকবরকে সে চেনে। তারই বৃকের দুধ খেয়ে আজ শিশু জালাল হিন্দু-স্থানের শাহ-য়েন-শাহ! ক্ষুরধার-বদ্বিধ মাহম আঙ্গার। তৎক্ষণাৎ দ্রুতগতি সংবাদবহ প্রেরণ করল মালোয়ায়। নির্দেশ দিল পত্রকে—এখন কী করতে হবে। আকবর মালোয়াতে উপস্থিত হতেই তাঁর চরণপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ল আখম খাঁ। অপহৃত ধনদৌলৎ উজার করে ঢেলে দিল সম্রাটের চরণে।

আকবর বললেন, তোমার মা পুত্রহীন হবে—শূদ্র সেজন্যেই এ-যাত্রা তোমাকে ক্ষমা করলাম। কিন্তু মনে রেখ, এই শেষ বার! তুমি তৈরী হয়ে নাও। আমার সঙ্গে আগ্রা ফিরে যাবে। মালোয়ার শাসন-দায়িত্ব তোমার হাতে রাখতে পারব না।

এর পরেই আকবর হজরৎ খাজা মৈনুদ্দীন চিস্তির দরগায় তীর্থ করতে যান। পথে রাজপুত কুল-তিলক অম্বররাজ ভারমল প্রস্তাব পাঠালেন, তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যার সঙ্গে আকবরের বিবাহ দিতে ইচ্ছুক। সম্রাট সম্মত হলেন। তীর্থ থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি অম্বর-কুণ্ডারীর পাণিগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, অম্বর রাজকন্যার ধর্মান্তরকরণ হয়নি। তিনি আজীবন হিন্দু দেবদেবীর পূজা-অর্চনা করেছেন। বোধকারি ইতি-হাসে তিনিই প্রথম মহিলা, যিনি মুসলমানের স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও হিন্দু! বিবাহের পক্ষকালের মধ্যেই সম্রাট এক ফরমান জারী করে আদেশ করেন, যদ্ব্যবস্থায় বন্দী হিন্দুদের কলপূর্বক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা চলবে না; পরাজিত সৈন্যদের স্ত্রী-কন্যাদের উপর কোনো অত্যাচার করলে কঠিন শাস্তি পেতে হবে। ইতিহাস দেয়নি, আশা করব আপনারা দেবেন প্রকৃত অধিকারী-কেই। আমি এই মানবিক আদেশের জন্য ধন্যবাদ দেওয়ার কথা বলছি; আকবরকে নয়, অম্বর-কুণ্ডারীকে।

এর পরেই আগ্রা-কিল্লাতে ঘটে গেল কয়েকটি ঘটনা, যা এত বিদ্রোহ-গতি যে, ইতিহাস তার কার্য-

* “দ.নিগাদারীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে

তোমার কোনো ফুরসৎ এখন নেই।

সবার সঙ্গে তোমার প্রীতির কখন, শূদ্র আমিই বাদ।

আমি যে তোমার, এটাই তো আমার তরফে শেষ কথা,

তুমিও সে আমার চলে, এমনটা আশা করি কিসের জোরে?

আমাকে কুল সাওয়ার ঢেক তোমার আছে;

জানি, জানি তা।

আমার কথা মনে!

আমি যে সীতল তোমাকে ভালবেসেছিলাম।”

কারণ সম্পর্কের ধরতাইটা ঠিকমতো ধরে রাখতে পারেনি। আংকা খানের উপর গাহম আঙ্গা এবং আধম খানের জাতক্রোধ ছিলই—বোধকারি আধম অনুমান করেছিল, তার মালোয়ার কীর্তিকাহিনী আর রূপমতীর কিসসা ঐ আংকাই সম্রাটের কানে তুলেছে। তা সত্য হলেও অন্যায় নয়—সে-কাজ মদ্য-সচীবের কর্তব্যভূক্ত। মোটকথা একদিন সকালে আংকা খান যখন আগ্রা-কিল্লার সদর-দফতরখানায় বসে কাজ করছেন তখন দূর্বীর বেগে দুই সহচরকে সঙ্গে নিয়ে হঠাৎ আধম খাঁ এসে হাজির। আধম খাঁ সিপাহ-সালার, তাই প্রহরীরা বাধা দেননি ; এমন কি দফতরের অন্যান্য কর্মচারী—মুনীম খাঁ, সিহারউদ্দীন প্রভৃতি সসম্মানে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। পদমর্যাদায় আংকা উচ্চতর ; ফলে গজ্জনবী শূদ্ধ চোখ তুলে তাকিয়ে দেখলেন, গাত্রোথান করলেন না।

আধম তার সহচর কুশম্ উজ্জবেককে কনুইয়ের এক গোঁড়া মেরে বললে, কী দেখাছিস বড়বকের মতো ? এই তো সেই বেইমান ! কাজ হাসিল কর !

উজ্জবেক বিনা বাক্যব্যয়ে তার ছুরিটা আমূল বসিয়ে দিল আংকা খানের পাঁজরে ! হায় হায় করে উঠল সবাই। যন্ত্রণার চেয়েও যেন বিস্ময়ের অভিব্যক্তিটা বেশি—বৃন্দ আংকা খান টলতে টলতে উঠে দাঁড়বার চেষ্টা করলেন ; ঠিক তখনই কোষমুগ্ধ আধমের সামনের খানা আকাশে একটি ঈদের চাঁদ রচনা করল—আর আংকা খাঁর দেহচ্যুত মস্তক ছিটকে গিয়ে পড়ল দফতরখানার প্যাষণ-চত্বরে।

চিৎকার চেঁচামেঁচিতে ছুটে এসেছে সবাই। আধম ঘুরে দাঁড়ালো। রক্তরাঙা আলা-ই-মুহলিখানা তুলল মাথার উপর। সন্ত্রস্ত প্রহরীর দল পিছিয়ে গেল এক-এক পা। আধম লাফ দিয়ে নেমে এল নিচে ; রক্ত-শ্বাসে ছুটল খাশ-মহলের দিকে। সম্রাট তখন হারেমে।

হাতিয়ারবন্দু সিপাহ-সালারকে ঐভাবে ছুটে আসতে দেখে হারেমের খোজা প্রহরী নিজ বৃন্দ বিবেচনামতো রুদ্ধ করে দিল প্রকাণ্ড সিং-দরওয়াজা। আধম তরবারীর আঘাত করল রুদ্ধ কবাটে : ক্যারি খোল্ দো !

আকবর ছিলেন খোয়াবগাহ-এ। সোরগোল শব্দে এদিকেই আসছিলেন। কে একজন প্রহরী ছুটে এসে বললে, সর্বনাশ হয়েছে জাহাপনা ! সিপাহ-সালার আধম খাঁ নে হামারা আংকা খান-সাবকো জান-সে মার ডালা !

জান-সে মার ডালা ! বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন

সম্রাট। উম্মাদের মতো ছুটে গেলেন হারেমের নির্গমন-দ্বারের দিকে। সেই যে খোজা প্রহরী সিং-দরওয়াজা রুদ্ধ করেছিল সেই লোকটা বাধা হয়ে দাঁড়ালো। দরওয়াজার পিঠ দিয়ে দু-দিকে দু-হাত প্রসারিত করে রুদ্ধল সম্রাটকে। বজ্রাহত হয়ে গেলেন সম্রাট ! সামান্য খোজা-প্রহরী আজ তাঁর পথ রোধ করতে চায় ! এরা সম্বাই কি বিদ্রোহীদের দলে ! হৃৎকার দিয়ে উঠলেন তিনি : তোরা এত বড় স্পর্শ ! আমার পথ রুদ্ধছিল !

লোকটা আত্মীয় নত হয়ে কুর্নিশ করে কল্লে, দীন-দুনিয়ার মালেক ! আমি শূদ্ধ আপনাকে স্বরণ করিয়ে দিতে চাই—আপনি নিরস্ত !

কোমরবন্দু থেকে একটা বাঁকা ছুরি বার করে সে সম্রাটের পদপ্রান্তে নামিয়ে রাখে। তৎক্ষণাৎ পথ ছেড়ে তিন-পা পিছিয়ে যায়, কুর্নিশ করতে করতে।

দ্বার খুলে বেরিয়েই মৃখোমুখি হলেন আধম খাঁর। তার হাতে তখনো আংকা খানের রক্তরাঙা নাগ্ন তলোয়ার। সম্রাটের হাতে বিষম্প্রমাণ চোরা গোস্তা। আধম একটা চিতাবাঘের মতো লাফ দিয়ে পড়ল সম্রাটের উপর। ডান হাতে ধরা তলোয়ারটা সে কিন্তু ব্যবহার করেনি—শূদ্ধ বাঁ-হাতে বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরেছে শাহ-য়েন-শাহের দক্ষিণ মণিবন্দু ! চীৎকার করে ওঠে লোকটা : সমস্ত ব্যাপারটা আগে তলিয়ে দেখুন জাহাপনা ! আমার নামে আংকা মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল।

আধম খাঁর মায়ের যে অধিকার আছে, তার ভা নেই—সম্রাটের গাত্রস্পর্শ করার ! দূরন্ত ক্রোধে আকবর জ্ঞান হারালেন। দৈহিক শক্তি তাঁর অপরিসীম। মাত্র তের বছর বয়সে পানিপথের যুদ্ধক্ষেত্রে এক ক্ষেপে তিনি স্বহস্তে হিমুর মস্তক স্কন্ধচ্যুত করেছিলেন ! এখন তিনি বিশ-বছর বয়সের নওজোয়ান। বাঁ-হাতে প্রচণ্ড আঘাত করলেন আধম খাঁর দক্ষিণ মণিবন্দু—হস্তচ্যুত হল হাতিয়ার। কিন্তু আধম খাঁও মস্তহস্তীর কল রাখে তার দেহে—ইতোমধ্যে হস্তচ্যুত হয়েছে আকবরের ডান হাতের সেই ছোরাখানাও ! দুজনেই নিরস্ত ! দুজনেই অসীম বলশালী। ঈদের পারের কাছে পড়ে আছে একজোড়া হাতিয়ার। খন্দমুহুরের জন্য দুই রাজপুরুষ পরস্পরের দিকে নিঃসঙ্গ তাকিয়ে রইলেন—যেন আসন্ন কালবৈশাখীর পূর্বমুহূর্ত। সহসা বিদ্যুৎগতিতে আকবর মৃদুঘাত করলেন আধমের চিবুকে। ভূতলশায়ী হল যেন ভূধর ! তৎক্ষণাৎ তিন চারজন প্রহরী কাঁপিয়ে পড়ল ভূতলশায়ী লোকটার উপর।

আকবর বজ্রনির্ঘোষে বললেন, শুকে চাঙদোলা করে নিয়ে যাও ঐ পাঁচিলের উপর—ফেলে দাও নিচে !

দুর্গ-প্রাকার রাজপথ থেকে দশ মিটার উঁচু পাকা তিনতলা। নিচে শাহ্ন-বাঁধানো পাথরের চত্বর! নিঃসন্দেহে—এ মৃত্যুদণ্ড!

আধম চাঁৎকার করে উঠল মৃত্যুভয়ে।

ইতিহাসকার আব্দুল ফজল দেখাছি উল্লেখ করতে ভুলেছেন—আধমের সেই মৃত্যুভয়-জ্ঞানত আত্মীর সঙ্গে মলোয়াবাসীর মৃত্যুভয়-জ্ঞানত চাঁৎকারের কোনো ধ্বনিসাদৃশ্য ছিল কিনা!

মৃত্যুতম্বে দুর্গ-প্রাকারের কুঞ্জর-অন্তরালে অবলম্বিত হল আধম খাঁর দোদুল্যমান দেহ।

আকবর কুংব মিনারের মতো নিশ্চল দাঁড়িয়ে ছিলেন বাহুবল্লবকে। যে প্রহরীটা আংকা খাঁর মৃত্যু-সংবাদ প্রথমে জানিয়ে ছিল, তাকে বললেন বন্ধুকে পড়ে দেখতে। প্রশ্ন করলেন, আতি তক্ জিন্দা হয়, ক্যা?

লোকটা কুনিশ করে বললে, জী হ্যাঁ, খোদাবন্দ! মখসুর! লোকিন জিন্দা।

আকবর তাকে আদেশ করলেন, তাহলে ওকে আবার উঠিয়ে নিয়ে আয়। আবার ছুড়ে ফেল! না মরলে, আবার! বতক্ষণ না তুই এসে আমাকে কলতে পারিস্ : মার নে বহ্ আধম খান-সাক্কো জ্ঞান সে মার ডালা।

একটু পরেই প্রহরীরা আবার চ্যাঙদোলা করে নিয়ে এল হতভাগ্য সিপাহ-সালারকে। লোকটা মখসুর, অর্থাৎ মারাত্মকভাবে আহত, কিন্তু জ্ঞান হারায়নি। স্থিতমুখ্য প্রাণাভিষ্কা চাইবার মতো বাক-ক্ষমতা তার ছিল না। একইভাবে তার দোদুল্যমান দেহটো দুর্গ-প্রাকার থেকে নিষ্কিন্ত হল রাজপথে। এবার পতন হয়েছে মাথা নিচু দিকে করে। চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে আধম খাঁর মস্তিষ্ক!

আকবর পিছন ফিরেই মৃথোমুখি হলেন তাঁর ধাই-মার। ঐতক্ষণে দুঃসংবাদ পেয়ে ছুটে এসেছেন মাহম আঙ্গা। তিনি শব্দ জেনেছেন, আংকা খান নিহত এবং বাদশা স্বয়ং অততরীকে শাস্তি দিচ্ছেন। তিনি অনুমান করেছেন, স্থিতমুখী আকবর অপরাধীকে গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন মার। মাহম আঙ্গাকে দেখে বাদশা শব্দ বললেন, লোকটা আমার আংকাকে (চাঁক সেক্টোরীকে) কতবারত অবস্থায় হত্যা করেছে। হক্ হাক্কিং ওকে ক্ষমা করতে পারে না।

মাহম শব্দ বললেন, তুম্ নে ঠিকই কিয়া হয় কো!

জ্ঞানতে পারলেন অনাতি কলম্বাই। অজ্ঞান ত্যাগ করলেন বৃদ্ধা। আকবরের সঙ্গে আর দেখা করেননি। আব্দুল ফজলের সর্চাঙ্কিত সিদ্ধান্ত—তবু তিনি মনে মনেও আকবরকে অভিলাপ সেনানি। একচাঁপশ দিনের

দিন পৃথশোকে কাতর অনশনরতা বৃদ্ধার সব যন্ত্রণার অবসান হল। সংবাদ পেয়ে শাহ্ন-য়েন-শাহ্ন স্বয়ং উপস্থিত হলেন আগ্রা-শহরের অপর প্রান্তে বৃদ্ধার আবাসে। শববাহীরা তখন তাঁকে ধরাধরি করে বাহিরে আনছে। আকবর তাদের একজনকে সারিয়ে দিয়ে স্বয়ং কাঁধ দিলেন। কে একজন অমাত্য সাহস করে বললে, আপনি কেন জাহাঁপনা, আমরা তো আছিই।

সম্রাট বললেন, সে তোমরা বুঝবে না।

আংকা আর আধম খাঁর জন্য দিল্লীতে মক্‌বারা বানিয়ে দিলেন সম্রাট—রাজকোষ থেকে অকাতরে অর্থ ব্যয় করে। আধম খাঁর মক্‌বারার কথা ইতিপূর্বেই বলেছি (চিত্র—6.5); শব্দ তখন উল্লেখ করতে ভুলেছি, ঐ-অষ্টভূজাকৃতি ইমারতেই শায়িতা আছেন একজন ভগ্নহৃদয়া বৃদ্ধা—যিনি তোপের মৃধ থেকে শিশু আকবরকে রক্ষা করার উদ্দেশে নিজের বুক পেতে দিয়েছিলেন একাদিন, যাঁর মরদেহ বহন করতে তক্ত-তাউস ছেড়ে তামাম হিন্দুস্থানের শাহ্ন-য়েন-শাহ্নকে নেমে আসতে হয় পথের ধূলোয়।

গিয়াস্‌উদ্দীন গজনবী, আংকা খান-এর মক্‌বারা নিজামউদ্দীন আউলিয়ার উত্তর প্রান্তে। ছোট্ট মক্‌বারা। ভিতরটা মাত্র 6 মিটার দৈর্ঘ্য-প্রস্থে। নিজামউদ্দীন আউলিয়ার বড় বড় ইমারতের মাঝখানে একান্তবাসী ঐ ইমারতটো দেখলে মনে হয় যেন ধর্ম-ভীরু একজন কেরানী আপন মনে দফতরে বসে কাজ করছে—‘ডেবিট-ক্রেডিট’ আর ‘লেজার’-এর বাইরেও যে একটা দুনিয়া আছে তা ও জানে না। শর্মাজীর ভাষায়, ‘Although small in size, it is virtually a gem of architecture.’^{১৪} (হোক আকারে ছোট, এ একটি স্থাপত্য রত্ন)।

গাইড আমাকে বলেছিল, লক্ষ্য করে দেখুন, এ ইমারতের পাথর সব লাল, আর তার মাঝে মাঝে ধপ্পপে সাদা কী সুন্দর মার্বেলের কাজ। এমনটি আর কোনো বাড়িতে দেখতে পাবেন না গোটা নিজামউদ্দীন আউলিয়া-চত্বরে।

তাই তো! কিন্তু কেন এই বিচিত্র পরিকল্পনা? গাইডকে প্রশ্ন করেছিলাম, সে জবাব দিতে পারেনি। আমিও কোনো কারণ বুঝে পাইনি।

আজ আব্দুল ফজলের প্রামাণিক ইতিহাস পড়তে পড়তে মনে হচ্ছে—তার মানে সম্রাট কি ভুলতে পারেননি সেই দৃশ্যটো? দফতরখানার শাহ্ন আংকা খানের রক্তে লালে-লাল হয়ে গেছে! আর উবুড় হয়ে পড়ে থাকা হতভাগ্যের পিঠ থেকে উঁচু হয়ে বেরিয়ে আছে আত-তারীর ছাঁরির সেই ধপ্পপে সাদা হাতীর দাঁতের মূঠ?

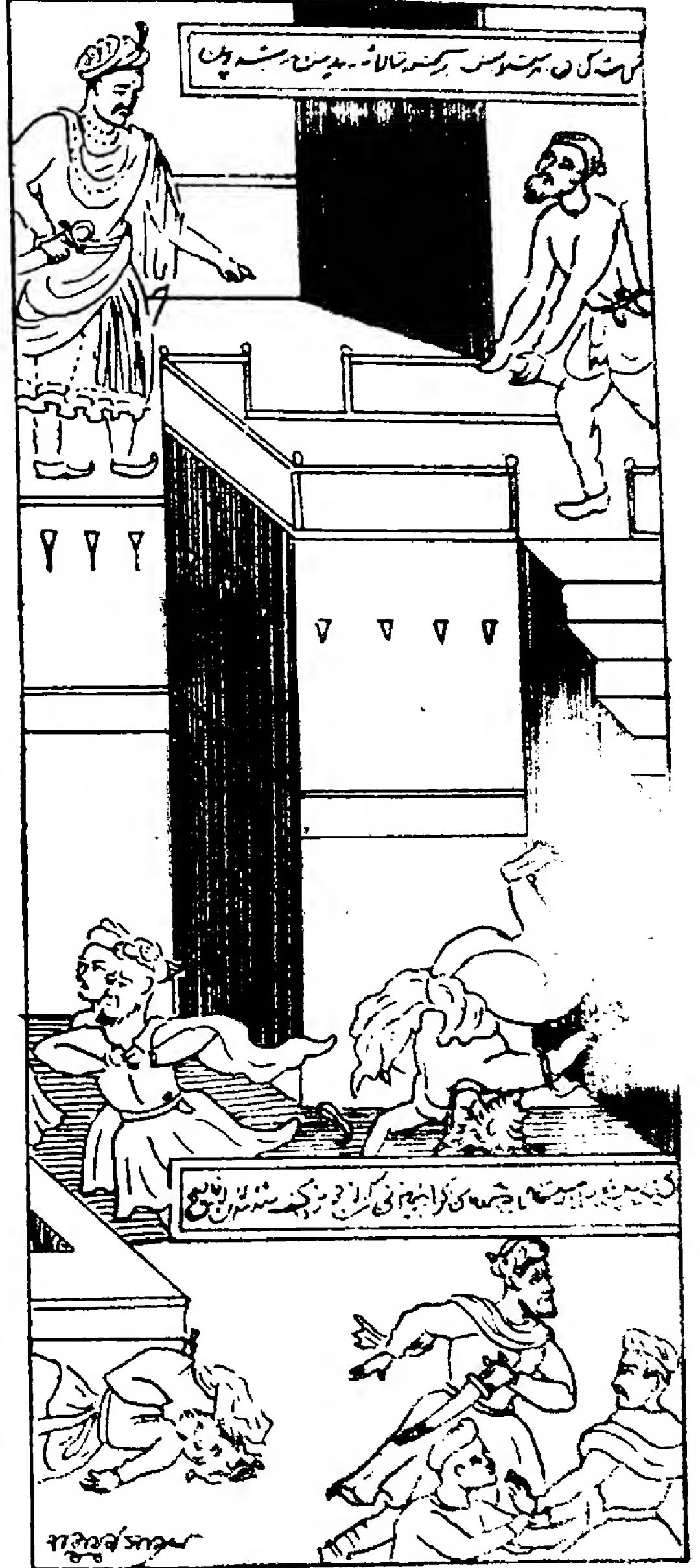
জীবনচরিতের ঐ পৃষ্ঠাখানি আকবর সচিত্র করিয়েছেন। ওয়াশিংটনে স্মিথসোনিয়ান সংগ্রহশালায় রক্ষিত" আকবর-নামার এই সচিত্র পৃষ্ঠাতে (চিত্র-9.2) দেখাছি শিল্পী অজন্তার ঢঙে ছবির মাধ্যমে কাহিনী বলেছেন। সর্বনিম্ন বামে আংকা খানের মৃতদেহ—তার মস্তক দেহচ্যুত ; পাশেই দেখছি নাঙা তলোয়ার হাতে আধম খাঁ ছুটেছে হারেমের দিকে। তার পাশে সহকারী উজবেগ খাঁ ও সম্মুখে প্রহরী। ঠিক তার উপরের ধাপে, বামে দেখাছি উজবেগকে নিয়ে আধম খাঁ এসেছে আকবরের সন্ধানে। চিত্রের উপরাধেদ আকবর ও খোজা প্রহরী। আকবর সেখানে আদেশ দিচ্ছেন—যতক্ষণ না মৃত্যু হয় ততক্ষণ, বারে বারে, অপরাধীকে দুর্গ-প্রাকার থেকে নিচে ফেলে দিতে হবে। আধমের পতনও আঁকা হয়েছে।

ছবিতে আকবরকে প্রোঢ় বলে মনে হয়, যদিও বাস্তবে তাঁর বয়স তখন মাত্র বিশ বছর। কিন্তু আধম ও উজবেগের দুটি চিত্রে 'ফটোজিনিক' সাদৃশ্য—যে চাতুর্ষ অজন্তায় বারে বারে দেখেছি—মহাজনক, সীকলী, বিশ্বান্তর, জুজুকের আলেখ্যে।

দিল্লীতে মথুরা রোডের ধারে আকবরী-জমানার সর্বপ্রথম সুবৃহৎ স্থাপত্য-কীর্তি : 'ইমায়ুন-স্টম্ব'। উদ্যান ঘেরা সমাধিসৌধ পূর্বযুগে যে নির্মিত হয়নি, তা নয় ; কিন্তু এত প্রকাণ্ড বাগিচায়, এমন সুসমঞ্জস তরুবিধিকার আবেষ্টনীতে স্থাপত্য-কীর্তিকে মহিমময় করে তোলার প্রয়াস ইতিপূর্বে হয়নি—এ সেই বাবুরী চাহরবাগ পরিকল্পনার বিচিত্র বিকাশ। ইমায়ুন-মক্‌বরায় পারস্য স্থাপত্যশৈলী অত্যন্ত সোচ্চার।

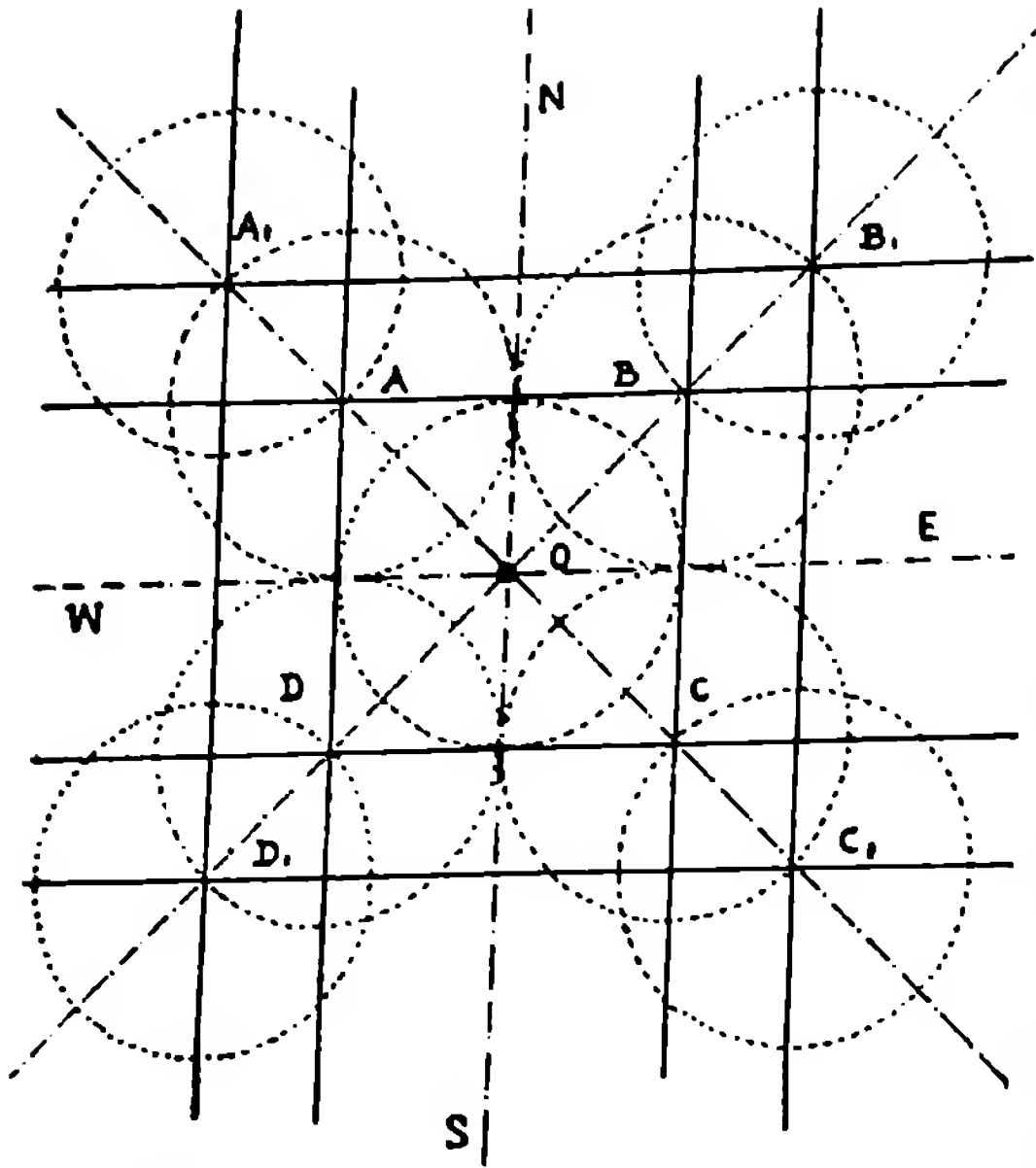
সমস্ত উদ্যানটি চতুঃখণ্ডে বিভক্ত। প্রধান প্রবেশ পথে সুউচ্চ একটি শ্বিতল দরওয়াজা, যা নিজেই এক স্থাপত্য-কীর্তি। বাগিচার কেন্দ্রবিন্দুতে যথেষ্ট উঁচু বেদী বা মোকাম-কুর্সির উপর মূল ইমারৎ। ত্রি-তল পরিকল্পনা। নিচের তলায়—যা নাকি মূল ইমারতের শ্লিষ্ঠ, অত্যন্ত বিস্তৃত। তার প্রতি দিকে সতেরটি করে খিলান, অর্থাৎ সর্বমোট চার-সতের আটষটি এবং চারকোণায় চারটি মিলে বাহান্তরটি খিলান। এই খিলান-গুলি বস্তুত এক-তলার কক্ষগুলির প্রবেশদ্বার। শব্দ কেন্দ্রস্থ খিলানে আছে সোপান, তা বেয়ে শ্বিতলের উপর ওঠা যায়। একতলার কক্ষগুলি ছিল অতিথিদের আবাসস্থল। মূল সৌধের চারপ্রান্তে চারটি কেন্দ্রস্থ জিয়ান, দু-পাশে দুটি করে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার খিলান। সৌধের কেন্দ্রস্থলে প্রকাণ্ড

গম্বুজ। সাদা মার্বেল পাথরের। চার-কোণায় চারটি ছত্রী, এ-ছাড়া জিয়ানের দু-প্রান্তে দুটি করে ছোট



চিত্র-9.2 আংকা খানের হত্যা ও আধমের শাস্তি।
[আকবর-নামা অনুসরণে]

ছোট ছত্রী। তাদের সঙ্গে মিডালী করেছে যোলোটি ছোট এবং আটটি বড় গুলদস্তা (চিত্র-9.5)।



চিত্র-9.3 হুমায়ুন-মকবরার নকশার মৌলছন্দ।

এ ইমারতে সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এর প্ল্যানিং-ছন্দ। ইতিপূর্বে, লক্ষ্য করে দেখুন—ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যের প্ল্যানিং-এর মর্মমূলে সরলরেখা ছাড়া আর কিছু ছিল না। বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্র, ষড়ভুজ, অষ্ট-ভুজ বা কৌণিক-কোণ-বিশিষ্ট জ্যামিতিক ছন্দ। এ-ক্ষেত্রে বাস্তু-নকশায় দেখছি নকশা-নিবিশ কাজ শূন্য করেছেন নয়টি বৃত্ত দিয়ে। নয়টিই সমান মাপের (চিত্র-9.3)। কেন্দ্রে একটি এবং তারপর ঈশান, নৈঋত, অগ্নি, বায়ু কোণে কেন্দ্র স্থাপন করে চারটি সম-মাপের বৃত্ত এমনভাবে আঁকা হল, যাতে তারা উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিম রেখাকে স্পর্শ করে। অতঃপর ঐ চারিদিকের চার কোণে পুনরায় চারটি সম-মাপের বৃত্ত আঁকা হল A, B, C, D। বিন্দু চতুষ্টয়কে কেন্দ্র করে, যাতে এই বৃত্ত-চতুষ্টয় পূর্ববর্তী বৃত্ত-চতুষ্টয়ের কেন্দ্রকে স্পর্শ করে।

এই নয়টি সম-মাপের মৌল বৃত্ত থেকে কী-ভাবে ইমারতের বাস্তু-নকশা ছকা হয়েছে তা চিত্র-9.4-এ বোঝাবার চেষ্টা করেছি। প্রান্তিক বৃত্তগুলিকে বেষ্টন করে যে বর্গক্ষেত্র, তার প্রতিটি পাশকে ছয়ভাগে ভাগ করা হল। ছয় সমানভাগে নয় কিন্তু। প্রান্তিক বৃত্তটির ব্যাস যদি হয় D, তাহলে $D=4a+2b$;...i.

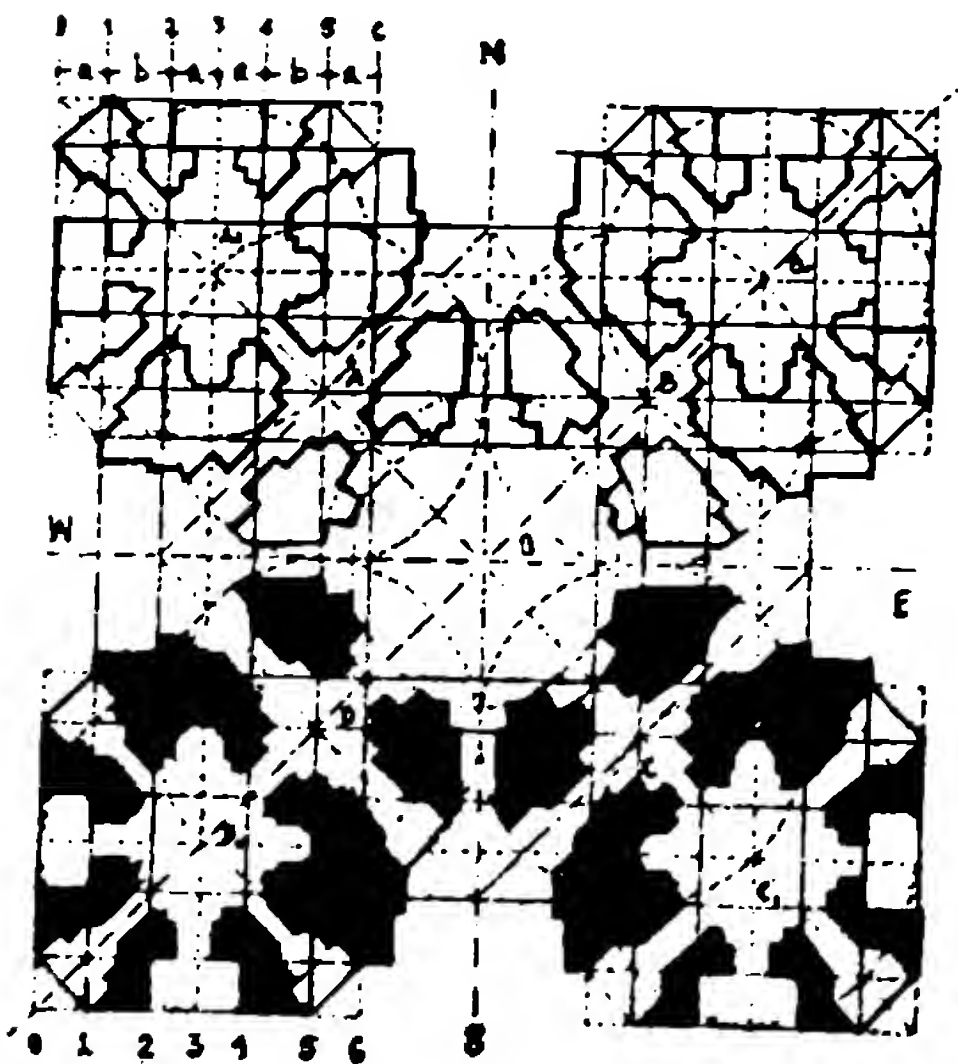
এখানে 'a' মাপ জ্যামিতিক হিসাবে পাওয়া যাচ্ছে। যে-হেতু 3-3 সরলরেখা A₁ ও D₁ বিন্দুর উপর দিয়ে টানা ; এবং 2-2 সরলরেখা A-বৃত্ত ও D-বৃত্তকে স্পর্শ করে উত্তর-দক্ষিণ রেখা, ফলে a মাপ সুনির্দিষ্ট। এখন যে-হেতু সমীকরণ (i)-এ আমরা D ও a-র মাপ জানি, তাই বীজগণিতের মাধ্যমে b-কে হিসাব কষে বার করতে পারি ; নয় কি ?

জ্যামিতি ও বীজগণিতে আপনার এ্যালার্জি আছে কিনা জানি না, আমি কিন্তু এ-খানেই ক্ষান্ত দিচ্ছি। কারণ এ্যালার্জি যদি না থাকে তাহলে যেটুকু বলেছি, তার সাহায্যেই আপনি গোটা প্ল্যানটা আঁকতে পারবেন।

প্রশ্ন সেটা নয়, প্রশ্ন হচ্ছে—এই যে বৃত্তকে মূল-ধন করে জ্যামিতিক মাপে প্ল্যান ছকা হল, এটা ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যে একটা নতুন কথা।

এটা নিছক পারসিক রীতি। শুধু প্ল্যান নয়। এ ইমারতের সর্বত্র পারস্যরীতির ছাপ। গম্বুজটাকে লক্ষ্য করুন—সেটি তুগলক, সৈয়দী বা লোদী ঢঙের নয়। এমন কি শেরশাহ্ যে পদ্ম-কলস অঙ্গণকার ব্যবহার করেছিলেন এ গম্বুজ-চুড়ায় তাও পরিত্যক্ত। হুমায়ুন-মকবরায় যেন তার সর্বাঙ্গ দিয়ে বলেছে : আমি ভারতীয় নই, আমি আগন্তুক !

কেন এমনটা ঘটল ?



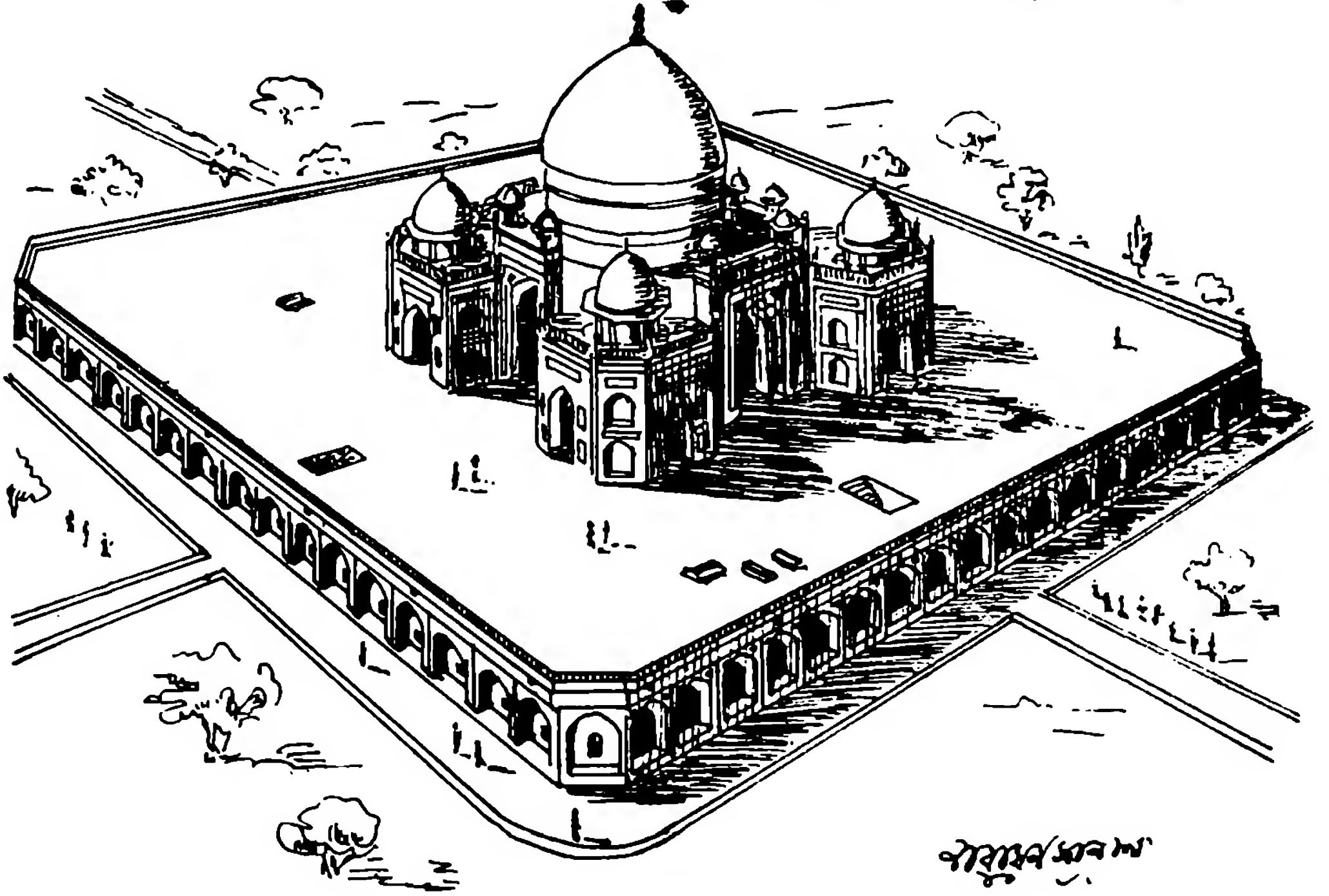
চিত্র-9.4 বস্তুর নকশার বাস্তব নকশার জ্যামিতিক-বিস্তার।

ইন্দো-ইসলামী শব্দ সমাসের ধারাবাহিক ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে কেন ও হঠাৎ সর্বাপেক্ষে এমন পারস্যের ছাপ নিয়ে আবির্ভূত হল ?

সকলেই বলছেন, এ মক্কারা নির্মাণ করিয়েছেন হুমায়ূন-মহিষী হাজী বেগম-সাহেবা। কিন্তু এর নির্মাণ শুরুর হয়েছিল 1564 সালে, শেষ হয় বছর পাঁচেক পরে। অথচ দেখছি, হাজী বেগম-সাহেবা মক্কা রওনা হন 1564 সালে, সেখানে থাকেন বছর চার-পাঁচ।¹⁰ তা-হলে এ কৃতিত্বের হিসাবাদার তিনি হন কোন হক-হিসাবে ?

তিনি : উস্তাদো-কি-উস্তাদ মীরজা গিয়াস।

হুমায়ূন যখন পারস্যে নির্বাসিত জীবন যাপন করছেন, তখন শেরশাহ-র হারেন থেকে মৃত্যু পেয়ে হাজী বেগম-সাহেবা সেখানে তাঁর স্বামীর সঙ্গে মিলিত হন। সেই সময়েই তাঁরা পারস্য-স্থাপত্যের এই বিশ্রুত-কীর্তি স্থপতিবিদের সঙ্গে পরিচিত হন। তাই হুমায়ূনের মৃত্যুর পরে বেগম-সাহেবা সুদূর পারস্যে সংবাদবহকে প্রেরণ করেন ঐ প্রথিতযশা বাস্তুরক্ষকে হিন্দুস্থানে আমন্ত্রণ জানিয়ে। হয়তো হাতে-কাজ শেষ করে আসতে তাঁর কিছু নিলম্ব হল। বেগম-



চিত্র-9.5 হুমায়ূন-মক্কারা, পরুড়াকলোনে।

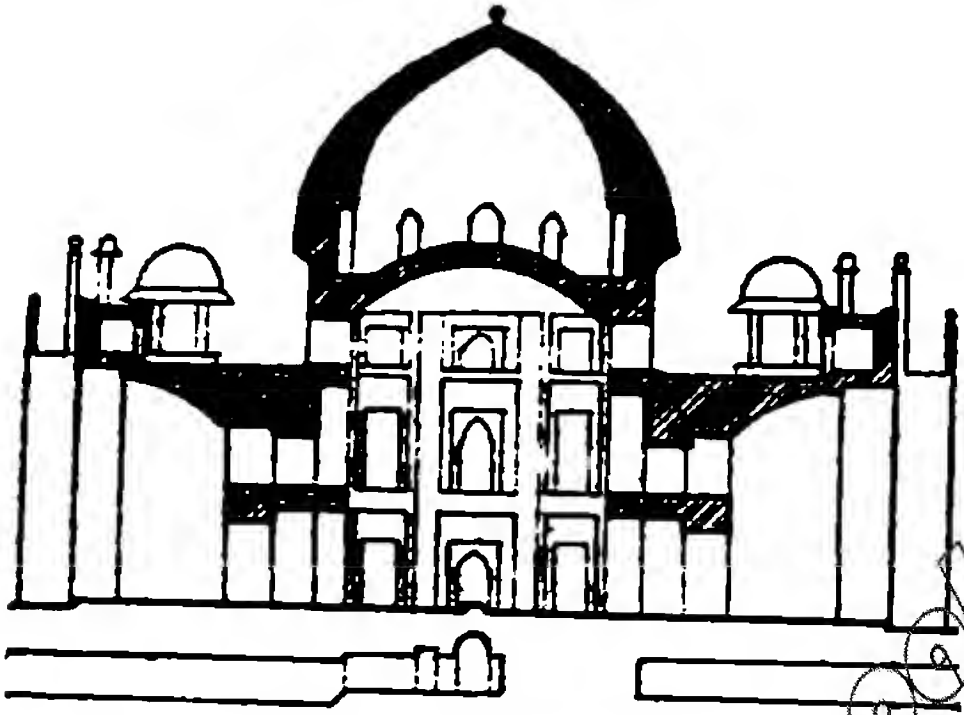
নিঃসন্দেহে এর নির্মাণ বায় হাজী বেগম-সাহেবার স্ত্রীধনে। স্থান-নির্বাচনও হয়তো তাঁরই কীর্তি— তাঁর স্বামীর প্রতিষ্ঠিত দীনাপনাহ-র সন্নিহিতে। ব্যবস্থাপনা যা কিছু করার তা করেছেন তরুণ আকবর, আগ্রা থেকে। অথচ স্পষ্টতই এ ইমারতের স্থাপত্য-শৈলী আকবরী চিন্তাধারার সঙ্গে আদৌ কোনও ঐকতান রচনা করে না। ফতেপুর-সিক্রি অথবা আগ্রা-কিঙ্গলায় আকবর-নির্মিত প্রাসাদ-স্থাপত্যের সঙ্গে এর ফারাক আশমান-জমিন। তাহলে এই অপূর্ব স্থাপত্য-কীর্তির জন্য সালাম জানাব কাকে ?

সাহেবাকে সুকুমার, তিনি ধৈর্যসহকারে প্রতীক্ষা করে-ছিলেন। আর হয়তো সেটাই হেতু—কেন কাজ শুরুর হতে দেরী হল দীর্ঘ নয় বৎসর। না হলে অর্থেরও অভাব ছিল না, রাজ্যেও ছিল না কোন অশান্তি। এবং সেটাই একমাত্র হেতু—কেন এ ইমারৎ নির্ভেজাল পারস্য রীতির। মীরজা গিয়াস বেখকরি সাসারামেও বাননি, তদানীন্তন ভারতবর্ষের বৃহত্তম মক্কারাটি দেখতে।

মীরজা গিয়াস ডব্ল-ডোম বানিয়েছেন (চিত্র-9.6)। নয়াটি বৃত্তকে মূলধন করে বিচিত্র জটিল প্ল্যানিং-এ এমন সুসম্বন্ধে কাজটি শেষ করেছেন,

যা প্রায় ভেঙ্কির পর্ষায়ে। কিন্তু সে হিম্মৎ ছিল মীর্জা গিয়াস্-এর। হাজী বেগম-সাহেবা- তাঁর লাখো বরিষ্ ব্বেহেস্ত-বাস মজ্জর হোক—নিশ্চয়ই খুঁম হবেন না, এই মওকায় যদি আমরা মাথার টুপি খুলি উস্তাদ মীরক মীর্জা গিয়াস্-এর উদ্দেশ্যে।

প্রসঙ্গান্তরে যাবার পূর্বে উল্লেখ করে যাই—এই মক্কারাতেই শাক্তিত আছেন—বেগা বেগম, হাজী বেগম এবং হামিদা বন্দু কেমম। এখানেই আছে শাহজাহাঁর সেই হতভাগ্য জ্যেষ্ঠপুত্রের সমাধি—দারা শেকো ; আছে ফারুকশিয়ারের কবর এবং এই মক্কারাতেই আশ্রয় নিয়েছিলেন সিপাহী কিদ্রোহের আমলে শেষ মুসল সম্রাট শ্বিতীর বাহাদুরশাহ। এখান থেকেই লেঃ হুসেন তাঁকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে ধরে নিয়ে যায়।



চিত্র-9.6 হুমায়ূন-মক্কারা, সেকশনাল এলিভেশন।

হুমায়ূন-মক্কারার সংলগ্ন, দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে যে ভূমিপ্ৰায় ইমারৎগুলি দেখিরে গাইড আপনাকে কলবে ওর নাম 'আব্বাসরাই, ওখানে আরবী মোল্লার দল বাস করতেন, এখানেই থাকতেন মীর্জা গিয়াস্ এবং তাঁর পারসিক সহকর্মীরা। আরবী মোল্লার দল ওখানে কেনোদিন বাস করেছেন কি করেনি খোদায় বালদ—কিন্তু মূল ইমারতের নির্মাণ সময়ে ঐ কক্ষ-গুলিই ছিল আর্কিটেক্ট আর এঞ্জিনিয়ারদের সাইট-অফিস-কম-রেসিডেন্স।

অতি সাম্প্রতিককালে শুনছি—স্কটল্যান্ডে দেখিনি—এখনকার দেওয়ালে নাকি কিছু মুরাল আঁকিয়ে করা ক্ষেত্র ঘেঁষে করাণ লরীকেব্র ঐ মীরজাব অধ্যায় থেকে প্রাচীর চিত্র আঁকা হয়েছিল। মেরী ও নীশ্বর চবি। নিঃসন্দেহে আকবরের নির্দেশে।

সে সময়ে আকবরের বহুপুত্র জন্মগ্রহণ করে এবং এক মাসের মধ্যেই তারা মারা যায়, প্রায় সেই সময়েই

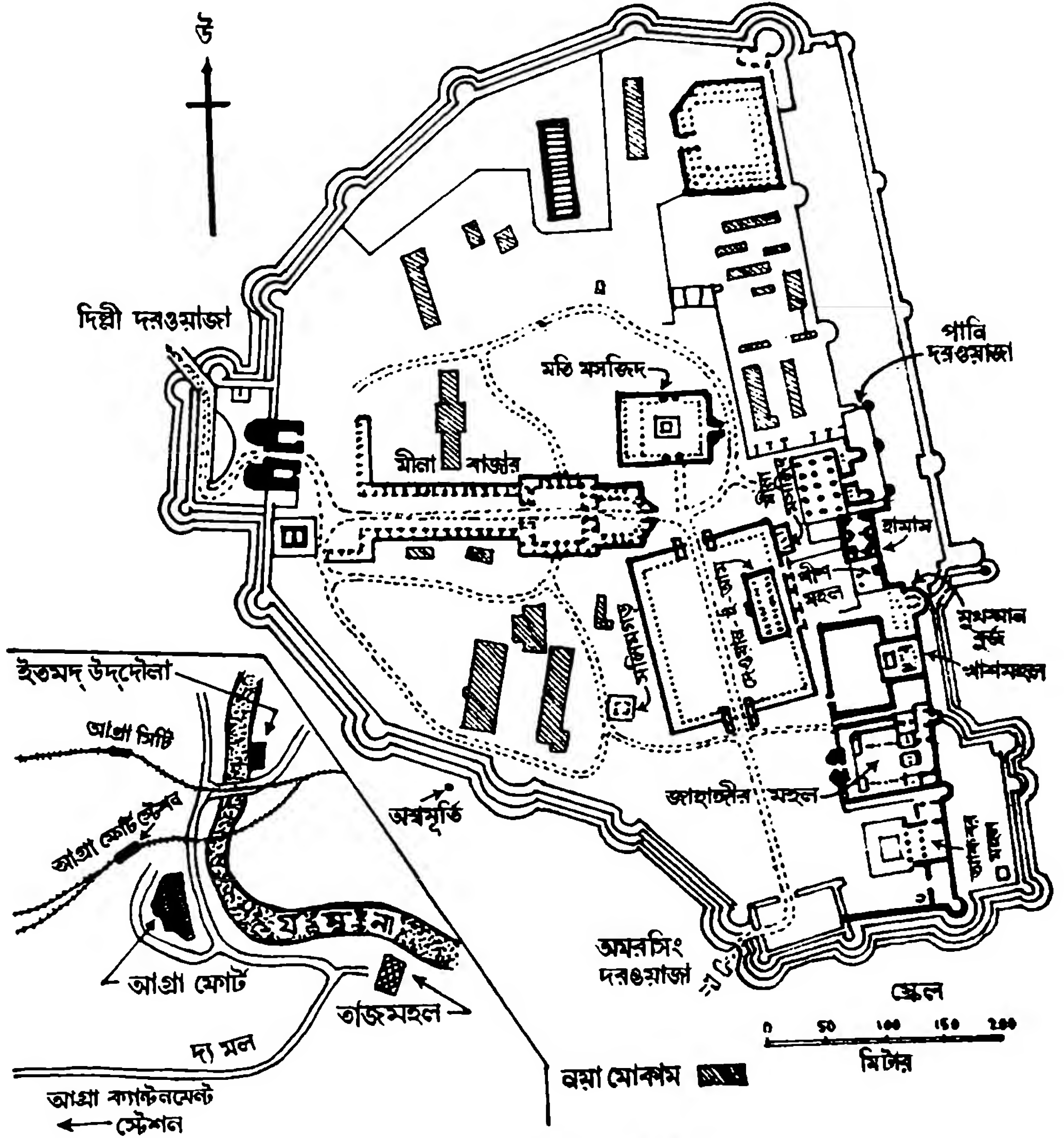
মাণ্ডু থেকে ফিরে এসে তিনি একটি নতুন নগর পত্তনের জন্য ফরমান জারী করেন" (Oct, 1564)। স্থান নির্বাচিত হয় আগ্রা নগরীর প্রায় এগারো কিলো-মিটার দক্ষিণে, গোয়ালিন্দর যাবার পথে এক নগণ্য গ্রামে : কাকুরালি। এই অঞ্চলে ইতিপূর্বেই দু-একবার সম্রাটের অস্থায়ী শিবির পড়েছিল, শিকারের প্রয়ো-জনে। সম্রাট এই নতুন নগরীর নাম দেন : 'নগর-চেন—শান্তি নগরী'। সম্রাটের আদেশে অনেকগুলি ইমারৎ গড়ে উঠতে থাকে, আমীর মানিকেরাও দু-চারখানা করে মোকাম বানাতে থাকেন। কিন্তু ছয় মাস যেতে-না-যেতেই সম্রাটের মত পরিবর্তন হয়। তিনি নগর-নির্মাণের কাজ বন্ধ করে দেন। অর্ধসম্প্রান্ত ইমারৎ ভেঙে ফেলে পাথরগুলি নিয়ে আসা হল আগ্রায়—অজ্ঞাত আগ্রা-কিল্লার 'সাইটে'।

আকবর বোধহয় প্রণিধান করেছিলেন, এমন চারি-দিক খোলা মাঠের মাঝখানে বাস করাটা ঠিক নয়। ফিরোজশাহ কোল্লার কথা সম্ভবত মনে পড়ে যায় তাঁর। তাই মহাজনগতঃ পন্থায় তিনি অনতিবিলম্বে আগ্রা-কিল্লা বানাতে শুরু করেন যমুনা-পূর্বাংশে। আবুল ফজল বলছেন, সম্রাট আগ্রা-কিল্লা নির্মাণের হুকুমনামা জারী করেন 1565 সালে। তত-দিনে সেকেন্দার-শাহী পুরাতন দুর্গ—'বাদলগড়' ভস্মদশায়। সুতরাং আগ্রা-কিল্লা হচ্ছে আকবরী-জমানার প্রথম বড় জাতের স্থাপত্য-কীর্তি। দৈনিক তিন-চার হাজার মেহনতী মানব কাজ করত সেখানে। লাল পাথরের দুর্গ-প্রাকার—সুদৃঢ় তার গাঁথনি, অত্যন্ত প্রশস্ত দেওয়াল, উচ্চতায় 21.34 মিটার (70 ফুট)।

বিশেষভাবে লক্ষণীয়, আকবর যখন এই মহাযজ্ঞের আরোজন করছেন তখনো মীর্জা গিয়াস্ দিল্লীতে উপস্থিত ; হুমায়ূন-মক্কারার 'ফিনিশিং টাচ' তখনো শেষ হয়নি। লাখো-সেলাম জালালউদ্দীন আক-বরকে—তিনি ঐ বিশ্রুতকীর্তি স্থপতিকেকে দিল্লী থেকে আগ্রায় নিয়ে আসেননি ; পরিবর্তে তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে স্থানীয় এলেমদার মিস্ত্রিকে সমবেত করলেন আগ্রায়। কারণ তরুণ সম্রাট একটি অচিন্ত্যপূর্ব অনুভাবনায় দোলায়িত হচ্ছিলেন সেই আমল থেকেই! একটা চিন্তা তাঁর মস্তিষ্কে দানা বেঁধে উঠছিল : পারস্যের অর্থ অনুদ্বরণে হিন্দুস্থানের সমূহ সর্বনাশ! একথা নিশ্চিত, সেই তরুণ বয়সে তিনি হিন্দু-ইসলামী যৌথ রীতির স্বরূপটা ধরতে পারেননি ; কিন্তু বলেছিলেন—কোন-পক্ষ চলে গেলে সেই সমস্বয়ের 'তীর্থে' উপনীত হওয়া যায়। তাই তাঁর এই বিচিত্র ব্যবহার। মীর্জা গিয়াসকে

উপেক্ষা এবং মিলিত হিন্দু-মুসলমানের এই ভারত-বর্ষকে নিজের পায়ে দাঁড় করানোর প্রচেষ্টা। গুজরাট, দাক্ষিণাত্য, কলিঙ্গ ও বঙ্গদেশ থেকে নাম-না-জানা স্থপতির দল আহ্বান পেয়ে আসতে থাকে গুঁড়ি

আছে তার খোঁজ রাখতেন)। খিলজী-তুগলক-সোদী-সৈয়দ শেখীতে দিল্লীশ্বররা যুগে যুগে পার্শ্ব-মুখী স্থানীয় স্থাপত্যদের সিন্টিস-বীম, ব্র্যাকেট, ঝরোখা, ঘণ্টা-কলস-চক-পদ্ম অলঙ্কার, ট্রান্সক্রেট



চিত্র-9.7 আগ্রা-কিল্লা, ভূমি-নকশা।

গুঁড়ি। পার্সি ব্রাউন বলেছেন¹². "It will be seen from this that the emperor was already aware of the artistic nature of his more distant subjects." (বেশ বোঝা যায়, সম্রাট তাঁর সাম্রাজ্যের দূর প্রান্তস্থিত অঞ্চলে কোথায় কী-জাতের শিল্পী

পস্থিতিতে ভারবহনের আরোজন যতদূর সম্ভব করতেন। জালালউদ্দীন আকবরই হচ্ছেন প্রথম দিল্লীশ্বর যিনি স্থাপত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে বলতেন না! এ হতে পারে না! হিন্দু-মুসলমান শৈলীর মহাবন্দানই এ-দলে একমুখ সমাধান। দুই

মহান শৈলীকে দুই ভিন্ন মেরুপ্রান্তবাসীর চিন্তা-ধারাকে এমন একসঙ্গে গাথতে হবে, যাতে জোড়ের দাগ দেখা না যায়। সে পরীক্ষার চূড়ান্ত সাফল্য ফতেপুর-সিক্রিতে—কিন্তু সে কীর্তি প্রৌঢ় আকবরের। আমরা এখনও আছি তাঁর প্রথম যৌবনে। আসুন,

অষ্টমীর চাঁদ

ভূমি-নকশায় আগ্রা-কিল্লা যেন অষ্টমীর চাঁদ (চিত্র—9.7)। পূর্বে যমুনা, পশ্চিমে জনপদ। উত্তর-দক্ষিণে কিল্লার দৈর্ঘ্য পোনে এক কিলোমিটার। দুটি প্রবেশদ্বার—পশ্চিমে দিল্লী দরওয়াজা, দক্ষিণে আকবরী দরওয়াজা (বর্তমান নাম অমরসিং গেট)। দিল্লী দরওয়াজার নির্মাণ শেষ হয় 1566 সালে; সেলিম তখনও জন্মগ্রহণ করেনি।

দিল্লী গেট : এ দরওয়াজা কোনো বিজয় তোরণ নয়; নরনাভিরাম কোন ইমারতের অবতরণিকা-স্বার নয়, এর মূখ্য ভূমিকা জঙ্গী প্রয়োজনে। স্থপতির মূল লক্ষ্য সেখানেই নিবন্ধ। তাই বিসর্পিত পথে এমনভাবে তিনি আগমন-সড়ক বানিয়েছেন যাতে দুর্গরক্ষীর দল সহজে অসংখ্যক সৈন্য নিয়েও বহিঃস্থ বিশাল বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়। ইতিহাস বলছে—এই ‘পেপারে’ আকবর একশয় একশ পেয়েছেন! সেলিম ও খুদরাম যথাক্রমে 1599 এবং 1622 খ্রিষ্টাব্দে তাঁদের পিতৃদেবদের বিরুদ্ধে কিদ্রাহ করে বিশাল বাদশাহী ফৌজ নিয়ে আগ্রা-কিল্লা আক্রমণ করে এবং দুর্গ-প্রবেশে ব্যর্থ হয়। জেনারেল লেক অবশ্য 1803 সালে ঐ পথেই দুর্গ-প্রবেশ করেছিল—কিন্তু তার জেবের ভিতর ছিল এমন একটি ‘একাধি’ ব্রহ্মাস্ত্র—যা পৃথিবীর যে-কোন দেশে যে-কোনো দুর্ভেদ্য দুর্গের পতন ঘটাতে সক্ষম : দুর্গাধীপের বিশ্বাসঘাতকতা! তাই ডক্টর রথ¹⁸ বলেছেন, “Militarily, the Fort of Agra was impregnable in medieval times.” (সামরিক বিচারে, কথ্যদুর্গে আগ্রা-কিল্লা ছিল সম্পূর্ণ দুর্ভেদ্য)।

প্রয়োজনের মূল্য পাই-পয়সা মিটিয়ে দিয়ে এবার দেখুন আকবর সেই স্থাপত্য-কীর্তিকে কীভাবে রূপান্তরিত করলেন। পার্সি ব্রাউন¹⁹ বলেছেন, “It displays an originality and spontaneity

প্রথমে দেখা যাক, তাঁর প্রথম কীর্তি : আগ্রা-কিল্লা! হুমায়ুন-মক্‌বারা নির্মাণ শেষে মীর্জা গিয়াসকে নানান উপঢৌকনে ভূষিত করে, পশ্চিমমুখো রওনা করে দিয়ে যে আগ্রা-কিল্লায় নতুন জাতের পরীক্ষা করতে এলেন জালালউদ্দীন।

denoting the beginning of a new era in the building art and one in which its creators were closely imbued with a fresh spirit, free and unrestrained.” (এ স্থাপত্য-কীর্তিতে মৌলিকতার ছাপ আছে; বেশ বোঝা যায় এর নির্মাতা একটা তাজা, বন্ধনহীন, সজীব প্রেরণায় নতুন কিছু গড়তে চান)। এ-কথা একশবার! তাজা, নতুন-কিছু! এর সঙ্গে তুলনা করুন গিয়াসউদ্দীন কিম্বা ফিরোজশাহ্ দুর্গের অথবা শেরশাহ্‌র পুরানা কিল্লার প্রবেশদ্বারের। স্পষ্টত অনুভব করবেন, আকবরের দিল্লী দরওয়াজা ওদের ডেকে বলছে, ‘আব-ওয়া-অজ্‌দাদ-এর ঋণ আমি অস্বীকার করি না, তবু আমি স্বতন্ত্র, আমি নতুন, আমি অনন্য!’

এ-কথা কিন্তু হুমায়ুনের মক্‌বারা বলেনি। সে-যেন এদের চেনেই না—ঐ প্রাণবর্তী গিয়াস-ফিরোজ-শের জমানার স্থপতিদের। সে শূদ্র পশ্ম-কলসহীন পারসিক গম্বুজ-চুড়ায় দাঁড়িয়ে বলেছিল : আমি আগন্তুক!

দিল্লী দরওয়াজা বললে, আমি তোমাদেরই বংশের, যদিও তোমার-আমার চিন্তাধারার মাঝখানে ‘জেনা-রেশান-গ্যাপ’!

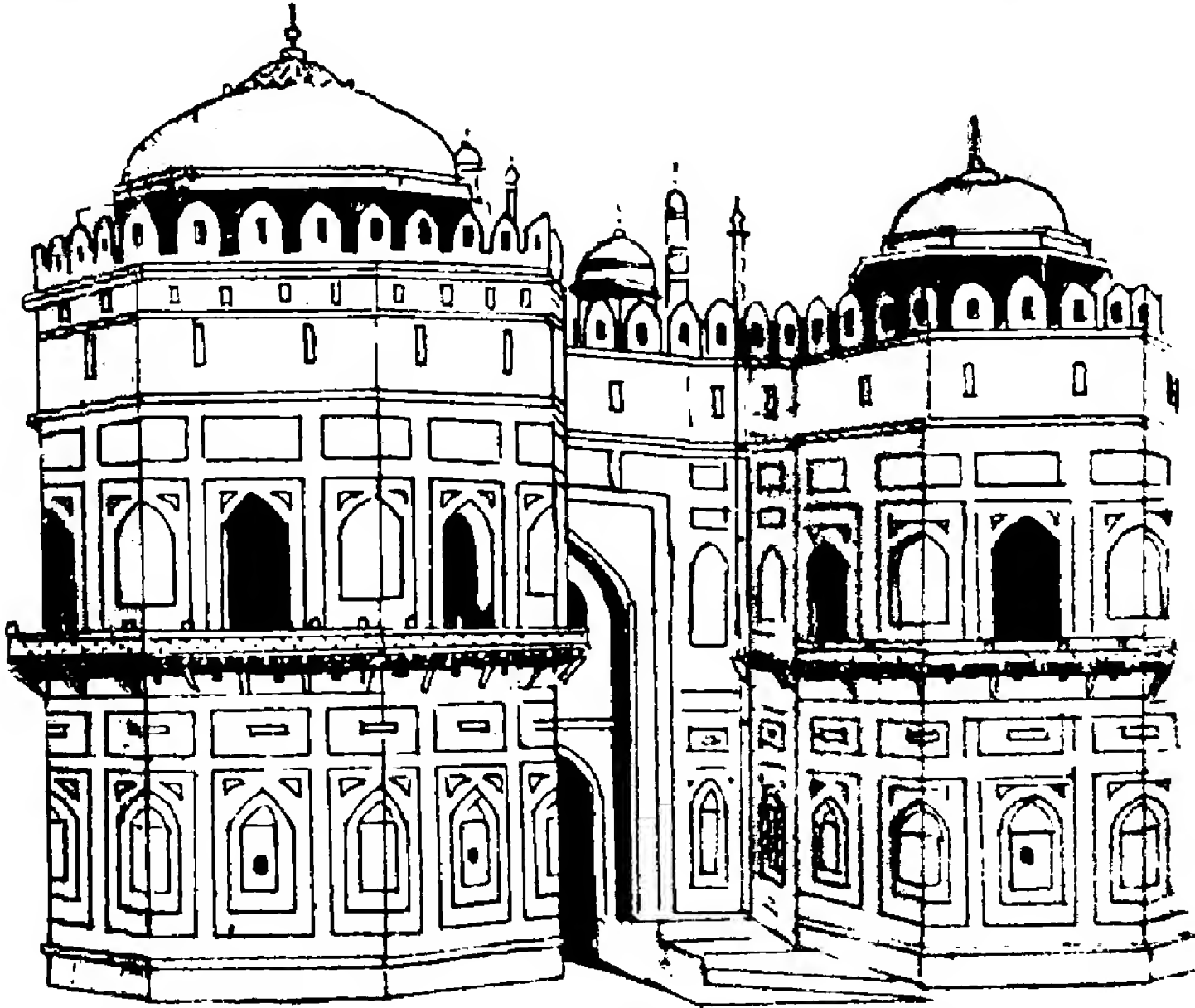
দরওয়াজার দূ-পাশে দুটি অষ্টভুজাকৃতি ইমারৎ—যেন দূ-পায়ে ভর দিয়ে সমভঙ্গি ঠামে দাঁড়িয়ে আছে দুর্গপ্রহরী (চিত্র—9.8)। তাদের মাথায় একসারি পল-তোলা কুঞ্জর—যেন যোদ্ধার শিরস্ত্রাণ। মিনারিকা নেই, চবুতরা নেই, গম্বুজ নেই। তবু বেশ কিছুটা অসংকরণ আছে তার প্রাচীরগাঙ্গে—যতটা শোভন সমরসাজে সম্বিজত যোদ্ধার ঢাজিকায়, কোমরবন্ধে অথবা তরোয়ালের মূঠে; তার বেশি নয়। মূল প্রবেশ-দ্বারের দূ-পাশে দুটি শীর্ণকায় গুলদস্তা যেন শূঙ্গ-হস্ত প্রহরীর হাতের বল্লম। প্রবেশদ্বারের দূ-পাশে দুটি পাদপীঠ নিশ্চয় নজরে পড়েছে আপনার—এখানে

আকবর স্থাপন করেছিলেন দুটি হস্তীমূর্তি, চিতোর-বিজয়ের পর--সেনাপতি জয়নাল ও পুস্তুর গজারূঢ় মূর্তি।

এবার ভিতরে চলুন। তোরণ অতিক্রম করে পিছন ফিরে দাঁড়ান দেখি? চিনতে পারছেন? আছে হ্যাঁ, এ সেই তোরণই, ভিতর-থেকে দেখা রূপ। প্রবেশ-দ্বারের দু-পাশে দুই অরিয়ল-গবাক্ষ, মূল-খিলানের কিনার বরাবর পশ্চিমকুড়ির নকশা, খিলানের উপর জোড়া পশ্চিমের একটা শ্বেত পাথরের ব্যান্ড; তারও উপরে ব্র্যাকেট-শোভিত ঝোলা-বারান্দা, অলিন্দ, ছত্রী। নানান সৌখিনতার রাজসিক আয়োজন। কিন্তু সেটাই তো স্বাভাবিক। অতন্দ্র-প্রহরীর ভীমকান্তিই তার ষোলো-আনা পরিচয় নয়—দেহলী অতিক্রম করে ভিতরে ঢুকে খোঁজ নিয়ে দেখ, তারও মা থাকে, মেয়ে থাকে, স্ত্রী থাকে। তারা খবর রাখে, ঐ ভীমকান্তি দুর্গ-রক্ষী আনন্দে হাসে, দুঃখে কাঁদে, সোহাগে চুম্বন করতে জানে! ভিতর দিক থেকে তারা দেখতে পায়, ঐ দুর্গরক্ষীর পশ্চিমকুড়ির পাড় বসানো ঘরোয়া ছবি।

আইন-ই-আকবরী বলছেন, “এই আগ্রা-কিল্লার ভিতর সম্রাট আকবর অর্ধসহস্রাধিক ইমারৎ নির্মাণ করিয়েছিলেন—লাল পাথরের, সাদা মার্বেলের পদ্ম বসানো নানান নতুন জাতের পরীক্ষা-নিরীক্ষা; আর সেজন্য সম্রাট গুজরাট এবং বঙ্গাল-মুসল্লুক থেকে নানান-জাতের দক্ষ শিল্পীকে আগ্রাতে নিয়ে আসেন।”

শব্দ অলঙ্করণে নয়, স্থাপত্যরীতিতেও নানান ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছিল হিন্দু ও মুসলমান শৈলীর মেলবন্ধনের। তার চরম সাফল্য দেখতে পাবেন ফতেপুর-সিক্রিতে। কিন্তু ফতেপুর-সিক্রি তো অশ্বেকর শেষ ফলাফল। Q.E.D.! মাকের ধাপগুলো? আগ্রা-কিল্লার ঐ শ-পাঁচেক ইমারতে হরেছিল সেই ঐতিহাসিক বিস্ময়কর পরীক্ষা। ঐ পাঁচশ মোকামের কোন এক নিভৃত করোকার ভিতর দিয়ে হরেছিল প্রথম চার-চোখের মিলন! ট্রাবিয়েট রাজকন্যা তার কাজল-কালো হরিণ নয়ন তুলে প্রথম তাকিয়ে দেখে-ছিল অম্বারোহী আগন্তুক আকুইয়েট-শাহজাদার দিকে! ঐ পাঁচশ ইমারতের কোন এক নির্জন



দিল্লী-গেট

চিত্র-৭.৪ আকবর-নির্মিত দিল্লী-গেট; আগ্রা-কিল্লা।

এই যে ভিতর ও বাহির—দু-দিক থেকে দুই ভিন্নমেরুর রূপারোপ, আকবরী স্থাপত্যের এ এক বিচিত্র বৈশিষ্ট্য। এর চরম সাফল্য বুলন্দ-দরওয়াজায়। সে-কথা যথাস্থানে।

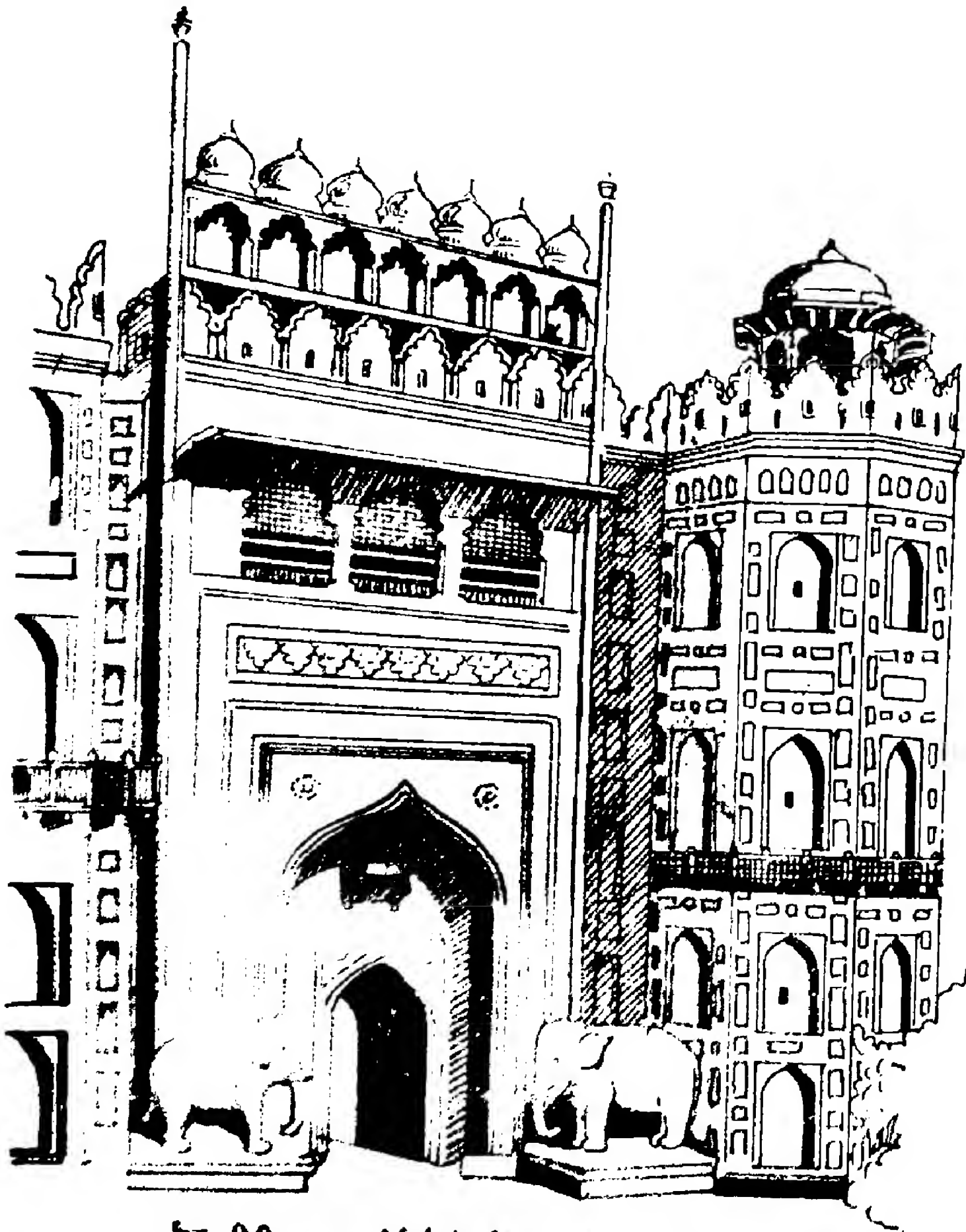
অলিন্দে ‘কবেল্ড-বায়’ তার পশ্চিমকোরকজুলা হাতখানা বাড়িয়ে দিয়েছিল ‘স্ট্যালেকটাইট’-নওজোয়ানের বহু-মূর্তির দিকে—ঠিক যে-ভাঙ্গিমার অম্বররাজের অনা-দ্বাতা কুণ্ডারী প্রসারিত করে দির্ভোছিলেন তার মেহীদ-

রঞ্জিত পাখাপরা হাত, তরুণ জ্বালালের দিকে!

আপসোস্! হরগিজ আপসোস্-কী-বাতে-সেই যুগান্তকারী মিলনদৃশ্যগুলি, ভারত-ভূখণ্ডে ইন্দো-ইসলামী-স্থাপত্যের সেই প্রথম প্রথম দৃশ্যগুলি আজ আর আপনি দেখতে পাবেন না। আকবর-নির্মিত সেই পাঁচশত ইমারতের মাত্র দুটি টিকে আছে। বাদ-বাকি চারশ আটশতইটি জমিন্-সামিন! আস্তে না! ভূমিকম্প নয়, মহাকালের স্থূল হস্তাক্ষেপন নয়—এ

ছেন অবনীন্দ্রনাথ, 'সম্রাটের মৃত্যু'; যার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ!'

ঠাকুরদার ঐ যুগসন্ধিক্ষণের ঐতিহাসিক ইমারৎ-গুলি ভেঙে ফেলে তিনি হাল-ফাসনের 'মার্বেল-মোকাম' বানিয়েছেন—যেমন পণ্ডিত ঠাকুরদার লাইব্রেরী কালেক্শান সেকেন্ডহ্যান্ড দামে বেচে দিয়ে হাল-আমলের নাতিরা টি. ভি. সেট কেনেন!



চিত্র ৩.৩ শাহ জাহানী-নির্মিত দিল্লী-পেট; লাল কিল্লা।

আর এক জায়গার কল্যাণাহাড়ী কিন্নরগলিয়া। কে সেই বে-তমিজ, বৃন্দক কল্যাণাহাড়?

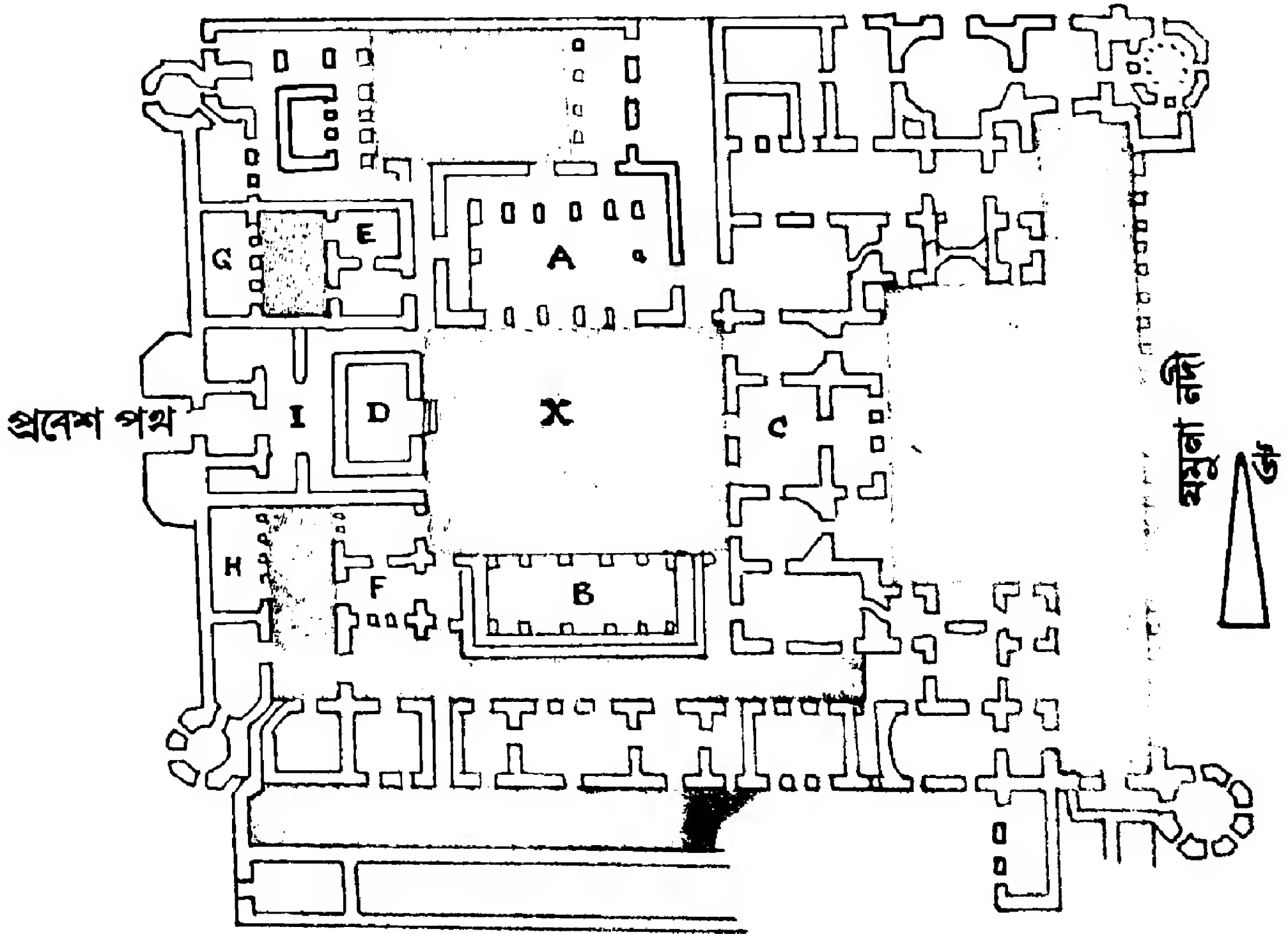
সেই যে দাড়িওয়ালা ভক্তগণকণ্ঠে যার হানি একে-

আজ্ঞে হাঁ, জাশ-শাহ্-জাহাঁ যুগল-স্থাপত্যে এক স্বর্ণশীল নাম 'জামশাহ' তিনি উপহার দিয়েছেন ভক্তবর্ষকে না, সুল কল্যাণ, পৃথিবীকে। তা সে

কীর্তির ক'-আনার হিসাবাদার সেই ভদ্রলোক, সে-
বিচার যথাকালে করব। ষোড়শো-আনা হিসাবাদার হলেও
বল্ধ-তার ঠাকুরদার যে মৌলিক স্থাপত্যচিন্তা—
অজ্ঞ, স্বয়ম্ভর, ইন্দো-ইসলামী বে-দাগ মেলবন্ধনের
সেই বিস্ময়কর পরীক্ষার আদিম উদাহরণগুলিকে
সৌখিন-মজদুরীর অজ্ঞহাতে এ-ভাবে তছনছ করার
জন্য স্থাপত্যের কোনো ছাত্র কোনোদিন শাহজাহাঁকে
ক্ষমা করতে পারে না। কী প্রয়োজন ছিল সেগুলি
ভূমিসাৎ করার? আগ্রা-কিল্লার আট-আনা অংশ তো
তখনও ছিল ফাঁকা—'ভেকেন্ট প্লট'। না হয় নদী
কিনার থেকে কিছুটা দূরেই নির্মিত হত সৌখিন
মর্মরে-গড়া রঙমহালে শাহ-য়েন-শাহ শাহজাহাঁর
কিলাসের আয়োজন?

সাহিত্য-শিল্প-সঙ্গীত-দর্শন-ইতিহাসচর্চা, কল্পিত জ্ঞান-
বিজ্ঞান-ললিতকলার বাবতীর শাখায় মঙ্গলদুগের
সূর্য ছিলেন 'জেনিথ' তার ঐ ঠাকুরদার আশ্রয়েই।
জাহাঙ্গীরী-জমানার মিনিরেচার পোর্টলে, কয়েক সে
সূর্য পশ্চিমে ঢলেছে। আর তাজমহল জে অস্ত-
গামী সূর্যের পশ্চিম-দিগন্ত-উদ্ভাসী শেষ বর্ণ-
সম্ভার। তার পরেই বিবি-কা-অক্‌বারার কিল্লুল
আন্দেয়া!

বিশ্বাস করতে না পারেন তো এখনই ভুলনা করে
দেখুন না কেন ঐ আগ্রা-কিল্লার আকবরী দিল্লী
গেট'-এর সঙ্গে লাল-কিল্লার শাহজাহানী দিল্লী-
গেট'-এর। তাহলেই বুঝতে পারবেন শাহজাহাঁর
কোনো মৌলিক চিন্তা ছিল না। আকবরী দরওয়াজা



চিত্র-9.10 জাহাঙ্গীরী মহল, বাস্তব নকশা : আগ্রা-কিল্লা।

একটিই হেতু : যতখানি প্রতিভা থাকলে সমকালে
দাঁড়িয়ে প্রাণধান করা যায় যে, আকবর-নির্মিত সেই
অধঃসহস্র ইমারৎ স্থাপত্য-ইতিহাসের যুগলম্বিকত্বের
প্রতীক, ততখানি স্থাপত্য-প্রতিভা ছিল না শাহজাহাঁর।
শাহজাহাঁ বুঝতে পারেননি যদু, স্থাপত্য নয়।

যেমন তুগলকী-লোদী-শেরী স্থাপত্যকে ডেকে বসে-
ছিল আদি নবাগত! - শাহজাহাঁর দরওয়াজা তা
কলতে পারেন না। বরং বলল : আদি প্রটোটাইপ!
আমার ঠাকুরদার!

লাল-কিল্লার দিল্লী-গেটের (চিত্র-9.9) দৃ-

প্রান্তে সেই দুই আটকোনা ব্যাস্টিয়ান, একই ছাঁদের। খিলানও তাই। ছতী, গুলদস্তা, সবই মাছি-মারা নকলনিবিশেষ নিপুণ হুবহু অনুলকরণ। মায় দরওয়াজার দু-পাশে ঐ যে জোড়া-হাতী, ওটাও উট-ঘোড়ার রূপান্তরিত হতে ভরসা পাবনি। তফাতের মধ্যে—ব্যাস্টিয়ানের কুঞ্জগদূলি এখন আর সাদামাটা নয়, তিন-তিন পাপড়িওয়ালা। যা ছিল যোম্মার শিরস্ত্রাণে বর্মগদূলিকা, তা হয়েছে বাদশাহী তাজের হাল্কা পাখির পালক। আর দেখছি, কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের উপর একসার ছোট-ছোট গম্বুজ এবং ভিতর দিককার অলঙ্কৃত গবাঁকটা এসেছে অন্দর থেকে সদরে। দুটোর একটাও মৌলিক চিন্তা নয়। ঐ একসার ক্ষুদ্রাকায় গম্বুজের দুই পাশে দুই গুলদস্তা, তলায়-তলায় ছোট-ছোট খিলান—ওটা বুলন্দ-দরওয়াজা (চিত্র—9.21) থেকে টুকে মেরে দেওয়া। শাহজাহাঁ এটুকুও বুঝতে পারেননি যে, বুলন্দ-দরওয়াজা একটা বিজয়-তোরণ, কেজো ভূমিকার চেয়ে তার তরফে বড় কথা মাথার উপর ঐ লরেলপাতার মুকুটখানি। তাঁর নিজের দিল্লী দরওয়াজা কোনো বিজয়-তোরণ নয়, সে দুর্গ-রক্ষী মাত্র। সৌখিন, নয়নাভিরাম কিছ্র মোকাম বানাতে পারলেই কেউ জাত আর্কিটেক্ট হয় না ; মার্বেল দিয়ে মূড়ে দিলেই ইমারৎ লাভ করে না ‘আর্কিটেক্টনিক’ ব্রহ্মা !

আগ্রা-কিল্লার ঐ শ-পাঁচেক আকবরী-ইমারতের ভিতর মাত্র দুটি মহল রক্ষা পেয়েছে : আকবরী মহল ও জাহাঙ্গীরী মহল।

আকবরী মহল : এটি 1569 সালে সমাপ্ত হয়। আবুল ফজল বলেছেন, তখন এর নাম ছিল ‘বঙ্গাল-মহল’। বোধকারি বঙ্গদেশীয় স্থপতিবিদদের প্রতি কৃতজ্ঞতার সন্মতি এই নামকরণ করেন। এই ইমারতেই দেখছি, বাঁম ও ব্র্যাকেট পদ্ধতিতে ছাদের ভার বইবার আরোহণ করা হয়েছে, আর্কুয়েট-পদ্ধতির পরিবর্তে। কক্ষগদূলির ভিতরে গিরে উপর দিকে তাকিয়ে দেখবেন—গম্বুজ নেই, সমতল ছাদ। কোনো ইস্লামী ইমারতে এত ব্যাপকভাবে বাঁম ও ব্র্যাকেট ইতিপূর্বে ব্যবহৃত হয়নি।

পুনরুদ্ধার দোষ এড়াতে দুটি ইমারতে একই জাতের স্থাপত্য-প্রয়োগবিদ্যার কচ্চিচি না করে শুধু জাহাঙ্গীরী মহলেরই বিস্তারিত বর্ণনা দিই (চিত্র—9.10)।

জাহাঙ্গীরী মহল : সর্দুচ্চ প্রবেশ তোরণের ভিতর দিয়ে এসে পেঁছাবেন I-চিহ্নিত হল-কামরায়। এটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করার—চারপ্রান্তে চারটি খিলান কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হয়ে আসছে, অথচ স্কুইণ্ড-পেডেণ্টিভগদূলি হিন্দু-স্থাপত্যের ‘ট্র্যাবিয়েট’ পদ্ধতির। অর্থাৎ ইমারতে প্রবেশমাত্র দেখতে পাবেন, হিন্দু-মুসলিম মিলিত শৈলী—অম্বরকুমারী আর আকবরের যুগলমূর্তি। পূর্ব দিকে এগিয়ে চলুন—রুজ্জ-রুজ্জ গমনাগমনের পথ নেই। এ-কান্ডটা পরে ফতেপুর-সিক্রিতেও দেখবেন। উদ্দেশ্য হচ্ছে, জেনানার পদারক্ষা। গমনাগমনের পথ সরাসরি হলে বাইরে থেকে অন্দর-মহলটা দেখা যেত।

কেন্দ্রস্থ প্রাঙ্গণটি (X) প্রায় সমচতুষ্কোণ, 21.95 মিটার বর্গক্ষেত্র। লাল পাথরের গাঁথনি, সূনিপুণ হাতে গড়া ব্র্যাকেট ও খিলান। উত্তরে একটি সম্মেলন কক্ষ (A), 18.9×11.3 মিটার মাপের। দরজার মাথায়—লক্ষ্য করে দেখুন, খিলান নেই, আছে হিন্দু-পদ্ধতির লিন্টেল অথবা কর্বেল-করা বাঁম। ব্র্যাকেটে গুজরাটী নকশার হাতী অথবা মকর। বাঁকের মূখে মূখে হংসগ্রীবা।

দক্ষিণদিকের কক্ষটি (B) আকারে কিছ্র ছোট। এখানে লক্ষণীয়, তিন দিক ঘেরা একটি অলিন্দ, আর তার সঙ্গে জালি-কাজ-করা পর্দা—যেমনটি দেখেছি গোয়ালিয়রের মানমন্দিরে ‘আঁখ-মিচোলী’-তে।

D-চিহ্নিত কামরাটি অলঙ্করণে আকীর্ণ। মাঝে মাঝে কুলদ্বীপ। যেন ছোট-ছোট দেব-দেবীর মূর্তি সাজিয়ে রাখার ঠাই। ‘যেন’ নয়, বাস্তবেই তাই—এ কক্ষটি ছিল মুসলমান সম্রাটের হিন্দু-মহিষী ও পুরললনাদের মন্দির। মহলের পূর্বপ্রান্তে সূদীর্ঘ বারান্দা, যেখান থেকে যমুনা দেখা যায়।

কেউ কেউ বলেছেন, এ প্রাসাদ জাহাঙ্গীরের তৈরী, তাই তার ঐ নাম। নিঃসন্দেহে সে তথ্য ভুল। আবার কেউ বলেন, এটি সম্রাট আকবর তৈরি করিয়েছিলেন শাহজাদার আবাস হিসাবে। আমার মনে হয়, সেটাও সঠিক নয়। কোনো ঐতিহাসিক নজির বা শিলা-লিপির জোরে এ-কথা বলছি না ; আন্দাজ করছি ইমারতের স্থাপত্যশৈলী দেখে। আমার অনুমান এটির নির্মাণকাল 1565-72 ; সেলিম যখন অজাত অথবা নিতান্ত শিশু। ফতেপুর-সিক্রির পরিণত শৈলীর পূর্বসূরী এই ইমারৎ।

আগ্রা-দরওয়াজা

সেলিমের জন্ম-ইতিহাসটা আমাদের অজানা নয়। স্যার যদুনাথ, ডঃ রমেশ মজুমদার বা ডঃ শ্রীবাস্তব না পারলেও সোরাব মোদী তা পেয়েছেন—গোটা ভারত-বর্ষকে জানিয়ে দিতে, সেই ‘মুঘল-এ-আজমে’র কিস-সা। নিতান্ত রূপকথার ‘গম্পা’। রাজার হাতিশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া আছে, অথচ রানীমার কোল-আলোকরা সাতরাজার-ধন মাণিক নেই। 1564 সালে রাজার যমজপুত্র হয়েছিল, কিন্তু জোড়া ঈদের চাঁদ জোড়া-পূর্ণিমা দেখেনি! আরও বছর খানেক পরের কথা। কে একজন সম্রাটকে সংবাদ এনে দিল : আগ্রার অনতিদূরে সিক্রি গাঁয়ে বাস করেন এক অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ফকির—শেখ সেলিম চিন্তিত। তাঁর আশীর্বাদে কী না হয়? ‘অপুত্রের পুত্র হয়, নির্ধনের ধন!’ আকবর স্থির করলেন—সম্রাটসীর দোরে ধনী দেবেন। বিরাট শোভাযাত্রা চলল আগ্রা থেকে সিক্রিতে। হাতী-ঘোড়া-সৈন্য সামন্ত। আর সবার পুরোভাগে তীর্থ দর্শনে চলেছেন তামাম হিন্দুস্থানের শাহ-য়েন-শাহ্! পদব্রজে।

বৃদ্ধ ফকিরের বয়স তখন নব্বই পুরতে মাত্র দু-বছর বাকি। সম্রাটের আর্জি শুনে বললেন : হবে! খোদাতালা তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন!

অনতিবিলম্বেই সংবাদ পাওয়া গেল অম্বরমহিষী আবিষ্তা—তাঁর গর্ভসগ্গারের লক্ষণ দেখা গেছে। আকবর তাঁকে রাজপ্রাসাদে রাখলেন না। সিক্রি গ্রামে ঐ সম্রাটসীর খান্কার কাছাকাছি রাতারাতি এক মোকাম বানিয়ে দিলেন। চতুর্দোলায় চেপে অম্বরমহিষী এসে আগ্রায় নিলেন সেই আবাসে। সেখানে 30শে আগস্ট 1569 তারিখে সন্তানলাভ করলেন অম্বরমহিষী। আকবর ঐ ফকিরের নামানুসারে তার নাম রাখলেন : ‘সেলিম’। ডাকতেন ‘শেখ-বাবা’ বলে।

শহর-আগ্রা থেকে উনচিশ কিলোমিটার দূরবর্তী এই গ্রামটি সম্রাটের পছন্দ হয়ে গেল। তিনি হুকুম দিলেন ঐখানে একটি মহানগরী স্থাপনের। যেন ময়দান-বের কান্ডকারখানা। বছর না খুঁরতে তৈরী হয়ে গেল দুর্গপ্রাকার, দুর্গ, ইমারৎ ও তাল্লাও (চিত্র--9.11)। দীঘিটি প্রাকৃতিক। শুধু সেচ-স্থপতির কারিগরী

কৌশলে জলটা ধরে রাখার ব্যবস্থা হল, নিকাশের দিকে একটি বাঁধ নির্মাণ করে। শহরের চৌহদ্দী প্রায় দশ কিলোমিটার। এটিকে সুরক্ষিত দুর্গের মতো বানানো হয়নি, প্রয়োজনও ছিল না। আকবরী শাসনের বনিয়াদ এত দৃঢ় যে—আর তা ছাড়া অদূরেই তো রইল দুর্ভেদ্য আগ্রা-কিল্লা। বহিঃশত্রুর আক্রমণ অথবা বিদ্রোহের সূচনা দেখলেই সেখানে আগ্রায় নেবার সুসন্দোবস্ত করা থাকল। তবু রাজাবরোধ বেটনকারী প্রাকার হল প্রথমাত্মিক সুদৃঢ়। ছয় কিলোমিটার দীর্ঘ, ষোল্লিট উঁচু এবং প্রাকারের উপর আড়াই মিটার চওড়া প্রশস্ত পথ দিয়ে অনায়াসে ঘোড়-সওয়ার টেহল দিতে পারে। দুর্গ-প্রাকারে কিছু দূরে দূরে প্রচলিত পশ্চাতিতে ব্যাস্টিয়ান; অনেকগুলি দরওয়াজা। প্রধান প্রবেশ পথ উত্তর-পূর্বে। নাম : আগ্রা দরওয়াজা।

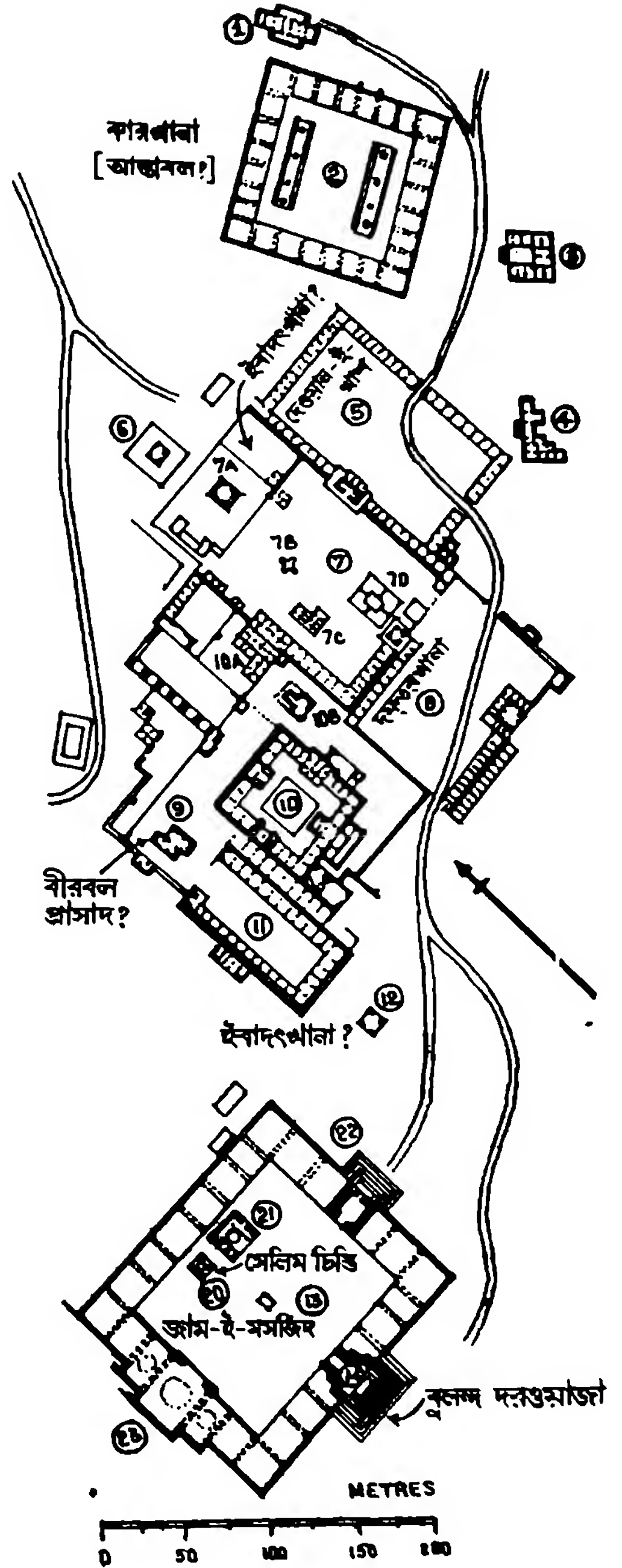
আপনি নিশ্চয়ই আগ্রা থেকে আসছেন। ফলে প্রধান তোরণ আগ্রা দরওয়াজা অতিক্রম করেই দেখবেন সামনে নহবৎখানা (16)। ঠুঁরা কলতেন, ‘চহার-সুখ’। তার ভিতর দিয়ে রাজপথ বিসর্পিল পথে এগিয়ে গেছে। ডাইনে একটি কাঁচা সড়ক। সেটা দিয়ে এক কদম এগিয়ে গেলেই পাবেন ‘তানসেন বারাদরী’ (15)। উম্তাদোঁ-কী-উম্তাদ গাজী মিক্রা তানসেনের আবাস। গত দশকেও দেখেছি, ফাঁকা টিলার উপর ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত কিছু ভাঙা পাথর—মাঝে মাঝে অবলুপ্ত ইমারতের ভিতের আভাস। নির্জন প্রান্তরে দাঁড়িয়ে সেবার মনে হয়েছিল সু-সরস্বতী সেখানে লুটিয়ে পড়ে কান্দছেন—‘বাল-বিধারকে টুটি কবরোপে যব কোই মেহেজবীন রোতি হয়’! পথবিহীন বাব্জার ডালে নিদাঘ-মধ্যাহ্নে ঘুঘুর কুঞ্জে বৃথাই সেদিন কান পেতে শুনতে চেয়েছি ইমন, বেহাগ বা পুরিমার রেশ! এ বছর (1980) দেখে এলাম, সেই ইমারৎটা পুরাতত্ত্ব বিভাগ থেকে আদ্যন্ত নতুন করে বানানো হচ্ছে। আকবরী শৈলীতে। আগামী বছর যদি যান, দেখবেন সেই ‘বালবিধারি’ বিধবার নিকা সুসম্পন্ন। সে জমিয়ে বসেছে ঠুঁরির আসরে। তার সর্বাপেক্ষা ঝলমল করছে নানান আভরণ। তার বাজুবন্ধ খুঁদু-খুঁদু যায়!

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. রেন্ট হাউস | 10. A. পাঁচমহল |
| 2. কারখানা (আস্তানল) | 10. B. সুনহারামহল |
| 3. কোনও অমাত্যের গৃহ | 11. অশ্বাবাস/উষ্ট্রাবাস |
| 4. স্নানাগার | 12. ইবাদতখানা (?) |
| 5. দেওয়ান-ই-খাশ | 13. জাম-ই-মসজিদ |
| 6. সূর্যতাল (পূর্বাঙ্গী) | 14. বুলন্দ-দরওয়াজা |
| 7. A. দৌলতখানা (?) | 15-19 চিত্র-9.11 চবুতবা |
| 7. B. পচিশী কোর্ট | (প্রদর্শিত অংশের |
| 7. C. আবদারখানা | বাহিরে) |
| 7. D. অনুপতলাও | 20. সৌলমার্চিস্তর দরগা |
| 8. দফতরখানা | 21. ইসলাম-খাঁ মক্‌বারা |
| 9. বীরবল-প্রাসাদ (?) | 22. পূর্ব-দরওয়াজা |
| 10. যোধপূর-প্রাসাদ | 23. মসজিদ-কিবলা |

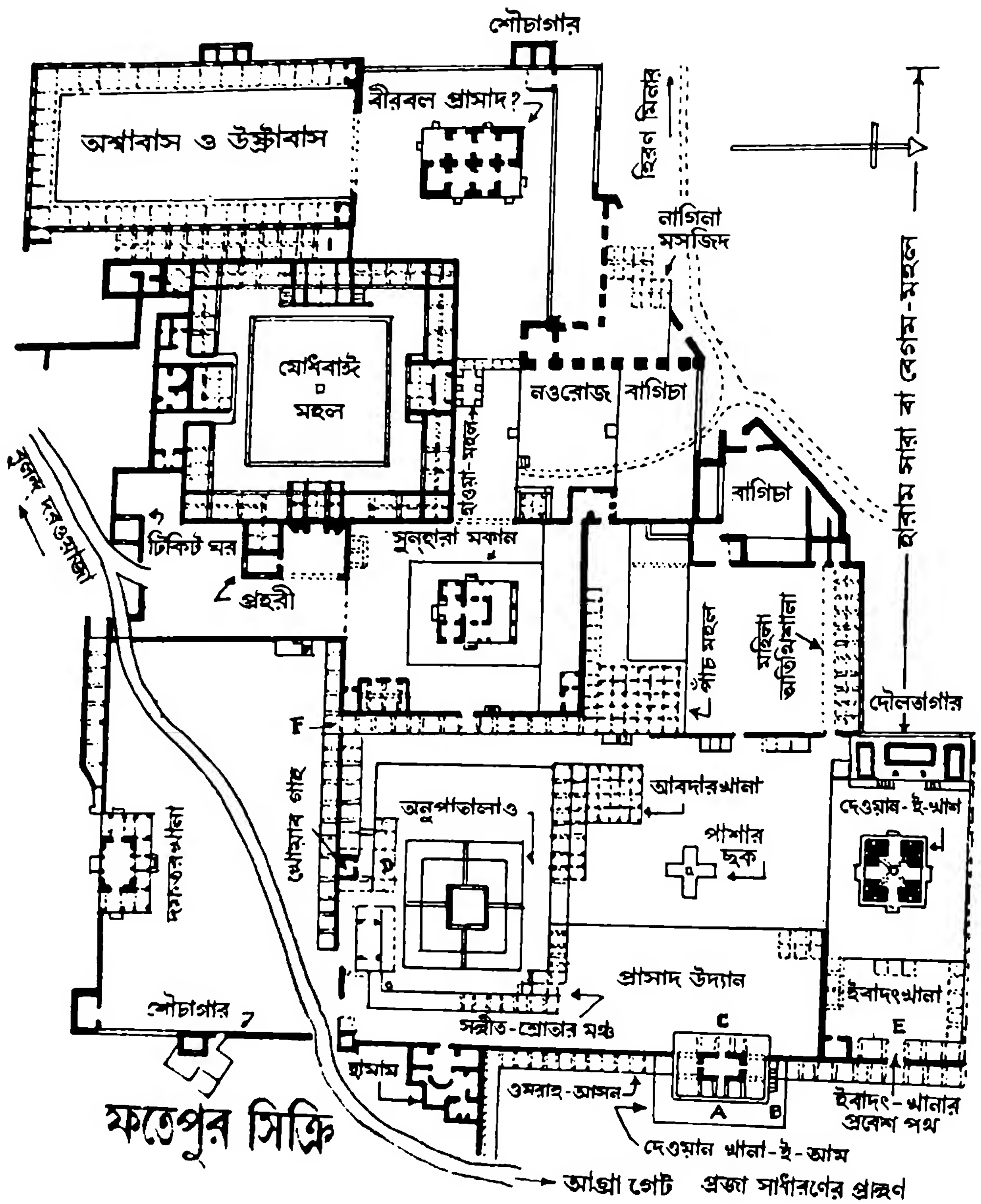
এ জিনিসটা—মাপ করবেন, আমার ভালো লাগেনি। মেরামতির কাজ নিশ্চয়ই হবে আকবরী শৈলীতে ; কিন্তু এমন একটি সূক্ষ্ম সীমারেখা টানতে হবে, যাতে দর্শক বদ্বতে পারেন কতটা আদিমরূপ, কতটা পুরাতত্ত্ব বিভাগের মেরামতির কেরামতি। এ বিষয়ে আমার পূর্ববর্তী গ্রন্থ অজন্তা-অপরূপাতেও¹⁶ আলোচনা করেছিলাম। লোক পরম্পরায় শুনছি, এ মত স্বীকার করতে পারেননি পুরাতত্ত্ব বিভাগের অতি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত একজন বাঙালী অফিসার। তাঁর মতে মেরামতি এমন নিখুঁত হবে, যাতে দর্শক বদ্বতে না পারে কতটুকু আদিম রূপ, আর কতটুকু সংযোজন। তা মতপার্থক্য ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রভেদ তো থাকতেই পারে। অন্তত পুরাতত্ত্ব বিভাগ এইটুকুই করে দিন না—নব-নির্মিত স্থাপত্য-কীর্তিতে রেখে দিন কিছু ফ্রেমে বাঁধানো ফটোগ্রাফ—কাজ শুরুর করার পূর্বের অবস্থা দেখিয়ে। তাহলেই আমাদের মতো সাধারণ দর্শক তৃপ্ত হবে।

আর পুরাতত্ত্ব বিভাগকে ধন্যবাদ তাঁদের ঐ মত-টাকে সম্প্রসারিত করে অজন্তার নষ্ট হয়ে যাওয়া প্রাচীর চিত্রে নতুন করে রঙের পোঁচরা মারতে কাউকে বসিয়ে দেননি।

ফতেপূর-সিক্রির স্থাপত্য-কীর্তিকে আমরা ত্রি-ধারায় বিভক্ত করে আলোচনা করব। এক : রাজসিক প্রয়োজন (দফতর, দৌলতখানা প্রভৃতি) ; দুই : পারিবারিক প্রয়োজন (জেনানামহল, খোয়াবগাহ ইত্যাদি) ; তিন : ধর্মীয় প্রয়োজন (মসজিদ, দরগা ইত্যাদি)। অবশ্য স্থানে স্থানে নির্দিষ্ট সীমারেখা মেনে চলা হয়তো সম্ভবপর হবে না, যেমন রাজসিক বুলন্দ-দরওয়াজা পড়বে ধর্মীয় পর্যায়ে, ধর্মীয় ইবাদতখানা আলোচিত হবে রাজসিক-বিভাগে।



চিত্র-9.12 প্রধান দর্শনীয় অংশের ভূমি-নকশা, ফতেপূর-সিক্রি।



চিত্র 9.13 ফতেপুর সিক্রি রাজপ্রাসাদের স্থানিক নকশা।

দেওয়ানখানা-ই-আম : আয়তক্ষেত্রের আকারে প্রকাণ্ড উদ্যান, তার চারদিকে অলিন্দ। পশ্চিমপ্রান্তের অলিন্দের কেন্দ্রস্থলে দ্বিতলে একটি কোলা-বারান্দায় পাশাপাশি পাঁচটি কক্ষ। কেন্দ্রস্থ অলিন্দ-ঝরোকার (চিত্র-9.13, A) বসতেন শাহ-য়েন-শাহ স্বয়ং। তিনি এখানে প্রত্যহ প্রাতে প্রজাবৃন্দকে দর্শন দিতে উপস্থিত হতেন পিছনের (C) প্রবেশপথ দিয়ে। বাহিরের দিক থেকে অন্যান্য বিশিষ্ট অমাত্যেরা, আমীর-মালিকেরা দ্বিতলে উঠে আসতেন একটি পৃথক সোপান (B) বেয়ে। এই ঝরোকার উত্তর-পশ্চিম কোণে দেখবেন এখনো একটি লোহার আঙটা পাষাণ চত্বরে সুদৃঢ়ভাবে আটকানো আছে—গাইডকে প্রশ্ন করবেন, সে দেখিয়ে দেবে। সেখানে রক্তদ্রব্য অবস্থায় নিত্য হাজিরা দিত একটি সুশিক্ষিত রাজহস্তী। কোনো হতভাগ্যের মৃত্যুদণ্ড হলে সর্বসমক্ষে ঐ হস্তীর পদ-তলে তাকে পিষ্ট করা হত! বলা বাহুল্য, এ ঘটনা ঘটত ক্রটি কখনো—তবু রাজশক্তির প্রতীক হিসাবে মাহুৎ নিত্য উপস্থিত করত সেই হস্তিপ্রবরকে। অর্থাৎ কামড়াই আর না কামড়াই ফোস করতে দোষ কি?

এই প্রশস্ত উদ্যানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মনে মনে ছবিটা আঁকবার চেষ্টা করুন—হিন্দুস্থানের শাহ-য়েন শাহ আকবর-বাদশার দরবারের দৃশ্যটি। সারি সারি শান্ত্রী সজ্জিনহাতে দণ্ডায়মান। ঘোষক উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করছে সম্রাটের আগমন বার্তা : হুশিয়ার! পিছনের দ্বারপথে সেই বৃষস্কন্ধ পুরুষটির আবির্ভাবমাত্র সসম্মানে নিজাম-উল-মুলুকতক্ হাজারো প্রজা উঠে দাঁড়িয়ে পূজার দিচ্ছে : আল্লা হো আকবর!

প্রসঙ্গত বলি, কয়েক বছর পূর্বে ব্রিটেনের তদা-নীনতন প্রধানমন্ত্রী কালাহান যখন ভারতভ্রমণে আসেন, তখন ঐ A-চিহ্নিত ঝরোকার একটি মৃগল-সিংহাসনে তাঁর সম্বর্ধনার আয়োজন হয়। তা-কড় তা-কড় ভারতীয় রাজনীতিজ্ঞ এবং পদস্থ মন্ত্রীমহোদয়গণের (নাম থাক, কে-জানে কবে আবার এমার্জেন্সি হবে) আসন পাতা হয়েছে। তাঁরা ঐ B-চিহ্নিত সোপান অতিক্রম করে যে-দ্বার আসনে বসে আছেন। কৃত্রিম দরবারের জৌলুষ আর রোশনাইয়ে আকবরী-জমানাকে উজান বেয়ে ফিরে আসতে হয়েছে। উদ্যানে কিছু প্রদর্শনীরও আয়োজন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এসে সব কিছু দেখে তাক্সব। হঠাৎ তিনি বলে বসলেন, অসম্ভব! ঐ সিংহাসনে আমি কিছুতেই বসব না! ভারতবর্ষের ইতিহাস আমার অজানা নয়!

এঁরা বে-ইন্ডিয়! কুঁসি-গুঁসি হাতে হাতে নিচ নামিয়ে আনা হল!

এ-কাহিনী ফতেপুর-সিক্রিতে প্রত্যক্ষদর্শী সরকারী গাইডের মুখে শুনোঁছি। কতদূর সত্য তা তামা-তুলসী-গল্পাজ্জ হাতে বলতে পারব না।

ইবাদখানা : আক্ষরিক অর্থ—প্রার্থনাস্থল। আকবরের ইতিহাস নিয়ে যারা গবেষণা করেন তাঁদের কাছে এ ইমারৎ—হিন্দু হলে কাশী, মুসলমান হলে মক্কা। সম্রাটের জীবনদর্শনের সৌকম্য-ভঙ্গে এই সৌধটিই সর্বদেব। ইতিহাস কহছে, 1575 সালে সম্রাট এটি নির্মাণ করেন—ঠিক কোথায় তা কলা হয়নি। প্রাথমিক পর্যায়ে উদ্দেশ্য ছিল—এখানে মুসলমান মোল্লাদের সঙ্গে সম্রাট ধর্মালোচনা করতেন। শিরা ও সুন্নি সম্প্রদায়ের বিবাদ মিটিয়ে দেওয়া, সুন্নি সম্প্রদায়ের মূল বক্তব্যটা প্রাধান্য করা ইত্যাদি। পরে আকবর এই ইমারতের দ্বার অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের জন্যও উন্মুক্ত করে দেন। মুসলমান, হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, জরথুষ্ট্র প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মের পণ্ডিতদের তিনি পর্যায়ক্রমে আমন্ত্রণ করতেন—তাদের বক্তব্য শুনতেন, আলোচনা করতেন, তর্ক করতেন এবং নিজ সিদ্ধান্তে আসার পথ খুঁজতেন। এরই শেষ ফল-শ্রুতি—দীন-ইলাহী ধর্মের প্রবর্তন। তারপর থেকে ইবাদখানা এ কার্যে ব্যবহৃত হত না।

এই ইবাদখানায় যে ধরনের আলোচনা হত তা থেকেই সম্রাটের চরিত্রটা বেশ বোকা যায়। কোনো কোনো ঐতিহাসিক ইঙ্গিত দিয়েছেন—আকবরের ধর্মসিঁহস্তুতা, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য প্রচেষ্টা এক দীন-ইলাহীর প্রবর্তন নিতান্ত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। অর্থাৎ মূল উদ্দেশ্য ছিল শাসন-স্বক্ষমতার বনিয়াদ সুদৃঢ় করা। এ-কথা আংশিক সত্য বলে মনে হয়, পূর্ণ সত্য নয়। নিরঙ্কর আকবরের অন্তরে লুকিয়েছিল একটি তালিব-ইলমী, ক্রিস্টিয়ান ছাত্র, একটি জ্ঞানপিপাসু সত্তা। নেতি নেতি করে তিনি তামাম জিন্দেগীভর কী-একটা খুঁজছেন : প্রাণ্ডির পশরা পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও সেই ফাঁকটা তাঁর ভরেনি! ফরাসী দার্শনিক ডেকার্টের চেয়ে অর্ধ শতাব্দী পূর্বে তিনি এসেছেন এই দুনিয়াদারীর দু-কুঁড়ি-সাতের খেলা খেলতে, অর্ধ শতাব্দী পূর্বে খেলা সাপাও করেন। ঐ ডেকার্টেঁ যেভাবে প্রচলিত ক্যাথলিক ধর্মকে নিজ বিবেক-বুদ্ধির তুলাদণ্ডে ওজন করে নিতে চেয়েছিলেন,

ঠিক তেমনিভাবেই এ পূর্ববর্তী আকবর সম্মুখে নিতে চেয়েছিলেন ধর্মাত্ম মোল্লাদের সংস্কারাজ্ঞার মতবাদগুলি। ডেকার্টে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন : Cogito, ergo sum (আমি চিন্তাশক্তি সম্পন্ন, তাই আমি আছি) ; আকবর সিদ্ধান্তে এলেন : ম্যানিশ্ হামেশা জাহক্ শাদ্ বাদ (পরমাত্মাতে বিলীন হলেই জীবাত্মার মৃত্তি—আকরিক অর্থ অবশ্য তাঁর আত্মা বিশ্বব্রহ্মের অন্তরে বিলীন হয়ে আনন্দলাভ করুক)।

ইবাদতখানার ধর্মালোচনার প্রসঙ্গে নানান তথ্য জিপিবদ্ধ করে গেছেন আব্দুল ফজল ও ফৈজি। দুটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ করছি, আকবর-চরিত্রের দুটি দিক উন্মোচিত করতে ; তাঁর পরম সহিষ্ণুতা এবং তাঁর বৈজ্ঞানিকসুলভ অনুসন্ধান।

একবার বৃন্দাবনবাসী এক তত্ত্বজ্ঞানী হিন্দু সম্মাসীর বিষয়ে উৎসাহিত হয়ে সম্রাট তাঁর জনৈক কর্মচারীকে বলেছিলেন সম্মাসীকে সদলবলে ফতে-পুর্-সিদ্ধিতে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতে। সম্রাটের বাসনা যে কর্মচারীটিকে চরিতার্থ করতে দেওয়া হল সে মঙ্গলরীতিতে রপ্ত, আকবরী-জমানার অভ্যস্ত নয়। ধরে আনতে কললে সে বেঁধে আনে। সে সেপাই পাঠিয়ে দিল বৃন্দাবন থেকে সেই সম্মাসীকে সশিষ্য স্নেহে নিয়ে আসতে। শাহ-য়েন-শাহ-এর আদেশ! সম্মাসীকে আসতে হল। পদব্রজে—বৃন্দাবন থেকে ফতেপুর্-সিদ্ধি। সম্রাট এসব বৃত্তান্ত কিছুই জ্ঞানেন না। ইবাদতখানায় বৈদিন সম্মাসী উপনীত হলেন সেদিন আকবর তাঁকে অনুরোধ করলেন সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যায় কিছু কলতে। অকুতোভয় সর্বভাগী সম্মাসী তৎক্ষণাৎ মূখে মূখে একটি স্বরচিত দোঁহা শুনিয়ে দিলেন :

“সান্তান কো কাঁহা সিদ্ধি সন্ কাম ?

আওরুং-রাং পাইয়া টুটি, ছোড় গায়ো হর-নাম !
যাকে দেখে ঘিন্ উপহাস হয়,

তোহি করবে পড়ি সালাম !!”*

সমস্ত সভা স্তম্ভিত। স্মারপ্রান্তে সিপাহ-সালার অজান্তেই ডান হাতে চেপে ধরেছে কোমরবন্ধে তরোয়ারের মূঠ। আকবর নির্বাক। সংবাদ নিয়ে

* আসাদের মতো ক্ষুদ্র প্রাণীর সিদ্ধিতে কী কাম ?

সেতে-আসতে পারের ঝিল ঝলে যায়,

ভুলে গেলাম হরের নাম।

এসে যাকে দেখতে হল, তার ধর্মে তো পা ঘিন্

ঘিন্ করছে! উপায় কি? ওকেই সেলাম জানাই।

জানতে পারলেন কর্মচারীর অবিম্ব্যকারিতায় সম্মাসী কী-ভাবে নিগৃহীত। আগন্তুক সম্মাসীকে একমুঠো আসরফি প্রণামী স্বরূপ দেওয়ার আদেশ করলেন শূদ্ধ।

দ্বিতীয় কাহিনীটি আকবরকে লক-বেকন-ভঙ্গ-তেয়ারের শ্রেণীভুক্ত করে।

ইবাদতখানার প্রথম দিকের ঘটনা। তখন সেখানে শূদ্ধ মুসলমান মোল্লাদেরই প্রবেশাধিকার। আকবর একদিন বললেন, আপনারা বলছেন, এই দুনিয়ায় সব কিছুই পয়দা করেছেন আল্লাহ্ ; কিন্তু সবকিছুই প্রত্যক্ষভাবে তিনি সৃষ্টি করেননি নিশ্চয়? পরোক্ষ-ভাবেও তো কিছু হয়েছে—মানুষের নিজের চেষ্টায়?

বড়ে-ইমাম ব্যাঙভরে বললেন, যেমন এই ইবাদত-খানা-ইমারৎ?

আকবর গাম্ভীর্য বজায় রেখে এবং ব্যাঙটা গায়ে না মেখে বললেন, না! যেমন ভাষা। বাক্শক্তি। আল্লাহ্ মানুষকে স্বর দিয়েছেন ঠিকই—কিন্তু অর্থ-বহু শব্দের ব্যবহারে মনের ভাব দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে সংক্রামণের যৌ বিদ্যা—ভাষার ব্যবহার, তা কি মানুষের সৃষ্টি নয়?

হরগীজ্ নয়! সমস্বরে প্রতিবাদ করে ওঠে মোল্লার দল! ওদের সম্মুখে সিদ্ধান্ত : ভাষাও ঈশ্বরের দান।

আকবর মানতে রাজী নন, বলেন—আমার ধারণা মানবশিশু তার বাপ-মায়ের কথাবার্তা শুনে নিজের চেষ্টায় ভাষা শেখে।

বড়ে-ইমাম তাঁর দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে নিদান হাঁকেন, জাহাঁপনার এরকম ভ্রান্ত ধারণা হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়! আপনি কাফেরদের সঙ্গে বড় বেশি মেলামেশা করেন।

: তার মানে আপনারা বলতে চান, কোনো সদ্যোজাত শিশু যদি জন্মের পর থেকে মানুষের ভাষা না শোনে তাহলেও আল্লাহ্-র কৃপায় সে কথা বলতে পারবে?

: আলবৎ পারবে! মনে করে দেখুন সম্রাট, এক বছর বয়সে আপনি মায়ের ক্রোড়চ্যুত হয়েছিলেন ; কিন্তু চার বছর বয়সে যাকে দেখেই চিন্তে পারলেন! এ কী আপনার নিজস্ব কৃতিত্ব? এ তো সেই পরম করুণাময় আল্লার কৃপা।

সমস্ত সভা একবাক্যে কেয়াবাং দিয়ে ওঠে।

আকবর হেসে বললেন, ঠিক আছে। এ প্রতর্ক আজ মূলতুর্বি থাক। পরে একদিন এ নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

এই ঘটনার ঠিক চার বছর পরে সম্রাট একদিন বলে বসলেন, মহাশয়গণ, আপনাদের নিশ্চয় স্মরণ আছে, চার বছর পূর্বে আমরা একটি প্রত্ন মূলত্ব নিয়ে রেখেছিলাম : ভাষা ঈশ্বরের দান, না মানুষ্যের সৃষ্টি। মনে পড়ছে ?

মোল্লার দল মুখ তাকাতাকি করে। কারও কিছু স্মরণ হয় না। তখন সম্রাটের আদেশে মীর মুনসি চার বছর পূর্বেকার 'প্ৰসিডিংস্' পাঠ করে শোনালো। শুনেন সকলেই স্বীকার করলেন, ও হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়েছে বটে।

বাদশা বললেন, আমি পরদিনই একটি পরীক্ষা শুরুর করেছিলাম। আজ তার ফলাফলটা যাচাই করার সময় হয়েছে। আমার আদেশে ফতেপুর-সিক্রির বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দশটি সদ্যোজাত শিশুকে সংগ্রহ করা হয়। আমি তাদের একটি পৃথক মোকামে আজ চার বছর ধরে লালন-পালন করছি। সেজন্য পাঁচজন মৃক-বধির দৃগ্ধবতী ধাত্রীকে নিয়োগ করা হয়েছে। আমার হুকুমে সেই মোকামের ত্রিসীমানার মধ্যে গত চার বছরে কেউ কোনো শব্দ উচ্চারণ করেনি। আজ সেই দশটি শিশু চার বছরের বালক। আসুন, আমরা সেই 'গুংগা-মহলে' গিয়ে দেখি তারা কতটা বাকপটু হয়েছে।

পরীক্ষায় দেখা গেল দশজন শিশুর একজনও কোনো কথা বলতে পারে না। হাত-পা নেড়ে মনের ভাব ব্যক্ত করতে পারে মাত্র। আকবর বললেন, আশা করি এখানে আপনারা আমার মত মেনে নেবেন—ভাষা মানুষ্যের সৃষ্টি, আল্লাহ-র এ দান প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ। 'আমারে দিয়েছ স্বর, আমি তার বেশি করি দান। আমি গাই গান।'

গাইডকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'গুংগা-মহলটা কোথায় ?

সে বলতে পারেনি। নামই শোনেনি বলল। তবে সরকারী হিসাব অনুসারে ইবাদতখানার অবস্থানটা সে আমাকে দেখিয়ে দিয়েছিল। সেটা আবার আমার পছন্দ হয়নি।

পুরাতত্ত্ব বিভাগের মতে হারাম-সারা প্রাসাদের পিছনে, অর্থাৎ তোমাবানা ও আম্ভাবলের দক্ষিণে (চিত্র—9.12-এ 12) যে ভূমিস্তম্ভ সেটাই ইবাদতখানার ধ্বংসাবশেষ।¹⁰ ওরা সে ধ্বংসস্তম্ভ ঘেঁষে সিঁড়িতে এসেছেন—ইবাদতখানা, যার ভিতটুকুমাত্র অবশিষ্ট আছে, তা ছিল একটি চতুষ্কোণ ইমারত, 19.5 মিটার বর্গক্ষেত্র।

আমি একমুঠ হতে পারিনি। আমার বিশ্বাস, ইবাদতখানা ছিল দেওয়ান-ই-খানের পূর্বাঙ্গের চতুষ্কোণ অংশটিতে যার চতুর্দিকে আলন্দ এবং পূর্ব-প্রান্তে একটি প্রবেশ দ্বার ছিল (চিত্র—9.13, E)। এই E-চিহ্নিত দ্বারটি যে অতীতে ছিল, বর্তমানে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, সে-কথা পুরাতত্ত্ব বিভাগের প্রানে ও রিপোর্টে স্বীকৃত। "Emerging from the Jewel House (আমাদের চিত্র—9.13-এর স্ক্যান, দেওয়ান-ই-খান), glance at the remnants of cloisters, towards the north-east corner, which formed a partially enclosed quadrangle. They abut a large ruinous building of two storeys, built of rubble masonry and trimmed with stone. They continued along the bare plastered back wall of the Diwan Khana-i-Amm where the sockets, hollowed out to fix bases of pillars, can still be seen, and would have screened the now closed doorway from that building." (italics ours)

আশ্চর্য! ঐ বৃহৎ ম্ভিতল ইমারতটি এবং বর্তমানে বন্ধ করে দেওয়া (E-চিহ্নিত) দ্বারটি কিজন্য নির্মিত সে-কথা আলোচনা করা হয়নি রিপোর্টে। বর্তমান লেখকের ধারণা, এটিই ইবাদতখানা! এই আয়তক্ষেত্রের মোকামটি ইবাদতখানারূপে চিহ্নিত হলে ঐ দ্বারটি অর্ধবহ হয়ে ওঠে। না-হলে বলতে হয় এটি প্ল্যানিং-এর একটি প্রকান্ড ত্রুটি। দ্বারটি অহেতুকী হলে তাকে ত্রুটি বলতে হবে এজন্য যে, এটি গোটা প্রাসাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করেছে। ঐ খিড়কি-দরজার জন্য পৃথক শাল্মীর প্রয়োজন হচ্ছে। ঘেঁকারে পুরাতত্ত্ব বিভাগ এটি বর্তমানে বন্ধ করে দিয়েছেন। অথচ ঐ অ-সনাত্ত ম্ভিতল মোকামটি ইবাদতখানা হলে ঐ দ্বারটি আবশ্যিক হয়ে পড়ে।

ইবাদতখানার বাহিরের দিক থেকে পশ্চিমের আসবেন, সম্রাট আসবেন ভিতর দিক থেকে। তাই এ ইমারতে দু-দিক থেকে দুটি দ্বার আবশ্যিক। পুরাতত্ত্ব বিভাগ যে (চিত্র—9.12-এ 12) ভূমিস্তম্ভকে ইবাদতখানা বলে সনাত্ত করেছেন সেখানে যেতে হলে সম্রাটকে নানান কামেলার মধ্যে পড়তে হয়। হারাম-সারা বা খোম্বাবগাহ থেকে সম্রাট নিশ্চয় ঐ উট এবং ঘোড়ার আস্তাবলের মধ্যে দিয়ে কোনো খিড়কি পথে প্রতিদিন ইবাদতখানায় যেতেন না। তাহলে তাঁকে যেতে হয়

বিকল্প পথে, দফতরখানার ভিতর দিয়ে, যোথবাঈ-প্রাসাদের পার্শ্বখানার সারিকে জন-হাতি রেখে (ইয়া আল্লাহ! সে-আমলের খাটো-পারখানা!) উট ও ঘোড়ার আশ্রয়ালের পিঠো-পিঠি নির্মিত ঐ পুরাতন বিভাগ-চিহ্নিত ইবাদতখানার! বেশ তাই যদি যান, তো কী-ভাবে যান? এতটো পথ সম্মুখে নিশ্চয়ই প্রতিদিন পদক্ষেপে যেতেন না। ফলে ঘোড়ার দরকার, দেহ-রক্ষী ও নিরাপত্তার প্রয়োজন হয়ে পড়ে আবাশ্যিক। সুতরাং কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না, পারখানা ও আশ্রয়াল সংলগ্ন ঐ ধ্বংসস্তূপ ইবাদতখানার।

অপরপক্ষে দেওয়ান-ই-খাশের পূর্বে ইবাদতখানা যদি অবশিষ্ট হয়, তাহলে বহিরাগত পণ্ডিতেরা যেমন E-চিহ্নিত দ্বার দিয়ে সেখানে যেতে পারেন, তেমনি সম্মুখে হারেম থেকে প্রাসাদ-প্রাচীরের বাহিরে না গিয়েও সেখানে উপস্থিত হতে পারেন। হারেমকে আড়াল করে যে একটি পাথরের জালিকাজ করা প্রাচীর ছিল সে-কথা তো রিপোর্টে স্বীকারও করা হয়েছে—ফলে অন্তরমহলের পর্দাও ব্যাহত হচ্ছে না।

জানি না, বাঙলা গ্রন্থে লেখা এ যুক্তি পুরাতন বিভাগের নজরে আদৌ পড়বে কিনা এবং আকবরী ইবাদতখানাকে ভবিষ্যতে ঐ উটের পুরীষ এবং হারাম-সারার শোচাগারের পরিবেশ থেকে মুক্তি দিতে তাঁরা স্বীকৃত হবেন কিনা।

বাদশাহী হামাম : গাইডকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেবেন, এই স্নানাগারে কী ধরনের ব্যবস্থাপনা ছিল। এখনো তার চিহ্ন দেখা যায়—শীতল ও গরম জল আসার পাইপ, জল গরম করবার আয়োজন, ঠান্ডা ও গরম জলের পৃথক চৌবাচ্চা। তৈলমর্দন-কক্ষ, সংলগ্ন শোচাগার, স্নানকক্ষ, বস্ত-পরিবর্তন কক্ষ সমস্তই পৃথক। এ ঘরে আলো আসার কান্দাটাও লক্ষণীয়। আরও বিশেষ করে দেখবেন, স্নানঘরের ডাডোতে কী মসৃণ 'স্লেজড' টালি বসানো ছিল। সাড়ে পনের-আনাই অবলুপ্ত তবু কিছু কিছু ভূপ্ণাবশেষ চিহ্ন আছে। ওর সামনে একটি দেশলাই কাঠি জ্বালালেই কম্পনার দেখতে পাবেন—একটিমাত্র চিরামে ঘরটা কী পরিমাণ কল্মল করত।

অনুপ-তাল্লাও : চতুষ্কোণ কৃত্রিম জঙ্গাশয়ের কেন্দ্র-স্থল প্রস্তর-নির্মিত বেদী। তানসেন, কৈফুবাওরা প্রভৃতি সূর-সরস্বতীর বরপুত্রদের সেই অবিষ্মরণীয় সম্প্রদায়ের আসর কসত এখানে। গান-বাজনার সখ যদি থাকে তাহলে, চুপি চুপি বাঁজ, ঐ বেদী-পাথরে

হাতটা ঠেকিয়ে সবার অলক্ষ্যে কপালে একবার ছুঁয়ে নেবেন!

বাদশাহ সচরাচর বসতেন উত্তর-পূর্ব কোণের চত্বরায় (সঙ্গীত-শ্রোতার মণ্ড)।

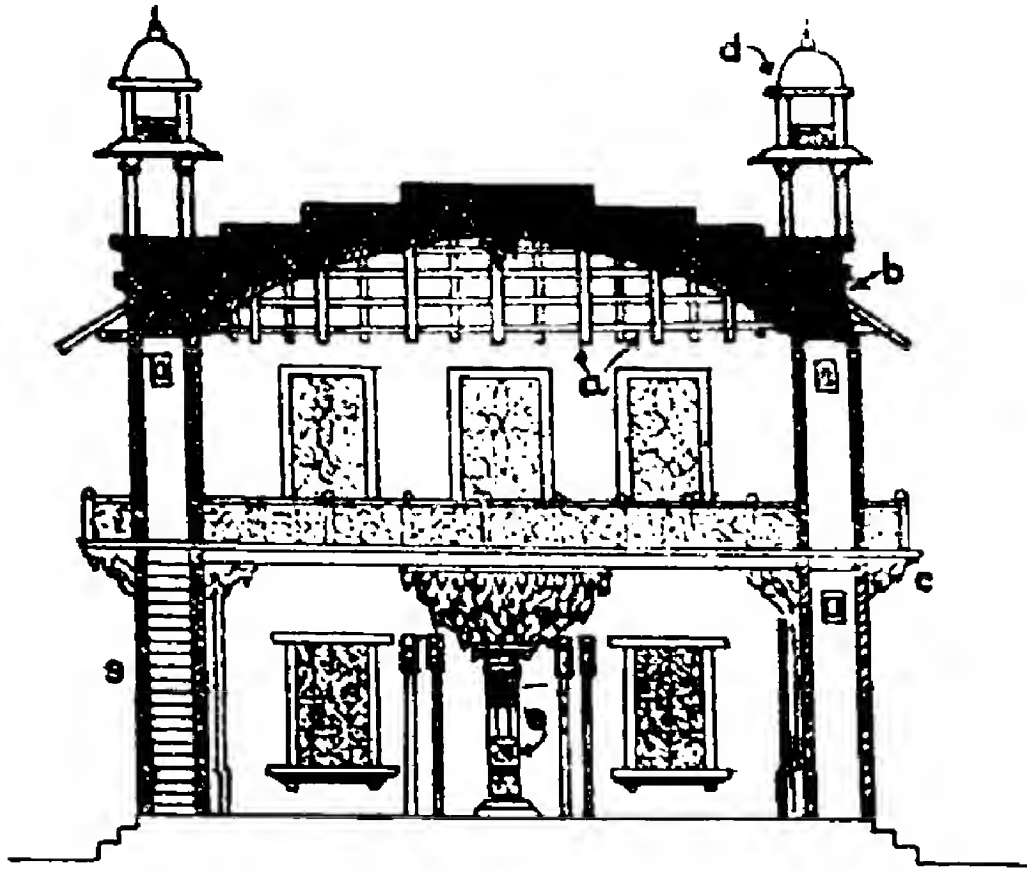
খোয়াবগাহ : অনুপ-তাল্লাও-এর দক্ষিণে অতি বিচিত্রিত অলিন্দ-সম্মিশ্রিত একটি বিশ্রামাগার, তার দক্ষিণে শাহ-য়েন-শাহের শয়নের আয়োজন। পালঙ্ক প্রস্তর নির্মিত; তাতে উঠতে হয় সোপান বেয়ে। ঐ প্রস্তর-পালঙ্কের নিচে থাকত এক হাত জল—যা ক্রমাগত ইভাপরেশান-এ কক্ষটিকে শ্লিথ-শীতল করে রাখত। লক্ষ্য করে দেখবেন, অথবা গাইডকে প্রশ্ন করলে সে দেখিয়ে দেবে—এই শয়নকক্ষ থেকে বেগম-মহলে যাবার, বরং বলা উচিত বেগমমহল থেকে এই খোয়াবগাহ-এ আসবার একটা গোপন পথ আছে! পথ দীর্ঘ এবং এখন মনে হতে পারে সেটা 'গোপন' নয়; কিন্তু সে-আমলে তাই ছিল। পাথরের স্তম্ভীন দেওয়ালগুলি অবলুপ্ত হয়ে যাওয়ায় বর্তমানে গোপনীয়তার আয়োজনটা সহজে বোঝা যায় না।

আবদারখানা : অনুপ-তাল্লাওয়ের উত্তর-পশ্চিমে ইংরেজি L-অক্ষরের মতো এই ইমারতটিকে কেউ কেউ বলেছেন মেয়েদের স্কুল। সম্ভবত এ ধারণা ভুল। হারেমের বাহিরে, বিশেষত অনুপ-তাল্লাও, যানাকি নাচ-গানের আসর, তার সংলগ্ন এ মোকাম নিশ্চয়ই স্ত্রী শিক্ষায়তন ছিল না। এটি অন্য প্রয়োজনে ব্যবহৃত হত। কী প্রয়োজনে? আমার যা অনুমান তা এখনই বলব।

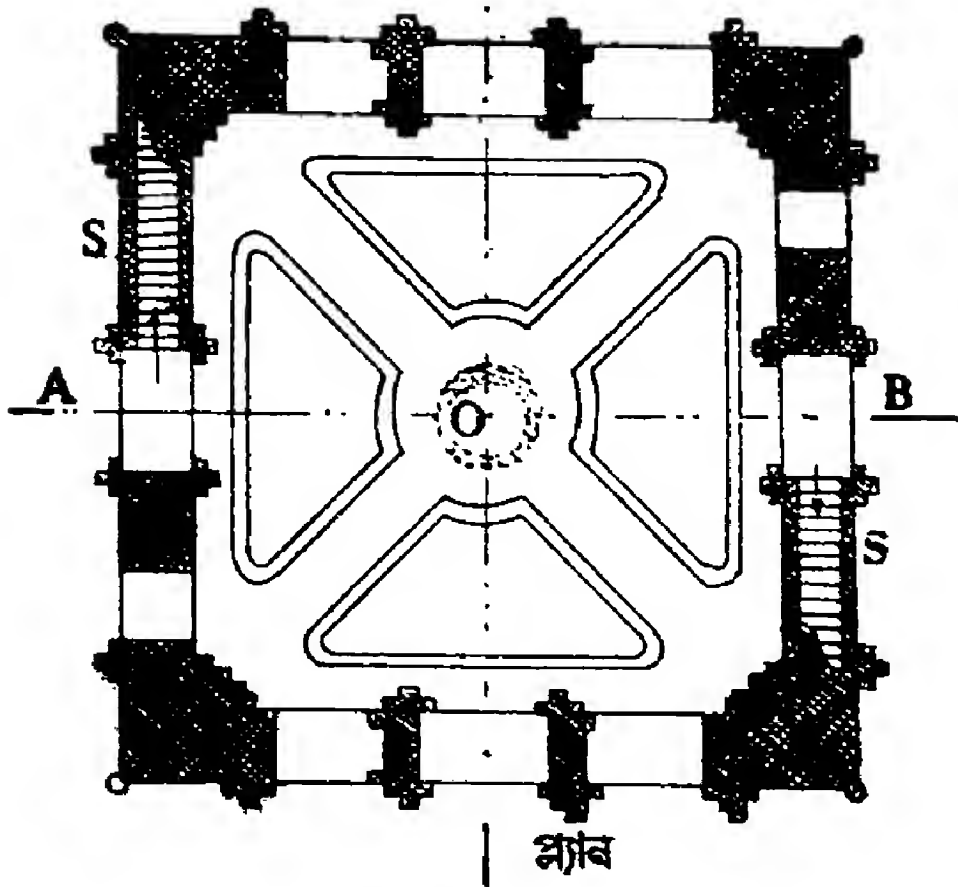
পাচিশী কোর্ট : অনুপ-তাল্লাওয়ের উত্তরে অক্ষের যোগ-চিহ্নের মতো দাগটা কোনো ইমারতের নয়। ওটা একটা প্রকান্ড পাশা-খেলার ছক। মেঝেতে খোদাই করে দাগ দেওয়া। খেলা সাঙ্গ হয়েছে চারশ বছর আগে, জীবন্ত ঘুটিগুলি আজ ছায়ার চেয়েও ছায়া। খেলোয়াড়েরা টিকে আছেন ইতিহাসের পাতায়—কিন্তু খেলার ছকের দাগগুলি পায়ে পায়ে আজও মিলিয়ে যাচ্ছি! কেউ কেউ বলেন, খাপসূরং বাদীরা হত এই পাশা-খেলার জীবন্ত ঘুটি। তাদের হাতে ধরে সরিয়ে-নাড়িয়ে দিতে হত না। খেলোয়াড়দের আদেশে তারা ঘর পালটাতো। এ-কথা যদি সত্য হয় তাহলে আবদারখানার ঐ শ্বিভল মোকামটি অর্থবহ হয়ে ওঠে। ওখানে কসলে খেলোয়াড়েরা গরুড়াবলোকনে ঘুটিগুলি দেখতে পান।

দেওয়ান-ই-খাশ : দৌলতগারের পূর্বপ্রান্তে সম-
চতুষ্কোণ এই ইমারতটি সুবিখ্যাত (চিত্র-9.14) তার
কেন্দ্রস্থ স্তম্ভটির কক্ষাণে (O)। কেউ বলেন, এটি
সম্রাটের গোপন মন্ত্রণাসভা। কেউ বলেন, এখানে বসে
তিনি হীরে জহরৎগুলি পরীক্ষা করতেন। কারণ এর
ঠিক পশ্চিমেই দৌলতখানা বা 'ট্রেজারি'। অন্তত পুরা-

শ্বিতীয়। হিন্দু ও মুসলিম-স্থাপত্যের মিলন
হয়েছে এখানে। স্বপ্নাতি বাদ নিত্যন্ত কাফুল বা
অহৈতুহী উল্লাসে অর্থব্যয়ে উৎসাহী না হন, তাহলে কক-
হারিক উপযোগিতার (functional utilitarian values)
মূল্যায়নে এ ইমারতকে কয়ে দেবটে হয়। এতটুকু
এক-কামরার বাড়িতে দুটি সিঁড়ি (s) বহুলা ;



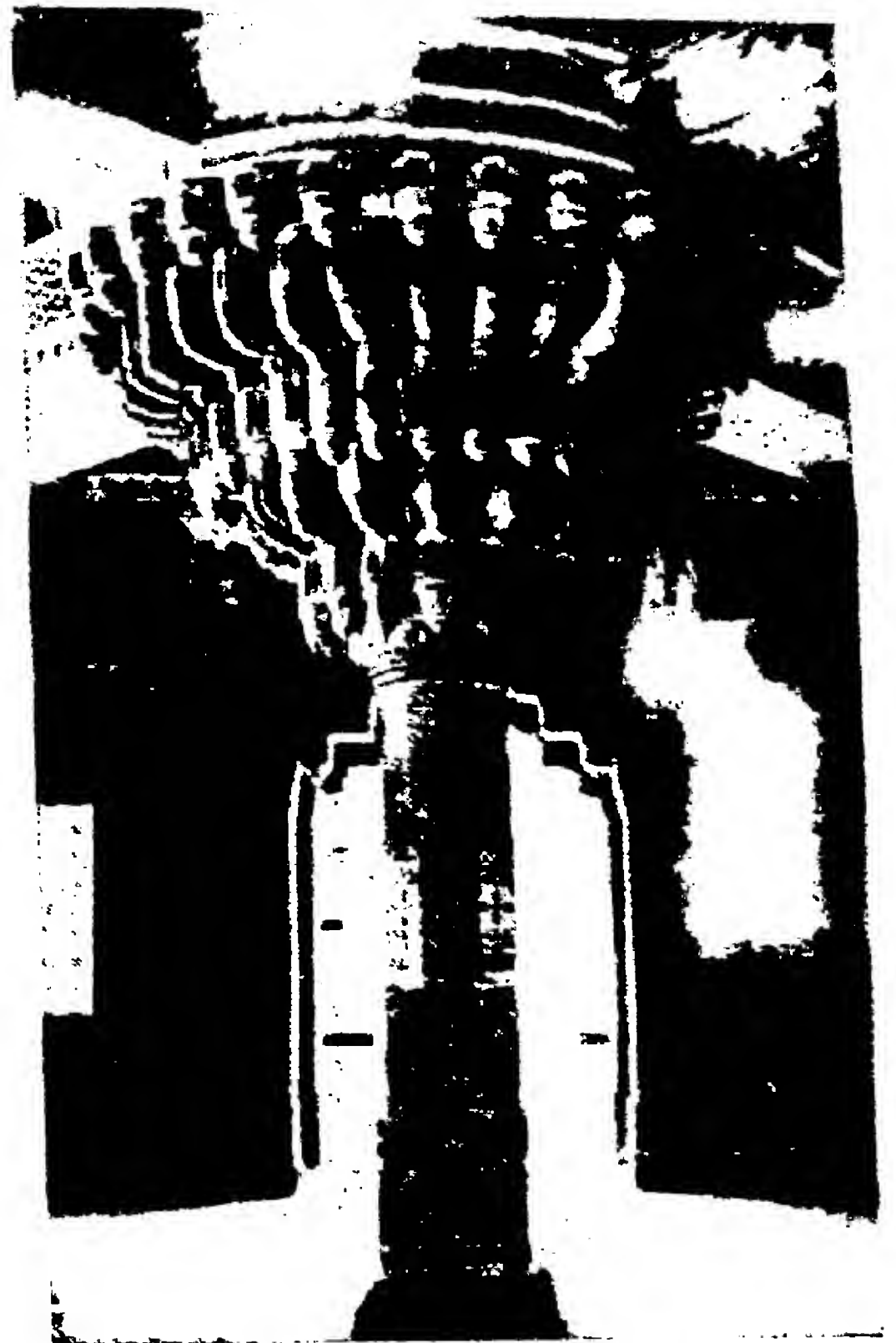
A-B সেকশন



চিত্র-9.14 খানমহল (?) দৌলতখানা (?)
[ইবাদতখানা-ই-খাশ?]

তত্ত্ব বিভাগের রিপোর্টে এই দুটি সম্ভাবনার কথাই
শব্দ বলা হয়েছে। কিন্তু তাহলে এ ইমারতের স্থাপত্য
সম্পূর্ণ নিরর্থক হয়ে যায়। কেন এ কেন্দ্রীয় বিচিত্র-
দর্শন স্তম্ভ? কেন দু-পাশে দুটি সিঁড়ি? কেন
শ্বিতলে রথনেমির কেন্দ্রস্থলে আসনের আয়োজন?

স্থাপত্যের বিচারে এ ইমারৎ অনন্য-একমেবা-

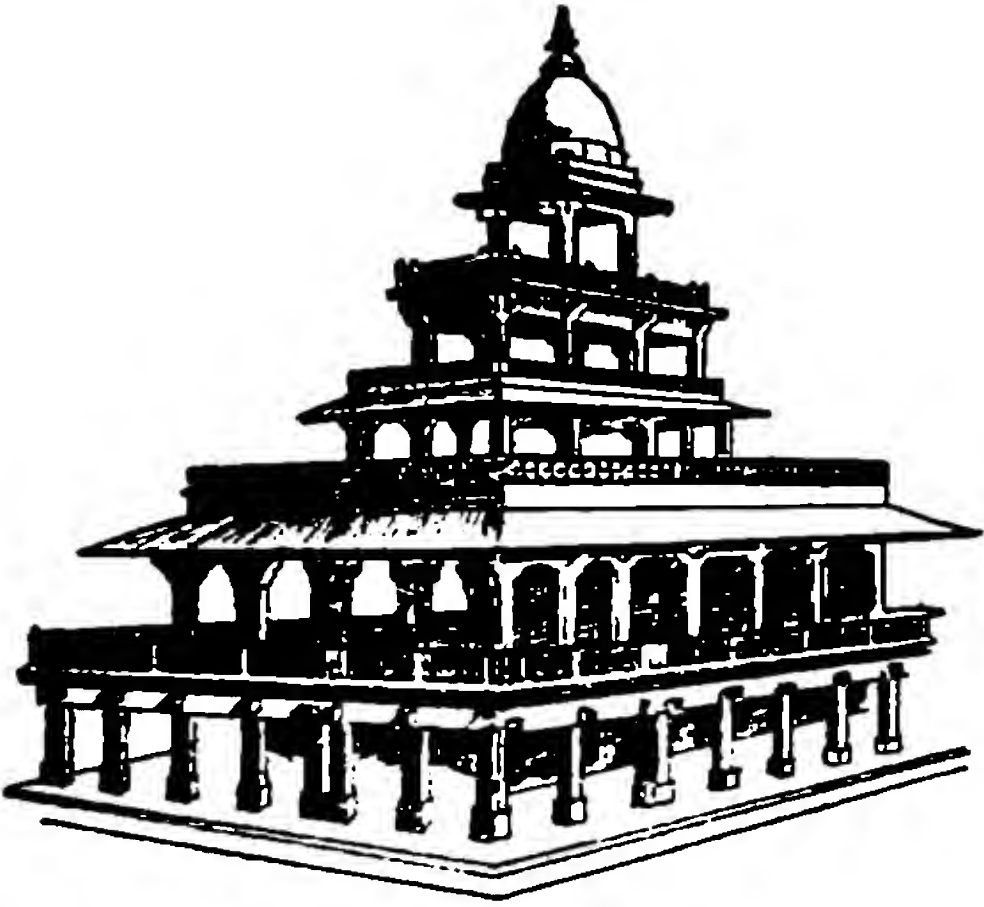


চিত্র-9.15 খানমহলের কেন্দ্রীয় স্তম্ভ, কতদূর-নির্ভর।

বাসের পক্ষে এ মোকাম সম্পূর্ণ অযোগ্য। স্বপ্নাতি গম্বুজ
বানিয়েছেন, কিন্তু পাথরের কড়ি-করমা (a) স্লেডে
বুঝতে দেননি ছাদের জর কী-জাবে রক্ষিত হচ্ছে।
গম্বুজ শব্দ ভিতর থেকেই লুকানো হয়নি, কাছির
দিক থেকেও হিন্দু-শৈলীর কবেলিঙ-করা খাপ
মোখে (b) ভা আড়াল করা হয়েছে। শ্বিতলে হিন্দু-

শৈলীর কোলা-বারান্দা, উপরে ছক্কা (c) ; সবার উপরে ছাদে চার-কোণার চারটি ইসলামী ছত্রী, গম্বুজ-সমন্বিত (d)। সবচেয়ে বিচিত্র-আকার কেন্দ্রীয় স্তম্ভটির (e)। পাদপাঠ চতুষ্কোণ, তার উপরে হিন্দু-মন্দিরের অষ্টদিকপালের আট-কোণা, তার উপর পার-সিক-নকশা খচিত ঘোলো-কোণা। সবার উপরে তিন-ধাকে এক বিচিত্র অলঙ্করণ। কী এর ব্যঙ্গনা? সেটা আপনার অভিরুচির উপর নির্ভর করে। বলতে পারেন—এ একমৈবাস্বিতীয় স্তম্ভটি বলছে : লা ইলাহা ইল্লা লাহা (অল্লা ভিন্ন দ্বিতীয় প্রভু নেই) ! অথবা I am, Who am ! কিম্বা 'য একবর্ণা বহুধা শক্তিবোধ্যঃ বর্ণনেনেকান নিহিতার্থঃ দধতি।' (চিত্র—9.15)।

আমার বিশ্বাস, গ্রন্থকার-চিহ্নিত ইবাদতখানার অতি স্নিকটে নির্মিত এই মোকামে বিশিষ্ট জ্ঞানী-



চিত্র—9.16 পাঁচমহল অথবা বাদগীর, ফতেপুর-সিক্রি।

পুণীদের নিয়ে সম্রাট ধর্মালোচনা করতেন—এমন বিষয়ে আলোচনা হত, যা ধর্মালোচক পণ্ডিত ও মোল্লাদের সামনে করা বার না ; সাধনমার্গে যারা এক ধাপ উপরে উঠেছেন—যাদের সঙ্গে জনান্তিকে আলোচনা করা যায় নিরীশ্বরবাদীদের বুদ্ধি, চার্বিকদর্শন, আউল-বাউল বা সুফী পণ্ডিতদের অন্তরঙ্গ কথা—তাদের নিয়ে সম্রাট এখানে ধর্মীয় দেওয়ান-ই-খাশ-এ বসতেন! প্রতি-যোগীদল ভিন্ন ভিন্ন সোপান বেয়ে শ্বিত্রঙ্গ উঠে আসতেন, বসতেন সম্রাটের চারিদিকে। সম্রাটের সিংহাসন ছিল একটি ঘূর্ণমান 'দ্বিচ্ছাভিঃ চক্রার' ; ইমারতের কেন্দ্র কেন্দ্র! স্মীকার করছি—এ আমার নিজস্ব অনুমান। পণ্ডিতেরা বঙ্গবর্নন। মানা-না-মানা আপনাদের অভিরুচি।

হারাম-সারা : আসুন, মনে মনে শাহ-য়েন-শাহের অনুমতি নিয়ে এবারে হারামে প্রবেশ করা যাক।

হারাম-সারার প্রধানতম প্রাসাদ হচ্ছে যোধবাঈ-মহল। আকবরী-জমানায় তার নাম 'যোধবাঈ-মহল' ছিল না। যোধবাঈ হচ্ছেন জাহাঙ্গীরের মহিষী, মানসিংহের ভগ্নী এবং শাহ-জাহাঁর গর্ভধারণী জননী। অম্বরমহিষী এবং অন্যান্য বেগমেরা এখানেই থাকতেন। এখানে মনে রাখতে হবে আকবরের দু-দুজন বেগম ছিলেন অম্বরমহিষীর চেয়ে 'সিনিয়ার' : রুখিয়া বেগম এবং সালিমা বেগম। তাঁরা ছোটরানীর নামে চিহ্নিত, মন্দির-সমন্বিত প্রাসাদে থাকবেন, এটা আশা করা অনায়াস। সে যাই হোক, এই যোধবাঈ-মহলের উত্তরে নওরোজ-বাগিচা এবং উত্তর-পশ্চিমে তথাকথিত বীরবল-প্রাসাদ। এই সমগ্র হারামসারাহ এবং দৌলৎ-খানার মধ্যে দুটি উল্লেখযোগ্য ইমারৎ আছে—পাঁচমহল এবং 'সুনহারা-মকান'। এই তো হচ্ছে প্ল্যানিং। এবার মোকামগুলি সনাক্ত করা যেতে পারে।

পাঁচমহল অথবা বাদগীর : (চিত্র—9.16) অসহ্য গরমের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য দু-জাতের দাওয়াই বাৎলেছেন পারস্য-স্থপতি—'বাদগীর' অর্থাৎ বায়ুর চলাচলে এবং 'জীর-জমিন্' অর্থাৎ ভূগর্ভের কক্ষ। সিক্রিতে ভূগর্ভে মাটি নেই, পাথর ; তাই এখানে বাদগীরের আয়োজন। এই পাঁচতলা মোকামে সর্ব-মোট 176-টি স্তম্ভ। নিচের তলায় সাত-বারো চুরাশি, তারপর সাত-আন্টে ছাপান্ন ; তারপর 20, 12 এবং সর্বোচ্চ তলে মাত্র চারটি। বর্তমানে স্তম্ভের উপর ইমারতের কক্ষালটিই শুধু বর্তমান—যেন কংক্রিট-বাড়ির কলাম-স্ল্যাব ঢলাই কাজ শেষে সেন্টারিং-তত্ত্ব খোলা হয়েছে মাত্র। সে-আমলে প্রতি তলায় বাহিরের অংশ দিয়ে জালি-কাজের নকশা সমন্বিত পাথরের দেওয়াল ছিল ; তা-থেকে ঝুলতো খস-খস। সূর্যাস্তের উপক্রম দেখলেই দাসী-বাদীর দল সেগুলি ভিজিয়ে দিত। যাতে সন্ধ্যার পর স্নিগ্ধ হয়ে থাকত ঐ পাঁচমহল। গভীর রাত পর্যন্ত সেখানে চলত মহিলা-মহলের গুলতানি—কোথাও কথাকোবাদের খোশগল্প, কোথাও গজল-এর আসর, কোথাও বা নিছক 'গজালি'!

ঐ 176-টি স্তম্ভকে লক্ষ্য করে দেখবেন—আকবরী-হারেমের প্রতিটি সুন্দরীর মতো ওরা পৃথক। কেউ কারও হৃদয় অনুকরণ নয়। হয় গঠনশৈলীতে ফারাক আছে, অথবা অলঙ্করণে।

সুনহারা-মকান : (চিত্র—9.17) যোধবাঈ-প্রাসাদের

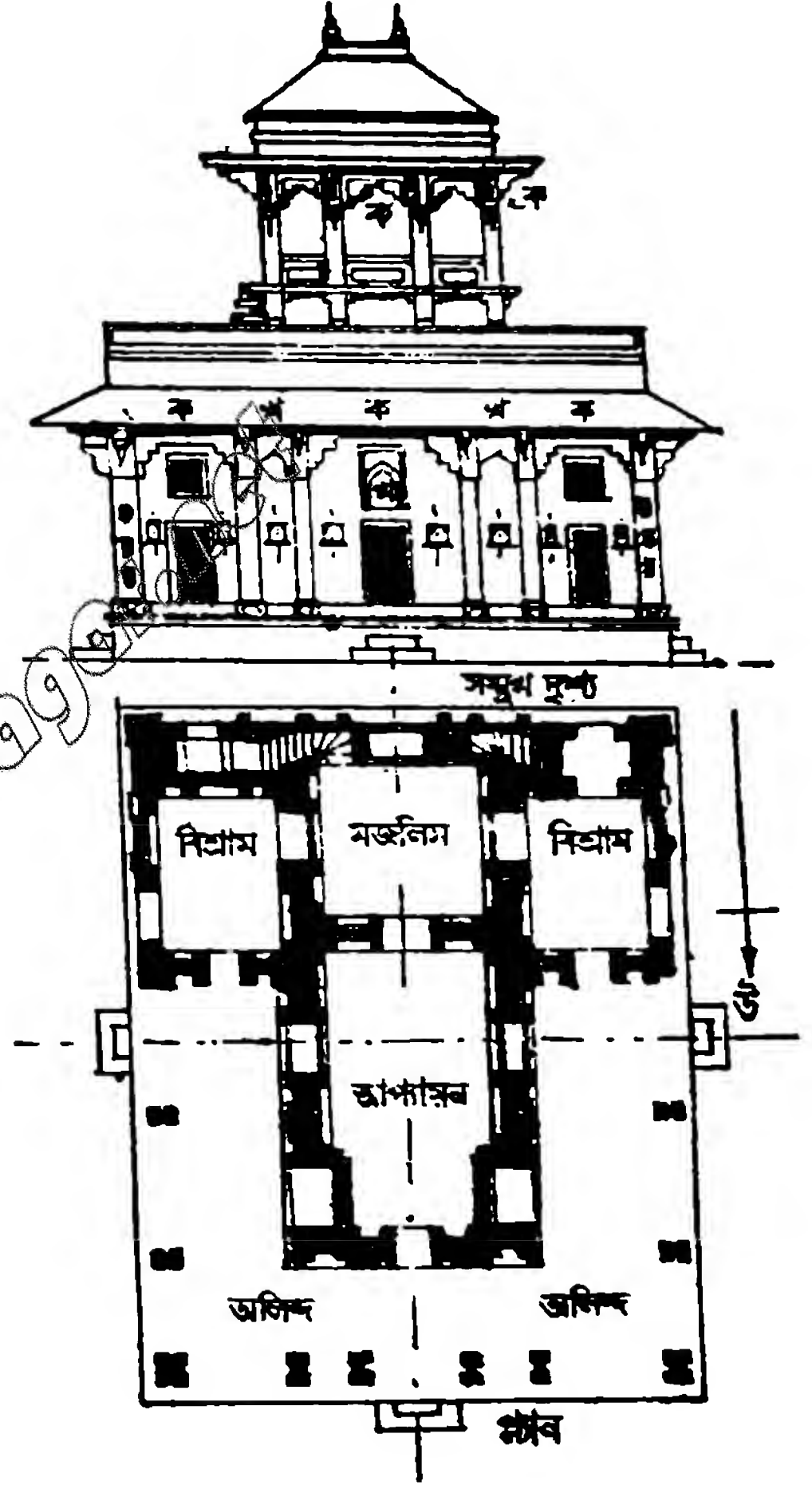
উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত এই ইমারতটিতে বাস করতেন আকবর-জুননাই হামিদা বানু। হারেমের গাির পরিচয় ছিল 'মরিয়ম মকান'। হাজী বেগম, বেগা বেগম এবং গুলবদন বেগমও কখনও কখনও এই মোকামে থাকতেন। 'সুনহারা-মকান' মানে 'স্বর্ণ-কুটির'। 'মাতৃসদন' নাম থাকলেই যেন ভাল মানাতো। ইংরেজী 'T'-অক্ষরের আকারে নির্মিত এই মোকামের দূ-দিকে দুটি সিঁড়ি আছে, দ্বিতলের চব্বতরায় উঠে যাওয়ার। সম্মুখদৃশ্যে লক্ষ্য করে দেখুন, খিলানে ভারবহনের দূ-রকম আয়োজনই আছে এবং তারা আছে পাশাপাশি। 'ক'-চিহ্নিত খিলান হিন্দু-ট্র্যাবিয়েট-পদ্ধতিতে এবং 'খ'-চিহ্নিত খিলান ইসলামী-স্থাপত্যের আর্চ বা আকুয়েট-পদ্ধতিতে। ছজ্জার প্রান্তে যে ব্র্যাকেট তাতে হিন্দু-ভাস্কর্যের (ক) নকশা। পশু-পাখী তো আছেই, এমন কি স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র ও বজ্রহস্ত-বলী রামদাসও হাজির। এর সিলিঙে যে অপূর্ব ম্যুরাল ছিল তা নষ্ট হয়ে গেছে। টিকে আছে ফেজি-সাহেবের একটি বয়েং।

ভূকি-সুলভানার কুটির : এ স্থাপত্যে বিশেষ করে লক্ষ্য করে দেখুন ঢালু ছাদটা। খাপরা-টালি বা নুড়িয়া-টালির আকারে পাথরের ছাদ তৈরি করা হয়েছে। তাই এ ইমারতকে 'কুটির' বললেই বোধহয় মানায়।

যোধবাই-প্রাসাদ : এই চতুষ্কোণ প্রাসাদের বাহিরের দিকে অন্ধপ্রাচীর—এমন কি ভৌমশীল পাশ্চাত্য-জাতীয় বিকল্প ব্যবস্থাও নেই—যেমন ছিল সত্যজিৎ রায়ের 'চারদলতা' ছায়া-ছবিতে, উনবিংশ শতাব্দীর পর্দা প্রথার চিত্র-চিত্রণে। অর্থাৎ বাহির থেকে শব্দ ভিতরই নয়, ভিতর থেকে বাহিরেও দেখা যেত না। প্রবেশ পথের দক্ষিণে প্রহরী মহল। দিবারাহ সেখানে হাজির থাকত অতন্দ্র-প্রহরী। যোধবাই-প্রাসাদে যদি ঢুকতে চান, তাহলে সর্বপ্রথমে ঐখানে গিয়ে আত্মপরিচয় দিতে হবে। অনুমতিপত্র দেখাতে হবে—তবে ভিতরে ঢুকতে পাবেন। না, আপনাকে কলিছি না, আপনি তো বিংশ-শতাব্দীর টেরিস্ট ; আপনার সাতখুন মাপ। সোজা ঢুকে যান।

এক্ষেত্রেও প্রবেশ-তোরণের দূ-প্রান্তে দুটি স্মার, তারা রুজ্জ-রুজ্জ নয়। চত্বরের উত্তরে ও দক্ষিণে যে দুটি দ্বিতল অংশ আছে, তাদের গঠন-বৈচিত্র্যের ফারাকটা লক্ষ্য করুন। একটি গবাঙ্কহীন, পাথরের দেওয়ালের শাল-মুড়ি দেওয়া। সেটা শীতকালের আবাসস্থল। অপরটি জালিকাজ-করা করোকর

আদত যেন 'সান্ন্যাসকুল' সেজি। সেটি নিদাঘ-সন্ধ্যায় অপর যাপনের জন্য। চত্বরের পশ্চিমে সে বড়প, সেটি পূর্বমুখী মন্দির। অর্থাৎ পূজারীকে পশ্চিম-মুখে কসে পূজা করতে হবে। এ-নিয়ম দূ-একজন পশ্চিম ভঙ্গ যোলা করবার চেষ্টা করেছেন, দেখছি। অর্থাৎ আকবর ইসলামী 'কিব্বলার' নির্দেশে পূজা-



চিত্র-9.17 সুনহারা-মকান-এর বাস্তব-নকশা ও এলিভেশন, কতেদর-সিঁড়ি।

রীকে, হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমমুখে পূজা করতে বাধ্য করেছেন! এ-কথার অবপর্ষ যেকা ফেল না—কলিঙ্গ ও খাজুরাহোর অধিকাংশ মন্দিরই তো পূর্বমুখী।

বীরবল-প্রাসাদ : এই স্থাপত্য-কীর্তির বিষয়ে

আমাদের মতপার্থক্য শব্দ পুরাতত্ত্ব বিভাগের সঙ্গেই নয়, ঐতিহাসিক মহাপণ্ডিতদের সঙ্গেও। লেখকের মতে এটি আদৌ বীরবলের প্রাসাদ নয়। সুতরাং এই স্থাপত্য-কীর্তির বিচার করার পূর্বে এর মালিকানার একটা ফয়সালা হওয়া দরকার।

বীরবলের নামে ষাঁরা মোকামটি চিহ্নিত করতে উৎসাহী তাঁদের যুক্তি তিন জাতের। এক : বিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা ডঃ শ্রীবাস্তব তাঁর মহাগ্রন্থে এটিকে বীরবলের প্রাসাদ নামে চিহ্নিত করেছেন। দুই : হিন্দু-স্থাপত্যের আধিক্য। তিন : নাম :—স্থানীয় লোকেরা একে বরাবরই বলে ‘বীরবলের প্রাসাদ’।

এবার আমাদের আপত্তিটাও শুনুন। দু-পক্ষের যুক্তি শুনে আপনারা না হয় রায় দেবেন।

মুগল-সম্রাট হারেমে যে দুর্ভেদ্য পর্দাপ্রথা ছিল, তাতে কোন বহিরাগত হিন্দু অমাত্য—তা তিনি দীন-ইলাহী ধর্ম গ্রহণ করুন বা না করুন, আকবর-বাদশাহর সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেন বা না দেন,—আকবরের হারেমের ভিতর বাস করবেন, এ একেবারে অচিন্তনীয়। স্ক্যানের এ ইমারতের অবস্থানটা লক্ষ্য করুন। উত্তরে ও পশ্চিমে খাড়া প্রাচীর, দক্ষিণে অশ্বাবাস ও উষ্ট্রাবাস, পূর্ব দিকে অন্যান্য বেগমদের আবাস—যোধবাঈ-মহল (জাহাঙ্গীর-জননীর অর্থাৎ পাটনারীর আবাস), সুনহারা-মক্কা (আকবর-জননীর আবাস), হাওয়া-মহল (পূরনারীদের সন্ধ্যাপানের অন্তঃপুর), নওরোজ বাগিচা (অন্তঃপুরচারিকাদের বাগান), এবং নাগিনা মসজিদ (শুধুমাত্র মহিলাদের প্রার্থনালয়) অর্থাৎ হারেমের কেন্দ্রবিন্দুতে।

এটা যদি বীরবলের প্রাসাদ হয় তাহলে প্রশ্ন হবে—তিনি কোন পথে যাতায়াত করতেন? উত্তরে ও পশ্চিমে খাড়া প্রাচীর, দ্বারের চিহ্নমাত্র নেই। তবে কি অশ্বাবাস ও উষ্ট্রাবাসের মাঝখানে দিয়ে? নাকি বেগমমহলের সমুখ দিয়ে?

ডক্টর শ্রীবাস্তব তাঁর যুক্তির সমর্থনে যা বলেছেন তার আক্ষরিক অনুবাদ আগে শোনাই, তারপর তা বিশ্লেষণ করা যাবে :¹⁸

“আকবরের আদেশে বীরবলের জন্য একটি মর্ম্মর-প্রাসাদ নির্মিত হয়, সেটির নির্মাণকার্য সমাপ্ত হলে সম্রাট তাঁর ঐ প্রিয় সভাসদের দীর্ঘদিনের বাসনা চরিতার্থ করতে স্বয়ং তাঁর গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে বান (জানুয়ারী, 1583); গৃহপ্রবেশের দিন আকবরের উপস্থিতিতে সম্মান জানাতে বীরবল এক বিরাট ভোজের আয়োজন করেন। সাম্প্রতিককালের কোন কোন গবেষক সন্দেহ প্রকাশ করেছেন—হারেমের এত কাছাকাছি বহিরাগত কোন পুরুষের বাসস্থান থাকা

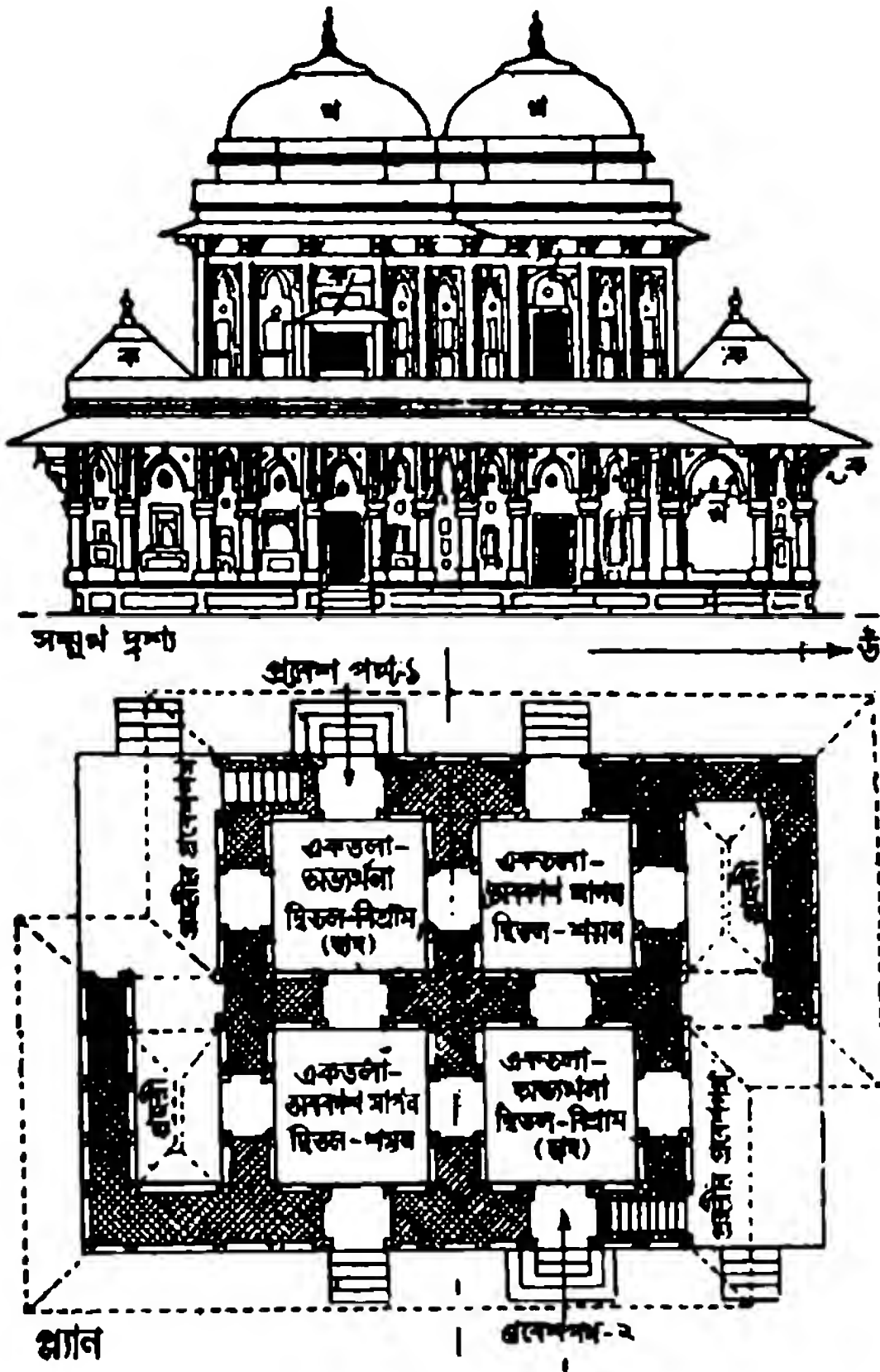
সম্ভবপর নয়। কিন্তু আব্দুল ফজল স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন, আকবর বীরবলের জন্য একটি মর্ম্মর-প্রাসাদ নির্মাণ করিয়ে দেন। যোধবাঈ-প্রাসাদ সংলগ্ন ঐ একটিমাত্র প্রাসাদ ভিন্ন আর কোন বাড়িই দাঁড়িয়ে নেই। There is, therefore, no doubt that the building consisting of two-domed palaces, standing on the north-west corner of the edifices at Fatehpur-Sikri, is the palace built by Akbar for Raja Birbar. [সুতরাং এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ফতেপুর-সিক্রিতে ঐ (যোধপুর) প্রাসাদের উত্তর-পশ্চিমে দণ্ডায়মান প্রাসাদটি—যাতে দুটি গম্বুজ আছে—আকবর তৈরি করিয়েছিলেন রাজা বীরবরের (অর্থাৎ বীরবলের) জন্য]।

ডক্টর শ্রীবাস্তব একজন অসামান্য পণ্ডিত। আকবরের প্রামাণ্য জীবনীকার। তাঁর কাছে ইতিহাস তথা আমরা নিরতিশয় কৃতজ্ঞ। কিন্তু এটা তাঁর কোন জাতের যুক্তি হল? ‘আব্দুল ফজল জানাচ্ছেন—আকবর বীরবলের জন্য একটি মর্ম্মর-প্রাসাদ তৈরি করিয়ে দেন। যেহেতু আর কোন প্রাসাদ টিকে নেই, তাই এটাই সেই বাড়ি।’—কেন? আকবর বানিয়েছেন বলে সে বাড়ি ধূলিসাৎ হতে পারে না? ঐ আব্দুল ফজলই তো বলেছেন, আগ্রা-কিল্লায় আকবর পাঁচশ ইমারৎ বানিয়েছেন, এবং গুণে দেখছি, বর্তমানে খাড়া ইমারতের সংখ্যা এক শতের কম—তাহলে আগ্রা-কিল্লার যাবতীয় খাড়া-মোকাম আকবর নির্মিত? যেহেতু তারা টিকে আছে? বরং ডক্টর শ্রীবাস্তবের বর্ণনা তো তাঁর সিম্বান্তের বিরুদ্ধ-যুক্তিকেই প্রতিষ্ঠা করে! মনে মনে কল্পনা করতে পারছেন—বীরবল তাঁর গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে পাঁচ-সাতশ কিম্বা হাজার-দু-হাজার মেহমানকে নিমন্ত্রণ করেছেন—সকলেই আবশ্যিকভাবে পুরুষ, যেহেতু মুগলযুগে এ জাতীয় উৎসবে স্ত্রীলোকের নিমন্ত্রণ হত না—আর মেহমানরা সার বেঁধে তসলিম রাখতে আসছেন? কিন্তু কোন পথে? ঘোড়ার আস্তাবলের ভিতর দিয়ে, উট ও ঘোড়ার পুরীষ ডিঙিয়ে সংকীর্ণ গলিপথে ‘কিউ’ দিয়ে? নাকি জেনানা-মহালের ভিতরে গর্দানা ঘূষিয়েছিল দুই-হাজার মর্দানা?

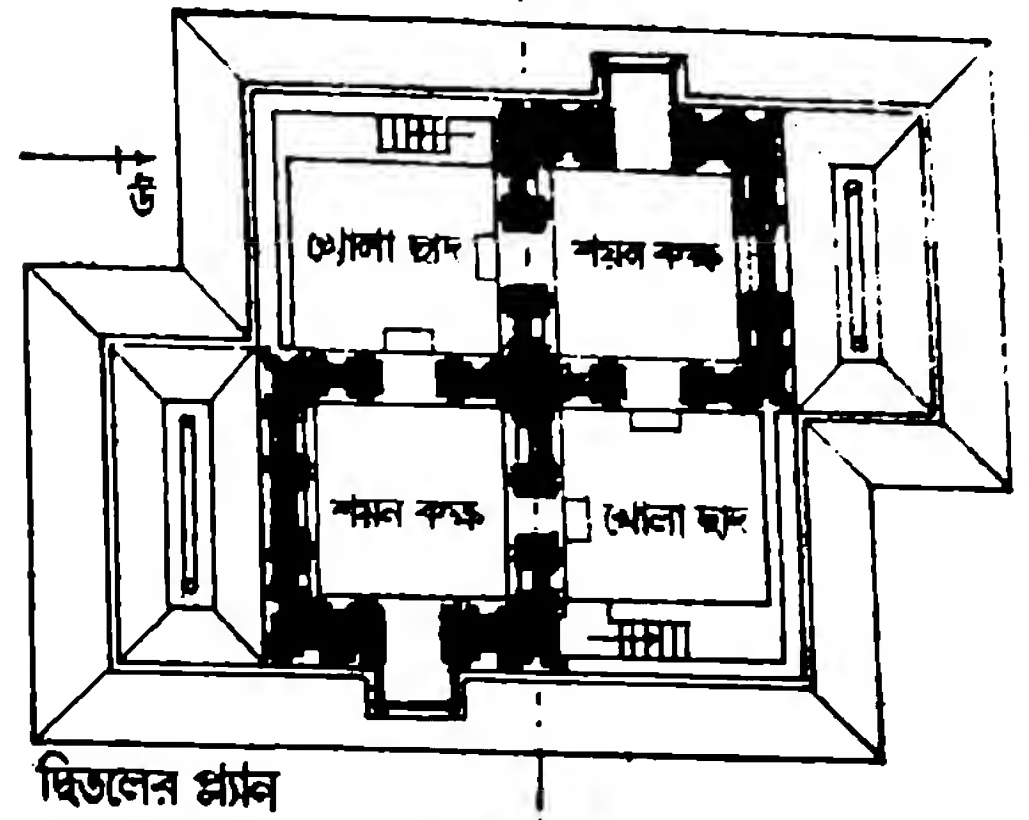
শব্দ তাই নয়, শ্রীবাস্তব-সাহেবের যুক্তিতে আমাদের আরও দুটি আপত্তি আছে। প্রথম কথা : তারিখটা। 1583 সালটা। হারাম-সারার কাজ শুরুর হয় 1571-এ, এবং বছর পাঁচেকের মধ্যে যাবতীয় কাজ শেষ হয়; বেগমরা বসবাস করতে শুরুর করেন। ফলে 1582-তে হারেমের মাঝখানে একটি মোকাম বানাতে

বহিরাগত মিস্ত্রীরা আসবে, হারেম বে-পর্দা হবে, এটা আশা করা একটু আপাত্তিকর। দ্বিতীয় কথা : উঃ শ্রীবাস্তব দ্বন্দ্ববার 'মর্ম্মর-প্রাসাদ' (marble palace) শব্দটা ব্যবহার করেছেন আব্দুল ফজলের উদ্দীপ্তি দিতে। আব্দুল ফজলের মূল রচনাপাঠের মতো বিদ্যো আমার নেই। অনুবাদক যদি ভুল না করে থাকেন তাহলে বলব : 'বীরবল-প্রাসাদ' মর্ম্মর-প্রাসাদ বা marble

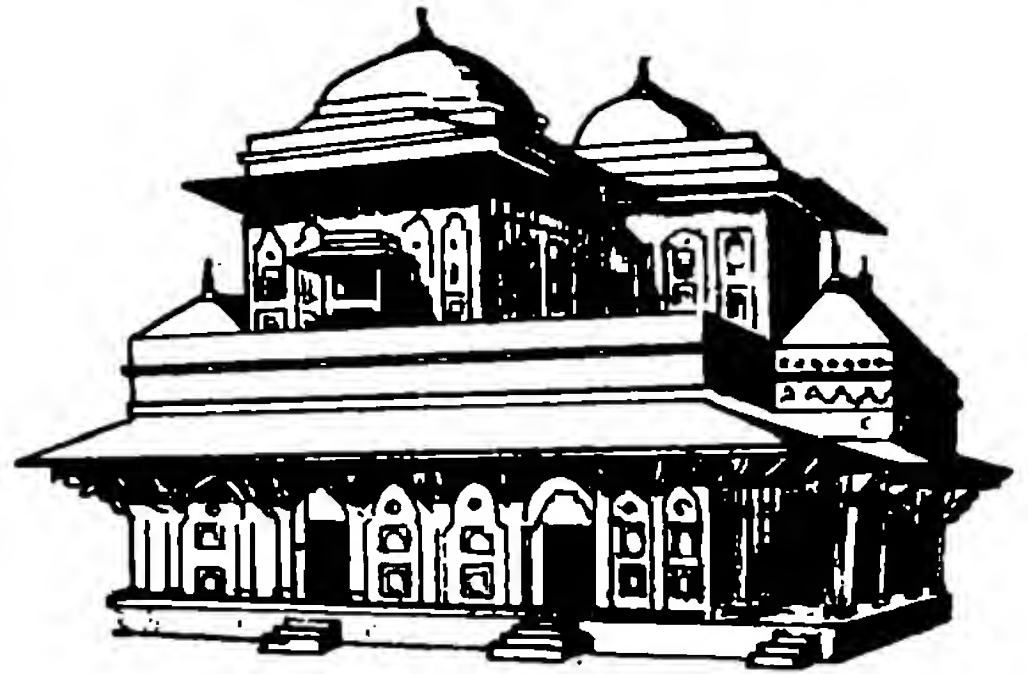
দ্বিতীয় মর্দু চিত্র এ ইমারতের হিন্দু-স্থাপত্যের আদিক। এ মর্দুটি আদৌ মানা চল না। ফতেপুর-সিক্র প্রায় প্রতিটি ইমারতে হিন্দু-শৈলীর প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বীরবল-প্রাসাদে হিন্দু স্ট্যাক্ট আছে ঘণ্টা-চক্র-পদ্ম, ট্রান্সক্রেট-পর্দা আছে, স্মীকার করছি—কিন্তু সেখানে রামসীতা-রাধাকৃষ্ণ-হনুমানের নেই! তা বরং আছে সুনহারা-মকানে, যে ইমারত-এ



চিত্র-9.18 বীরবল-প্রাসাদ, বাস্তব-নকশা ও এলিভেশন, ফতেপুর-সিক্র।



চিত্র-9.18A বীরবল-প্রাসাদের স্কিউ।



চিত্র-9.18B বীরবল-প্রাসাদের সম্মুখদৃশ্য, পরিপ্রেক্ষিতে, ফতেপুর-সিক্র।

palace নয়, সেটি বালি-পাথর বা 'স্যান্ডস্টোন' দিয়ে তৈরী।

টোডরমল, তানসেনের আবাসস্থল চিহ্নিত—রাজ-প্রাসাদ থেকে বহু দূরে। নবরত্নের অন্যান্য পুরুষ—আব্দুল ফজল, ফৈজী, আবদুর রহিম খান-ই-খানান, ভগবানদাস, মানসিংহ প্রভৃতি কাউকেই প্রাসাদ-চত্বরের ভিতর থাকতে দেওয়া হয়নি—হারেমের ভিতর তো দূর-অন্তঃ—শুদ্ধমাত্র বীরবলই ব্যতিক্রম?

নিঃসন্দেহে বাস করতেন নিষ্ঠাবান মুসলমান আকবর-জননী এবং তাঁর পিসী গুলবদন। তাহলে?

ওদের তৃতীয় ও শেষ মর্দু ছিল : নাম। হ্যাঁ, এবারেও স্মীকার করছি, লোকপরিম্পরায় এ ইমারতের নাম : 'বীরবল-প্রাসাদ'। কিন্তু বীরবলের নামটা ভারতবর্ষে কী-ভাবে ব্যবহৃত হয় তা কি আমরা জানি না? অসংখ্য মজাদার চুটকি গল্প, যা পরবর্তী যুগের কোন রসিকব্যক্তির উর্বর মস্তিষ্কে জন্ম নিয়েছে তা

বীরবলের নামে চলে। তার শতকরা পঁচানব্বই ভাগ কাহিনীর সঙ্গে রাজা বীরবলের কোনও সম্পর্ক নেই। লোকমুখে নাম জড়িত থাকাকে যদি গুরুত্ব দিতে হয় তাহলে তো স্বাধীন ভারতের আর এক প্রখ্যাত প্রতি-রক্ষামন্ত্রীর নামে লোকমুখে প্রচলিত 'জ্যাক্স-গুর্জালিকে ঐ মন্ত্রীমহোদয়ের জীবনীতে উল্লেখ করতে হয়।

তাহলে এ প্রাসাদে কে বাস করত?

আমি একটি বিকল্প-সিদ্ধান্ত পেশ করতে চাই। কিন্তু আমার যুক্তি পেশ করার পূর্বে আপনাদের লক্ষ্য করতে কলব, এ প্রাসাদের অনন্যসাধারণ স্থাপত্য-বৈশিষ্ট্য।

স্থানে লক্ষ্য করে দেখুন (চিত্র—9.18)—এটি একটি সমজ-বাড়ি বা 'টুইন কোয়ার্টার্স'। কিন্তু সেটা অনন্যসাধারণ কেন? কারণ সচরাচর টুইন-কোয়ার্টার্সে আমরা দেখতে পাই—এক-অংশ অপর-অংশের দর্পণ-প্রতিবিম্ব। এখানে তা নয়। এ-মোকামের কেন্দ্র-বিন্দুকে স্পর্শ করে যে-কোনো দিকে একটি সরল-রেখা টেনে, যাতে প্ল্যানটি দু-ভাগে ভাগ হয়; তার-পর সম্তর্ষিমন্ডল যে-ভাবে ধ্রুব-নক্ষত্রকে চক্রাবর্তন করে, সেইভাবে যে-কোন আয়তানা বাড়িকে কেন্দ্র-বিন্দুর চারপাশে 180 ডিগ্রি পাক খাওয়ান; দেখবেন জ্যামিতি-বইয়ের 'উপরিপাত' পদ্ধতিতে প্রতিটি দেওয়াল, দরজা, কুলুঙ্গি, কোণ খাঁজে-খাঁজে মিলে গেছে। যে-কোন সাধারণ টুইন-কোয়ার্টার্সে এমনটি হবে না। সেখানে অমন খাঁজে-খাঁজে মেলাতে হলে আয়তনের কম্বিকে ট্রেনিং কগজে আঁকতে হবে এবং উল্টে করে অপর-অংশে কসাতে হবে। সেখানে দেখ-কেন টুইন-কোয়ার্টার্সে প্রবেশপথ একই দিকে; এখানে তা নয়। তাই এই প্ল্যানিং অনন্যসাধারণ!

প্রশ্ন হচ্ছে, এ ইমারতের এই অদ্ভুত প্ল্যানিং-এর হেতু কী? কী প্রাচীন, কী মধ্যযুগীয়, কী আধুনিক প্ল্যান-ডিজাইনিং-এ তো এমন সমজ বাড়ি ছু-ভায়ে দেখিনি! এটা কি নিতান্তই কাকতালীয়?

আমার বিশ্বাস—তা নয়। এ প্রাসাদের মালিকানা আকবরের দুই মহিষীর—বারা অম্বর রাজকন্যার চেয়ে কমবে কড়, আগে সম্রাজ্ঞী হয়েছেন এবং হিন্দু মন্দির-সম্বন্ধিত প্রাসাদে কনিষ্ঠ সপত্নীর তত্ত্বাবধানে বাস করায় যদিও আন্তরিক স্নায় নাও থাকতে পারে। ইমা-রুটি বেন দুই বোন, সমজ বোন, যেন রুখেয়া বেগম ও সালিমা বেগম। দুজনেই সম্রাট রাজপুত্রনারী; রুখেয়া হচ্ছেন কবর-তনয় মিজা হিন্দুসর আকাজা এবং সালিমা হচ্ছেন কবর-তনয় কন্যা গুল-র-ব-এর তনয়া। দুজনেই কবর-বাদ-শাহ-র নারী, দুজনেই

আকবরকে বিবাহ করেছেন প্রধানা বেগম অম্বরকুমারীর আগে। তাই এ সমজ বাড়িতে কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। প্রতিটি ফ্ল্যাটে প্রবেশপথ ভিন্ন মুখী; প্রথমে অভ্যর্থনা-কক্ষ বা বৈঠকখানা, পিছনে অবকাশ-খাপন কক্ষ। দ্বিতলে সমুখের ঘরটির উপর খোলা ছাদ এবং পিছনে শয়ন-কক্ষ। পৃথক সোপান দিয়ে দ্বিতলে যাতায়াতের ব্যবস্থা। দুটি ফ্ল্যাটের মাঝখানে স্য়ার আছে; অর্থাৎ প্রয়োজনে দুই সখী যৌথভাবে কোনও আপ্যায়ন-ব্যবস্থা করতে পারেন। দু-তরফের জন্য পৃথক প্রহারার আয়োজন।

এ-মত গ্রাহ্য হলে ক্লা যায়, এই ইমারতেই শৈশবাবস্থা অতিবাহিত হয়েছে খুদরমের, অর্থাৎ ভবিষ্যৎ শাহজাহাঁর, নিঃসন্তানা রুখেয়া বেগমের তত্ত্বাবধানে।

পুরাতত্ত্ববিদ সৈয়দ আংহার আব্বাস রিজ্জিভির মতে বীরবলের প্রাসাদ ছিল রাজপ্রাসাদ থেকে বহু দূরে—চাঁদ পোলের উত্তরে, বীর পোল-এর কাছে। 'বীর পোল' দরওয়াজার নাম নাকি ঐ রাজা 'বীর-বলে'র নামানুসারেই।

নওরোজ বাগিচা : যোধবাঈ-প্রাসাদের উত্তরে একটি চতুষ্কোণ বাগিচা—সেখানে বসত নওরোজ-এর বাজার। মীনা বাজার। সেখানে বিক্রেতার দল সম্রাটের হারেমভুক্ত ললনাকুল, অথবা আমীর-মালিকদের স্ত্রী-কন্যা-পুত্রবধূ। ক্রেতা শূদ্র বাদশাহ্। অথবা শাহজাদা!

"নওরোজ উৎসবের সময় হারেম বা জেনানামহলে একটি অদ্ভুত ধরনের মেলা হত। মেলা পরিচালনার দায়িত্ব নিতেন আমীর ওমরাহের পত্নীরা, সাধারণতঃ তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে রূপবতী স্ত্রী যারা, তাঁরা। যে সমস্ত দ্রব্য বাজারে সাজানো হয়, তার মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য জরীর ফুল-লতা-পাতা-তোলা রেশমী কাপড়, ভালো ভালো সুচীশিল্প, সোনার কারুকাজ-করা শিরস্ত্রাণ, দামী মসলিন ইত্যাদি সব বিলাসের সামগ্রী। মেলায় প্রধান আকর্ষণ হল, কেনাবেচার হাস্যকর অভিনয়টুকু। সম্রাট ঘুরে ঘুরে সাজানো জিনিসপত্রের দেখেন এবং সুন্দরী বিক্রেতা আমীর-মনসবদারের পত্নীদের সঙ্গে দরদস্তুর করেন।"¹⁰

শোনা যায়, এই নওরোজের মীনাবাজারে সেলিম ও নুরজাহাঁর প্রথম সাক্ষাৎ। কাহিনীটি রোমাণ্টিক। শাহজাদা সেলিম নাকি কোন এক সুন্দরীর কাছে দুটি কবর-তর কিনেছিলেন। তারপর আর এক দোকান-দারনারী কাছে কবর-তর দুটি গচ্ছিত রেখে মীনাবাজারে

অন্যান্য দোকানগুলি ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকেন। কেনাকাটা শেষ হলে সেলিম ফিরে এলেন সেই দোকান-দারনীর কাছে, যার জিম্বাদারীতে কবুতর-জোড়া রেখে গিয়েছিলেন। তখন তাড়াহুড়ার মধ্যে সেই মেয়েটির দিকে ভালো করে চোখ তুলে তাকানোই হয়নি। এখন তাকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন! শাহজাদা পার্শ্ববর্তী অনুচরকে প্রশ্ন করলেন, মেয়েটি কে? সহচর অনুচরকে জানালো, মির্জা গিয়াস্ মদহুমদ বেগ-এর কন্যা, ওর নাম মেহেরউন্নিসা! শাহজাদা অশ্রুতে বললেন, না! ওর নাম নূরজাহাঁ! জগতের আলো!

ইঠাৎ লক্ষ্য হল, মেয়েটি একটিমাত্র কবুতরকে নিজের বুকের উপত্যকায় চেপে ধরে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে, নতনেয়ে। শাহজাদা এগিয়ে এসে বললেন, এ কী! দু-দুটো পায়রা রেখে গেলাম, এখন দেখছি একটা। বাকিটা কোথায় গেল?

মেয়েটি নতনেয়ে বললে, উড়ে গেছে।

—উড় গ্যয়ে! কৈসে? —অবাক সেলিমের প্রশ্ন।

মেয়েটি অস্ফালবদনে হস্তধৃত কবুতরটিকে বন্ধন-মস্ত করে নীল আকাশের দিকে উড়িয়ে দিল। বিশ্ব-কিজয়িনীর হাসি হেসে বলল, —স্বাসে!

অনেক ঐতিহাসিক এ-কাহিনী মানেন না। তাঁদের মতে প্রাক-বিবাহ যুগে মেহেরউন্নিসার সঙ্গে সেলিমের নাকি দেখা শোনাই হয়নি; তা হোক, আপাতত ঐ রোমান্টিক কাহিনীটি মেনে নিয়েই বাগিচাটা ঘুরে-ফিরে দেখা যাক। বাগিচার পশ্চিম-প্রান্তে নাগিনা মসজিদ; নিষ্ঠাবান অন্তঃপুরচারিণীদের উপাসনার আয়োজন। নাগিনা মসজিদের দক্ষিণ-পূর্বে, নওরোজ বাগিচার পিছনে চতুষ্পাশ্ব ঘরখানার বিষয়ে নানামুনির নানা মত। কেউ বলেন এটি কবুতরখানা, কেউ বলেন অস্ত্রাগার, আবার কারও মতে এটি পিলখানা। এখানেই নাকি থাকত ‘গজমস্তা’। গজমস্তা কে? সে গল্প বলব যখন তার মক্কারা দেখতে যাব।

হারেম দেখা শেষ করে গাইডকে বলি, সব দেখলাম, কিন্তু রঙমহল কই?

—রঙমহল? সেটা কি?

—ঐ যে মৃগল-প্রাসাদের রঙমহল, শীষমহল, নাচঘর? আগ্রা-কিল্লা অথবা লাল-কিল্লা শাহজাহানী-জমানায় যা দেখেছি। ভিতরে সিলিঙে হাজারো কুচি-কুচি কাঁচ। দেশলাই-কাঠি জ্বাললে রোশনাইয়ে চোখ ধাঁধিয়ে যায়! যেখানে বসে জাহাঁপনা সিরাজী পান করতেন, আর নৃত্যরতা বাঁজীর নাচ হাজারো

চুম্বক-পাথরে প্রতিফলিত হতে দেখতেন?

গাইড মাথা নেড়ে বললে, না বাবুজি। তেমন কিছু ফতেপুর-সীক্রে নেই।

হবেও বা। জালালউদ্দীন তার বাপের মতো আফিঙের নেশার বৃন্দ হয়ে পড়ে থাকতেনও শেখনি, ছেলের মত স্ত্রীর আঁচল এক হাতে চেপে ধরে অপর হাতে পেয়ালার পর পেয়ালো মদ্যপান করতেনও শেখনি। তার মানে এ নয় যে, আকবর-বাদশা ছিলেন ‘টিটোটালা’—ওরগাজীবের মতো ধর্মের কারাগে মদ্য-স্পর্শ করতেন না। মদ তিনি খেতেন, কাঁচং কখনো—কিন্তু মরদের মতো, পাটো জোয়ানের মতো। তাহলে সেই কিস্‌সাই বলি, শুনুন^{২০} :

সম্রাট তখন সূরাটে। খবর এসেছে দমন-এ পতু-গীজরা বড় বাড়বাড়ি করছে। আকবর বললেন, নাঃ! ঐ লালমুখো বিদেশী বেনিয়ারগুলোকে এবার শাস্ত্রতা করতে হয়! সৈন্য সাজাও—‘দমন’ যাব! দমন করতে।

পতুগীজ বেনিয়ার দল অত্যন্ত খলিফা। তারা ঠিক খবর পেয়ে গেল। বড় কড় পিপে ভর্তি সিরাজী পাঠিয়ে দিল সূরাট-কিল্লায়, ভেট স্বরূপ। কি যেন তার অদ্ভুত নামটা—মনেও থাকে না ছাই! হিন্দুস্থানে সে সিরাজী পয়দা হয় না—লালমুখোরা ‘শাম্পান’ না ‘শাম্পিন’ কী-যেন বলে। কড় জম্বর সে-দারু!

আকবর সেদিন সন্ধ্যায় তাঁর ইয়ার-দোস্তদের নিমন্ত্রণ করলেন পানের আসরে। সূরাট-কিল্লার ছাদে, চবুতরায় মখমলের জাজিম বিছিয়ে তাকিয়া ঠেং দিয়ে বসেছেন জাহাঁপনা, মাথায় জরীর তাজ, অঙ্গে ঢিলে-ঢালা আঙুরাখা, খিদেমদ্যার মরুর-পাখায় ব্যজন করছে। আর তাঁকে ঘিরে তাঁর অমীর মালিক ইয়ার-দোস্ত-মোসাম্মেবের দল—খান-ই-আজম, মজঃফর খাঁ, লস্কর খাঁ, প্রভৃতি। বাঁজী নেই সেই জঙ্গী পরিবেশে। না থাক, কবি কোথায় নেই? অন্তত কাব্যরসিক? কেউ কেউ ফার্সী কবিতা পাঠ করে শোনালো। হাফিজ আর ওমর খৈয়াম। বাদশা বললেন, বড় খাঁটি কথা বলেছেন খৈয়াম :

‘গোয়েন্দ বেহেমত-ই-ইদম বহর খুশ-অস্ত’।

মন-মে গোয়েন কি অব-ই-আঙুর খুশ-অস্ত’।

ই-নজ-বগীর ও-দস্ত আজ-আঁ নশিয়া ব-দার

কে আওয়াজ বনাইল বরাদর আজ দর খুশ-

অস্ত ॥*

* লোকে বলে, মগটা নাকি বড় জবর জারনা। হবেও বা। আমি বলি, এই আঙুরাখাই বা কয় কিসের? এটা নগদ, সেটা ধার। কি জানো ভাই—ও ঢোলের আওয়াজ দর থেকে শুনতেই মিথি!

পানপাতের ডুংগার ফিরছে হাত থেকে হাতে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে একে একে কাৎ হয়ে পড়লেন সবাই। একমাত্র রাজা মানসিংহ বে-এক্টিয়ার হননি। প্রভুভক্ত মান সংবত হয়ে সম্রাটকে সঙ্গদান করছিলেন, তাঁর নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে। এমন বে-এক্টিয়ার পানের আসরে যে অনেক অনেক দুর্ঘটনা ঘটেছে। কে একজন কিসসা শোনালো, রাজপুত্র জওয়ানদের হিন্দুত্বের কথা। কললে, আমি শুনছি, জাহাঁপনা, রাঠোর রাজপুত্রদের মধ্যে এমন পাটো জোয়ান আছে যে, বর্ম পরে থাকলে তাকে বর্ষার আঘাতে পেড়ে ফেলা যায় না। বরং বর্ষার ফলা দু-টুকরো হয়ে যায়।

শাহ-য়েন-শাহ ততক্ষণে চুর। জড়িয়ে জড়িয়ে কললেন, ফঃ! সে তো আম্মো পারি!

—পারেন?

—হরগিজ! এমন কি বন্ধে বর্ম না-সেটেই! দেখবে?

সব কটা মাতাল উবু হয়ে উঠে বসে। বলে, ঠিক হ্যায়! দেখান! হয়ে যাক!

শাহ-য়েন-শাহ হাঁকলেন, এ্যাই! কোই হ্যায়?

হস্তদন্ত হয়ে ছুটে এল খিদমদগার। পঞ্চাশ-ষাট পাঠ কিল্লাইতির তলানি-প্রভাবে সেও বেহেশ্তের দোর গোড়ায়। সম্রাট তাঁর কোমরবন্ধ থেকে বিশাল তলোয়ারখানা বার করে বললেন—এটাকে ঐ পাথরের বর্জ্জ গুঁজে দিয়ে আয়। মূঠ থাকবে দেওয়ালের দিকে। বর্জ্জলি?

লোকটা আত্মমি নত হয়ে একটা মোগলাই কুর্নিশ কাড়ল। তারপর সেই নাঙা তলোয়ারখানা নির্দেশ মত শক্ত করে সেটে দিল চব্বতরার এক স্তম্ভের ঝাঁজে। মূঠ দেওয়ালের ভিতর, সুচ্যগ্রভাগটা সামনে। বাদশা টল্‌তে টল্‌তে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, তোরা দেব! ঐ সামসেরের উপর আমি ঝাঁপ খেয়ে পড়ব। কিসসা চোট লাগবে না! ওটা ঠুং করে—বাস! দু-টুকরো হয়ে যাবে।

সবাই সমস্বরে কেরাবাং দিয়ে ওঠে।

কোথাও কিছু নেই কক্ষের ও-প্রান্ত থেকে লাফ দিয়ে পড়লেন রাজা মানসিংহ। বহুদূরদৃষ্টিতে চেপে ধরলেন সম্রাটের মণিকন্ড। বাঁ-হাতে টেনে ফেলে দিলেন তলোয়ারখানা।

দূরদৃষ্ট ভ্রোমে হুকুর দিয়ে ওঠেন মদাপ সম্রাট : মান সিং! হোঁশিয়ার! তুমি শাহ-য়েন-শাহ-এর গাত্র-স্পর্শ করেছ! মনে নেই আথম খাঁর কথা?

সম্রাটের চোখে-চোখে রেখে মানসিংহ দাঁড়িয়ে বসলেন, শাহ-য়েন-শাহ! আমি আথম খাঁ নই, আমি মান সিং! আমি আপনার আংকাকে খুন করে আসিচ্ছি; আপনার আংকার মালিকের জ্ঞান বাঁচাতে এ-কাজ করেছি।

আকবর দু-হাতে টিপে ধরলেন মানসিংহের কণ্ঠ-নালা। আবুল ফজলের মতে, সে সন্ধ্যায় সৈয়দ মজঃফর মানসিংহকে সাহায্য না করলে একটা দুর্ঘটনা হয়তো ঘটে যেত সুরাট-কিল্লায়।

পরদিন সকালে সম্রাটের খোঁয়ার ভেঙেছে খবর পেয়ে মানসিংহ দেখা করতে এলেন। তাঁকে দেখে আকবর মিটি-মিটি হাসতে থাকেন। বলেন, জ্ঞান নিয়ে খুব বেঁচে গেছ মান সিং!

মানসিংহ হাস্য গোপন করে বলেন, জানে বেঁচেছি আমি, না বেঁচেছেন আপনি?

—তুমি। আমি কালকের কথা বলছি না মান,—কল্‌ছি আজকের কথা।

—আজকের কথা। মানে?

—বাঃ! আজ সকালে তাহলে তোমার কী হাল হত বল দিকিন? এদিকে শেখদুবাবার অভিশেক, ওদিকে শাহ-য়েন-শাহকে গোর দেওয়া। সব দায়বাক্তি তো তোমাতেই বর্তাতো? না কি বল?

মানসিংহ হাজার হলেও হেঁদু। আঁৎকে উঠে বললেন, থাক, থাক, এই সাতসকালে ও-সব অমঙ্গলের কথা কলবেন না, জাহাঁপনা!

আকবর খিল্‌ খিল্‌ করে হেসে উঠতে গিয়ে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যান। বলেন, রসিকতা নয় মান! এবার আমার নিজের মক্‌বারা বানাবার সময় হয়েছে! কদিন থেকে শব্দ সে-কথাই ভাবছি। তুমি উস্তাদ পীর মহম্মদকে একবার খবর পাঠাও। সিকেন্দ্রার সেই জমিটা তো...

হারেম দেখা শেষ হয়েছে; আসুন এবার মস্‌জিদে যাই। যোধবাঈ-প্রাসাদের পাশ দিয়ে সড়ক আছে। ওখান দিয়ে দু-কদম এগিয়ে গেলেই জাম-ই-মস্‌জিদের পদ-দরওয়াজা; লোকে বলে, বাদশাহী দরওয়াজা। জুতো জোড়া খুলে ফেলুন; আমরা ভিতরে যাব।

জাম-ই-মস্‌জিদ : স্থাপত্যে নতুনত্ব বিশেষ কিছু নেই। সেই চিরচরিত প্ল্যানিং। মাঝখানে প্রকান্ড চত্বর—‘শেহান’; উত্তর-দক্ষিণে 133.6 মিটার, পূর্ব-পশ্চিমে 165.2 মিটার। পশ্চিমে গুল মস্‌জিদ, ডান-দিকে আকবরের গুরু সেগিম চিস্তির দরগা, তার

পাশে, পূর্বদিকে শেখ সেলিম চিশ্তির নাস্তি তথা আব্দুল ফজলের ভগ্নপতি ইসলাম খাঁর সমাধি-সৌধ। শেখ সেলিম চিশ্তির দেহাবসান হল ফেব্রুয়ারী, 1572-তে। ততদিনে এ মসজিদে বারো-আনা কাজ শেষ হয়েছে। সম্রাট এ মসজিদ তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন—সে-কথা লেখা আছে প্রার্থনা-সৌধের প্রাচীরে।

এ মসজিদে লক্ষ্য করবার মতো জিনিস হচ্ছে—প্রার্থনাক্ষেত্র দূ-পাশের দুটি ঘরের উপর গম্বুজ-জোড়া। তার চার-কোণায় স্কুইণ্ড-পদ্ধতি নয়, হিন্দু-স্থাপত্যের করবেল-করা বাঁমের সাহায্যে ধাপে ধাপে ঐ চার-কোণা ঘরখানাকে আট-কোণা, ক্রমে ষোলো-কোণার রূপান্তরিত করা হয়েছে। এখানেই আকবরী-বৈশিষ্ট্য! আপাতদৃষ্টিতে মসজিদ নির্ভেজাল ইস-লামী ঐতিহ্যের—কিন্তু দীন-ইলাহী ধর্মের প্রবর্তক ঐটুকু সূক্ষ্ম হিন্দু-শৈলী যোগ না করে তৃপ্তি পান-নি। তত্ত্বটা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, দু-দুটো আলোক-

চিত্র দিতে হল (চিত্র—9.19 ও 9.20)।

সেলিম চিশ্তির কবর : সৈয়দ রিজভি কলছেন,²¹ "শেখ সেলিম চিশ্তির মার্বেল-থক্কার কবর দিতে সকলেই ভাঙ্গা জাতের বিশেষণের খোঁজে অভিযান হাওড়ান। এর কাব্যিক মনোরম রূপটিকে কবর করার উপযুক্ত বিশেষণের সত্যি কড় অভাব। ভারত-বর্ষের যাবতীয় মর্মর সৌধের মধ্যে এটি অনন্য।"

শ্বেতবর্ণের এই সমাধিসৌধ বাস্তবে না দেখলে অনুভব করা যাবে না এর নরনার্ভিক্য রূপ। আমি শুধু কয়েকটি বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই :

প্রথমতঃ, আপনারা হয়তো ইতমদ্-উদ্-দৌলা অথবা তাজমহল দেখার পর ফতেপুর-সিক্রিতে এসেছেন। তাই প্রথমেই কথাটা খেয়াল করবেন—এ মর্মরসৌধ ইতমদ্-উদ্-দৌলা অথবা তাজের পূর্বরূপে নির্মিত। তাদের পূর্বসূরী। এইবার লক্ষ্য করে দেখুন, সন্দোখ ঘিরে ঐ পাথরের জালি-কাজটুকু। বিশেষ



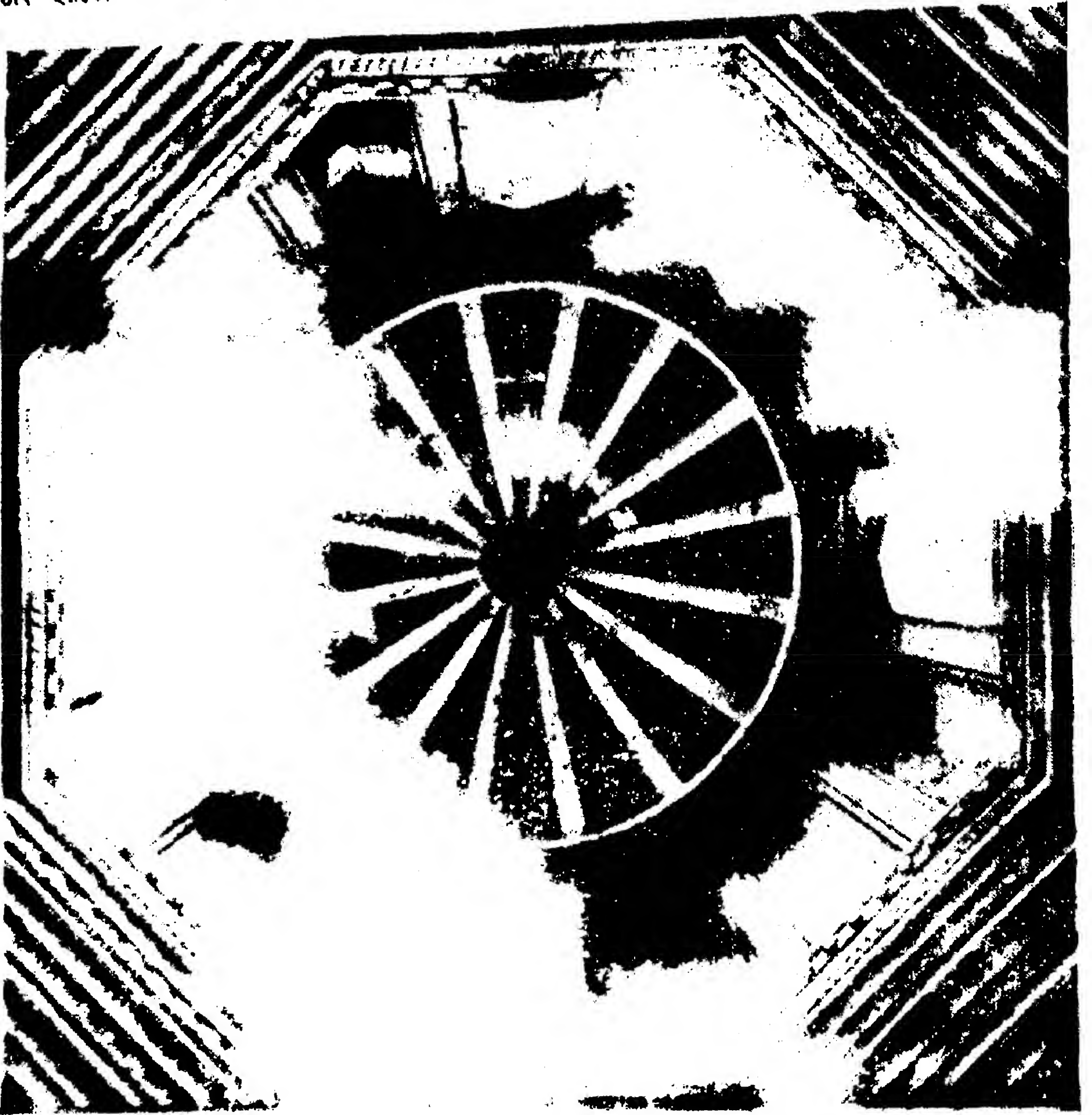
চিত্র—9.19 জাম-ই-মসজিদের করবেলিং (হিন্দু-শৈলীর প্রভাব লক্ষ্যীয়), ফতেপুর-সিক্রি।

করে দক্ষিণ-পূর্ব কোণের প্রকান্ড পাথরখানা। কী
নিখুঁত কাজ! বিভীকৃত, সমাধিসৌধ বেটনকারী
প্রসারিত-বাহু ছাড়া। যেন শেখ সেলিম চিন্তিত আতপ-
তাপ থেকে ভব্বন্ধকে রক্ষা করতে বিস্তৃত করে
দিয়েছেন তাঁর ছতছায়া। যেন শব্দ আতপ-তাপ নয়,
জ্বালা-শোক-দুঃখ দর্শনার হাত থেকে রক্ষা করতে।
ভীতীকৃত, লক্ষ্য করুন—গ্যাকেটের একটি বিচিত্র ডিজাইন।
ইংরেজী 'S'-অক্ষরের মতো দেখতে। যেন সাপের
ফমা; নাঃ। ময়ালগ্রীবা! তাও নয়। তবে কিসের মতো?
হঠাৎ হয়তো মনে পড়ে যাবে—বীরভূম বা বাঁকুড়ার

কোনো আউল-বাউল দরবেশদের মেলায় দেখা কোনো
মুশকিল-আসান বা ফকিরকে। তাঁর হাতের বণ্ডিকম-
যণ্ডির কথা। নব্বই বছর বয়সের দরবেশ শেখ সেলিম
চিন্তিতকে কি অমনই একটা লাঠি ঠুক ঠুক করে ঘুরতে
দেখিয়েছিলেন সম্রাট? সেলিম চিন্তিত চলে গেছেন,
কিন্তু সেই বণ্ডিকম-যণ্ডির শাস্বত ছায়াপাত হয়তো
ঘটেছে ঐ গ্যাকেট-ডিজাইনে!

সব শেষে বলব—লক্ষ্য করে দেখুন, ছাদের জল-
নিকাশী ব্যবস্থাটা।

ছাদের চারিদিক ঘিরে নিশ্চিদ্র প্যারাপেট। ব্যাপার



চিত্র-৯.২০ জাম-ই-মসজিদে সিলিং (হিন্দু-শৈলীতে কারুকার্য ব্যাকশা), ফতেপুর-সিটি।

কি? জলনিকাশী নালি কই? ছাদের জলটা তাহলে নিকাশ হয় কোন্ পথে? গাইডকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে দেখিয়ে দেবে। গম্বুজ-ধোয়া বৃষ্টির জল একটি ফাঁপা মর্মর-স্তম্ভের ভিতর দিয়ে চলে যায় ভূগর্ভে। ঐ ভারবাহী ফাঁপা স্তম্ভের মাঝখান দিয়ে জমায়েত হয় মসজিদ-শেহানের কেন্দ্রস্থিত জলাশয়ে।

সেলিম চিস্তির দরগায় মন্ড হওয়ার অবকাশ অনেক—কিন্তু মাপ করবেন আমার স্থূল দৃষ্টিভঙ্গীটাকে, আমি সবচেয়ে অভিভূত হয়েছি এই ‘এঞ্জিনিয়ারিং স্কিল’-এ—বিশেষ করে তার পিছনে যে শ্রম্ভান্বয় হৃদয়টি আছে, তার কথা ভেবে। কী অপারিসীম শ্রম্ভা সম্মাটের। আকাশ থেকে যে জলধারা ঐ গম্বুজের উপর পড়বে তা যেন কোনো জলনিকাশী নালি দিয়ে মসজিদ-চত্বরের মেঝেতে নেমে না আসে। তাতে যেন কারো পা না লাগে! তাই নিঃশব্দে, সকলের দৃষ্টির অগোচরে ব্যবস্থা করা হয়েছে জলটা একটা ‘ভারবাহী’ ফাঁপা মর্মর-স্তম্ভের ভিতর দিয়ে সঞ্চিত হবে ভূগর্ভে। সেখান থেকে জলটাকে ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী দিয়ে এনে ফেলা হয়েছে শেহানের কেন্দ্রস্থ একটি জলাধারে। এমন একটি শ্রম্ভাবিন্ম হৃদয় এবং বাস্তববিদ্যায় সেই শ্রম্ভার বাস্তব রূপায়ণ ইতিপূর্বে কোনো স্থাপত্য-কীর্তিতে ‘দেখিনি। গুরুর স্মৃতিতে মঠ-মন্দির-মসজিদ তো কতই নির্মিত হয়েছে—এর পূর্বে ও পরে; কই এমনটি তো আর কোথাও দেখিনি।

বুলন্দ-দরওয়াজা : (চিত্র—9.21) জবাব নেই! মিনারের জগতে যেমন কুংব, গম্বুজরাজ্যে যেমন বিজ্ঞাপনের গোলগম্বুজ, মক্কার দানিয়ায় যেমন তাজ, তেমনি দরওয়াজার ইতিহাসে বুলন্দ—লা-জবাব। ইংরেজের তৈরী বোম্বাইয়ের গেটওয়ে অব ইন্ডিয়া, অথবা দিল্লীর রাজপথের শেষপ্রান্তের ইন্ডিয়া গেটের সঙ্গে এর তুলনা চলে না। বরং বিশ্ব-ইতিহাসের অন্যান্য পর্যায়ে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশে খুঁজলে এর দোসর পাওয়া যেতে পারে : সারগনের প্রাসাদ-তোরণ, সূসা-তোরণ, রোমের বিজয়-তোরণ অথবা পারীর আর্ক দ্য ট্রাম্ফ। তাদের মধ্যেও বুলন্দ বিশেষ, বুলন্দ একক, বুলন্দ অনন্য। কারণ আর সবাই ষোলো-আনা স্থাপত্য; আর বুলন্দ ষোলো-আনা স্থাপত্য ছাড়াও বাকি ষোলো-আনা ভাস্কর্য।

এ দরওয়াজা একটি প্রতিকৃতি : জালালউদ্দীন আকবরের প্রতিমূর্তি।

রৌদ্যার তৈরী বাজজাক-এর বিশ্ববিখ্যাত প্রতি-

মূর্তি দেখেছেন? অথবা তার ভালো ফটোগ্রাফ? সেখানে ঐ ফরাসী মনুষীর দৈহিক সাদৃশ্য বহুটা প্রতিবিম্বিত, বুলন্দ-দরওয়াজায় তার চেয়ে এক তিন কম নেই আকবরের।

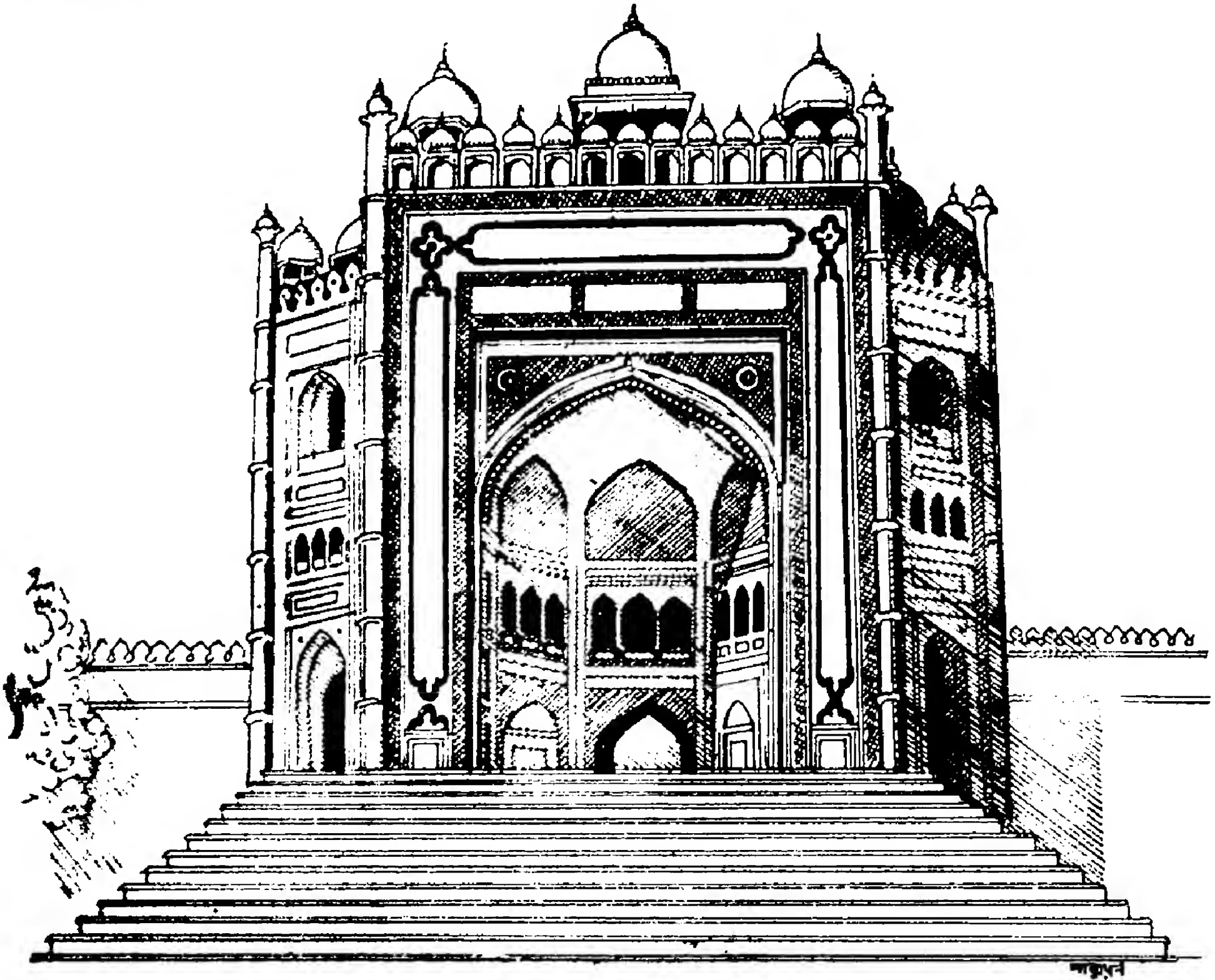
জাম-ই-মসজিদের দক্ষিণ প্রবেশ পথেও ছিল পূর্ব-প্রবেশদ্বারের অনুরূপ আর একটি দরওয়াজা। আকবর দক্ষিণাত্য জয় করে, বস্তুত গুজরাট-বিজয় সম্পূর্ণ করে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করে সেই প্রবেশ-তোরণটি ভেঙে ফেলেন। সেখানে গড়ে তোলেন এই অপূর্ব স্থাপত্য-কীর্তি (1573)। বাস্তব-নকশায় 40 মিটার × 27 মিটার। উচ্চতা মসজিদের শেহান থেকে 40.87 মিটার। সামনে থেকে সোপানশ্রেণীর উচ্চতা যোগ করলে 61.24 মিটার বা 168 ফুট।

মানুষের উচ্চতা তো দুই মিটার হয়-কি-না-হয়। তাহলে প্রবেশ-তোরণ অত উঁচু করে বানানো হয় কেন? তাতে ‘আর্কিটেক্টনিক’ মহিমা আরোপ করতে। এম্পায়ার স্টেট্ বিল্ডিংস্ অথবা হুভার ড্যাম-এর উচ্চতা মানুষের প্রয়োজনে। পিরামিড, কুংব বা ইফেল টাওয়ারের উচ্চতা স্থাপত্যের প্রয়োজনে। তাই স্থাপত্যের ইতিহাসে যুগে যুগে নির্মিত হয়েছে বিশাল তোরণ। গ্রীক ও রোমক স্থপতি তোরণের গায়ে পোর্টিকো বানিয়ে বাতায়নের পথটা খাটো করে দুদিক বজায় রেখেছেন। ব্যাকলিন, সূসা বা পারস্যের রাজারা তা করেননি। তাঁরা মানুষের প্রয়োজন এবং স্থাপত্যের প্রয়োজনে কোনো সমঝোতা-আনার চেষ্টা করেননি। সম্মাট নেবুকাডনেজার-এর ইশার-তোরণ নির্মিত হয়েছিল বুদ্ধদেবের সম-সময়ে (605 থেকে 562 খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে)। তার একটি মডেল রাখা আছে বার্লিনের পার্গামন সংগ্রহশালায়। কিম্বা পারস্য-সম্মাট প্রথম শাপুর সূসাতে যে 36.5 মিটার উঁচু তোরণটি বানিয়েছিলেন 275 খ্রীষ্টাব্দে। এ দৃষ্টিতে মানুষের প্রয়োজন এবং স্থাপত্যের প্রয়োজনে কোনো সমঝোতার চেষ্টা করা হয়নি। তাই ওর নিচ দিয়ে যাবার সময় দর্শক স্বতঃই এক হীনমন্যতার শিকার হয়। এর সঙ্গে তুলনা করুন বুলন্দ-দরওয়াজার। সামনের দিক থেকে বিশাল তোরণ, ভিতর দিক থেকে তা স্বাভাবিক উচ্চতার। আগমনকালে বা স্থাপত্যের প্রয়োজনে মহিমাময় উচ্চতায় বিশ্বাকর, নিগমনের সময়ে তা মানুষের প্রয়োজনে স্বাভাবিক উচ্চতার। অর্থাৎ সম্মুখদৃশ্যে বুলন্দ-দরওয়াজা হচ্ছে বাদশাহের সেই রূপ যা দেখে প্রজাবন্দ, এবং ভিতর দিক থেকে তার আবেদন মানুষ-আকবরের—হামিদা বানুর কাছে যার পরিচয় মেরে লাগল; অম্বর রাজ-

কুমারীর কাছে 'জীবনের জীবন।' এই অনুভাবনাটো রূপায়িত করতে সম্ভবদংশের প্রকাণ্ড খিলানকে ভিতর-দিকে স্বাভাবিক উচ্চতার পরিণত করতে বাস্তবিকভাবে যে বিচিত্র প্রয়োগ-কৌশলের ব্যবস্থা করা হয়েছে তার গাণিতিক স্বরূপটো সাধারণ পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য মনে হতে পারে—তা আলোচনা করছি না ; কিন্তু লক্ষ্য করে দেখুন—সে ব্যবস্থাটো কী নিখুঁত ! মেঘে মেঘে যেমন মিশে যায়, স্বপ্নে-স্বপ্নে যেমন মিলে যায়, সেইভাবে ভিতর-বাহিরের খিলান বে-দাগ মিলে

আকাশচন্দ্রস্বী মহিমায় মণ্ডিত হয়েছে। ঐ সারি সারি সোপানের জন্য, জমির ঢালের জন্য। যেন সারবন্দী সোপান সন্ধ্যাটের পদপ্রান্তে প্রণতিরত।

স্থপতিবিদ একটিমাত্র খিলান বানিয়েছেন। মোদী-সৈয়দী শৈলীর অল্প অনুকরণে পাশাপাশি তিনটি খিলান নির্মাণ করাঙ্গে কিন্তু সর্বনাশ হয়ে যেত। যা কলতে চান, তা বলা হত না। কী বক্তব্য শিল্পীর ? তিনটি ভিন্ন ধর্মী রসের ভাণ্ড নিয়ে তিনি হাজির হয়েছেন। যে যেমনটি চায়, তাকে তেমনটি



চিত্র--9.21 বুলন্দ-দরওয়ারা, সম্ভবদশা (বীররস)।

গেছে ! এ-কথা বলছি না—এটা আকবরের আবিষ্কার—এই 'ইবান-হন্দ' ইসলামী-স্থাপত্যের এক প্রচলিত প্রয়োগরীতি ; কিন্তু সেই রীতির কী সুন্দর সার্থক প্রয়োগ করা হয়েছে এক্ষেত্রে, আকবর-বাদশার স্বেচ্ছ-রূপটো কীভাবে ফুটে।

বুলন্দ-দরওয়ারার চার-আনা সাক্ষ্য তার স্থান-নির্বাক্তনে। সাইট নিম্নোক্তভাবেই কামাল করেছেন বাদশা। এখানে প্রাকৃতিক 'কটর', অর্থাৎ জমির ঢাল এমন ছিল যে, বুলন্দ-দরওয়ারা নির্মাণ শেষে স্বতই

রস পরিবেশনের বাসনা তাঁর। তিনটি ভিন্ন মেজাজী আবেদন : ভয়ানক, বীর ও শান্ত।

ভয়ানক রস কেন ? ওটা দরকার। ঠিক যে প্রয়োজনে দেওয়ান-ই-আমের চত্বরপ্রান্তে রক্তদ্বন্দ্ব অবস্থায় উপস্থিত থাকত সন্ধ্যাটের গজদানব : গজ-মত্তা। এই ভয়ানক রসটা রাজভক্ত প্রজাবৃন্দের জন্য নয়—শত্রুগণ তাদের জন্য, যারা গোপন ষড়যন্ত্রে যোগ দিতে চায়। মীর্জা হাকিমকে, বিদ্রোহী সেলিমকে মদৎ জুড়িয়ে যারা বিশ্বাসঘাতকের মনোফলাভের

খোয়াব দেখে। বুলন্দ-দরওয়াজার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকুন—সামনের দিক থেকে মনে মনে কিছুটা অংশ চাপা দিয়ে ওর খাঁড়িত-অংশ লক্ষ্য করুন ; দেখতে পাবেন এক ব্যাদিত-বদন ভয়ঙ্কর দৈত্যকে। রাক্ষসটার চোখ আছে, কান আছে, মায় তার হাঁ-মুখে সারি সারি সাদা হাঙরের দাঁত ! কান পাতলে শুনতে পাবেন রাক্ষসটা হৃদয় হাড়ছে : হোর্শিয়্যার ! (চিত্র—৯.২২)।

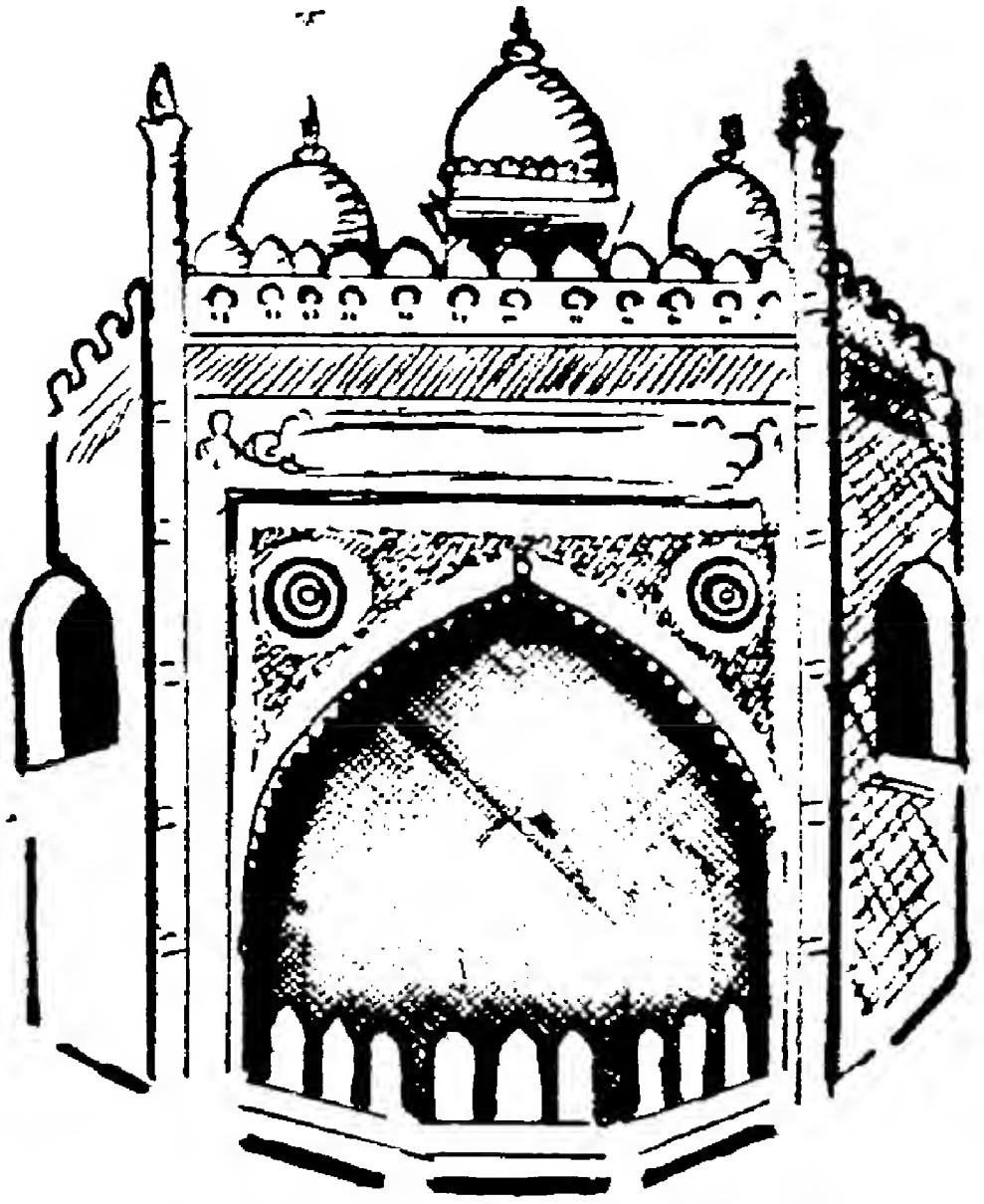
যদি বলেন, এ আমার দৃষ্টি বিভ্রম, অহৈতুকী কবি-কল্পনা, তাহলে আমি কিন্তু একটা প্রতিপ্রশ্ন তুলব। বলব, আকবরী-জমানায় ইবান তো বড় কম দেখলেন না, তোরণও প্রচুর—ফতেপুর-সিক্রির ‘আগা-দরওয়াজা’, বাদশাহী-দরওয়াজা, আগা-কিল্লার অনেক অনেকগুলি সুউচ্চ প্রবেশ-তোরণ, সেকেন্দার দক্ষিণ-দ্বার এবং মূল মক্কার বিশাল-তোরণ—কই, ঐ বিশেষ জোড়ানকশাটা তো কোথাও নেই—ঐ বোটা কে আপনি বলছেন নিতান্ত এ্যাক্সিডেন্টাল গোলাকৃতি একটা অলংকরণ, আর আমি সভয়ে ভাবছি : দৈত্যের রক্তচক্ষু ?

তবু দৈত্যটাকে দেখতে পেলেন না তো ? তা পাবেন কেমন করে ? আপনি তো আর শাহজাদা সেলিমের কানে ফুস-মন্তর ঝাড়তে আসেননি। বিদ্রোহে অংশ নেবার কোনো বাসনা নেই আপনার। এসেছেন মহামহিম আকবরের কীর্তিকাহিনী দেখতে। বেশ, তাই দেখুন না কেন ? আবার মনে মনে নিচের অংশটা চাপা দিয়ে তোরণ-সম্মুখের মাথায় তাজটুকুকেই দেখুন বরং। এটি বীররস।

তৃতীয়তঃ, শান্তরস। একটা জিনিস খেয়াল করে-ছেন ? বিজয়-তোরণ বানাতে চান তো মস্জিদে এলেন কেন বাদশাহ ? কেন ভেঙে ফেললেন জাম-ই-মস্জিদের দক্ষিণ দরওয়াজা ? তার চেয়ে কি বুদ্ধিমানের কাজ হত না যদি তিনি ফতেপুর-সিক্রিতে ঢোকার মুখে আগা-তোরণটা ভেঙে ফেলে বুলন্দ-দরওয়াজা গেঁথে তুলতেন। বিজয়-তোরণ তো নগরে প্রবেশের মুখেই ভালো মানায়। বোম্বাই-এর গেট-ওয়ে অব ইন্ডিয়া থেকে বর্ধমানের কার্জন-গেট কি সেই শিক্ষাই দেয়নি আমাদের ? কিন্তু না ! ধর্মপ্রাণ সম্রাট তাঁর ঐহিক সাফল্যের জয়মালাটি শ্রদ্ধানয়ন বিনয়ে নারিয়ে দিয়েছেন রাজার রাজার চরণমূলে। অর্থাৎ হিসাবে। জাম-ই-মস্জিদের প্রবেশদ্বার—যে মস্জিদে অন্তিম শয়ানে শয়ে আছেন তাঁর গুরু শেখ সেলিম চিস্তি—যে প্রাঙ্গণে প্রবেশ করার পূর্বে তাম্বা হিন্দুস্থানের

শাহ-য়েন-শাহকেও তাঁর মরণখচিত মক্কার পদতলা খুলে রেখে নগ্ন পদে জনারূপে সন্নিবিষ্ট হতে হয়, সেই পদপ্রান্তেই তিনি উজার করে দিয়েছেন তাঁর বিজয়-অভিমান !

সম্রাটের মানসিকতার সেই বৈচিত্র্যকে বুঝে নিতে হলে বুলন্দ-দরওয়াজাকে কল্পন দেখতে হবে ভিতর দিক থেকে (চিত্র—৯.২৩)। মস্জিদেবর আর তিনটি খিলানের সঙ্গে কোনো ফারাক নেই। ছোট প্রবেশদ্বার, ঘরোয়া ছবি, স্বাভাবিক ককথাপন। সেখানে দাঁড়িয়ে বিশ্বাসই হতে চায় না—করেক পা অগ্রসর হয়ে পিছন ফিরে দাঁড়ালেই দেখতে পাব



চিত্র—৯.২২ বুলন্দ-দরওয়াজার ভয়ঙ্কর রস।

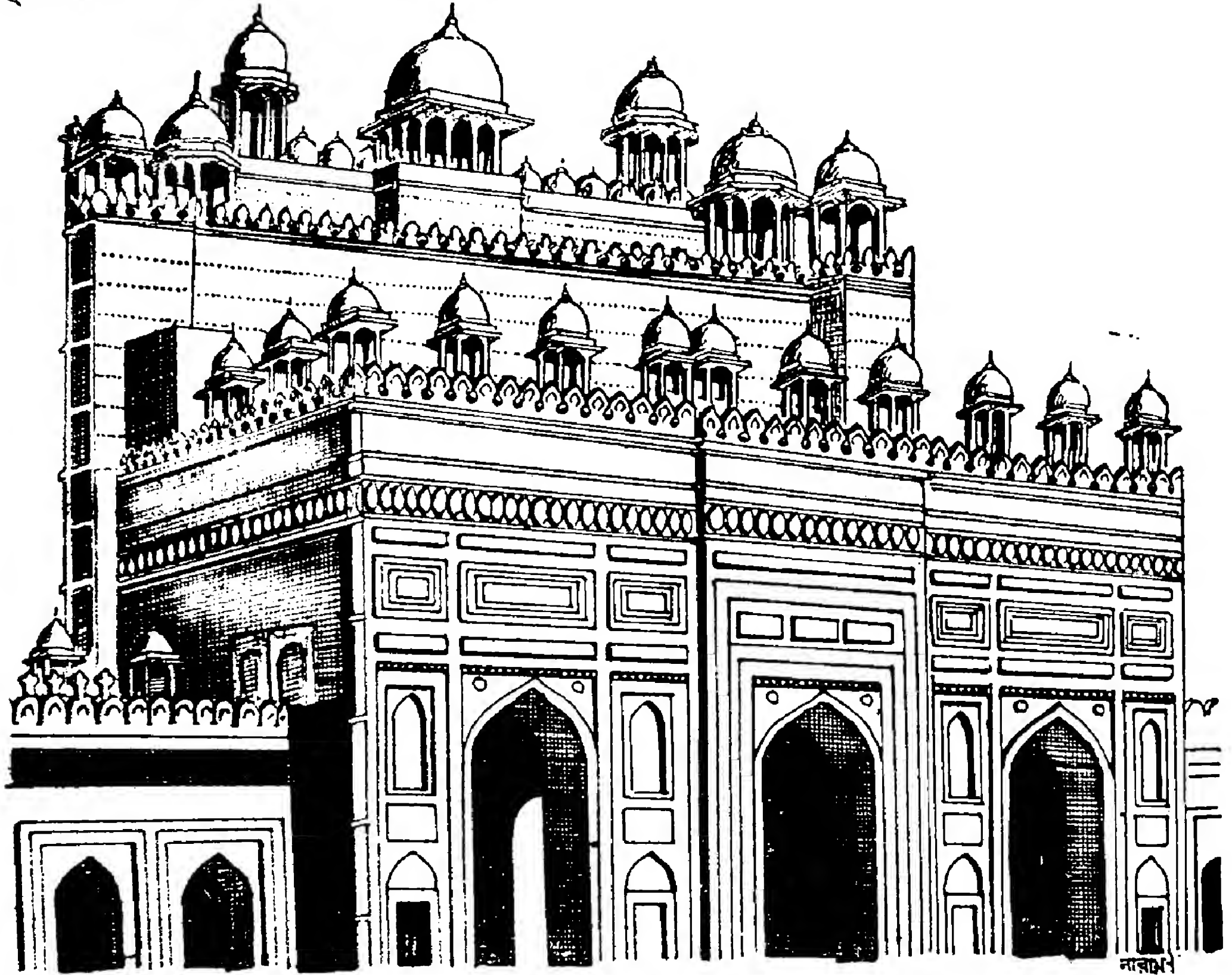
ভারতেশ্বরের আকাশচুম্বী বাদশাহী দাড়া—সারি সারি চরণাশ্রিত সোপান। ব্যাদিত-বদন রাক্ষস-খিলান, কিম্বা দরবার-আসীন সম্রাটের মাথায় সেই তাজের বাহার !

তাই ফল্গুনাম : বুলন্দ—লা-জবাব !

হয় তো নতুন কথা কিছুই কল্প হইল না। হয়তো বুলন্দ-দরওয়াজার সামনে দাঁড়িয়ে এ-সব কথা আপনাদেরও মনে হয়েছে। সাহস করে সে-কথা বলতে পারেননি, কারণ আপনারা জানতেন, এ জাতীয় কল্প-ভাবনা ইসলামী ঐতিহ্যে নেই। এ নিত্যন্তই হিন্দু শিল্পশাস্ত্রের একটি অনুভাবনা। বরং অবনীন্দ্রনাথ^{২৩} বলেছেন : ‘সাদৃশ্য’। শিল্পের বড়-অংশের

পঞ্চম অঙ্গ। হয়তো আপনারা অবাক হয়ে ভেবেছেন—
আকবর-বাদশার মুসলমান শিল্পী অমনভাবে কেন
ডাঙছে? কিন্তু আকবরী-জমানার ফতেপুর-সিক্রিতে
কি সমবেত হয়নি হিন্দুস্থানের শ্রেষ্ঠ হিন্দু চিত্র-
করেরাও? ঐ মন্দির-মকানী আর তুর্কি-সুলতানার
প্রাসাদে, বাদশার খোয়াবগাহে রামসীতা, রামাকৃষ্ণ,
হনুমানজীর ছবি আঁকতে? সেটা কি ছিল না দেওয়া-
নেওয়ার যুগ? টোবিয়টে রাজকুমারীর সঙ্গে আকুয়েট
শাহজাদার মহাব্বতের জমানা? হয়তো আকবরী যুগের

হিরণ-মিনার : ফতেপুর-সিক্রি থেকে বিদায় নেবার
আগে আর একটি দলছোট স্থাপত্য-কীর্তি দেখে যেতে
ভুলবেন না : হিরণ-মিনার। ঐ জলাশয়ের ধারে,
জেনানামহলের পিছনে, প্রাকারের বাহিরে। এ মিনারে
নাকি সে-আমগে প্রতিদিন সন্ধ্যায় দীপ জ্বলে দেওয়া
হত। পথভ্রান্ত পথিককে ঐ মিনার পথ দেখাতো।
হুদের বৃকে বাইচ-প্রতিযোগিতা হলে, সংলগ্ন ময়দানে
মল্লযুদ্ধের আয়োজন হলে এই মিনারশীর্ষে বসে নিরা-
পদ দূরত্রে রাজাবরোধের জেনানামহল আনন্দলাভ



চিত্র—৪.২৩ বৃন্দাবন-দরওয়াজা, মন্দিরদের ভিতর থেকে (শান্তরস)।

শ্রেষ্ঠ চিত্রকরের দল—ঐ কসওয়াল, কেশু, মদকুন্দ-
লাল, হারিকস, দাসবস্ত্রদের কাছ থেকেই মুসলমান
উস্তাদ শুনোছিল কাকেরদের সেই মন্দির বর্ণনা :

রূপভেদাঃ প্রমাণানি ভাবলাবণ্যবোধনম্।

সাদৃশ্যং বর্ণিকাত্মক ইতি চিত্রং ক্ষুদ্রকম্ ॥*

* রূপভেদ (anatomy), প্রমাণ (anatomical measurements), ভাব, লাবণ্যবোধনা, সাদৃশ্য, এবং বর্ণিকা-
ত্মক—এই হচ্ছে চিত্রের ক্ষুদ্রকম্।

করতেন। গাইড আমাকে বলেছিল, ঐ মিনারের নিচে
নাকি একটি হাতীকে কবর দেওয়া হয়েছে।

—হাতী! কোন্ হাতী? হাতী কেন?

গাইড তা বলতে পারেনি। পুরতত্ত্ব বিভাগের
স্থানীয় অফিসারকে প্রশ্ন করেছিলাম, তিনিও বললেন,
স্লোক পরম্পরায় কথাটা চাগু আছে বটে। সরকারী
রিপোর্টেও বলা হয়েছে, 'হয়তো' হিরণ-মিনার একটি
হাতীর স্মৃতিস্তম্ভ।

দূরন্ত কোতুহল হয়েছিল আমার। ফিরে এসে প্রামাণিক ইতিহাস ঘেঁটে যা উদ্ধার করতে পেরেছি তা নিবেদন করি :

হাতী জন্তুটা বাদশা আকবরের বড় প্রিয়। ফতেপুর-সিক্রির একাধিক প্রাচীর-চিত্রে হাতীর ছবি—হাতীর ম্বন্দরম্বন্দ, হস্তিপৃষ্ঠে শিকার, হাতীর শোভা-যাত্রা ইত্যাদি। বাস্তবেও তাঁর অনেকগুলি প্রিয় হাতী ছিল—গিরনবর, অপূর্ব, রণধ্বজন এবং গজমুক্তা।

শেষোক্ত গজমুক্তা ছিল সম্রাটের পিলখানায় হাজার হাতীর মধ্যে সবচেয়ে বড়। সব চেয়ে প্রিয়ও ছিল সে আকবর-বাদশার। একাধিক শোভাযাত্রায় সে বাদশাহকে পিঠে নিয়ে নগর পরিক্রমা করেছে। তখন তার গজকুম্ভে বিচিত্র আলিঙ্গন, তার পিঠে ম্বর্ণখচিত হাওদা, তার গলার কাঁছ থেকে দোদুল্যমান অসংখ্য পিতলের ছোট ছোট ঘণ্টা। শব্দ উৎসবে নয়, ব্যসনেও সে আকবরের সঙ্গী। অনেক যুদ্ধে সে আকবরের বাহন। গজমুক্তা জীবনের শেষ যুদ্ধ করেছে হল্দিঘাটের উপত্যকায়। হিরণ-মিনার কি তারই স্মৃতিস্তম্ভ? জানি না। তবে গল্পটা শুনুন। গল্প নয়, ঐতিহাসিক কাহিনী :

: আঠারই জুন, 1576; হল্দিঘাটের (হল্দিঘাট নয়) সংকীর্ণ গিরিবর্ষে নেমে এসেছেন চিতোর দুর্গ থেকে সেই আশ্চর্য মানদুর্ষটি। তাম্র হিন্দুস্থানের একমাত্র মানদুর্ষ—কাশ্মীর থেকে কুমারিকা, গোড় থেকে গুজরাট এই বিস্তৃত ভূখণ্ডের একমাত্র ব্যতিক্রম যে মানদুর্ষটি জিন্দগি-ভর বলে গেছেন : একলিঙ্গ ছাড়া আর কারও পায়ে মাথা নোয়াবো না! সারাজীবনে সে লোকটা আকবর-বাদশার বশ্যতা মানেনি। শেষ পর্যন্ত নাকি শাহ-য়েন-শাহ এমন প্রস্তাবও পাঠিয়ে ছিলেন যে, মেবারের শিশোদিয়া রাণা শব্দ নামমাত্র এক আশ্রয় নজরানা দিয়ে আকবরের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিন। রাণা সম্মত হননি—পরিকর্তে বেছে নিয়েছিলেন আজীবনের জন্য নির্বাসিত জীবন, আধপোড়া জোয়ারের রুটি, কণার জল আর ভূশা। বাধ্য হয়ে আকবর সৈন্য মানসিংহকে প্রেরণ করলেন চিতোর জয় করতে।

হল্দিঘাটের সংকীর্ণ গিরিবর্ষে মৃথোমুখি দেখা হল ওদের।

একদিকে সমগ্র হিন্দুস্থানের মিলিত রাজশক্তির প্রতিভূ মৃগল সিপাহ-সালার রাজা মানসিংহ; অপর দিকে শিশোদিয়া রাজবংশের একটিমাত্র মানুষের দুর্জয় সাহস, মৃত্যুঞ্জয়ী বীর্য আর অপারিসীম স্বাধীনতা-

স্পৃহা। আবুল ফজলের হিসাবে মৃগল সেনাপতি মানসিংহের সৈন্যসংখ্যা আশি হাজার, অপরদিকে চিতোরের সৈন্যসংখ্যা তার চতুর্থাংশ : বিশ হাজার। এই অসম যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ, তার কলঙ্কল আপনাদের অজানা নয়; টেকের ভাষায় 'হল্দিঘাট' হচ্ছে ভারত-ভূখণ্ডের ধর্মপলি! কিন্তু না, আমি ডে. রাণা প্রতাপের কীর্তি-কাহিনী শোনারতে বসিনি, আমি কাঁছি 'গজমুক্তার' কথা।

আকবর মানসিংহকে যেমন বেছে নিয়েছিলেন তাঁর অব্যত দক্ষ সেনাপতির ভিতর, তেমনি বেছে নিয়েছিলেন মানের বাহন হিসাবে—পিলখানার অব্যত হস্তিদানবের ভিতর থেকে গজমুক্তাকে। ফতেপুর-সিক্রি থেকে মানসিংহকে পিঠে করে গজদানব এসে উপনীত হয়েছে আজ এই সংকীর্ণ গিরিবর্ষে।

প্রতাপ প্রথমে যে হাতীর পিঠে সওয়ার হয়ে লড়াই করতে এলেন তার নাম 'লোনা'। আবুল ফজল কছেন, 'লোনা'ও নাকি এক গজদানব! হস্তিপ্রেমিক আকবরের নজর ছিল ঐ সুবিখ্যাত হস্তীটির উপর। লোনাও গজমুক্তার মত অসমস্বাসিক, দৌঁহক কম-তায়, রণকুশলতায় তুল্যমূল্য! নিতান্ত দুর্ভাগ্য বলতে হবে—অতর্কিতভাবে গুলিবিষ্ম হয়ে লোনার মাহুং মারা পড়ল। লোনা ঐ মাহুংয়েরই শব্দ একান্ত অনুগত; অন্য কোনো মাহুং এই ক্রান্তিকরী যুদ্ধে লোনাকে পরিচালনা করতে সাহসী হল না। প্রতাপ বাধ্য হয়ে বাহন বদল করলেন।

রণক্ষেত্রের একান্তে এতক্ষণ অশান্তভাবে ক্রমাগত মাটিতে পা ঠুকছিল ঠেতক। রাণা প্রতাপের আকৈশোর বাহন! প্রভুকে পিঠে পেয়েই উত্তেজিতভাবে হুঁশধরান করল একবার। প্রতাপ অশ্বের মূখ ঘোরা-লেন। তরবারি সঞ্চালনে পথ করে তিনি এগিয়ে চললেন যুদ্ধক্ষেত্রের কেন্দ্রবিন্দুতে—ঐ যেখানে গজমুক্তার পিঠে হাওদায় বসে যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন রাজা মানসিংহ।

হায় হায় করে উঠল শিশোদিয়া সৈন্যদল! এ কী সম্ভব? অম্বারোহী কখনও শ্বেরষ সময়ে প্রবৃত্ত হতে পারে গজারুড়ের—বিশেষ, সেই গজ যদি হয় ভারতপ্রেম গজমুক্তা! কিন্তু রাণা প্রতাপকে সে-কথা বোঝাবে কে? তাই ওরা অন্য কোন্সল করল। উপযুক্ত পরি পরাঘাতে জর্জরিত করে দিল গজমুক্তাকে। বাতে যন্ত্রণায় সে রণে ভগ্ন দিয়ে ছুটে পাল্লয়! কিন্তু আশ্চর্য! গজমুক্তা তবু মূখ ঘোরালো না। তীরবিষ্ম দানবটা যন্ত্রণায় বৃহিভ-ধরনিত রণক্ষেত্র মূখর করে

ভুলল, তবু পিছদ ফিরল না। তিল তিল করে এগিয়ে চলে প্রতাপের দিকে।

ঠিক সেই মূহুর্তটিতে চৈতক যে কাণ্ডটো করে বসেছিল তা মধ্যযুগের সমর-ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। সেই খন্ড-মূহুর্তে চৈতক—উঠেপ্রবা। পিছনের দ-পায়ে ভর দিয়ে অসীম সাহসে সামনের দৃষ্টি পা সে ভুলে দিল ঐরাবতের করিকুম্ভে। মূহুর্তমধ্যে প্রতাপ রেকাবের উপর দেহভার রেখে দাঁড়িয়ে উঠলেন—তীক্ষ্ণ শুলের আঘাত করলেন মানসিংহের কবাট-কক্ষে। সেই ভীম আঘাতে মানসিংহ আসনচ্যুত হলেন বটে কিন্তু ভূতলশায়ী নয়। ইতিমধ্যে মানসিংহের দেহরক্ষী বসিয়ে দিয়েছে চৈতকের সামনের পাশে এক ধর্মাস্তিক তলোয়ারের কোপ।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে সেই ঐতিহাসিক আহ্বান : 'হো নীলা ঘোড়াকা সওয়ার!' এবং অল্প পরেই রক্তক্ষরী চৈতকের মৃত্যু। হল্দিঘাটের ক্ষতিদরে সেই বিজয়-প্রান্তরে, যেখানে অন্তিম শয়ানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল প্রভুভক্ত চৈতক সেখানে স্নানপুত্রে বানিয়ে দিয়েছে তার এক প্রতি-মূর্তি।

কিন্তু গজমুক্তার কথাটা ইতিহাস লিখে রাখতে ভুলেছে। হল্দিঘাটের যুদ্ধ শেষে শরবিন্দ হস্তি-দানবও ভূতলশায়ী হয়েছিল ভীমপর্বের শেষদশাটির অন্তর্ভুক্ত। হস্তি-চিকিৎসক তার দেহ থেকে গঙ্গাদলি একে একে মোচন করে ঔষধ প্রয়োগ করলেন। অতিক্রমে উঠে দাঁড়ালো গজমুক্তা। বিজয়ী মানসিংহকে পিঠে নিয়ে সে ফিরেও এসেছিল ফতেপুর-সিক্রিতে। কিন্তু কতক্ষণদলি তার নিরাময় হল না। আকবর-বাদশাহকে শেষ প্রণাম জানাবার জন্যই যেন সে তার কর্তব্যকৃত দেহটা টানতে টানতে এতটা পথ এসেছে।

ইতিহাস এটুকুই। ঝকিটা আপনাদের অভিরুচি।

ন—হিরণ-মিনারের গায়ে কেনও ফলক নেই। আকবর-নামা অথবা আইন-ই-আকবরীতে হিরণ-মিনারের কোনও উল্লেখ আমি খুঁজে পাইনি। 'হিরণ' শব্দটার অর্থ হিন্দিতে 'হিরণ' ; হস্তী নয়। তাহলে কোন ক্ষেত্রে কব, এ মিনার গজমুক্তার স্মৃতিস্তম্ভ ?

আমি শব্দ করে একটি বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ক্ষমত দেব।

'হিরণ' হিন্দিতে 'হিরণ', কিন্তু সংস্কৃতে? হিরণ অর্থ স্বর্ণ, হলদে রঙ। কেমন হলদে? হল্দিঘাট উপত্যকার মাটি যেমন হলদে ?

হল্দিঘাটের পৈতৃক সমর তো শব্দ মানসিংহ আর

প্রতাপের নয়,—চৈতক এবং গজমুক্তারও। শেষোক্ত দু-জনেই প্রাণ দিয়েছে ঐ যুদ্ধে—কিছু আগে আর কিছু পরে। বিজিতদল তাদের বীর যোদ্ধা চৈতকের স্মৃতি-স্তম্ভ গড়ে দিয়েছে। বিজয়ী দলের আকবর-বাদশাহ তার 'জবাব' না দিয়ে থাকতে পারেন ?

শব্দ তাই বা কেন? লক্ষ্য করে দেখুন না কেন ঐ মিনারটিকে। স্থাপত্যের শৈল্পিক নির্দেশনায় আকবর কি তাঁর বক্তব্য বলে যাননি? ঐ বিচিত্র-দর্শন মিনারটি—যা ঘৃণাক্ষরেও কোন পদার্থের মিনারের অন্তর্ভুক্ত নয়, আর ভবিষ্যতেও যা কেউ কোনদিন অন্তর্ভুক্ত করেনি, সে কি সোচ্চারে ঘোষণা করেছে না সে কার স্মৃতিবাহক ?

মিনারের রঙ গেরদা—হলদ ও লালরঙের সংমিশ্রণ। কেমন জান? যেন হল্দিঘাটের হলদে-রঙের ধূসর মাটিতে লেগেছে রঙের ছোপ! চতুষ্পাশ্বে পাদপীঠের উপর অষ্টভুজাকৃতি মিনার কিছুটা উঠেছে স্ফারদেশের মাথা পর্যন্ত। তার উপরের অংশটা? মোটা থেকে সরু হয়েছে—যেন একটি অতি-পরিচিত বৃহদাকার ভূতলশায়ী মরণহত প্রাণীর আশ্রমানে উৎক্ষিপ্ত আহত চরণ। তার গায়ে অসংখ্য কাঁটা, কাঁটা আর কাঁটা। স্তম্ভের সর্বাঙ্গে ঐ শত শত তাঁর বেঁধা আছে কেন গো? জানি না। তার কোনও রকম ব্যাখ্যা কোন পণ্ডিত দিতে পারেননি—না ঐতিহাসিক, না পুরাতত্ত্ববিদ, না শিল্প-বিদ। হয় তাঁরা প্রশ্নটা এড়িয়ে গেছেন, নয় বলেছেন—ও কিছু না! অ্যাক্সি-ডেন্টাল আর্ট।

আমার মন মানেনি। ঐ হিরণ-মিনারের সামনে দাঁড়িয়ে আমার কেমন যেন বার বার মনে হয়েছে—এ কোনো মিনার নয়, এ মক্কারা! স্থাপত্য নয়, এও এক ভাস্কর্য—বুলন্দ-দরওয়াজা যেমন আকবর-বাদশাহর। ফতেপুর-সিক্রির দুই প্রান্তে দুটি প্রতিকৃতি-ভাস্কর্য—বুলন্দ-দরওয়াজা আর হিরণ-মিনার—প্রভু ও ভূত্যের, সওয়ার ও বাহনের (চিত্র—9.24)।

পণ্ডিতেরা যে যাই বলুন, আমি বস্তু, ঐ মিনারের সামনে দাঁড়িয়ে মনের চোখ দিয়ে দেখুন—ঐ মক্কারার নিচে শান্তিতে শায়িত আছে সেই ঐতিহাসিক ঐরাবৎ : গজমুক্তা।

গ্র্যান্ড মদগলদের আধডজন বাদশাহর প্রথম দু'জন ভাগ্যবানকে বাদ দিলে বাদবাকি সবারই শেষজীবনে একই জাতির মন্ত্রণা-পদের হাতে পিতার নির্যাতন। আকবর দিয়েই তার শব্দ। তাঁর শেষ জীবনে সেজিম

বিদ্রোহ করে বসল। সেলিমের আশঙ্কা অতিরিক্ত মদ্যপানজনিত অপরাধে তাকে বণ্ডিত করে আকবর তাঁর নাতি খসরৌকে সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে যাবেন, অথবা শাহজাদা খুররমকে, অর্থাৎ শাহজাহাঁকে, যাকে শৈশবাবস্থা থেকে মানুষ করছেন আকবরের প্রথমা পত্নী, পত্নীহীনা রুখেয়া বেগম-সাহেবা, বা তুর্কি সুলতানা। আকবর-বাদশাহর জীবনের এই অংশের একটি সুন্দর সমসাময়িক প্রতিচ্ছবি সংরক্ষিত আছে নিউ ইয়র্কের 'মেট্রপলিটান মিউজিয়াম অব আর্টস'-এ। তার একটি রৈখিক অনুকৃতি আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করেছি (পৃষ্ঠা-৭১)।

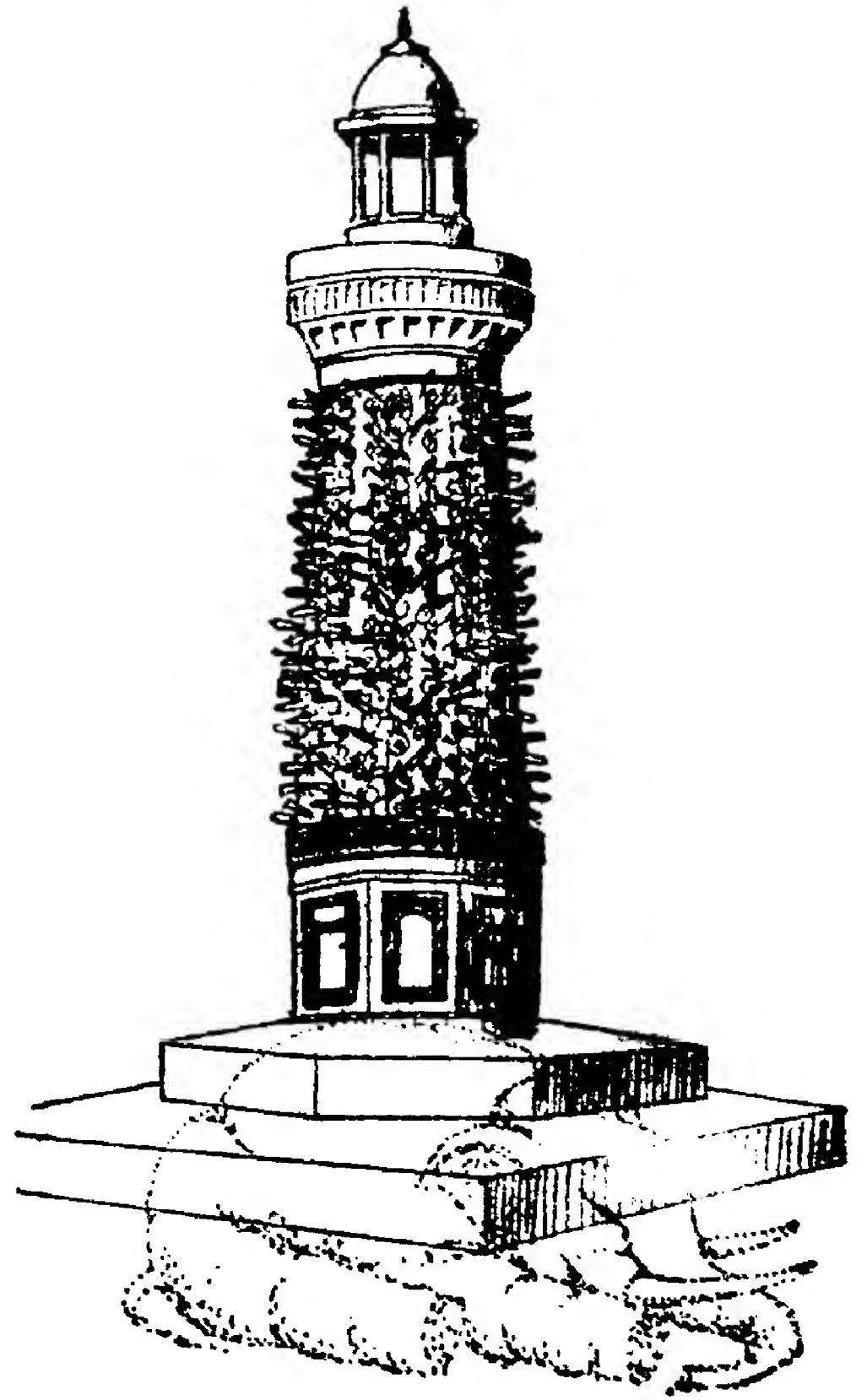
আকবরের মাথার পিছনে একটি রজচ্ছটা বা 'হ্যালো' আঁকা হয়েছে, যদিও স্যার টমাস রো তখনও ভারত-বর্ষে আসেননি, এবং ভারতীয় চিত্রকর পাশ্চাত্য-চিত্রে সেল্ট, বা যীসাস-এর 'হ্যালো' দেখতে অভ্যস্ত হয়নি। সম্মুখে যুক্তকর, নতজানু সেলিম, এবং তাঁর পিছনে রাজা মানসিংহ। আকবরের পায়ে কাছ শাহজাদা খুররম এবং তার সম্মুখে, সেলিমের নিচে খসরৌ। চিত্রের দক্ষিণপ্রান্তে, কিনারঘেঁষে নিচের দিকে সম্ভবতঃ রাজা বীরবল। চিত্রের নিচে দুটি চিত্রল হরিণ, উপরে ময়ূর। কি-জানি কেন শিল্পী বাদশাহ আকবরের আলেখ্যে কিছু বিরক্তির চিহ্ন রেখে গেছেন; তাঁর প্রকৃতি এবং বামহস্তের ব্যঙ্গনায় বৃদ্ধ বাদশাহর শেষজীবনের বিড়ম্বনার যেন একটা ইঙ্গিত আছে!

যতই বিরক্ত হন, আকবর কিন্তু সেলিমকে উত্তরাধিকার থেকে বণ্ডিত করতে চাননি কোনদিন, তবে হ্যাঁ, এ-কথা তিনি বলেছেন—তত্ত্ব-তাউসে বসবার যদি বাসনা থাকে তবে মদ্যপানের মাত্রাটা তাকে কমাতে হবে। সেটা আবার শাহজাদা সেলিমের খাতে নয় না। বড়ো বাপটা মাটি নিলেই মিটে যায়—তাহলে চুটিয়ে সুলতানী করতে পারে সেলিম। কিন্তু সে সৌভাগ্য আর কিছুতেই হয় না।

তা বটে—ভাবেন আকবর—বড় বেশি দিন তিনি রয়েছেন এই দুনিয়ায়। ষাট পার হয়ে এল। পুরানা জমানার জান-পহ্‌চান যারা ছিল এ দু-কুড়ি সাতের খেলার সাথী, সবাই একে একে রঙ্গমণ্ড থেকে সরে দাঁড়াচ্ছে। একলা চলার পথে রওনা হয়ে গেলেন বৈরাম পুত্র আবদুর রহিম খান-ই-খানান—সেই অসাধারণ গুণগ্রাহী পণ্ডিত মানুসটি। আকবরী নবরঙ্গের অন্যতম উজ্জ্বল রঙ্গ—যাঁর সম্বন্ধে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন, "পড়েছি, আকবরের সভাসদ আবদুর রহিম খান-ই-খানান হিন্দী কবি গঙ্গো-র চার-লাইনের

কবিতা শুনে চার লক্ষ টাকা পুরস্কার দিয়েছিলেন।" দিল্লীতে নির্মিত হল আকবরী-নির্দেশে তাঁর মক্‌বরা। বর্তমানে তা ভগ্নদশায়; কিন্তু তার বাহ্যিক নী-সন্দেহে অনুপ্রাণিত করেছিল তাজমহল পরিকল্পনা-কারকে (চিত্র-9.25)।

এটিও হিন্দুদের পঞ্চরঙ্গ সেউলার ছন্দে নির্মিত। এর প্ল্যানিং-এর মূলে হুমায়ুন-মক্‌বারার মতো

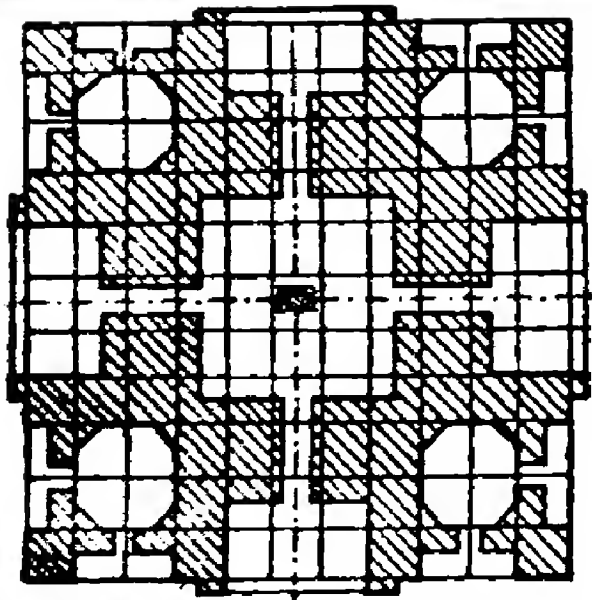
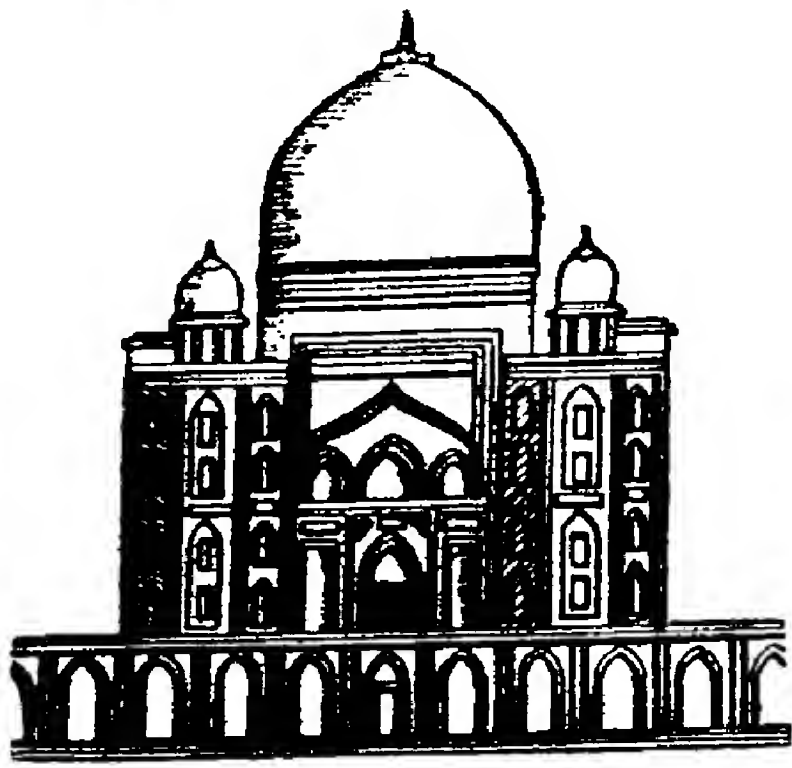


চিত্র-9.24 হিরণ-মিনার কি 'পঞ্চরঙ্গ'-র মক্‌বরা?

বস্তুর বনিয়াদ নেই; আছে সরলরেখার সমাহার। অথচ একতলার সার-সার খিসান হুমায়ুন-মক্‌বারার কথা দর্শকের স্মরণপথে এনে দেয়। মূল ইমারৎ ভূমি-ভূক্‌শায় বর্গক্ষেত্র এবং এগার-এগারং একশ-একশের বাঁধনে বাঁধা হয়েছে। চার-প্রান্তে চারটি অষ্ট-ভুজ কক্ষ অথচ কেন্দ্রস্থ সমাধিকক্ষ চতুর্ভুজ-বর্গ-ক্ষেত্র। চারটি কেন্দ্রীয় সিলানও তাজমহলী ভক্ত। এ

যেন হিন্দু-শৈলীতে হুমায়ুন-মক্‌বারার পারসিক
শিল্প-এর ভারতীয়করণ!

একে একে প্রয়াত হলেন—হাজী বেগম-সাহেবা,
ঐতিহাসিক ফৌজ, সঙ্গীতকেশরী তানসেন। তান-
সেনের মৃত্যু হল লাহোরে (1589)। মর্মান্বিত বাদশাহ,
মিঞা তানসেনজীর মরদেহ নিয়ে এলেন পঞ্জাব থেকে
শোয়ালাবির। মুসলিম দুনিয়ার মহাধার্মিক শেখ
মহম্মদ গিরাস-এর সমাধিসৌধের সম্মুখটে নির্মাণ
করালেন ছোট একটি মক্‌বারা। ছোট, কিন্তু সুন্দর—



০ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১

চিত্র—৩.২৫ আকবর রাইস খান-ই-খানান-এর মক্‌বারা,
বাস্তুশিল্প ও সম্মুখশিল্প, দিল্লী।

যেন বেহাগের একটি তান। শূন্যে দিলেন প্রিয়
কন্ঠকে, পুণ্ড্রাহী সঙ্গীত। সমাধিস্থ হল এক যুগ।
একই বছরে মৃত্যু হল রাজা টোডরমলের, আকবরের
বিশ্বাস্ত রাজস্ব-আদায় ও শাসন-ব্যবস্থার নিয়ামকের।
টোডরমল তখন বৃদ্ধ, অনুমতি চাইলেন বাদশাহর
কাছে, তিনি অকসর নিতে ইচ্ছুক। পত্রে লিখলেন,
‘দুনিয়াদারী তো অনেকদিন হল, এবার জিন্দেগির
যাকি দিন কটা আমি হরিদ্বারের গঙ্গাতীরে ঈশ্বরের

সেবা করে কাটিয়ে দিতে চাই।’

লাহোর থেকে সে পত্রে জবাবে নিরঙ্কর বাদশাহ
জ্ঞানিলেন, ‘নিপীড়িত মানুষের সেবাই তো ঈশ্বরসেবা।
আপনি আমার অমাত্য হিসাবে তো সেই মানুষেরই
সেবা করছেন—যে মানুষ সৃজন করেছেন আল্লাহ
অর্থাৎ রামজী! আপনাকে অকসর নিতে দিতে
অক্ষম।’^{২১}

সে পত্র রাজা টোডরমলের হাতে যখন পৌঁছাল
তখন তিনি নিতান্ত অসুস্থ। তবু, তখনই যাত্রা
করলেন লাহোর অভিমুখে। সেখানেই মৃত্যু হল
তার। মর্মান্বিত হলেন বাদশাহ। মোত, মোত,
মোত আর মোত! চঞ্চল হয়ে উঠলেন আকবর।
আজীবন কত কত মানুষের জন্য মক্‌বারা বানিয়ে
দিয়েছেন; কিন্তু নিজের জন্য তো কিছুই করা হয়নি!
তাহলে কোথায় শোবেন তিনি নিজে? অম্বর রাজ-
কুমারীকে পাশটিতে নিয়ে? তখনই ডেকে পাঠালেন
তার শ্যালক ভগবানদাসকে। টোডরমল নেই, মান সিং
জঙ্গী মানুষ, —শিল্প-স্থাপত্য বোঝে না; পারলে
ভগবানদাসই পারবে এ দায়িত্ব নিতে। ভগবানদাস
অম্বর মহিষীর ভ্রাতা, সেলিমের মাতুল-তথা-স্বশুর।
সেই হবে উপযুক্ত লোক। জমিটা পছন্দ করা আছে—
সেকেন্দ্রায়, আগ্রার অনতিদূরে। মক্‌বারার বাস্তু-
নকশাও মনে মনে ছকা আছে, কাজে হাত দেওয়া
হয়নি।

আহবানমাত্র কিন্তু রাজা ভগবানদাস হুজুরে
হাজির হতে পারলেন না। সংবাদবহ ফিরে এল দুঃ-
সংবাদ নিয়ে। রাজা টোডরমলকে দাহ করতে ভগবান-
দাস স্বয়ং গিয়েছিলেন শ্মশানে। সেখান থেকে ফিরে
এলেন জ্বর গায়ে। বর্তমানে শয্যাশায়ী।

বাদশাহ বললেন, তাঁকে বলে এস, একটু ভালো
হয়ে উঠলেই যেন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।
ব্যাপারটা জরুরী।

সেই বাদশাহী নির্দেশটা আর মানতে পারেননি
প্রভুভক্ত ভগবানদাস। জ্বর থেকে মুক্তি পেলেন না
আদৌ। টোডরমলের মৃত্যুর সপ্তাহ না ঘুরতেই বিদায়
নিলেন ভগবানদাস।

নাঃ! সেলিমের যুক্তিটাই ঠিক। বড় বেশি দিন
বেঁচে আছেন উনি!

লাহোর থেকে ফিরে এলেন আগ্রায়। সেই আগ্রায়,
যেখানে তরুণ জালাল একদিন এসেছিলেন হুমায়ুন-
মক্‌বারার স্থপতি মীর্জা গিয়াসকে বিদায় দিয়ে।
এসেছিলেন নিজ তত্ত্বাবধানে জীবনের প্রথম স্থাপত্য-



চিত্র 9.26 আবুল ফজল সম্রাটকে 'আকবর-নামা'-র দ্বিতীয় খণ্ড উপহার করছেন,

চিত্রকর গোবর্ধন (1602 ?)

[ডাবলিন-এর 'চেস্টার বীয়েটলি' গ্রন্থাগারের সংগ্রহশালার মূলচিত্রটি আছে ।]

কীর্তি রচনা করতে—হিন্দু-মুসলিম যৌথ স্থাপতি
রূপায়িত করতে। এয়ারও এলেন নিজ তত্ত্বাবধানে
জীবনের শেষ স্থাপত্য-কীর্তি রূপায়িত করতে :
'আকবরস্ টম্ব্—আট সিকান্দ্রা।'

আগ্রা-কিল্লা থেকে আট কিলোমিটার দূরে
সিকান্দ্রার মোদী প্রতিষ্ঠিত 'সেকেন্দ্রা' জনপদ।
সেখানেই নির্বাচন করেছেন নিজ সমাধিক্ষেত্র। অতি
প্রকাণ্ড বাগানখোদা চৌহান—হুমায়ুন-মক্‌বারার অনু-
করণে বাবুরী চাহারবাগ। কিন্তু ঐ পর্যন্তই।
বাকিটা ইন্দো-ইসলামী-শৈলীতে—পারস্যরীতিতে নয়।
বাগিচার চার প্রান্তে চারটি তোরণের আভাস ; শব্দ
দক্ষিণ দিকের দরওয়াজাটাই বাস্তবে প্রবেশ-তোরণ।
প্রতিবোধিত-মূলক নানান নকশা বানালো নানান
স্থাপতি। হঠাৎ কি-জানি কেনন করে আইডিয়াটা
মাথায় এল। দরওয়াজার মাথায় গোঁথে তুলতে হবে
চারটি মিনারিকা—যেন মুরাশ্জিন-মিনারে দাঁড়িয়ে বড়-
ইমাম-সাব দুই হাত আশ্মানের দিকে তুলে আজান
দিচ্ছেন : আল্লাহ্ হো আকবর।

তৈরী হল কাঠের মডেল। দারুণ পছন্দ হয়ে
গেল বাদশাহর। তিনি জানতেন না, ঐ অপূর্ব
প্রয়োগ-কৌশল অনুকৃত হবে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মক্‌বারায়
—তাজমহলে !

আকবর-পারিকল্পিত এই প্রবেশ-তোরণটি শ্বিতল।
সম্মুখদৃষ্টে তিনখণ্ডে বিভক্ত। দ-পাশে দুটি করে
খিলান এবং কেন্দ্রস্থলে একটিমাত্র জিল্লান উচ্চতায়
ঐ দ-পাশের খিলানদ্বয়ের যৌথ উচ্চতাকে ছাপিয়ে
গেছে। ঐ কেন্দ্রস্থ খিলানের গর্ভে আবার দুটি ক্ষুদ্র-
কার খিলান। এ সৌখের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ঐ
মিনারিকা চতুষ্টয়।

মূল সৌখটি বর্তমানে যেমন দেখছেন, আকবর যে
সে-ভাবে চিন্তা করেননি এ-কথা প্রায় নিঃসংশয়ে বলা
যায়। আকবর কী চেয়েছিলেন ? জানি না ! তবে যা
হয়েছে, তা নয়। জ্ঞান না ছকে নিশ্চয় তিনি কাছে
হাত দেননি, হরতো কাঠের মডেলও নির্মিত হয়েছিল।
যে-কারণেই হোক সেটা ভবিষ্যতে অনুসরণ করা হয়নি।
সম্মুখদৃষ্টের জিল্লান এবং চারটি বৃহদায়তন ব্যাসিট-
রান-সদৃশ অঙ্গসঙ্গি একতলা পর্যন্ত গাঁথা শেষ হতে-
না-হতেই কাজ বন্ধ করে দিতে হল। সাময়িকভাবে।
করল এদিকে শব্দ হয়ে গেছে তাঁর শেষ-জীবনের
প্রাণান্তকর ইতিহাস :

সেলিম বিদ্রোহ করে বসল !

মর্মান্বিত হলেন বাদশাহ্। তবে তিনি ছিলেন

শ্বিতধী, বিচক্ষণ মানু্য। উত্তেজিত না হয়ে একটি
পত্র রচনা করলেন সবেত ভাষায়। তরুণ বয়সে বৈরাম
বিদ্রোহ করায় যেমন তাঁকে পিতৃসম্বোধন করেছিলেন
মোসায়েম ভাষায়, এই পরিণত বয়সেও তেমনি
সেলিমকে পুত্রসম্বোধন করে বলেছিলেন ইঠকারিতায়
সামিল না হতে। সেলিমের অন্তরঙ্গ দোস্ত মহম্মদ
সরিফের হাতে পত্রখানি পাঠিয়ে দিলেন বিদ্রোহী পুত্রের
কাছে, এলাহাবাদ দূর্গে। তাকে মৌখিক নির্দেশও
দিলেন বাগম্বার—সে যেন শেখুবাবাকে বদ্বিষে-সদ্বিষে
আগ্রাতে ফেরত নিয়ে আসে। কিসের জন্য এ বিদ্রোহ ?
এ তক্ত-তাউস বৃদ্ধ তো তারই জন্য পাহারা দিয়ে বসে
আছেন।

সোরাব মোদীর 'মুঘল-এ-আজম'-এর প্রভাবমস্ত
হবার জন্য এইখানে বলে রাখা ভালো যে, সেলিমের
বিদ্রোহের সঙ্গে তার পহেলী-প্যার 'আনারকলি'-র
কোন সম্পর্ক নেই। মেহেরউল্লিসাও নয়, এ শব্দ
আশু সিংহাসন লাভের মোহ।

ফল হল না। খাজা মহম্মদ সরিফ এলাহাবাদে
পৌছাতেই শাহজাদা সেলিম বলে ওঠে, এই যে তুমি
এসে পড়েছ। তোমাকেই খুঁজছিলাম।

খাজা সরিফ অবাক হয়ে বলে, আমাকে ? কেন ?
—বাঃ ! আমি তক্ত-তাউসে উঠে বসলে তুমিই তো
হবে আমার উজীর-এ-আজম !

খাজা সরিফ একটা ঢোক গিলল। কম তাজব
কী-বাঃ ! সে হতে চলেছে উজীর-এ-আজম-উল্-
মূলক ! অগত্যা সম্রাটের পত্রটা সে জেব থেকে আদৌ
বার করল না।

আকবর বুঝলেন, এ কোন ছেলে-ছোকরার কাজ
নয়। কাকে পাঠাবেন ? মানসিংহ জাতীয় জগী
মানুষকে দিয়ে কাজ হবে না—চাই ধীর-স্থির কোন
পণ্ডিত মানু্যকে। যার পণ্ডিত্যকে শ্রদ্ধা জানাতে
বাধ্য হবে সেলিম, যতই বিদ্রোহী বেপরোয়া হোক সে।
এই সময়েই একদিন গোবর্ধন এল ঔর দরবারে।
গোবর্ধন আকবরী-জমানার শ্রেষ্ঠ হিন্দু-চিত্রকর। সে
সম্প্রতি শেষ করেছে একখানা জল-রঙে আঁকা ছবি—
ছোট্ট মিনিয়চার, 24×13.5 সেন্টিমিটার মাপের।
বিষয়বস্তু :—আব্দুল ফজল তাঁর 'আকবর-নামা'র
শ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত করে গ্রন্থখানি দরবারে পেশ কর-
ছেন (চিত্র-9.28)।

চিত্রখানি দর্শনমাত্র সম্রাট মনোস্থির করলেন। এ
কার্যের দত্ত হবার উপযুক্ত মানু্য—আব্দুল ফজল।
অসাধারণ পণ্ডিত, সর্বজনপ্রিয় ঐতিহাসিক—

বিদ্রোহী সেলিমের কাছে এলাহাবাদ কিল্লায় এই পণ্ডিত মানদুর্ষাট নিরস্ত হাঞ্জির হলে সেলিম ভুল বুঝবে না। কিন্তু আব্দুল ফজল তখন রাজধানীতে নেই; ছিলেন দাক্ষিণাত্যে। তৎক্ষণাৎ প্রভুগাম্ভীর্য সংবাদবহ ছুটল সেখান থেকে তাঁকে নিয়ে আসতে। সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র প্রভুভক্ত আব্দুল ফজল রওনা দিলেন আগ্রার দিকে। দর্ভাগ্য তাঁর, এবং ভারতীতহাসের,— রাজধানীতে পৌঁছাতে পারলেন না।

সেলিমের খোকা-বিদ্রোহের এইটেই সব চেয়ে বড় অপকীর্তি। আব্দুল ফজলকে সম্রাট তলব করেছেন খবর পেয়ে সেলিম তাঁর গুপ্তহত্যার আয়োজন করল। বন্দেল্লা সর্দার বীর সিং আগ্রার পথে হত্যা করল আব্দুল ফজলকে। ইতিহাসকার বলছেন, ব্যর্থনামা বীর সিং ঐ ইতিহাসকার মহাপণ্ডিতের কীর্তিত মন্ডুটা পাঠিয়ে দিয়েছিল তার প্রভুর কাছে। আর অমানুষ সেলিম আব্দুল ফজলের ছিন্নশিরটি ফেলে দিতে বলেছিল আস্তাকুড়ে।

তানসেনের মৃত্যুতে সমাপ্ত হয়েছিল ললিতকলার একটি বিশেষ অধ্যায়—সেটা স্বাভাবিক অবসান; আব্দুল ফজলকে হত্যা করে সেলিম স্বহস্তে টেনে দিল আর একটি অধ্যায়ের স্ববানিকা : ইতিহাস চর্চা!

মুগল গৌরব-রবি পশ্চিমে ঢলতে শুরুর করেছেন।

দুরন্ত ক্রোধে জ্বলে উঠলেন আকবর-বাদশাহ্। হুকুম দিলেন : সৈন্য সাজাও। আমি স্বয়ং যাব এলাহাবাদ। বিদ্রোহ দমন করতে।

সংবাদ পেয়ে ছুটে এলেন অতিবৃদ্ধা মরিয়াম মকানী—আকবরের গর্ভধারিণী জননী। পুত্রের হাত দুটি ধরে বললেন, বেটা! উস্কো মাফি কিয়া যায়। আমি তার হয়ে মাফ চাইছি।

অগ্নিগর্ভ আশ্বেয়গিরির মত নিশ্চল দাঁড়িয়ে ছিলেন আকবর। শান্ত সমাহিত কণ্ঠে বললেন, তুমিই আমাকে মাফ কর, আম্মাজান! তা হয় না। বিস্মিতা হামিদা বান্দু বলেন, আমার কথা রাখবি না? আমি... আমি না দশমাস তোকে গর্ভে ধারণ করেছি?

আকবর বললেন, মা! তুমি আমাকে তোমার জঠরে লালন করেছ। সাজা বাৎ। কিন্তু ডেবে দেখ—যাঁর বৃকের দুষ্ট খেয়ে আমি মানদুষ্ট, তাঁকেও আমি রেহাই দিইনি। আখম আমার কতবারত কর্মচারীকে খুন করেছিল। সেলিমও ঠিক তাই করেছে। এখানে আমি কারও পিতা নই, কারও পুত্রও নই।

অতিবৃদ্ধা বান্দু বেগমের যেন মনে হল তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান ঐ বৃদ্ধটা সম্পূর্ণ অপরিচিত।

অক্ষুটে বললেন, কারও পিতা নয়, কারও পুত্র নয়! তবে তুমি কী?

: হক্-হাক্কাতের জাঁঞ্জিরবন্দ অশ্ব-বধির এক নফর।

ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে গেল আকবর-জননীর মূঠ।

বাদশাহী সৈন্য অগ্রসর হল স্থলপথে। আকবর রওনা দিলেন ময়ূরপাখি বজ্রায়। কখনোবন্ধে। সেলিমের কিস্মৎ প্রসন্ন—চড়ায় আটকে গেল বজ্রা। হাতী দিয়ে তাকে টেনে জলে নামাতে না নামাতে নামল প্রচণ্ড বর্ষা—তিন দিন চসল অক্লান্ত বর্ষা। মাঝ-মাল্লারা বজ্রা চালাতে সাহস গেল না—দিগ্দিগন্ত দেখা যায় না কিছুই। ইতিমধ্যে আগ্রা-কিল্লা থেকে ছুটে এল কদমাস্ত এক অশ্বারোহী সংবাদবহ। দঃসংবাদ এনেছে সে—মরিয়াম মকানী নাকি মৃত্যুশয্যায় : শেষ দেখা দেখতে চান পুত্রকে! আকবর প্রথমটা বিশ্বাস করেননি। ভেবেছিলেন, তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এ বৃদ্ধা এক হারোমি ফিকির। কিন্তু পত্নলোভিকা স্বয়ং গুলবদন বেগম—অশীতিপর্যায় ধার্মিক মহিলা। তিনি মিছে কথা লিখবার লোক নন।

আকবর ফিরে এলেন আগ্রায়।

তার কদিন পরেই হামিদা বান্দু বেগমের মরদেহ নীত হল দিল্লীতে—হুমায়ূন-মক্‌বরার তাঁর চিহ্নিত সন্দোখ-এর নিচে শব্দিয়ে দেওয়া হল তাঁকে।

আকবরের মাতৃভক্তি আদর্শম্বানীর। তামাম জিন্দগিতে তিনি মাত্র দুবার মাতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করেছিলেন বলে লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর জীবনীকার। একটির কথা এইমাত্র বলেছি, সেটি লিখে যাবার ফুরসৎ পাননি আব্দুল ফজল; কারণ তিনি নিজেরই পরোক্ষ-ভাবে ছিলেন সেই ঘটনার মূলে। কিন্তু পূর্ববর্তী ঘটনাটি আব্দুল ফজল সবিস্তারে লিখে গেছেন :

সেবার আগ্রা-কিল্লায় সংবাদ এল পত্নগীজ বোম্বেটের দল নাকি পবিত্র কুরাণ গ্রন্থটিকে একটি কুকুরের গলায় ঝুলিয়ে দমন শহরের পথে পথে দেখিয়ে নিয়ে বেরিয়েছে। শব্দে কিস্ত হয়ে গেলেন হামিদা বান্দু বেগম। এর প্রতিশোধ চাই! পুত্রকে আদেশ করলেন একটি গাধার গলায় একশত বাইবেল গ্রন্থ লাটকিয়ে দিয়ে আগ্রা শহরে কোড়ুক বাঘার আয়োজন করতে। সম্মত হতে পারেননি নিরস্ত্র জালাল-উদ্দীন আকবর। বলেছিলেন, মা, আমি জেনেছি—বাইবেল একটি মহান গ্রন্থ। কতকগুলো অশিক্ষিত পত্নগীজ বোম্বেটের অবিম্ভাব্যকারিতার অপরাধে

আমি সেই পবিত্র গ্রন্থকে অবমাননা করতে পারি না।
সে যাই হোক, নিতান্ত ঘটনাচক্রে—যেন প্রাণ দিয়ে
হামিদা বান্দু বেগম জ্ঞান বাঁচালেন তাঁর নাতির।

পিতামহীর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সেলিম নিজেই চলে
এল আগ্রায়। প্রকাশ্য দরবারে—দেওয়ান-ই-আমের
অলিম্বে আসীন বাদশার চরণপ্রান্তে প্রণত হয়ে ক্ষমা
ভিক্ষা চাইল। অসাধারণ সংঘম বাদশাহ্ আকবরের।
সর্বসম্মুখে কোনোরকম উত্তেজনার বহিঃপ্রকাশ হল না।
হাজার হোক, ঐ অপদার্থ পুত্রকেই তো বসিয়ে দিয়ে
ক্ষেতে হবে হিন্দুস্থানের তক্ত-তাউসে? মুরাদ ও দানি-
য়েজ তার পুত্রকেই মারা গেছে—অতিরিক্ত মদ্যপান ও
অস্বাস্থ্যময়ী জীবনযাপন করায়। অন্তঃপুরে এসে আকবর
আচম্কা ছেলের কাঁধ ধরে ঘুরে দাঁড়ালেন। পিতা-
পুত্র দুজনে মদ্যোন্মত্ত। একেবারে আচম্কা
আকবর ঐ অতকড় জোয়ান ছেলের গালে কষিয়ে দিলেন
এক বাদশাহী থাম্পড়। উল্টে পড়ে গেল সেলিম—
ঠিক আশ্রম খাঁর মতো।

কাঁধের কাছে খাম্চে ধরে আবার দাঁড় করিয়ে
দিলেন। কলেন, মনে থাকবে?

সেলিম ততক্ষণে বাকশক্তি হারিয়েছে।

হিড় হিড় করে ওকে টেনে নিয়ে গেলেন
গোসলখানায়। একজন হাকিম, একজন নাপিত ও
একজন খিদমদগারের জিম্মায় ঐ ঘরে আবদ্ধ করলেন
শাহজাদাকে। বিস্মৃত প্রহরীকে ডেকে কলেন, দশ
দিন কারাগার! এর মধ্যে কারও সঙ্গে যেন দেখা
সাক্ষাৎ করতে না পারে। খেতে চাইলে খেতে দিও—
কিন্তু খবদার! এই দেউরার ভিতর এক ফোঁটা মদ
বা এক দানা আফিং ঢুকেছে খবর পেলে তোমাদের
তিনজনকেই হাতীর পায়ের তলায় পিষে ফেলব!

সেকেন্দার মক্কার বানানোর কাজ কিন্তু অগ্রসর
হচ্ছে না। কাজ বন্ধুত্ব বন্ধ আছে। দারোদা-ই-
ইমারুৎ প্রতিদিনই আসে সম্রাটের নির্দেশ নিতে, প্রতি-
দিনই কিরে যায়। বাদশা ব্যস্ত। দেখা হয় না।
তা তো হবেই। ওদিকে যে ঘনিষ্ঠে উঠেছে নানান
অশান্তি। বাদশা অসুস্থ আর সিংহাসন নিয়ে
কুকুরে-লড়াই শুরু হয়ে গেছে সেলিম আর তার জ্যেষ্ঠ
পুত্র খসরৌর। অমাত্যদের একদল এদিকে, একদল
ওদিকে মদ্য জুগিয়ে চলেছে। সুযোগ-সম্মানী খুদরাম
শুধু প্রহর গুলছে।

দুঃখ অনুশোচনার শেষ শব্দ পাঠলেন জালাল-
উদ্দীন বাদশা!

কঠিন রোগ রক্ত আমাশয়।

ওবী-ই-হাজিক হামিক আলি গিল্লি চেণ্ডার
দুটি করেননি। কিন্তু পারলেন না।

সেলিম এসে দাঁড়ালেন মৃত্যুপথযাত্রী পিতার
শিয়রে।

আকবরের প্রায় নির্মীলিত চোখ-জোড়া উজ্জ্বল
হয়ে উঠল। দেহরক্ষীকে বললেন, আমার তাজটা নিয়ে
এস, পরিয়ে দাও ওর মাথায়। আমার রাজ-পরিচ্ছদ
পরিয়ে দাও ওর অঙ্গে। যাবার আগে দ-চোখ ভরে
একবার দেখে যাই—সেখদাবাকে কেমন মানিয়েছে।

সম্রাটের শেষ আদেশ পালিত হল। অর্ধশয়ান
আকবর অতি কষ্টে তাঁর কোমরবন্ধ থেকে টেনে বার
করলেন গজদন্তের মূঠ-ওয়াল ম্বর্ণখচিত একটি বাগ-
দাদী ছুরিকা। তুলে দিলেন তাঁর সেখদাবার হাতে।
এটি তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন অর্ধ শতাব্দী
পূর্বে হুমায়ূনের কাছ থেকে। অক্ষুণ্ণে বললেন,
সেখদাবা, যে অধিকার তোমাকে দিয়ে গেলাম, দেখ,
তাঁর অমর্যাদা যেন না হয়।

পরম শান্তিতে চোখ দুটি বন্ধে গেল শাহ-য়েন-
শাহ জালালউদ্দীন আকবরের।

সাল-গজস্তার সাল-তামামি তামাম শব্দ।

আমি ঐতিহাসিক নই। আকবরের যে আলেখ্যটি
আমি এঁকেছি তাতে আপনাদের মনে হতে পারে
আকবর ছিলেন আদর্শ-পুরুষ—আদর্শ সম্রাট! হয়তো
ঠিক মতো বলতে পারিনি—অন্তত সে-কথা আমি
বলতে চাইনি। আমি শুধু বলতে চেয়েছি, আকবর
ছিলেন আদর্শ আর্কিটেক্ট! মানুষ হিসাবে তিনি
দোষে-গুণে মেশানো। জাহাঙ্গীরের চরিত্রে যে নিষ্ঠু-
রতার বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখব, হয়তো তার আদিম
উৎস জাহাঙ্গীরের পিতৃরক্ত! বাদশাহী খেলাজে আক-
বর এমন অনেক কিছু করেছেন, যাতে তাঁকে আদর্শ
ভারত-সম্রাট বলতে বাধে। তা যদি তিনি হতেন তাহলে
'গুংগা-মহল' পরীক্ষার অব্যবহিত পরে তিনি ঐ দর্শটি
শিশুকে মৃত্যু দিতেন—তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতেন;
জ্ঞান-পিপাসুর পক্ষে স্বাভাবিক হত, পরীক্ষাটা চালিয়ে
যাওয়া এবং দেখা, পরবর্তী পাঁচ-সাত বছরে নিরন্তর
প্রচেষ্টায় মৃক-বধির শিশুদের আবার স্বাভাবিক করে
তোলা যায় কি না। তা তিনি দেখেননি। আকবরের
মৃত্যুর পর ঐ গুংগা-মহল থেকে বাসকদের উদ্ধার
করা হয়, তখন তাদের যথেষ্ট বয়স—অথচ সকলেই
মৃক। আকবর হাতীর আগু লড়াই দেখতে ভাল-

বাসতেন। সে-বড় নশংস দৃশ্য! কিন্তু আমি তো মানুষ-আকবরকে যাচাই করতে চাইনি—চেয়েছিলাম স্থাপত্য-প্রেমিক আকবরের মূল্যায়ন। নিঃসন্দেহে তিনি তামাম মৃগল-জমানার শ্রেষ্ঠ আর্কিটেক্ট! জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি স্থাপত্যে নানান জাতের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গেছেন এবং সাফল্য লাভ করেছেন প্রায় প্রতিবারেই।

শেষ পরীক্ষাটা অবশ্য সমাপ্ত করে যেতে পারেননি।

আকবরের মরদেহ যখন সেকেন্দ্রার অসমাপ্ত মক্‌বারায় সমাধিস্থ করতে আনা হল, তখন সেই ইমারতের মর্মভেদী আত্ননাদটা কেউ শুনতে পারিনি!

দক্ষিণ-তোরণটা সদ্যসমাপ্ত, নির্মিত হয়েছে মূল ইমারতের প্রধান লিয়ান। আকবরী নির্দেশে তাতে উৎকীর্ণ করা হয়েছে ক্যালিগ্রাফির কাজ। তাতে লেখা হয়েছে : ‘আল্লা-হো-আকবর’ এবং ‘জাল্‌লে-জালাল্‌হু’—দীন-ইলাহির শ্বেত পদ্যকার। আশ্চর্য, উৎকীর্ণ হয়নি ইসজামের সেই শাস্বত-বাণী : ‘লা (নাই) ইলাহা (প্রভু) ইল্লা লাহা (প্রভু ভিন্ন) ; নূর-মহম্মদ রসূল-আল্লাহ্’ (জ্যোতির্ময় মহম্মদ সেই আল্লাহ্-র প্রেরিত)।

প্রবেশ-তোরণের ক্যালিগ্রাফিতে সর্বমোট ছত্রিশটি বাণী—তার প্রথম তেইশটি ঘোষণা করেছে সেই মক্‌বারায় চিরশয়ান ব্যক্তিটির জাগতিক পরিচয়, তাঁর জীবনকথা। বাকি তেরটি বাণী ‘শাহী শরিয়তের

তারিকে’ (মহম্মদ-উক্ত ধর্মনির্দেশে) সীমিত নয় ; বিশ্ব-প্রেম-মৈত্রীর কথা, দর্শনের কথা, মর্জির কথা, ভাবের কথা। তাতে আছে সেই সব ইঙ্গিত যা শহীদ পরগম্বর হজরৎ মহম্মদই দেননি, দিয়ে গেছেন আরও অনেক অনেক মহাপুরুষ : বুদ্ধ, জরথুষ্ট্র, কৰ্ম্মান মহাবীর, যীশু, এমনকি আচার্য শঙ্করের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত উপনিষদের বাণী। শেষ শ্লোকটা তো নিতান্ত অশ্বত-বেদান্তের নির্যাস :

‘স্বানিগ্‌ হামেগা জহা-শাদ বাদ

আজ্‌ আলগ্‌ কোয়াদাস আবাদ বাদ।*

ভাষান্তরে বার মূলকথা পাওয়া যাবে ঐশোপ-নিষদে :

‘অগ্নে নয় সূপথা রায়ে অগ্ন্যান

বিশ্বানি দেব বয়দানি বিশ্বান্‌।

যদ্বোধস্মজ্জদুহরাগমেনো

ভূয়িষ্ঠাং তে নম-উক্তিং বিধেম ॥†

□

* তাঁর (কবরস্থ ব্যক্তির) জীবাস্তা সেই কিস্বস্তার পরমাঙ্গার বিলীন হয়ে থাক। সব মালিন্য দহন করে তাঁর উপস্থিতিতে দ্যালোক উজ্জ্বল হয়ে উঠুক ॥

† ‘হে অগ্নি! তুমি আমাদেরকে সূপথে লইয়া যাও। হে দেব! তুমি আমাদের সকল ক্রমই জান ; আমাদের অপকর্ম্মী পাপ-সমূহ বিদূরিত কর। আমরা তোমাকে কবরস্থ প্রদান করিতেছি।’

জাহাঙ্গীর

ঘটনা	সময়কাল	ঘটনা	সময়কাল
সেলিমের জন্ম	.. 1569	সেকেন্দ্রায় আকবর-সমাধি সমাপ্ত	.. 1612
মেহেরউল্লিসার জন্ম	.. 1576	আনারকলির সমাধি নির্মাণ	.. 1615
সেলিম ও মানসিংহের (ভগবানদাসের কন্যা) বিবাহ	.. 1585	খস্রোকে হত্যা	.. 1622
সেলিম ও মানমতীর (উমরসিংহের কন্যা) বিবাহ	.. 1586	জাহাঙ্গীর-জননীর সমাধি-নির্মাণ (সেকেন্দ্রায়)	.. 1623
মেহেরউল্লিসার প্রথম বিবাহ (শের আফকন)	.. 1592	নুরজাহাঁ কতৃক ইতমদ্-উদ্-দৌলা	
খস্রোর জন্ম (মাতা মানমতী)	.. 1592	নির্মাণ	.. 1624-28
সেলিমের অভিষেক	.. 1605	খস্রোর বিদ্রোহ	.. 1624-25
শের আফকনকে হত্যা	.. 1607	জাহাঙ্গীরের মৃত্যু	.. 1627
নুরজাহাঁকে বিবাহ	.. 1611	জাহাঙ্গীর-সমাধি নির্মাণশেষে নুরজাহাঁর মৃত্যু	.. 1645

জাহাঙ্গীরের আমলে নির্মিত মৃগল-স্থাপত্যের মূল্যায়নে ঐ বাদশাহ-র জীবনী বিস্তারিত আলোচনা করা নিম্প্রয়োজন। স্থাপত্য-বিষয়ে তিনি ছিলেন উদাসীন। ওটা বৃক্কে না। তবু তাঁর আমলে নির্মিত দুটি স্থাপত্য-কীর্তি আমাদের খুঁটিয়ে দেখতে হবে : আকবরের সমাধি এবং ইতমদ্-উদ্-দৌলা।

জাহাঙ্গীর ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠুর। যে অপরাধে তিনি তাঁর পিতার হাতে একটি চড় খেয়েছিলেন এবং দশদিনের জন্য সংকট জীবন-স্বাপনে বাধ্য হয়েছিলেন, ঠিক সেই অপরাধে তিনি পুত্রকে অন্ধ করে দেন ; এবং মরণান্তিক বস্ত্রা দেবার পর। বিদ্রোহী পুত্র খস্রোর অনুচরদের যে নৃশংস-পদ্ধতিতে তিনি হত্যা করেছেন তাতে তাঁকে 'স্যাডিস্ট' ছাড়া আর কিছুর বলা যায় না। একটি মৃত ঘাঁড় আর একটি মৃত গাধার ছাল ছাড়িয়ে তান ভিতর তাঁর কিদ্রাহী পুত্রের দুই সেনাপতিকে ঢুকিয়ে দিয়ে সেসাই করে দিয়েছিলেন। তারপর শোভাযাত্রা করে সেই বীভৎস-দৃশ্য আগ্রা শহরের মানুষজনকে দেখিয়েছিলেন। কীভাবে রুম্মশ্বাস দুটি মানুষ কাটা-মাংসের গন্ধে আকর্ষণ উৎকট বিবাক্ত বাতাসে জীবনের শেষ নিশ্বাস নিতে নিতে মৃত্যু বরণ করছে ! খস্রোর সাতশত অনুচরকে তিনি শুলে দিয়েছিলেন। দুই সারি শূলবিন্ধ মৃত্যু সহকর্মীর মাঝ-

খান দিয়ে খস্রোকে শোভাযাত্রা করে যেতে হয়েছিল দৃষ্টিশক্তি খোয়াবার পূর্বে। বন্ধুদের যৌথমৃত্যু দর্শন করানোর পর সম্রাটের আদেশে তাকে অন্ধ করে দেওয়া হয় ! পুত্রের প্রতি পিতার এ নিষ্ঠুরতা ইতিহাসে দল্ভ !

দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষের—জাহাঙ্গীর পুত্র খস্রো এবং শাহজাহাঁ-তনয় দারাশুকো হিন্দুস্থানের তক্ত-তাউসে আসীন হননি। হলে, হয়তো আকবরের স্বপ্ন সফল হত, এবং মৃগল গোরবসূর্য এত দ্রুত অস্তমিত হত না।

শের আফকনকে হত্যা, তার বেগমকে মৃগল-হারেমে নিয়ে আসা এবং বিবাহ করার পিছনেও দীর্ঘ ইতিহাস। প্রচলিত কাহিনী বলে, সেলিম মেহেরউল্লিসাকে কুমারী অবস্থায় দেখেছিলেন, আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং বিবাহে আগ্রহী হয়েছিলেন। আকবর সম্মত হননি, কারণ বাদশাহ্ জানতেন শের আফকনের সঙ্গে ঐ কুমারী কন্যার বিবাহ ইতিপূর্বেই স্থিরীকৃত হয়েছে। মেহেরউল্লিসার পিতা ও ভ্রাতা যথাক্রমে মিজ্রা গিয়াস উদ্দিন মদহুম্মদ বেগ এবং আসফ খাঁ সে-আমসেই ছিলেন আকবরের রাজসভার দুই বিশিষ্ট অমাত্য। আকবরের জীবিতকালে সেলিম কোনো উচ্চবাচ্য করেনি ; কিন্তু মসনদে উঠে বসার মাত্র দু-

বছরের মধ্যেই সে শের আফকনকে হত্যা করায় এবং মেহেরকে নিজের হারেমজাত করে।

অনেক ঐতিহাসিকের মতে এসব গল্পকথা। কিন্তু কয়েকটি সঙ্গত প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তরও তাঁরা দিতে পারেননি।

এক : শের আফকন ছিলেন বর্ধমানের জায়গীরদার। তাঁর হত্যার ঘটনা অত্যন্ত রহস্যজনক। জাহাঙ্গীর নিয়োজিত সুবেদার কুৎবউদ্দীন বাদশাহী নির্দেশে একটি তদন্ত করতে বর্ধমানে আসে এবং শেরকে ডেকে পাঠায়। ইতিহাস বলছে, এই তদন্তে কুৎবের শিবিরে শের উপস্থিত হওয়ায় বিনা প্ররোচনায় কুৎবের নির্দেশে একাধিক ঘাতক শেরকে বোধ আক্রমণে নিহত করে। শের আফকন বিদ্রোহের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন এমন একটি ইঙ্গিত কেউ কেউ দিয়েছেন—সেটা তদন্ত করতেই নাকি সুবেদার কুৎব-এর আগমন। তাহলে অভিযন্ত্রের উপস্থিতিমাত্র কেন কুৎবের নির্দেশে চার-পাঁচজন রক্ষী শেরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে হত্যা করবে? তদন্তকারী অফিসারের এ-জাতীয় আচরণের একটি ব্যাখ্যাই বোধহয় সম্ভবপর : সেটাই ছিল বাদশাহী নির্দেশ। প্রকাশ্যে না হলেও, গোপনে। না হলে, এ অপরাধে পরে কুৎবের গদ্যনা যেত ; অন্তত বিচার হত। আরও লক্ষণীয়, শেরের 'ষড়যন্ত্র'টা যখন অপ্রতিষ্ঠিত, অনুমান-নিষ্ঠার, তখন বাদশাহের এ-জাতীয় গোপন নির্দেশের হেতুও একটিই হতে পারে : মেহেরউল্লিসাকে দখল করা!

দুই : যদি ধরে নেওয়া হয় যে, বাদশাহী গোপন নির্দেশে এই হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়নি, অর্থাৎ কুৎবের অবিম্ভ্যকারিতা, ব্যক্তিগত আক্রোশ বা অন্য কোনও কারণে এ দৃষ্টান্ত ঘটতে থাকবে এবং জাহাঙ্গীর তাকে ক্ষমা করলেন, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই আমরা আশা করতে পারতাম নিহত জায়গীরদারের বিধবা সসম্মানে তার পিতার আলয়ে নীত হবে। অথচ তা হল না! মেহেরের পিতা মির্জা গিয়াস্ ও দ্রাভা আসফ খাঁ দুজনেই অত্যন্ত সম্মানিত অমাত্য : তাঁদের অর্ধাভাব নেই, কন্যার প্রতি কোন কারণে মির্জা গিয়াস্ বিরূপ ছিলেন না। তাহলে সেই বিধবা কন্যাকে কেন মির্জা গিয়াস্ নিজ আশ্রয়ে নিয়ে আসতে পারলেন না?

তিন : ইতিহাস আরও বলে, মৃগল হারেমে এসে পরো চার বছর মেহেরউল্লিসা সম্রাটকে বিবাহ করতে স্বীকৃত হন। বারে বারে সে জাহাঙ্গীরের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। এজন্য জাহাঙ্গীর নানা-

ভাবে মেহেরকে মানসিকভাবে পীড়নও করেন। এ-পক্ষে একটিই সিদ্ধান্ত আসা যায় : মেহেরউল্লিসা জাহাঙ্গীরকে স্বামীহস্তা বলে চিহ্নিত করেছিল। না হলে দীর্ঘ চার বছর সে এভাবে জাহাঙ্গীরকে প্রত্যাখ্যান করত না। অপরপক্ষে, বাস্তবে বন্দিনী না হলে সে মৃগল হারেমে ভাগ করে পিতার আলয়ে চলে যেত।

সুতরাং মহাপণ্ডিত ঐতিহাসিকেরা যেকোনো কল্পনা, কিছুতেই মেনে নিতে পারা যায় না যে, শের আফকনের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জাহাঙ্গীরের সম্পর্ক নেই। ভাষান্তরে শের আফকনের দুর্ভাগ্যের মূল হেতু তার বেগমের প্রাক-বিবাহ জীবনের ঘটনা!

জাহাঙ্গীর দিনপঞ্জিকা লিখতেন। তাতে দেখছি, খুর্রম (ভবিষ্যৎ শাহজাহাঁ) তার দাদা অখ খসরোকে হত্যা করেছে জানতে পেরে জাহাঙ্গীর বিন্দু-মাত্র বিচলিত হননি। খসরোর মৃত্যুর তারিখটুকু শূন্য দিনপঞ্জিকায় উল্লিখিত হয়েছে।

মদ ও মোহোমানদের প্রতি জাহাঙ্গীরের আসক্তি প্রায় কিংবদন্তীর পর্যায়ে। আশ্রা-কিল্লায় জাহাঙ্গীরী-মহলের সম্মুখে রাখা একটা প্রকাণ্ড পাথরের চৌকিটা দেখিলে গাইডরা আজও বলে, সেটাকে মদিরায় পুঁথি করে জাহাঙ্গীর নাকি আকণ্ঠ ভুবে থাকতেন! হয়তো কথাটা বিশ্বাস্য নয়, কিন্তু রাজকাণ্ডের যাবতীয় দায়দায়িত্ব নুরজাহাঁর উপর ন্যস্ত করে তিনি যে মদিরা ও অহিফেনের নেশায় বন্দ হয়ে পড়ে থাকতেন এটা ইতিহাস-স্বীকৃতিই শূন্য নয়, তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে।

গৃহের মধ্যে মিনিয়চার মৃগল-পেন্টিংস্ জিনিসটা তিনি ভালবাসতেন। ওটা সত্যি বুদ্ধতেন।

জাহাঙ্গীরী-জমানায় প্রথম স্থাপত্য-কীর্তি—আকবরের অসমাপ্ত সমাধিসৌধ সম্পূর্ণ করা। এটি একটি বিতর্কিত বিষয়। বিভিন্ন পণ্ডিত এ-বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। অনেকে এ-স্থাপত্যের অবি-মিশ্র প্রশংসাও করেছেন। আমরা তাঁদের সঙ্গে একমত হতে পারছি না। যেটুকু বিষয়ে প্রায় সকলে একমত প্রথমে হাইপোসিস্-রূপে তা দাঁখিল করা যাক :

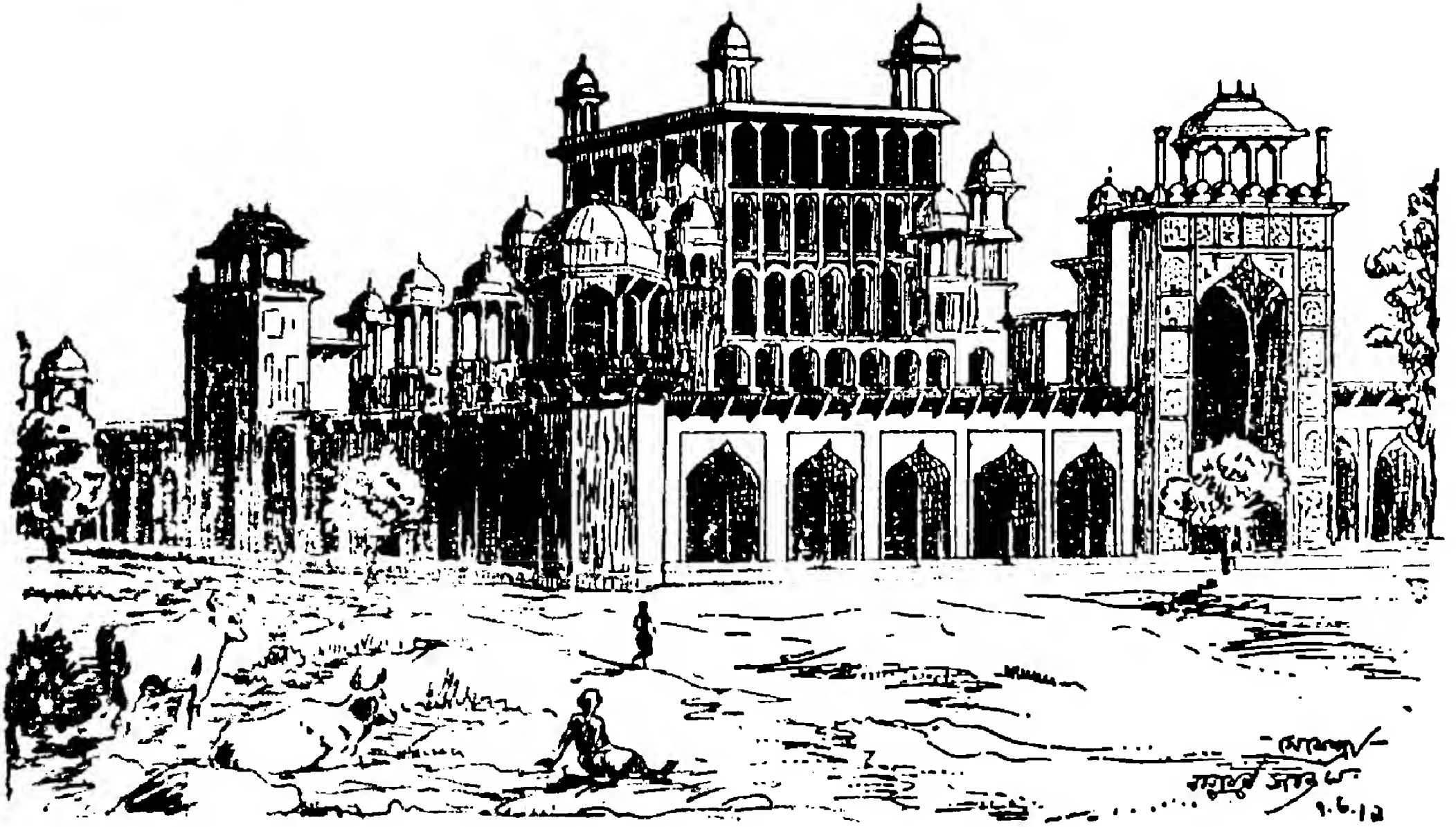
আকবরের সমাধি, সেকেন্দ্রা : এ-ইমারতের মূল প্ল্যানিং যে আকবর-বাদশাহ্-র এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তিনি কাজ শুরু করেছিলেন, কিন্তু শেষ করে যেতে পারেননি। এটা ঐতিহাসিক সত্য। বাকিটা শেষ করেন জাহাঙ্গীর 1605 থেকে 1612-র বাকিটা শেষ করেন জাহাঙ্গীর 1605 থেকে 1612-র ভিতর। প্রশ্ন হচ্ছে দুটি। প্রথমতঃ কতটুকু আক-

ধরী-জমানার সমাপ্ত? দ্বিতীয়তঃ, বাকি অংশের কতটা আকবরী পরিকল্পনা-মোতাবেক (চিত্র-10.1)।

আকবর বাগিচার ভূমি-নকশা (লে-আউট) সমাপ্ত করেন, দক্ষিণ-তোরণ নিশ্চয়ই শেষ করে যান। অপর তিনটি তোরণ-প্রতিম ইমারৎও খুব সম্ভবত তাঁর আমলে নির্মিত। মূল সমাধিমন্দিরের একতলাও তাঁর তৈরী। বাকিটা জাহাঙ্গীরী-জমানায়।

বিতর্কিত দ্বিতীয় প্রশ্নটা আরও জটিল : মূল পরিকল্পনা জাহাঙ্গীর কতদূর অনুসরণ করেছেন? এ নিয়ে পূর্বসূরী স্থপতি-সমালোচকেরা খুব বেশি বিচার করেনি। যতদূর জ্ঞান, এ দৃষ্টিকোণ থেকে

কিন্তু প্রাথমিক পরিকল্পনা যার, শেষ দিকের সমাপ্ত ইমারৎ তো তাঁর স্বাক্ষর বহন করে না? সম্ভবতঃ পিতৃদেহের পরিকল্পনা এতই বৃহৎ ও ব্যয়বহুল ছিল যে, তা অনুসরণ করবার মতো হিম্মৎ, মানসিকতা ও অর্থবসায় জাহাঙ্গীরের ছিল না। বাবুর-বাদশাহ্ মৃত্যুশয্যা পুত্রের প্রতি যে আদেশ করেছিলেন তা হুমায়ূন মেনেছেন জীবন দিয়ে। আর মৃত্যুশয্যা আকবর-বাদশাহ্ পুত্রের প্রতি যে আদেশ করেছিলেন জাহাঙ্গীর তা মানলেন আড়ম্বর দিয়ে। মসনদে উঠে তিনি আত্ম-কিল্লা থেকে যমুনা-তক্ বদলিয়ে দিলেন একটি ধাতব-শৃংখলে অসংখ্য ঘণ্টা ; ঘোষণা করলেন :



চিত্র-10.1 সেকেন্দার আকবরের সমাধি (স্কেচ)।

এই সৌধের বিশ্লেষণ আরদৌ করা হয়নি। কিন্তু প্রশ্নটা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। কারণ গোটা ইমারতে একটা বিসদৃশ স্থাপত্য-বৈপরীত্য বিদ্যমান।

সম্পূর্ণ ইমারতের নকশা ও নির্দেশ-সম্বিত কাগজপত্র এবং সম্ভবত কাঠের তৈরী মিনিয়চার-মডেল নিশ্চয়ই হস্তগত হয়েছিল জাহাঙ্গীরের। কিন্তু সেভাবে ইমারৎটি যে শেষ হয়নি এ প্রায় নিঃসন্দেহে ধরে নেওয়া চলে। আকবরই যারা গেছেন কিন্তু তাঁর স্থপতি ও নকশাবিশেষরা নিশ্চয়ই বহাল তবিয়তে হাজির ছিল। তাহলে জাহাঙ্গীর নিজের বৃদ্ধি খাটাতে গেলেন কেন? নিজের বৃদ্ধি? না-ও হতে পারে।

যে-কোন প্রজা ঐ ধাতব ঘণ্টায় নিনাদ তুলে সর্বাচার দাবী করতে পারবে। তদানীন্তন ভারতবাসীর স্কেন্দেও একটার বেশি মাথা ছিল না। ফলে, তারা ঘণ্টা বাজায়নি, নির্বিচারে অনশনাক্রান্ত প্রজার দল খাজনা দিয়েছে, নজরানা জুগিয়েছে—জাহাঙ্গীরের নিদ্রায় তারা ব্যাঘাত বটায়নি।

আমাব বিশ্বাস : 1605 সালের পর স্থপতি ও কারিগরের বদল হয়েছিল। শিল্পী বদল না হলে নিচের তলা এবং উপর তলায় দৃষ্টিভঙ্গির এতটা পার্থক্য হত না। এতটা বৈপরীত্যের অর্থ : সম্ভবত জাহাঙ্গীর নিজ বৃদ্ধি বিবেচনামতো দায়সারাভাবে কাজ সেরে

পিতৃশ্রম থেকে মৃত্যু হতে চান। তাই এ স্থাপত্য-কীর্তির নিম্নাংশে ও উর্ধ্বাংশে ফারাক আসমান-জমীন! আর তাই আজ এই সৌধের সম্মুখে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে ভাবতে থাকি—ঐ শীর্ণকায় স্তম্ভ-শোভিত বামনাকৃতি 'সুপারস্ট্রাকচার'র জন্য এত সুদৃঢ় ভিত আর বনিয়াদ কেন? আর সবার উপর প্রশ্ন : ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যের আবশ্যিক অঙ্গ গম্বুজটা কোথায় হারিয়ে গেল?

তাই বলি : আকবর বানিয়েছেন একতলা (1598-1604) এবং জাহাঙ্গীর বার্ক চার তলা (1605-1612)। সর্বোচ্চতলটি সাদা মর্মরের; সেখানে জালিকাজের আধিক্য। প্রাচীরের চার প্রান্তে চারটি ছতী—সেগর্দল ফতেপুর-সিক্রির দেওয়ান-ই-খাশের অনুসরণে। নিচের তিনটি তলায় সারি সারি সরু সরু স্তম্ভ, যার জন্য নিম্নাংশের দৃঢ় বনিয়াদ নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন। আর নিচেরকার দৃষ্টি তলাতেই আছে সারবন্দী ছতী। বেশ বোঝা যায়, মজতবা আলী-সাহেব বর্ণিত 'আর্কি-টেক্টোনিক মাহিমা' এখানে এসে হাজির হয়েছিল সৌধ নির্মাণের প্রথম পর্যায়ে; আর তারপর কখন-জানি আদাব জানিয়ে নিঃশব্দ চরণে সে নেপথ্যে সরে গেছে!

প্রশ্ন হচ্ছে, আকবর জীবিত থাকলে কী-ভাবে সেই মাহিমাকে এই স্থাপত্য-কীর্তিতে শাস্বত আসনে অধিষ্ঠিত করতেন? সেটা আন্দাজ করা প্রায় অসম্ভব। দেখাছি, ফাগুর্সন, হ্যাভেস, পার্সি ব্রাউনের মতো বিদ্বৎ পণ্ডিতও সে-কথা আন্দাজে বলতে চাননি। হয় সে প্রসঙ্গ আদৌ উত্থাপন করেননি, অথবা কৌশলে এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু আমাদের একটি সুবিধা আছে। আমরা বিদ্বৎ পণ্ডিত নই, এসেছি আনন্দ আহরণে। তাই আমরা বিচার করে দেখতে পারি, যুক্তি-নির্ভর সিদ্ধান্তে সেই আকবর-কল্পিত ইমারতের ছবিটা কতদূর আঁকা যায়।

(i) ফাগুর্সনের বিশ্বাস, এ-ইমারতের শীর্ষদেশে ইন্দো-ইসলামী ঐতিহ্য স্বীকার করে একটি গম্বুজ বসানোর পরিকল্পনা ছিল আকবরের। তাঁর কালজয়ী গ্রন্থে^১ ফাগুর্সন ছবিতে ফর্টকি চিহ্ন দিয়ে গম্বুজের সম্ভাব্য আকৃতিটাও দেখিয়েছেন। কেন্দ্রস্থ কক্ষের বনিয়াদ সোচ্চারে ঘোষণা করছে অমন একটি প্রকাণ্ড গম্বুজের ভারবহনে সে সক্ষম। সুতরাং গম্বুজ একটা হতই। কিন্তু কী জাতের? না, তাজমহল 'পেরাজী-গম্বুজ' নয়। সেটা কল্পনা করলে তাজমহল 'ডোম-ডিজাইনারের' প্রতি—ভা তিনি ইশা আফান্দিই হোন অথবা উস্তাদ আহমেদই হোন—অবিচার করা হবে।

আকবর-আমলে মঙ্গল-শৈলীতে 'পেরাজী-গম্বুজ' রাজধানীতে নির্মিত হয়নি। সম্ভবত সে-জনই ফাগুর্সন গম্বুজটাকে 'পেরাজী ঢঙের' (Bulbous dome—বা একটা গোটা পেরাজের মতো প্রথমে বাইরের দিকে কঁকে তার উর্ধ্বমুখী ব্যাটা শূন্য করে) আঁকেননি; একেছেন হুমায়ুন-মক্কারা অথবা সেলিম-চিষ্টের দরগাহ গম্বুজের অনুসরণে। আমরা কিন্তু তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারলাম না! আমাদের মতে, গম্বুজটার প্ল্যান গোলাকৃতি হত না আদৌ, হত আয়তক্ষেত্র। কেন? সেটা আলোচনা করব ইতমদ্-উদ্দৌলা দেখবার সময়।

(ii) হুমায়ুন-মক্কারার একতলার চারটি কোণা ছেঁটে ফেলা হয়েছিল, পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ রচনা করে। সেই ছন্দটা আকবর মেনে চলেছেন এই সৌধের প্রধান প্রবেশ-তোরণে। সেখানে তিনি একই কয়দার চারটি কোণা ছেঁটে ফেলেছেন। কিন্তু মূল সৌধের চারটি কোণা ছেঁটে ফেলা হয়নি। লক্ষণীয় বৈরাগ্যপুত্র আবদুর রাহিম খান-ই-খানানের মক্কারাতেও (চিত্র—9.25) আকবর চারটি কোণা ছেঁটে ফেলেননি; কিন্তু তাজমহল পরিকল্পনাকার এ-বিষয়ে হুমায়ুন-মক্কারার ছন্দটি গ্রহণ করেছেন। আকবর এখানে চারটি প্রান্তে বসিয়েছেন অত্যন্ত দৃঢ়মূল প্রকাণ্ড চারটি ক্যাস্ট্রন। অষ্টভুজাকৃতি এবং বিশেষভাবে লক্ষণীয়, লাইন ছাড়া। কেন? এই অদ্ভুত বৈচিত্র্য কেন করা হল? জাহাঙ্গীর দেখাছি, জবাবে কলতে চেয়েছেন : ওদের স্মারক চার-চারটি বামনাকৃতি অতি হালকা ধরনের ছতী কসাতে। বে-শরম কি বাতে! কিল্লার চারপ্রান্তে আকবর-বাদশাহ্ চার-চারটে কামান বসালেন মজ্জড়-বংশ ধ্বংস করতে! তাহলে?

একটিই জবাব :

এ সমস্যার মূর্তিমান সমাধান দক্ষিণ-প্রবেশদ্বারে। আকবর যেন সেই গৃহচূড়ায় দাঁড়িয়ে আশ্মানের দিকে দুই বাহু উৎক্লিপ্ত করে তাঁর প্রাণের আবেগ জানাচ্ছেন—এ সমাধান কেন কেউ দেখতে পেল না!

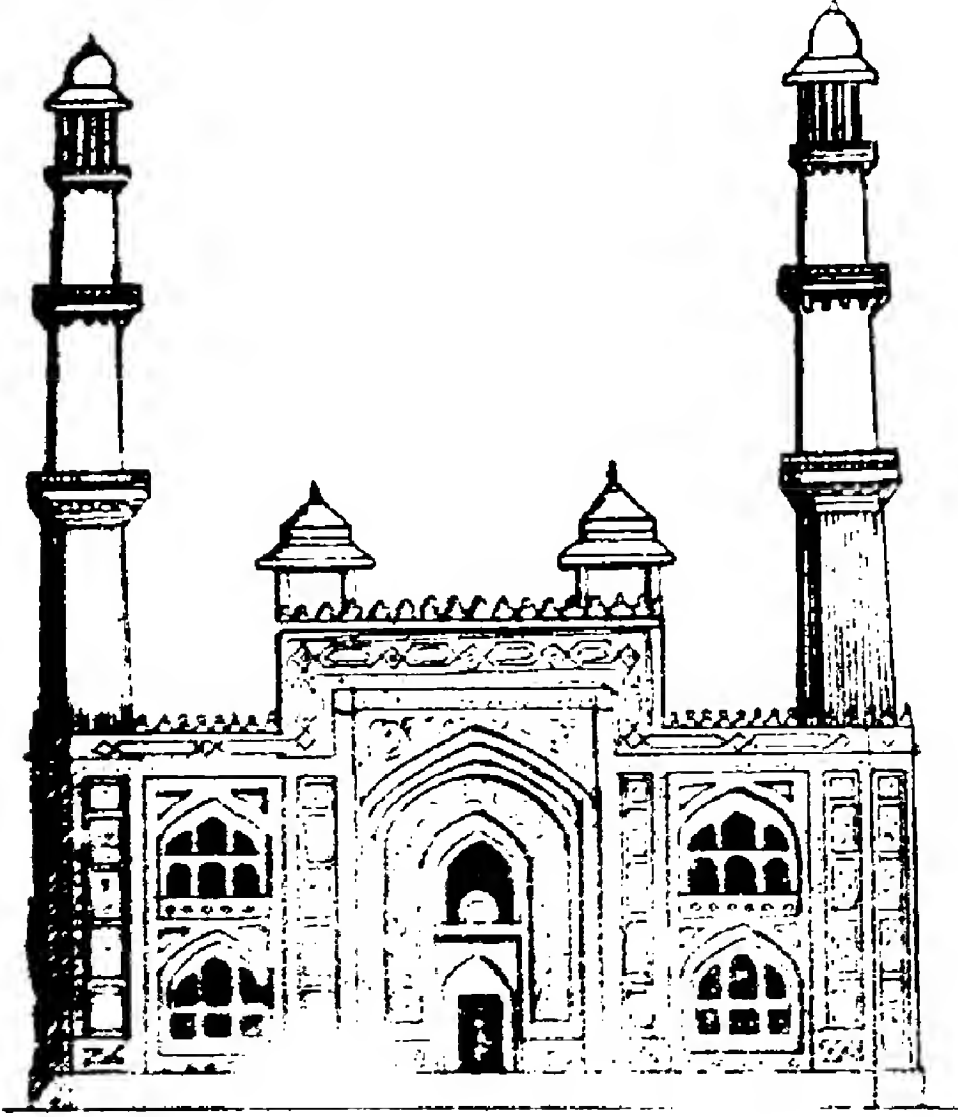
এ সমাধান নজরে পড়েনি স্থূলদৃষ্টি জাহাঙ্গীরের, কিন্তু পড়েছিল তাঁর বেগম ফার্সী-কবি নূরজাহাঁর! কেন, তা পরে বলছি।

লক্ষ্য করে দেখুন, দক্ষিণ প্রবেশ-তোরণে আকবর-বাদশা একটা অদ্ভুত আবিষ্কার করে যেনে আছেন। এ জিনিস উত্তর-ভারতে ছিল না, বহিঃ দক্ষিণ-ভারতে ছিল। আকবর যেন পথের বাঁকে পরেশবাবুর মতো আচমকা কুড়িয়ে পেয়েছেন একটি পরশ-পাথর! পার্সি

গাউন বসেছেন, “এই নব্যবিস্কৃত অলংকার মণ্ডে আবিষ্কৃত হল চূড়ান্ত সাফল্য সমন্বিত হয়ে।”

আমি ঐ মিনারিকা-চতুষ্টয়ের কথা বসছি (চিত্র—10.2)।

আদি কবি যেমন ‘মা নিষাদঃ’ শ্লোকটি মৃঠোর ধরে তমসা নদীর তীরে ক্রমাগত পদচারণা করছিলেন আর চিন্তা কবছিলেন ঐ অমৃতা ‘ছন্দবন্দ-পদ’-এর সার্থক প্রয়োগ হতে পারে কোন মহামানবের কীর্তিকাহিনী বর্ণনায়, ঠিক তেমনি ঐ পরশপাখরটা জেবের ভিতর নিয়ে আকবর-বাদশাহ ও বোধকরি বহু বিনিদ্রজননী যাপন করেছেন খোয়াবগাহ-র সম্মুখস্থ আলিন্দে



চিত্র—10.2 সেকেন্দরা মক্কারার প্রধান-ভোরণ, সম্মুখদৃশ্য।

অশান্ত পদচারণা। সম্ভবতঃ স্থাপত্যে একটি সন্তকান্ড রামায়ণ রচনার সিদ্ধান্তে এসেই আকবর তাঁর নির্মীয়মান সমাধিসৌধের চার প্রান্তে চারটি দৃঢ়মূল অষ্টভুজাকৃতি ক্যাপিটেলন স্বেপে তোলেন। আকবর-বাদশাহ আর এক দশককাল জীবিত থাকেন হরতঃ আমরা ঐ সমাধিসৌধের চার প্রান্তে চারটি মিনারিকা দৃষ্টান্ত পেতাম—যার পূর্ণ বিকাশ দর্শন করে যুগে যুগে আমরা সত্যের জানাই তাজমহল-পারিকল্পনা-করক। তবুও বহুত পেয়েছিলেন তাঁর পত্নক। কবি তিন : তাই স্বপ্নের ঐ আবিষ্কারটা দরত পেয়েছিলেন এবং বার বার কাজে ও লাগিয়েছেন আশ্রয় এবং লাহোরে : পিতার, স্বামীর এবং নিজের

সমাধিসৌধে। প্রাক-তাজমহল যুগের এ তিনটি ইমা-রতেই আছে মিনারিকা-চতুষ্টয়।

(iii) হুমায়ুন-মক্কারার প্রথমতলায় বৈচিত্র্য নেই, যতিচিহ্নহীন একটানা পর পর সতেরোটি খিলান। মিতলে নির্মিত হয়েছে প্রকান্ড খিলান-সমন্বিত ইবানটি। তুলনায় আকবর একতলার কেন্দ্রস্থলে একটি সুস্পষ্ট যতিচিহ্ন রেখেছেন ; গড়েছেন জমিন-সই সুবহু ইবানটি। আর তার এক-এক পাশে পাঁচটি করে খিলান। আরও লক্ষ্য করে দেখুন—হুমায়ুন-ইবানে বৈচিত্র্য আনা হয়েছে শুধুমাত্র রঙের ফেরতাইয়ে, সাদা-মার্বেলের পাশে লাল-পাথরের বৈপরীত্যে, তার মাথায় দু-প্রান্তে দুটি তব্বী ছত্রী ; ইবানের ফোকর দিয়ে দেখা যায় তিন-তিনটি খিলান। অপরপক্ষে আকবরী-ইবানে একঘেরেমি বিদূরিত হয়েছে জ্যামিতিক নকশার বৈচিত্র্যে, এক এক খোপে এক এক জাতের ডিজাইন। তাদের আলিম্পন-চাতুর্ষ্য এত বেশি নয় যে, চোখ পীড়িত হবে ; এত কম নয় যে, একঘেরে লাগবে। ইবানের মাথায় একটিমাত্র চব্বতরা—সেটা গোলাকৃতি নয়, আয়তক্ষেত্র এবং তিন তিন খিলান-সমন্বিত—যেমন দেখেছি ফতেপুর-সিক্রিতে, রাজস্থানে এবং গজরাটের হিন্দু-শৈলীতে। সেই ইবানের ফোকর দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটিমাত্র ছোটমাপের খিলান, যেমনটি দেখে-ছিলাম বুলন্দ-দরওয়াজায়। হুমায়ুন-মক্কারার প্রথমতলের উচ্চতা ছিল 6.71 মিটার, আকবর সেটাকে বৃদ্ধি করেছেন প্রায় দেড়গুণ—9.14 মিটারে।

অনুমান করতে অসুবিধা হয় না—আকবর বৃহত্তর কিছুর গড়তে চেয়েছিলেন। তাই ঐ সুউচ্চ শিল্প ; তাই ঐ সুদৃঢ় বনিয়াদ ! এবং ইমারৎ যেন হুমায়ুন-মক্কারার প্রতিচ্ছায়া না হয়, যেন স্বকীয় মহিমায় রূপায়িত হয়ে ওঠে এ-বিষয়েও তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল।

(iv) মূল সৌধে মিতল-মিতলে বাস্তব-নকশা বা প্ল্যান কেমনতর হত, সেটা আন্দাজ করা নিতান্ত অসম্ভব। শুধু অনুমান করা যায়, তা পারসারীতি-সম্ভব বস্তু-কেন্দ্রিক হত না, অর্থাৎ হুমায়ুন-মক্কারা যেমন নয়টি বস্তু, তাজমহল যেমন পাঁচটি বস্তুকে মূল-ধন করে গড়ে উঠেছে, তা কিছতেই হত না। প্ল্যান হত ভারতীয় ঢঙে, আরও সুনির্দিষ্টভাবে—ইন্দো-ইসলামী শৈলীতে ; অর্থাৎ তার প্ল্যানিং-এর গঙ্গোত্রী-গোমুখে থাকত সরল-রেখায় বিধৃত কোনও জ্যামিতিক ছক। বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্র, ষড়ভুজ, অষ্ট-ভুজ। এ অনুমানের পিছনে যদি একটাই—দীর্ঘ স্থাপত্য-জীবনে আকবর ঐ নীতিই বরাবর অনুসরণ

করে এসেছেন। যেমন ধরুন, খান-ই-খানান মক্‌বারা। এই স্থাপত্য-কীর্তি তাজমহল পরি-কল্পনাকারকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। আপাতদৃষ্টিতে, অর্থাৎ সম্মুখদৃশ্যে ঐ দৃষ্টি সৌধের—খান-ই-খানান মক্‌বারা এবং তাজের সাদৃশ্য যতই থাক, তাদের প্ল্যানিং-এর মৌলি ছন্দ ভিন্ন মার্গের। যে-কোন দর্শক মনে করবে, (চিত্র—9.25) এর প্ল্যানিং মূলেও বুদ্ধি আছে পাঁচটি বস্তু—কিন্তু তা বাস্তবে নেই। যে-কোনো ‘একক’কে মডুল ধরে পাঁচটি বস্তুর সাহায্যে ঐ পঞ্চ-বস্তু প্রতিম বাস্তব-নকশাটিকে বাঁধতে যান, পারবেন না। ও গড়ে উঠেছে সরলরেখার সমাহারে, বর্গক্ষেত্র থেকে।

(v) এবার প্রশ্ন হতে পারে, বাস্তব-নকশা না হয় আন্দাজ নাই করা গেল, ওর ‘ফাসাদ’ বা সম্মুখদৃশ্য কী-ভাবে পরিকল্পনা করেছিলেন মূল পরিকল্পনা-কার? সেটাও ধারণার বাইরে। আন্দাজেও কোন ইঙ্গিত দেওয়া অযৌক্তিক, অশোভন হবে। বোধকরি এটুকুই সাহস করে কলা চলে—যা হয়েছে, তা নয়! জাহাঙ্গীরী-কল্পনায় যে সারি-সারি সরু-সরু স্তম্ভের উপর গোলাকার ছত্রী রূপায়িত, তা ছিল না আকবরের সূন্দর চিন্তাতেও। এ-কথা কলতে সাহস পাচ্ছি এজন্য যে, লক্ষ্য করে দেখুন—দক্ষিণাধিকের মূল প্রবেশ-তোরণে এবং পূর্ব ও পশ্চিমের দরওয়াজা-প্রতিম ইমারতে (উত্তরদিকেরটা ভেঙে গেছে) ঐ ধরনের গোলা-কৃতি ছত্রী একটিও নেই। সর্বক্ষেত্রেই বর্গক্ষেত্র (ছল্লা-সমন্বিত স্তম্ভচতুষ্টয়ের উপর স্থাপিত) অথবা আয়ত-ক্ষেত্র (সেক্ষেত্রে ছল্লা-সমন্বিত আটটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত)। তার উপর ছত্রীসদৃশ ছোট গম্বুজ কোথাও নেই, আছে হিন্দু-স্থাপত্যের কর্বেলিঙ-করা শিখর—যা দেখেছি যোধপুরে, বিকানিরে, গুজরাটে, অম্বরে, যা হিন্দু-ভারতের একান্ত সম্পদ, এবং যা ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যে প্রথম সলজ্জ পদক্ষেপ করেছিল আগ্রা-কিল্লায়, জাহাঙ্গীরী-মহলের চারচালা ছাদে। এবং যেটি অতি সুন্দরভাবে রূপায়িত হয়েছে পরের দশকে, জাহাঙ্গীরী-জমানাতেই, ইতমদ্-উদ্-দৌলার কেন্দ্রীয় গম্বুজে।

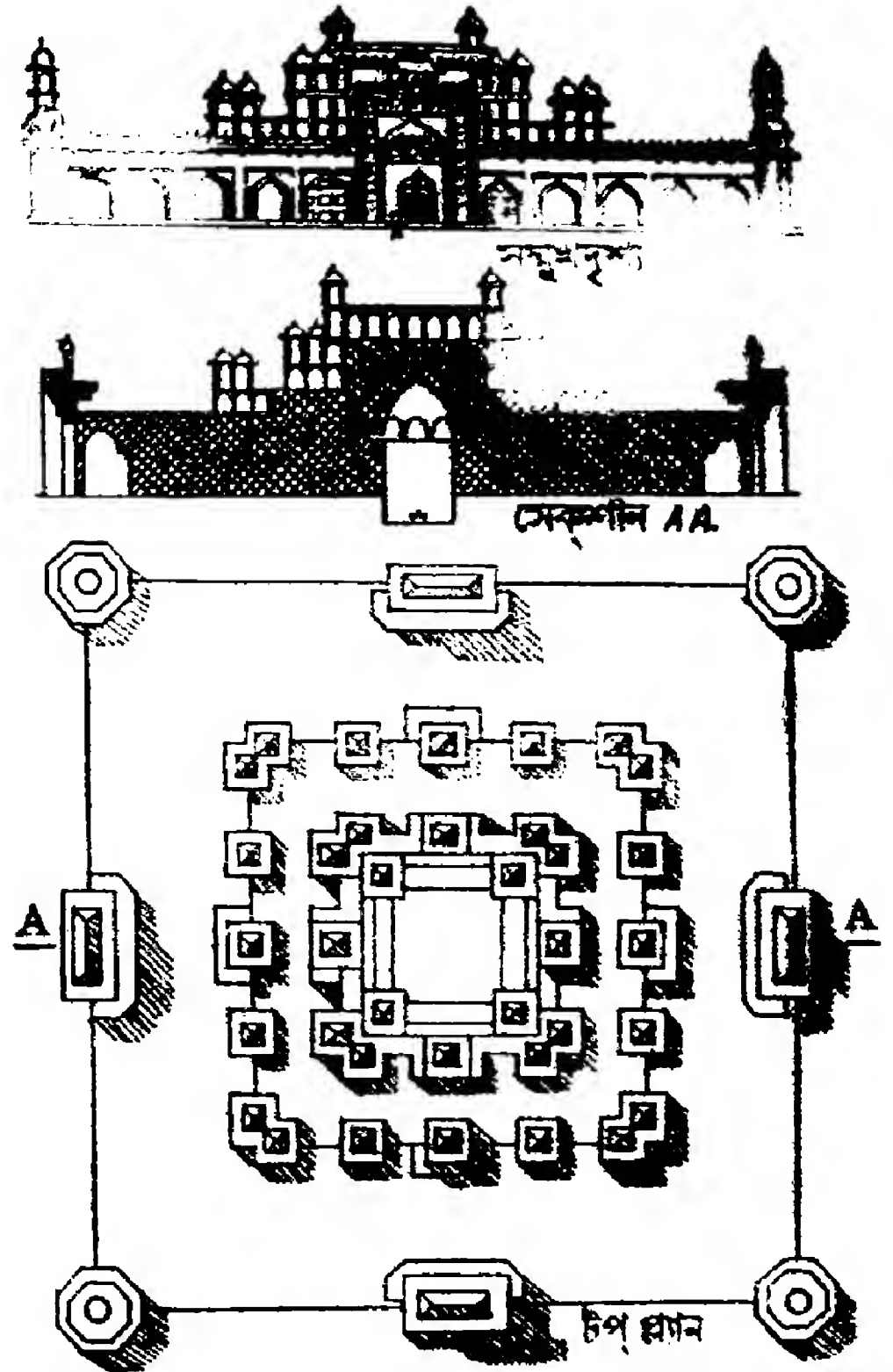
এজন্যই আন্দাজ করছি, হয়তো মূলসৌধের প্রধান গম্বুজটি ফাগুর্সন অনামিত গোলাকার হত না, হয়তো হত আয়তক্ষেত্র।

ইতমদ্-উদ্-দৌলা : প্রায় দশ বছর পরে সম্রাজ্ঞী নূরজাহাঁ নির্মাণ করালেন আগ্রার ষমুনা পুর্জিনে পিতা-মাতার সমাধিসৌধ : ইতমদ্-উদ্-দৌলা।

জাহাঙ্গীর

সেটি ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যে একটি হাইকেন-চিহ্ন। সংক্রমণধর্মী। গগনের অঙ্গরে এতক্ষণ কেন বিশুদ্ধ গ্রুপদ-খামার চর্চাছিল, কেন কর্মকর্তার স্থির করেছেন এবার ঠারার জমাটি আসন্ন কসকেন। তাই দুই ভিন্ন মেজাজী সূরসাধনার মাঝখানে, বিরতিকালে, নূরজাহাঁ একটি আবেগময়ী ভঙ্গন গাইতে এসেছেন!

আকবরী-জমানার স্থাপত্য ছিল—স্রষ্টার মতই—হাশ্বেড পার্সেন্ট পূরুষ! বৃহৎকন্থ, কবাটকন্থ, আত্মানু-লম্বিত বাহু, শালপ্রাংশু। তার কল্পনা—স্বাভাবিক।



চিত্র—10.3 সেকেন্দ্রা মক্‌বারার উপর-থেকে-দেখা বাস্তব-নকশা, সেক্সান ও সম্মুখদৃশ্য।

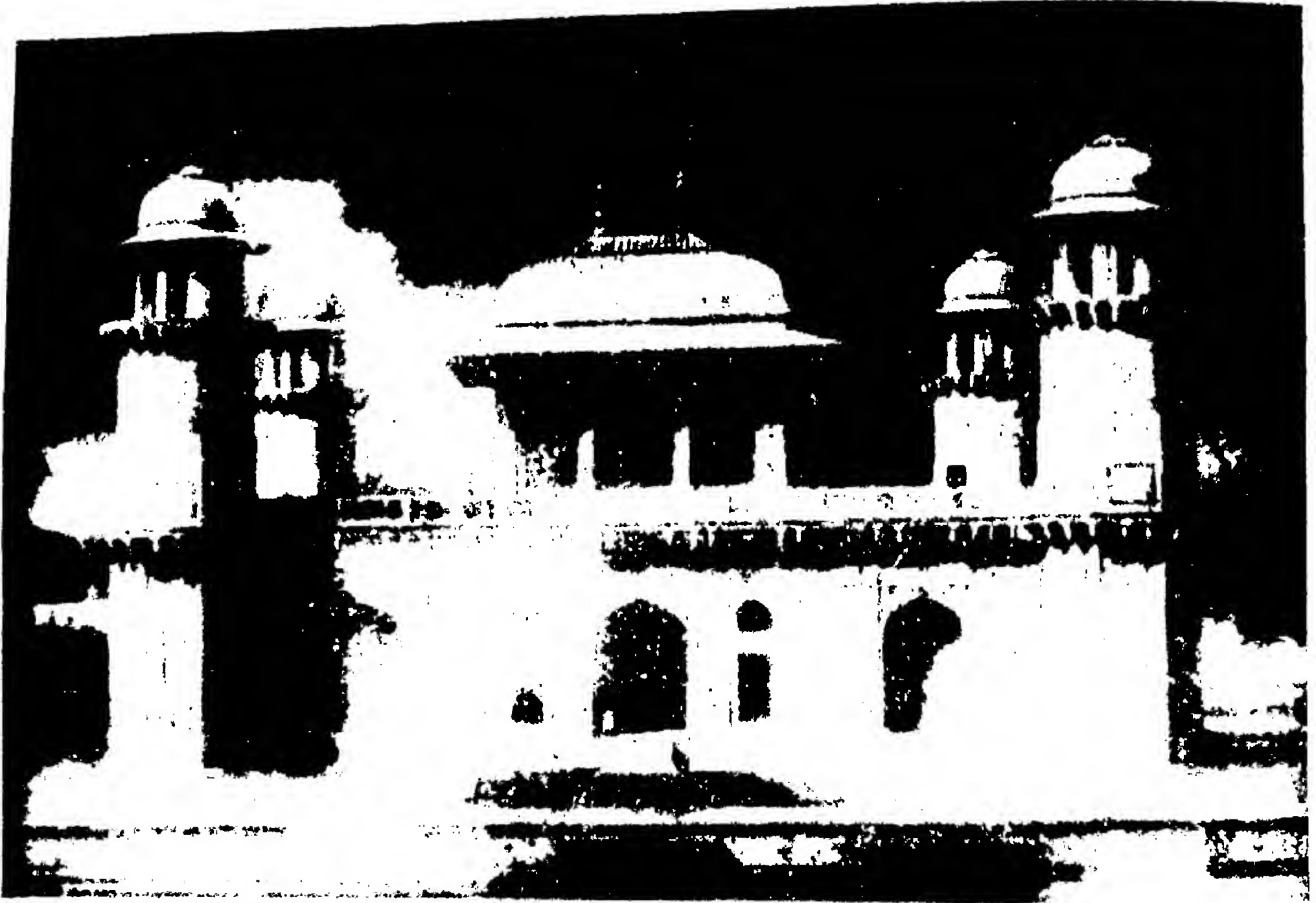
পৌরুষের, দাঢ়ের। তাদের যা সাজ-পোশাক তাতে সৌকুমার্য যদি তোমার নজরে না পড়ে থাকে তবে বলব, ভূমি অন্ধ। নকশা ছিল, তবে সীমিত। সমর-সাজে সিন্ধিত ঘোষার পক্ষে যতটা মানার—জৌহ-জালিকে জ্যামিতিক ছন্দ, কোমরবন্ধে বৃটিয়ার নকশা, ঢালিকায় নকশার চুম্বিক, কড় জোর জলোয়ারের মতো হাতীর-দাঁতে কিছু স্ফূর্ত কারুকার্য। তার বেশি নয়। এর ঠিক পরবর্তী যুগে স্থাপত্য আবির্ভূত হতে

জেলহে বরবার-নটীর কেল—তার ওড়নায় সাজা-করির
জামনার কারুকৃতী, সর্বাপো পামা-মোতি-হীরা-জহ-
রতের জৌলুস, তার চরণে কলহংস-নিম্বক-মধুর
সদ্বর্ণনুপদর।

আকবরী-স্থাপত্যে যেন মিকোলাজেত্তোর পৌরুষ-
কজনা—ব্যাভাস-ডেভিড-মোজেস্‌ই তাঁর হাতে ভালো
খোলে ; সিস্তিন-চ্যাপেলের সিবিল, লরেজান্সি সমাধি-
সৌধের স্নাতি-গোথলি-উষা প্রভৃতি নারীমূর্তিরও কেমন
যেন পদ্রুবাণি উঠ। আর শাহ-জাহাঁর স্থাপত্য যেন
রাফাইলের শিল্পভাবনা—তাঁর পদ্রুবাণিও নারী-

মক্‌বারায় দক্ষিণে, এখানে প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতার -
নদীর অবস্থানজনিত হেতুতে তা পূর্বে। প্রবেশ-
দ্বারটি লালরঙের বালিপাথরের, তার মাঝে মাঝে সাদা
মার্বেলের নকশা। অথচ কেন্দ্রস্থ মূলসৌধটি আদ্যন্ত
দাম্পশদ্র নিখাদ মর্মরের (চিত্র —10.4)।

শেরশাহ শূর অথবা ফিরোজশাহ তুগলক
ভারতীয় স্থাপত্য-ইতিহাসে দর্শন্য ব্যতিক্রম। তাই
ইতিহাস জানে না—ইতমদ্‌উদ্‌দৌলার মূল পরি-
কল্পনাকারের পরিচয়। আন্দাজ করছি : নূরজাহাঁ
স্বয়ং মোটামুটি সে-আউটটা ছকোছিলেন। হয়তো



চিত্র—10.4 ইতমদ্‌উদ্‌দৌলা, সম্মুখ থেকে আলোকচিত্র।

সদলত পেলকতা। এই দুই বিপরীত-ধর্মী স্থাপত্য-
চিন্তার মাঝখানে নূরজাহাঁর ইতমদ্‌উদ্‌দৌলা যেন
অধীনারীশ্বর! বিবর্তনের মধ্যপথে সংক্ৰমণ-ধর্মী
একটি শ্বেতকর্ণের মর্মর সেতু।

165 মিটার বাহুর বর্গক্ষেত্র। চারিপাশে প্রাচীর—
বাহুরী-উত্তে তার চারিদিকে সদৃশমঞ্জস চাহুর বাগ।
ঠিক কেন্দ্রস্থলে বর্গক্ষেত্রের বাস্তু-নকশায় মূলসৌধ।
প্রবেশদ্বার এ-ক্ষেত্রে পূর্বদিকে। লক্ষণীয়, প্রবেশ-
দ্বার হুমায়ুন-মক্‌বারায় ছিল পশ্চিমে, সেকেন্দ্রা-

তিনি সেটা পারতেন, কারণ তিনি কবি, শিল্পী,
সদৃশিক্ষিতা। কম্পাস ধরে নকশা হয়তো ছকতে জান-
তেন না, কিন্তু কী চান তা বুঝিয়ে কলার মতো শিক্ষা
তাঁর ছিল। সে-ক্ষেত্রে আন্দাজ করতে পারি, তাঁর
পূজ্যপাদ শ্বশুর নিজের সেকেন্দ্রা-সমাধির যে
প্ল্যানটি ছকোছিলেন সেটি তাঁর হস্তগত হয়েছিল,
অথবা কাঠের মডেলটি। কারণ লক্ষ্য করে দেখছি,
সেকেন্দ্রা-মক্‌বারায় অনেকগুলি শৈল্পিক অনুভাবনা
—যা মূল পরিকল্পনায় ছিল, কিন্তু জাহাঙ্গীরের

হাতে বাস্তবে রূপায়িত হয়নি—সেগর্দিল ইতমদ্-উদ্দৌলার সাথেরূপে গৃহীত হয়েছে। অথবা আন্দাজ করতে হয়, নুরজাহাঁ এ-কাজের জন্য এক দশক পরে নিয়োগ করেছিলেন আকবরী-জমানার সেই বংশ আর্কিটেক্টকে, যাকে হয়তো বাঁওগা বেরোছিলেন জাহাঙ্গীর সেকেন্দ্রার সমাধিস্থতকরণে।

এমনটা অনুমান করছি নিম্নলিখিত সূত্রকয়টি থেকে :

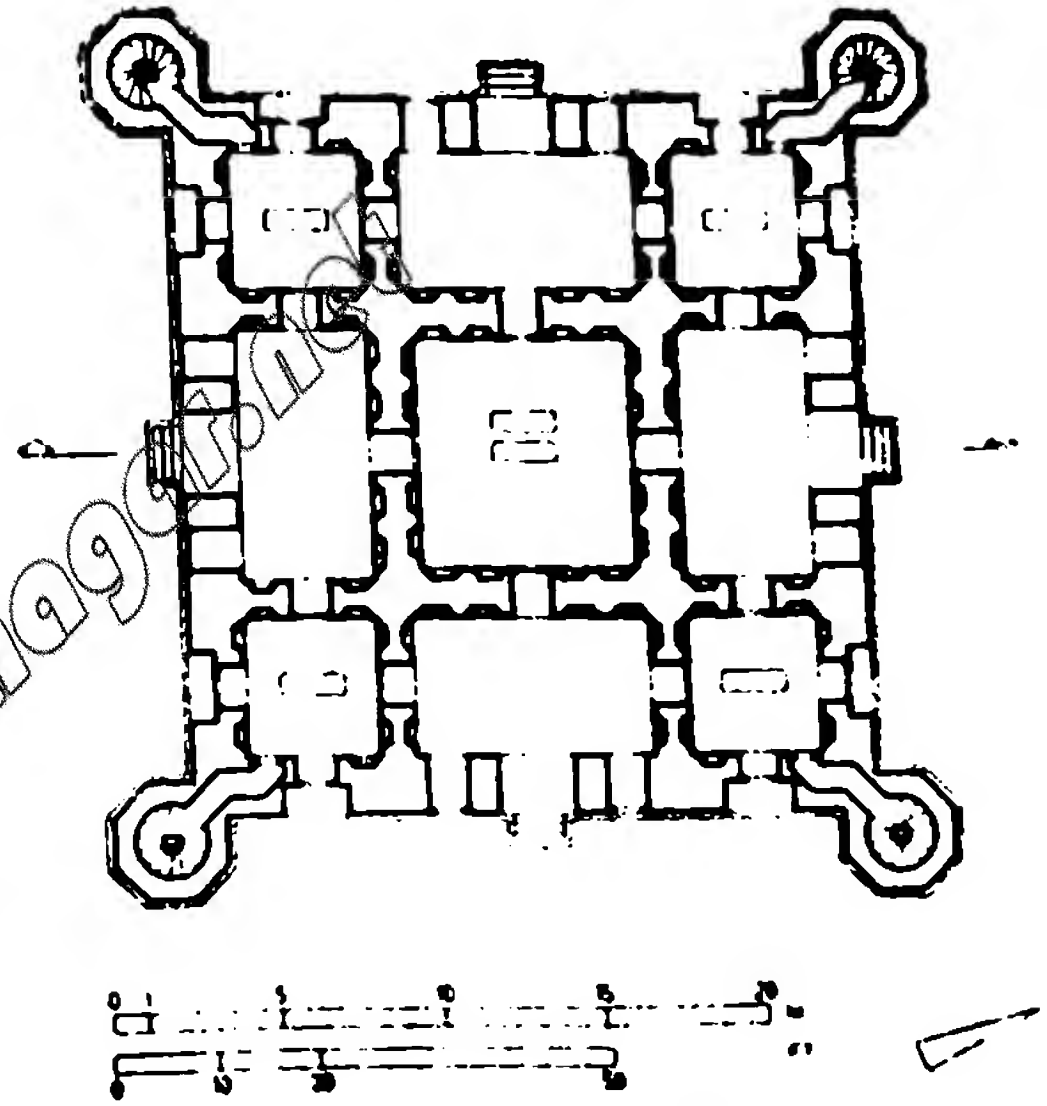
(i) আকবর তাঁর সমাধিসৌধের চার-কোণায় চারটি দৃঢ়মূল ব্যাস্টিয়ন কেন নির্মাণ করেছিলেন তা জানা ছিল ইতমদ্-উদ্দৌলা-স্থপতিতর। কারণ তিনিও দেখাছি, ইমারতের চার-কোণা পয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ রচনা করে ছোট্টে ফেলেননি, পরিবর্তে আকবরী-জন্মে চার-চারটি 'সাইন-ছাদা' দৃঢ়মূল ব্যাস্টিয়ন বানিয়েছেন। অথচ জাহাঙ্গীরের মতো তার মাথায় চারটি বামনাকার ছত্রী বসাননি। সেগর্দিলকে মিনারিকায় রূপান্তরিত করেছেন। যে-হেতু এই ইমারতের বিস্তার ও উচ্চতা খুব বেশি নয়, তাই মিনারিকাগর্দিলকেও নাতিদীর্ঘ করা হয়েছে। নিম্নাংশে অষ্টভুজ হলেও দ্বিতল অংশে আধা-আধি উঠেই তা গোলাকৃতি হয়েছে। মিনারিকায় ব্র্যাকেট-সম্বিত দুটি বাজুবন্ধ পরানো হয়েছে আকবরী সেকেন্দ্রা-তোরণের হুবহু অনুকরণে। উপরস্থ ছত্রীটিও সেই ডিজাইন থেকে সংকলিত।

(ii) দ্বিতলে, কেন্দ্রস্থলে গোলাকৃতি গম্বুজ বসানো হয়নি আদৌ। এখানেও আকবরী-শৈলীতে চার-চালা চবুতরা-ছাদ বানানো হয়েছে। এ-ছাদ দেখেছি সেকেন্দ্রায় মূল প্রবেশদ্বারের শীর্ষে এবং ফতেপুর-সিক্রির অনেক অনেক ইমারতে। এ-জন্যই ফাগু'সন-সাহেবের অনুমান-নির্ভর চিত্রে হুমায়ূন-গম্বুজটা আমাদের মনে নিতে সায় ছিল না সেকেন্দ্রার মূল সমাধিসৌধে।

(iii) একতলার কার্নিসে এবং মিনারিকা-চতুষ্টয়ের মণিবন্ধে যে ছম্ভা ও কোলা-বারান্দার ব্র্যাকেট তাও হিন্দু-শৈলীর, ফতেপুর-সিক্রির প্রভাবমণ্ডিত। এই আনুভূমিক অলংকরণটি রৌদ্রছায়ার মিতালীতে শূভ্র মর্মর-প্রাসাদে একটা স্নিগ্ধতার আমেজ আনে। ভার বহনের প্রয়োজনে ঐ ব্র্যাকেটগুলি অহৈতুকী। এর উপস্থাপনের দুটি উদ্দেশ্য। এক : পূর্বযুগের শৈলীকে সম্মান জানানো। দুই : সমৃদ্ধদর্শে কোলা-বারান্দার একটানা ছায়ারেখায় ছোট ছোট সাদা-দাগের আলিম্পনের মাধ্যমে একটা মনমুগ্ধকর প্যাটার্ন রচনা করা।

(iv) ইতমদ্-উদ্দৌলার বাস্তু-নকশা পারস্য-রীতি-সম্মত বৃত্তকেন্দ্রিক নয় ; অর্থাৎ হুমায়ূন-সমাধিতে যেমন নয়াট বৃত্তকে নুলদন করে স্যান চক্কা হয়োছিল, সে পথ আকবর তাঁর দীর্ঘ স্থাপত্য-জীবনে একবারও অনুসরণ করেননি, সেই বৃত্তকেন্দ্রিক প্রাণিও নুরজাহাঁরও মনে ধরেনি! শুধু ইতমদ্-উদ্দৌলার নয়, লাহোরে জাহাঙ্গীর-মক্‌বারাও পরিকল্পিত হয়েছে জ্যামিতিক সরলরেখার ব্যবহারে, বৃত্ত থেকে নয়।

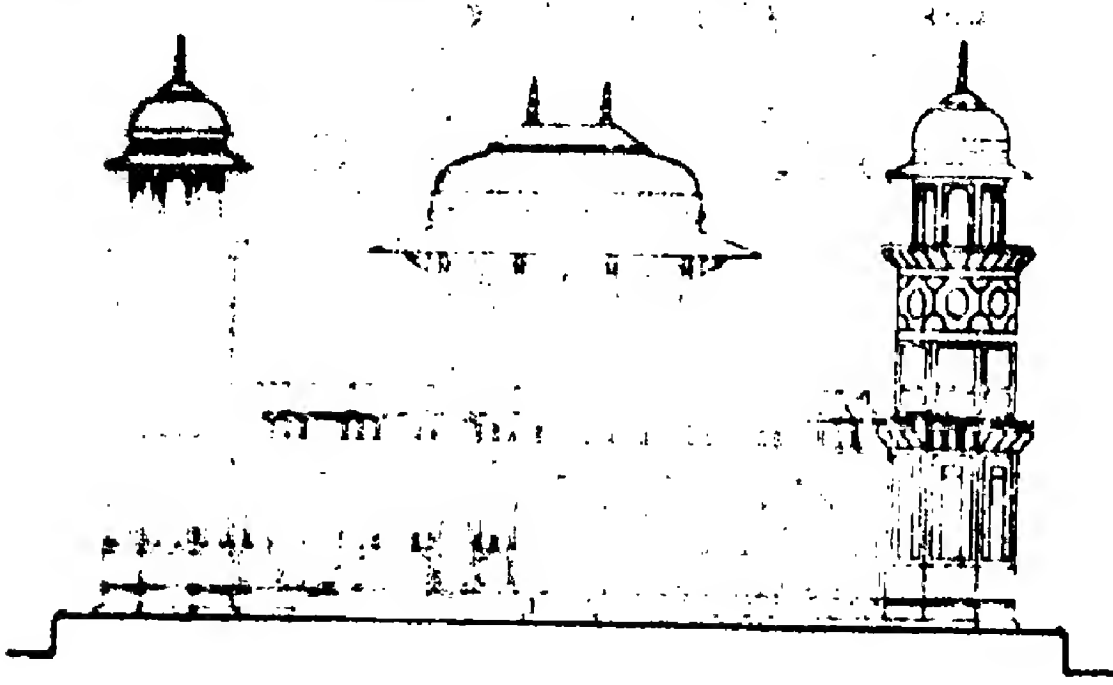
বহিরণে আকবরী-জমানার পুরাতালী-চক্কে সলাম জানিয়ে এ ইমারৎ কেন অন্তরালে আগমনী যুগের আগমনী গাইতে আগ্রহী। সমস্ত দেওয়াল জুড়ে



চিত্র-10.5 ইতমদ্-উদ্দৌলার বাস্তু-নকশা।

নানান জাতের জটিল জ্যামিতিক নকশা। সেগর্দিল মূলতঃ পারস্যরীতির, হিন্দু-শৈলীর নয়। সিলিঙে ও দেওয়ালে কারুকৃতি আরও ঘননিবন্ধ, আরও জটিল। কী সূক্ষ্ম, কী নিখুঁত কারিগরী! জ্যামিতিক মাপ-জোখের বেন হুন্দমুন্দ হয়ে গেছে! দেওয়ালের গারে পাথরে খোদাই করা 'স্টিল-লাইফ পেইন্টিং'! ফল-দানীতে পুষ্পগুচ্ছ, প্রসাধন-মঞ্জুষা, সূর্য্য-ভঙ্গার, ফলের পাত্র, পানের মদিরা-চষক। দেখতে দেখতে মনে থাকে না—এ নকশাগুলি একটি সমাধিসৌধের দেওয়ালে খোদাই করা। মনে হয় বেন, ক্লাস বাসনের প্রয়ো-জনে নির্মিত এ বর্ষি কোন হারেম-রঙমহলের দেওয়াল। ঐ ঠাণ্ডানট অলংকার আর সূর্য্যভঙ্গারের

জৌলুদেবের মাঝে মাঝে কুরান সরিফের বাণী উৎকীর্ণ করা। সেগুলিকে ঐ পরিবেশে যেন প্রহসন বলে মনে হয়! হয়তো অপরাধ আমার নিজের- হয়তো তদা-নীন্তন শিল্পবোধের নিরিখে এতে কোন রসভাস ঘটে না, কিন্তু বর্ণিকাভঙ্গের উৎকর্ষে মৃদু হওয়া সত্ত্বেও—স্বীকার করব—আমার কেমন যেন বারে বারে সুর কেটে যাচ্ছিল। মিশরীয় ফারাওদের পিরামিডে এটা আমার চোখে বিসদৃশ লাগেনি—কারণ তাদের জীবনদর্শনে পুনর্জন্মবাদ স্বীকৃত, মৃত্যুতে তাদের যবনিকাপাত নয়; কিন্তু এই ইসলামী সমাধিসৌন্দর্যে এটা আমার ভালো লাগেনি। ইসলামী সমাধিসৌন্দর্যের অভ্যন্তরে মনটা যে গাম্ভীর্য, যে শান্ত সমাহিত উদাসীন পরিবেশ প্রত্যশা করে, এখানে যেন তার ব্যতায় হয়েছে, বারে বারে, অলঙ্করণের আতিশয্যে।



চিত্র-10.6 ইতমদ্‌উদ্‌দৌলার সমাধিসৌন্দর্য।

বাহিরের দিকে নকশার বাহুল্যে কিন্তু সে-কথা মনে হয় না। প্রথমতঃ, সেটি সমাধিকঙ্কের অভ্যন্তর নয়; দ্বিতীয়তঃ, এই রঙিন নকশাগর্ভিণী থাকায় মধ্যদিনেও শব্দ-মর্মরে আলোর প্রতিফলন চোখকে পীড়িত করে না—যে অনুভূতিটা হয় নিদাঘ-মধ্যাহ্নে তাজমহল দর্শকের। অথবা হয়তো, হিন্দু-মন্দিরের বাহিরে এবং গর্ভগৃহে এই বৈপরীত্য দেখে দেখে আমি অভ্যস্ত বসেই! এই প্রসঙ্গে আরও বলি, এখানে আলিম্পন চাতুর্যের প্রয়োগবিদ্যায় একটা নতুন জাতের পদক্ষেপ করা হয়েছে। এতদিন মৃৎশিল্প-স্থাপত্যে মক্কারনা মার্বেল খোদাই করে তার তিতর শব্দ কালো-রঙের মার্বেলই কসনো হত—অথবা লালচে জয়পুরী বালি-পাথরে সাদা এবং কালো রঙের 'পাতি'। পদ্ধতিটার লাতিন নাম : Opus sectile; এই ইমারতে সর্বপ্রথম মর্মর খোদাই করে তার তিতর নানান জাতের দর্শন পথেরে ছোট ছোট টুকরো সূর্যবিন্যস্তভাবে

সাজিয়ে বর্ণাঢ্য নকশা সৃজন করা হয়েছে—প্রবাল, পাষাণ, মৃদা, পোখুরাজ, নীলা প্রভৃতি। এ পদ্ধতিটার লাতিন নাম : pietra dura। ইতমদ্‌উদ্‌দৌলার এই পদ্ধতিতে শিল্পী এমন বর্ণবোঁচড়ের কেরামতি দেখিয়েছেন, যা পার্সি ব্রাউন সাহেবের ভাষায় 'Could only be excelled by those of a butterfly's wings'—অর্থাৎ যা মানুষ অতিক্রম করতে পারবে না, পারবে প্রকৃতি, প্রজাপতির ডানায়।

জাহাঙ্গীরের সমাধি, লাহোর : ইতমদ্‌উদ্‌দৌলার বিষয়ে পূর্বসূরীরা উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করেছেন—ফাগদসন, হ্যাভেল, পার্সি ব্রাউন; আমি অবিমিশ্র প্রশংসা করতে পারিনি। কোনো উন্মাদিক মনোভাবের জন্য নয় কিন্তু। যে-কথাটা আমি আপনাদের বলতে চেয়েছি, হয়তো বোঝাতে পারিনি, সেই সত্যটা প্রাণধান করেছিলাম স্বয়ং নূরজাহাঁ। হয়তো তত্বটা বুদ্ধি দিয়ে নয়, বোধ দিয়ে বোঝার; বৈদগ্ধ্যের দৃষ্টিতে তা দৃশ্যমান নয়, বেদনার পরকলায় তা অনুভব করা যায়।

রাজধানী থেকে বহুদূরে, লাহোরে, নূর মহম্মদ জাহাঙ্গীরের সমাধি নির্মাণ করতে যে এল, সে হীরা-মৃদা-জহরতে ভূষিতা ভারতসম্রাজ্ঞী নূরজাহাঁ নয়, সে পণ্ডাশোধরা, বিগতভর্তা এক হতভাগিনী। এখন তার ভূমিকা—'বাল বিখারকে টুটি কবরোঁপে জব কোই মেহেজবীন রোতি হয়'-এর। তাই জাহাঙ্গীর-মক্‌বারায় নেই ইতমদ্‌উদ্‌দৌলার রাজসিক জৌলুদ, রঙিন-পাথরে চোখ-ধাঁধানো চেকনাই। পানপাত্র, চষক, ফুলদানী আর সুরাভুঙ্গারের খিলখিলানি নেই তার খিলানে খিলানে। সে হিসাবে জাহাঙ্গীরের বেতনভুক কর্মচারী ইতমদ্‌উদ্‌দৌলার মক্‌বারার সঙ্গে তার নিজের সমাধির প্রভেদ—জগতের আলো নূরজাহাঁর সঙ্গে বিগতভর্তা শাহজাহাঁ-বিমাতার।

নূরজাহাঁ এ-ইমারতে আদৌ কোন গম্বুজ বানাননি। কেন? যে-হেতু স্বয়ং আকবর-তনয় বানাননি আকবরের সমাধিতে? কিন্তু এবারেও দেখছি, মূল ইমারতের চার প্রান্তে চারটি লাইন-ছাড়া মিনারিকা বানানো হয়েছে, এবং সেগুলি মাপে খাটো নয়, যথেষ্ট উঁচু।

নূরজাহাঁর সমাধি, লাহোর : সেখানেই কিন্তু এ বিয়োগান্তক নাটকের যবনিকাপাত নয়। তারপর কেটে

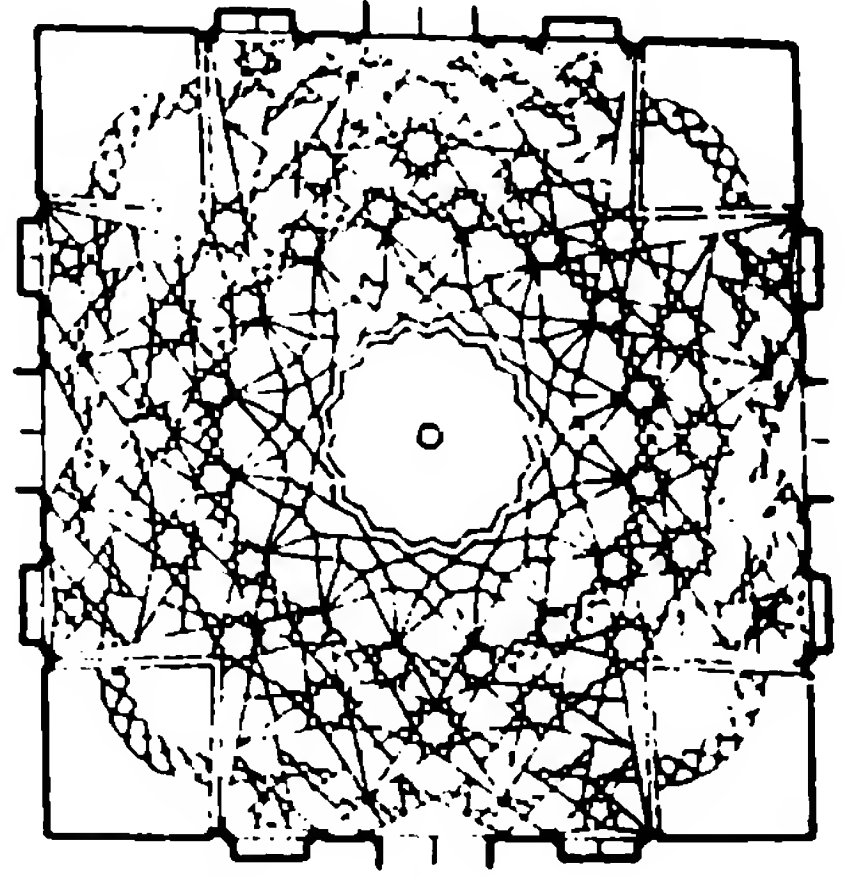
গেল আরও আঠারো বছর। নূরজাহাঁ এখন সত্তর ছ'ট-ছ'ই। ডু'ইয়ে-মু'য়ে নুয়ে পড়ার জমানা। হারেম-আব্দুতে দোপাটায় মদ্য লুকিয়ে দিন গজরান করছেন জাহানের নূর-জগতের আলো। তস্‌বির-ছড়াই তখন তাঁর একমাত্র সম্পদ। শেষ-পারাণির খেয়াঘাটের পিচ্ছিল সৈকতে উপনীত হয়ে বৃন্দার আশঙ্কা হল—বোধকরি মৃত্যুর পরেও এই চোখের-বাঁজি বিমাতাকে শাহ্‌জাহাঁ নিশ্চিন্তে শূতে দেবে না স্বামীর পাঞ্জর-ঘেঁষে। জিন্দা-জাহাঙ্গীর যাকেই পাটরানী করুক, বর্তমান দিল্লীশ্বর বেহেশত-আসীন জাহাঙ্গীরের পাশের সম্ভোধিটি সংরক্ষিত রাখবে নিজ গর্ভধারিণী জননীর জন্য। বেশ, তাই হোক—সব অবমাননা, সব ইব্‌তিজালই যখন সহেছেন দীর্ঘ আঠারো বছর, তখন ওটাও সহবে। অন্তত স্বামীর ঐ মক্‌বারা-চৌহন্দীর একান্তে যদি ঠাই পান, তাতেই তিনি সন্তুষ্ট। হয়তো এ-কথা চিন্তা করেই লাহোর-মক্‌বারায় তাঁর চিহ্নিত সম্ভোধি-এর আশাও ছাড়লেন। সেই লাহোর-মক্‌বারার চাহুর বাগের এক নিভৃত প্রান্তে, কলম্বনা রাভী নদীর কিনারে অতঃপর নির্মাণ করালেন একটি অনাড়ম্বর ক্ষুদ্রায়তন মক্‌বারা। পাশাপাশি দুটি সম্ভোধি—একটি নিজের, একটি লাডলির।

হ্যাঁ লাডলির। লাডলি-বেগমের। বণ্টনা ছাড়া যাকে কিছ'ই হাতে তুলে দিতে পারেননি ভারত-সম্রাজ্ঞী, সেই কাব্যে উপেক্ষিতার জন্য নির্মিত হল একটি সম্ভোধি। লাডলি হচ্ছে শের আফকনের কন্যা। নূরজাহাঁর একমাত্র সন্তান। শাহ্‌জাদা শাহ্‌রিয়ারের বেগম—যে কুৎসিত-দর্শন জড়বুদ্ধিসম্পন্ন শাহ্‌রিয়ারকে বিবাহ করতে বাধ্য হয়েছিল সেই অনিন্দ্য-কান্তি রূপসী মেয়েটি—মুগল রাজনীতির নির্দেশে, ক্ষমতা দখলের ক্রেদান্ত স্বপ্নে, এবং যে শাহ্‌রিয়ারকে শাহ্‌জাহাঁ প্রথমে অন্ধ ও পরে হত্যা করেছিল। নূরজাহাঁর গর্ভজাত একমাত্র সন্তান—উর্বশী-নির্মিত লাডলি-নগম তারপর আর নিকায় বসেনি। বোধকরি গোটা ইনসানিয়াৎ-এর প্রতি দূরন্ত ঘৃণায় বিবাহিত জীবনের পাকে আর নিজেকে জড়ায়নি। যে মায়ের জন্য সে কৈশোরে বাপকে হারিয়েছে, যে মায়ের জন্য অনিন্দিতা অনাঘ্রাতা মেয়েটি ঐ জড়বুদ্ধির অঙ্ক-শায়িনী হয়েছে—খোদাতালায় কী আজীব মহিমা—সেই আশ্রয়জ্ঞানের সেবাতেই সে কাটিয়ে দিয়েছে বাকি জীবন।

এ সমাধিসৌধ আরও নিরাডরণ ; আরও বিধবা ! সেটা দেখলে বিশ্বাসই হতে চায় না, তার নিচে মাটির

গভীরে কন্যাকে বকে জড়িয়ে শূতে আছেন—নূরজাহাঁ, দু'ট দশক ধরে বিনি বনিকায় অন্তরাল থেকে ছিলেন বাস্তবে ভারতভাগ্যাকাশে !

সে সমাধি এমন কি ইতমদ্‌উদ্‌দৌলার আদরিণী আশ্রয়ভারও নয়—সে মক্‌বারা সদৃশ বর্ধমানভূমির এক নগণ্য মনসবদারের মন্দভাগিনী কুলবধূর লেশময় ! যে মেয়েটি জানতো ঘৃম্পাঙ্কানিয়া গানে চাপড়ে চাপড়ে ছোট-সোনা-মেয়ে লাডলিকে ঘৃম্পাঙ্কতে, সবে-বরাতের উৎসবে যে তরুণী মেয়েটি জানতো গাছ-কোমর করে শাড়ি জড়িয়ে মিলাদ-সরিক্ষের জমায়তে দু-পাঁচ-শ' লোকের জন্য ফিনি রাখতে, অথবা জোনাক-জ্বলা মধ্যরাতে যে বদ্বতীকৃষ্টি জানতো বর্ধমান-কিন্দার খিড়কির দেউড়িতে প্রতীক্ষা করতে—কখন শোনা যাবে ঘরে-ফেরা ক্রান্ত মরদের অশ্বকুঁড়নি !



চিত্র-10.7 ইতমদ্‌উদ্‌দৌলার সিলিঙে জ্যামিতিক নকশা।

আর সেই হতভাগিনীর কবরের পাষাণে উৎকীর্ণ করা আছে দু-ছত্র কবিতা। তাঁর স্মরণিত একটি ফসলী রয়েছে। তাও ভারতসম্রাজ্ঞী নূরজাহাঁর নয়, ইতমদ্‌উদ্‌দৌলার গরিবনী আশ্রয় মেহেরউম্মিসার নয়, এমন কি বর্ধমান-দেহলীর গ্রাম্য কুলবধূরও নয়—তা নৈবার্ত্তিক, স্পর্শকাতরা এক বেদনা-বিধ্ব শাস্ত্রত কবি-আশ্রয় আর্তি :

‘বর্ মজার-ই-মশ্‌ ঘরীবান্‌ নই চিরাবী নই ঘুলাই।
নই পর-ই-পরওয়ানা সজ্জদ নই সদা-ই বুল্‌বুলি ॥’
কলম্বনা রাভী নদীর কিনারে ঐ নগণ্য মক্‌বারায় যে মাধুর্যস সঞ্জন করেছেন বৃন্দা কবি, তার কথা-মাঠও রচনা করতে পারেননি কোটিপতি নূরজাহাঁ তাঁর পিতৃস্মৃতির জোঁলে। তাই দরদী কবি সত্যেন্দ্রনাথ

ইতমদ্‌উদ্‌দৌলার স্থাপত্যে মৃদু হয়ে রেখে যার্নি কোন কাব্যোচ্ছ্বাস, এবং অনুবাদ করে গেছেন ঐ অনবদ্য ফার্সী করে-টিয় :

“গরীব-গোরে দীপ জেদল না, দিও না কেউ ফুল
জুলে,
শ্যামপোকর না পোড়ে পাখ, দাগা না পায়
বুল-বুলে ॥”

* * *

প্রথম প্রকাশকালে যে তথ্যটি পরিবেশন করেছিলাম, সেটা বর্তমান পরিমার্জিত সংস্করণে কিছু বদল করতে হচ্ছে। কারণ ইতিমধ্যে ‘লাডলি বেগম’ নামে একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার উৎসাহী হয়ে নূরজাহাঁ সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য-সংগ্রহ করেছি। লাডলি-বেগমের স্বামী শাহজাদা শাহরিয়ারকে হত্যা করা হয়েছিল বুরহানপুর দুর্গে। আশা ছিল, তার সমাধি সেখানেই দেখতে পাব। মধ্যপ্রদেশের বুরহানপুর কিল্লার গাইড সেটা আমাকে দেখাতে পারেনি।

কিন্তু আগ্রার ইতমদ্‌উদ্‌দৌলা মক্‌বারার গাইড এবার আমাকে মীর্জা গিয়াস্ এবং আসরফ্ বেগম অর্থাৎ নূরজাহাঁর পিতামাতার কবর দেখানোর পর যখন দেখালো নূরজাহাঁর একমাত্র কন্যার কবর, তখন চমকে উঠেছিলাম আমি। বলিছিলাম : সে কি। লাডলি-বেগমের সমাধি তো পাজাবে? শাহদারায়?

লোকটা বলিছিল : নহী বাবুজী! ইয়েই হায় উন্‌কী-কবর! পরে খবর নিয়ে জেনেছি, তথ্যটি হয়তো ঠিকই।

নূরজাহাঁর মৃত্যুর পরে আরও বছর পনের বেঁচে ছিলেন লাডলি-বেগম। তিনি থাকতেন পাজাবে, ঐ শাহদারায়; মায়ের সমাধির কাছাকাছি। মৃত্যুর পূর্বে তিনি একটি আখেরী-আজি পাঠিয়েছিলেন সম্রাট শাহজাহাঁর কাছে কেন তাঁর স্বামীর মৃতদেহ

বুরহানপুর কিল্লা থেকে এনে শাহদারায় সমাধিস্থ করার অনুরোধ সন্মত দেন। ঐ সপ্তে আজি ছিল, তাঁর নিজের মৃতদেহও মায়ের মক্‌বারাতে সমাধিস্থ করার। স্বামীর কবরের কাছাকাছি।

হতভাগিনীর ধারণা ছিল না—সেই এই সাগান্য অনুরোধটুকু রক্ষা করার ক্ষমতাও ছিল না সেদিন শাহজাহাঁর। তিনি তখন আগ্রা কিল্লার বন্দী। শাহজাহাঁর পুত্ররা—দারা-শুজা-মুরাদ রওনা হয়ে গেছে খুর্রমের ভ্রাতৃবৃন্দ—খসরৌ, দানিয়েল, শাহরিয়ারের পথে। শাহজাহাঁর অত সাধের ময়ূর-সিংহাসনে তখন আসীন তার তৃতীয়-পুত্র আলমগীর।

জিন্দা ঔরংকে সম্মান না দিলেও মর্দাকে যথোচিত সম্মান দেবার কানদন ছিল—মুগল জমানায়। তাই শাহদারায় এক অখ্যাত অন্তর্বাসিনীর মৃত্যু হয়েছে সংবাদ পেয়ে হস্তদস্ত হয়ে ছুটে এল পাজাবের শাসন-কর্তা। মৃত্যু নাকি সম্রাট জাহাঙ্গীরের পুত্রবধূ! মুগল-হারেমের অতি সম্মানীয়া মর্দা! মৃতদেহকে কফিন-বন্ধ করে শাসনকর্তা সেটিকে পাঠিয়ে দিল রাজধানীতে। গোকযাত্রা এসে থামল লাল-কিল্লায়।

লাহোর-দরওয়াজার প্রহরী জানতে চাইল কীসের এ গোকযাত্রা? কার এ মৃতদেহ? পরিচয় পেয়ে দুর্দভি-নিলাদ করল নক্করখানার ঘোষক।

সব বস্তান্ত শূনে নয়া শাহ-য়েন-শাহ আলমগীর বাদশাহ্ হুকুমজারী করলেন—‘ও বড়িটার দেহে খানদানী মুগল রক্ত নেই। ওর আশ্বাজান পাঠান; আশ্বাজান—ওর জন্ম সময়ে ছিল পাঠানের স্ত্রী! ওকে যেখানে ইচ্ছা কবর দাও।’

আমীর-ওমরাহ্‌রা নিজেদের বৃদ্ধি বিবেচনামত সিদ্ধান্তে এল—লাডলির দাদামশাই আর দিদিমার সমাধির পাশে শূইয়ে দিল লাডলিকে!

সে গরীব-গোরে দীপজ্বালার বা ফুল দেবার প্রশ্নই ওঠে না। □

শাহজাহাঁ

উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা

সময়কাল

জন্ম (মাতা : উদয়সিংহ-তনরা মানমতী বা যোষবাই) ..	1592
পিতা সেলিমের অভিষেক ..	1606
জাহাঙ্গীর ও নূরজাহাঁর বিবাহ ..	1611
খুদরুম ও আজুবান্দ-বেগমের বিবাহ ..	1612
ভারতে ব্যাপক ব্যবহারিক-স্লেগ ..	1618-24
ঔরঙ্গজেবের জন্ম ..	1618
জাহাঙ্গীরের মৃত্যু ও শাহজাহাঁর অভিষেক ..	1627
মমতাজমহলের মৃত্যু ..	1631
আগ্রা-কিল্লায় খাশমহল, শীশমহল, মীনা মসজিদ, নাগিনা মসজিদ, দেওয়ান-ই-খাশ, নির্মাণ	1631-40
তাজমহল নির্মাণ শুরু	1631
দিল্লীতে রাজধানী অপসারণের সিদ্ধান্ত	1638
লাল-কিল্লায় সৌধসমূহের নির্মাণ	1639-48
লাল-কিল্লায় উন্মোচন মহানুষ্ঠান	1650
দিল্লীতে জাম-ই-মসজিদ নির্মাণ	1644-50
ঔরঙ্গজেব কর্তৃক শাহজাহাঁ কবরী	1658
আগ্রা-কিল্লায় শাহজাহাঁর মৃত্যু	1666

ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্য-ইতিহাসে শাহজাহাঁ সর্ব-বিখ্যাত নাম। বলা হয়, মৃগল-স্থাপত্যকে তিনি গৌরবের গৌরীশৃঙ্গে উন্নীত করেছেন। নিঃসন্দেহে স্থাপত্য ছিল শাহজাহাঁর এক দূরন্ত নেশা : প্যাশান ! মৃগল শিল্পরীতিতে তথা ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যে তিনি একটি নতুন 'স্টাইল' আমদানী করলেন, যার বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য হল—মর্মরের ব্যাপক ব্যবহার, নর পাপড়ি-ওমাজা খিলান, মণি-মুক্তা-খচিত *pictre dura* -নকশার আধিক্য, জাফ্রি-কাজে নিপুণতা এবং আন্তর-বৈশিষ্ট্য হল : আকবরী-যুগের স্থাপত্য-পৌরুষ ও হিন্দু-শৈলী-সখাতা বর্জন। শাহজাহাঁর স্থাপত্য-সুখ্যাতির চার-আনা অংশ আগ্রা-কিল্লায়, চার-আনা লাল-কিল্লায়, চার-আনা দিল্লীর জাম-ই-মসজিদসহ

এখানে ওখানে ছড়ানো আর বাদবাকি ঝোলো-আনা আগ্রার তাজমহলে ! সোজা হিসাব !

শিল্পী-শাহজাহাঁকে করেক শ বছর ধরে নানা বিশেষণে, নানান খেতাবে বিভূষিত করা হয়েছে। স্কুলপাঠ্য ইতিহাস বইতে, টেক্সটবুকের জন্য রচিত গাইড বইতে, এমন কি পাণ্ডিত্য-মণ্ডিত শিল্প-সম্বন্ধীয় গবেষণা-গ্রন্থে। উল্লেখ্য যে কেউ কেউ তাঁকে শিল্পী-হিসাবে লেওনার্দো, মিকেলান্জেলো, স্কিটোফেন, তানসেন, শেরশায়ের বা রবীন্দ্রনাথের সম-শ্রেণীতে তুলতেও পরাম্ভ নন ! বিশ্ব-জগদ্বব্যাপী দরবারে এঁরা সকলেই নাকি সমশ্রেণীর শিল্পপ্রজ্ঞা ! উল্লেখ্য-বিবর্জিত এবং যুক্তি-নির্ভর দৃষ্টিভঙ্গিতে এই তথ্যটা বিচার করার সময় হয়েছে।

বাহি-শাহ-জাহাঁ সম্পর্কেও পশ্চিমেরা বাদে কিছু ঐতিহাসিক নাটকের প্রভাবে সাধারণ বাঙালী স্বতই অশ্রুসিক্ত। জীবনের শেষ আট বছর মহামান্য সম্রাটের কেন্দ্রেই বন্দী-দশায়। প্রাথমিক পুত্র দারাশুকো, মৃত্যুদ, সজা এবং পোষ্ট সুলেমানের অপমৃত্যুবর্তী তাঁকে বুক পেতে সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই অনুভব করা যায়, এ বিষয়ে তাঁর তৃতীয় পুত্র ইতিহাসের চক্খড়িতে মহাকালের পাষণ-ফলকে লেখা পূজাপাদ পিতৃদেবের হস্তাক্ষরে দাগা বুলিয়েছে মাত্র! জাহাঙ্গীর মস্তাবস্থায় তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র বিদ্রোহী খসরোকে অশ্ব করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তার ছোট-ভাই খুর্রমের জিম্বাদারীতে। খুর্রম বর্হানপুর দরগে বন্দী খসরোকে গুলিঘাতকের সাহায্যে হত্যা করে পিতাকে জানালেন, “দাদা কলিক-পেন-এ মারা গেছেন!” জাহাঙ্গীর বুকলেন সবই, কারণ নির্দেশটাও সেই ইঙ্গিতবাহী ছিল।^১ তা-ছাড়া তাঁর আমলের ভারতবিশেষ স্বতন্ত্র হলে 1628 সালে উনিশে জানুয়ারী বৈশাখ শাহ-জাহাঁর অভিব্যক্তি হল “On the very same day he consigned Dawar Bakhsh to prison. Two days later, Khidmat Parast Khan arrived at the prison with a second *farman* and in obedience to it, Asaf Khan put to death Dawar Bakhsh, and his brothers Gurshasp, Shahriyar and Tahmurs and Hoshang, the sons of Daniyal.” [ঠিক সেইদিনই সম্রাট হুকুম দিলেন দাওয়ার বক্শকে (খসরোর পুত্র) কারাগারে নিক্ষেপ করতে। দু দিন পরে খিদমত পারাস্ত খাঁ একটি দ্বিতীয় ফরমান নিয়ে কারাগারে উপস্থিত হল। শাহ-জাহাঁর এই দ্বিতীয় ফরমানের নির্দেশানুসারে আসফ খাঁ একে একে হত্যা করল—দাওয়ার বক্শকে, তার ছোটভাই গার্সাম্পকে, শাহ-খিরারকে (লাউজি-বেগমের স্বামী, যাকে অন্ধ করে এতদিন কয়েদখানার জিইয়ে রাখা হয়েছিল, শাহ-জাহাঁর সেই জড়বাক্যসম্পন্ন ছোট ভাই) এবং দানি-য়ালের (শাহ-জাহাঁর স্বল্পতাত) দুই নাবালক পুত্র তাহমাস আফ হোসাং-কে।]

এদের অধিকাংশই কিশোর ও বালক—দারা-সজা-মৃত্যুদের মত বুকক বা প্রাণ নষ্ট। এবং অধিকাংশই সিংহাসন দাবীর কথা চিন্তাই করেনি, সে বরসই তাদের হয়নি। পাছে কড় হয়ে তারা শাহ-জাহাঁর সুলতানীতে বাধার সৃষ্টি করে তাই এই সাক্ষাৎ! মহাত্মকর্তৃক অনেক-অনেক মহাত্মার অনেক-অনেক অপকীর্তির কথা

লিখে গেছেন বেদব্যাস ; কিন্তু রাষ্ট্রের অন্ধকারে পান্ডবশিবিরে পাঁচটি শিশুকে হত্যা করে আসা বোধ-হয় সবচেয়ে নাকারজনক ; তেমনি মৃগল-জমানার অনেক-অনেক অপকীর্তি, এমন কি জাহাঙ্গীরের নৃশংসতাকেও ছাপিয়ে ওঠে শাহ-জাহাঁর এই গণশিশু-হত্যা। আর মজা হচ্ছে, এই গণহত্যার পক্ষকাল পরে আগ্রা-কিল্লায় উপনীত হয়ে যুবক শাহ-জাহাঁ এক বর্ণাঢ্য বিজয়-উৎসব করেন। সেদিন দিলখুশ বাদ-শাহ্ তাঁর পেয়ারের বেগমকে দুই লক্ষ আসরুফি উপহার দেন, এবং বার্ষিক দশ লক্ষ আসরুফির মাসোহারার ব্যবস্থা করে দেন।^২ অতর্কিত শিশুহত্যার চিহ্নমাত্র নেই শাহ-জাহাঁর বিবেকহীন মানসপটে, পক্ষকালের মধ্যে !

কোনো কোনো সম্ভাবনাময় শিশুশিল্পীর অকাল-মৃত্যু হয়—আপনারা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন—তাদের অভিভাবকদের অতি-উৎসাহের তাড়নায়! গলা তৈরী হতে না হতেই তাঁকে সঙ্গীতের আসরে উপস্থাপিত করা হয়। তুলি বাগিয়ে ধরতে না ধরতেই তার একক প্রদর্শনীর আয়োজন হয় ; বানান রপ্ত হবার আগেই প্রভাবশালী পিতা তার কবিতা সাময়িক পত্রে ছাপিয়ে দেখার ব্যবস্থা করেন! সেই এন্তেজামে এন্তেকাল হয় শিশুশিল্পীর। তার অকালপক্ক দৃষ্টিতে ধরা ও সরা বে-ফারাক্ হয়ে যায়। খুর্রমের বয়স যখন তের, তখন তার আত্মজ্ঞান তাকে কাবুলে নিয়ে যান। উর্তাবাগ নামে এক প্রাসাদে নাবালক-পুত্রকে রেখে জাহাঙ্গীর কিছুদিনের জন্য কোথায়-বুঝি গেছিলেন। “The existing buildings there not being to the Prince's taste, he soon carried out suitable alterations.”^৩ (সেই সাময়িক-আবাসের হর্ম্যরাজী শাহ-জাদার পছন্দ না হওয়ায় তিনি সেগর্দলি ভেঙে হাল-ফাসানের মোকাম বানান) বদলুন কান্ড! তের বছরের বালক! জাহাঙ্গীর ফিরে এসে পুত্রের কীর্তিতে বে-এস্তিরার! আনন্দের আতিশয্যে সম্রাট এক উৎসবের আয়োজন করলেন। পুত্রকে সোনা-রূপা-জহরৎ ও রেশম বস্ত্র ওজন করিয়ে সেগর্দলি গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিজিয়ে দিলেন।^৪ শুধু তাই নয়, চিত্রপ্রেমিক জাহাঙ্গীর এই ঘটনার একটি স্থায়ী স্মৃতিচিহ্নের ব্যবস্থাও করলেন। সমসাময়িক এক বিখ্যাত চিত্র-করের মাধ্যমে^৫ (চিত্র—11.1)।

কাবুলের গরীব-দুঃখীদের তাতে অশেষ উপকার হয়েছিল সন্দেহ নেই—কিন্তু সেইদিনই মৃত্যু পরোয়ানা ঘোষিত হল আগ্রা-কিল্লার সেই পাঁচশত ইমারতের,

যা বানিয়েছিলেন জালাল-উদ্দীন আকবর তাঁর কৈশোরে, হিন্দু-মুসলিম মিশ্রিত-শৈলীর প্রথম পরীক্ষা করতে।

তত্ত্ব-ই-সুলেমানে আসীন হওয়ার পর থেকে ঔরঙ্গ-জীবের হাতে বন্দী হওয়া-তক্ দীর্ঘ একটিশ বছর ধরে শাহজাহাঁ ক্রমাগত ইমারৎ গড়ে গেছেন—শুধু আগ্রা বা দিল্লীতে নয়, যখন যেখানে গেছেন, সেখানেই : কাশ্মীরে, লাহোরে, আম্বালায়, বারী, ফৈজাবাদ, গোয়া-লিয়র, কাবুল, সর্বত্র। তাঁর প্রথম কীর্তি আগ্রা-কিল্লাতে : দেওয়ান-ই-আম। সিংহাসনে উঠে বসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। বোধকারি সেখানেই তাঁর শেষ কাজ : অনবদ্য মতি মসজিদ (1654), যা তাজমহল ও দিল্লীর জাম-ই-মসজিদ ব্যতিরেকে শাহজাহাঁর শ্রেষ্ঠ

দিল্লীশ্বরকেই ছাপিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তাই তুলনা করতে হলে ভিনদেশের কিন্তু সময়কালের আর একজন সম্রাটের কথা মনে পড়ে : ফরাসীদের গ্র্যান্ড মনার্ক, চতুর্দশ লুই। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন 1643 খ্রিষ্টাব্দে, শাহজাহাঁর শাসনসূর্য বখন মঙ্গ-গগনে। আগ্রার তাজমহল যে দশকে শেষ হল প্রায় সেই দশকেই লুই হরোঁছিল পৃথিবীর অপর প্রান্তে : ভার্সাই প্রাসাদ। একই রকম আড়ম্বর, একই রকম জাঁকজমক এবং প্রাক-কলনের মূলরক্ষ একই ভঙ্গিতে আকাশচুম্বী। তাজ ও ভার্সাই প্রাসাদের নির্মাতাম্বরের সাদৃশ্য বিস্ময়কর! জীবন-যাপন পদ্ধতি তাঁদের এক সুরে বাঁধা। আহা-বিহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, শিকার-সঙ্গীত-সুরা-নারীতে আসক্তি ছাড়াও সাদৃশ্য আছে—



চিত্র-11.1 সম্রাট জাহাঙ্গীর খুদরমকে সোনা দিয়ে ওজন করছিলেন।
[মুগল মিনিয়চার; 1615 খ্রিষ্টাব্দে অঙ্কিত; বর্তমানে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত।]

স্থাপত্য-কীর্তি। শাহজাহাঁ-স্টাইলের মূল কথা : মর্মর প্রেম। তারই আনুষ্ঠানিক হিগাবে এসেছে অন্যান্য 'ম্যানারিজম',—নয় পাপাড়ি-ওয়ালা খিলান, সমতল ছাদের চারপ্রান্তে চার ছতী, pietre dura পদ্ধতিতে খোদাই-এর কাজ, মোজেইক এবং জাফ্রিকাটা জালি-কাজ।

শাহজাহাঁ জাঁকজমক ও আড়ম্বর খুব পছন্দ করতেন। এদিক থেকে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সব

দৃষ্টিতেই সুদর্শন, দৃষ্টিতেই 'লেডী-কিলার' : অশ্রু আশ্রয়, দৃষ্টিতেই হারিয়ে উপস্থিত সহস্র সুন্দরীর ভিতর বিশেষ এক-এক জনের প্রতি অনুরক্ত। শাহজাহাঁর মিতীয়া স্ত্রী আজীবন বেগম এক চতুর্দশ লুই-এরও মিতীয়া পত্নী Madame de Maintenon। শাহজাহাঁ এবং লুই দৃষ্টিতেই নিজ নিজ দেশে সর্বোচ্চ-মূল্যের সুন্দরতম সৌখ বানিয়েছেন, খরচের জন্য পরোয়া করেননি। আর দৃষ্টিতেই এক-একটি দীর্ঘ-

স্বারী রাজবংশের শেষ জেলে। তাঁদের পরেই সুখ পাশ্চিমে উল পড়েছে।

কিলাস-বাসনে আকণ্ঠ নিমজ্জমান হলেও শাহজাহা তাঁর পিতৃদেবের মতো অলস, মাতাল এবং কত বা-কিম্বদন্তি ছিলেন না আদৌ। লম্বা-ত্যাগ করতেন সূর্যো-দয়ের দৃ-দৃষ্ট আগে। প্রাতঃকৃত্যাদি সেয়ে উপস্থিত হতেন খোয়াবগাহ-সংলগ্ন তসবিখানায়। নামাজ-অন্তে তসবি-ছড়া হাতে নিয়ে মালা জপ করতেন সূর্যোদয় পর্যন্ত। তখনই এসে হাজির হত দশ-পনের-জন খিদ্মৎগার—তাকে রাজসজ্জার সজ্জিত করতে। বিচিত্র তার কারদা। এক-একজন ভূতা রাজ-অঙ্গে এক-একটি পোষাক পরিরেই কুর্নিশ করতে করতে পিছ-হটে অন্তর্হিত হত। তৎক্ষণাৎ এগিয়ে আসত দ্বিতীয় জন। মোতির মালাটা রাজকণ্ঠে যে দুলিয়ে দেবে, কিম্বা তাজটা বসিয়ে দেবে রাজমস্তকে, বাকি সারাটা দিনে তার আর কোনো কাজ নেই।

আপাদমস্তক মহামূল্য পরিচ্ছদে—সাদা-জরি, সোনা ও মণিমুক্তা সমেত তার ওজন প্রায় চার কিলো-গ্রাম—আবৃত্ত করে শাহ-য়েন-শাহ এসে আবির্ভূত হতেন ঝরোকা-দর্শনের চিহ্নিত গবাক্ষে। কিলাস-বাহিরে ময়দান-সামিল প্রজাবন্দ উদ্ব-মুখে সমস্বরে পুকার দিয়ে উঠত : পাদশাহ্ সালামৎ (বাদশাহ্ দীর্ঘ-জীবী হন)। এ প্রথাটি পারস্য থেকে আমদানী। গুরুতর কোনো অভ্যুদয় থাকলে নিচে থেকে আম-জনতার কোনো মূখপাত্র সে আজি সম্রাটের সমুখে পেশ করতে পারত। যদিও তারা সাহস সঞ্চর করে সেই আইন-মোতাবেক আজি পেশ করেছে বলে কোন ঐতিহাসিক নজর নেই।

ঝরোকা-দর্শনের পর বৃথিকা-মঞ্জিল। রোজ নয়, মাঝে মাঝে। হাতীর লড়াই দেখতে। একমাত্র সম্রাট জিম্ব লড়াই-য়ের আদেশ দেওয়ার অধিকার আর করত ছিল না। বৃথিকা-মঞ্জিলের চব্বতরা থেকে নিচের ময়দানে হাতীর লড়াই স্পষ্ট দেখা যেত। বেগম-মহলের পবাক থেকেও। সে বড় নিষ্ঠুর দৃশ্য। সুমাত্রা, যব-খীপ, অসাম, সিংহাস, বর্মী ও শ্যামদেশ থেকে হাতী আসত রাজধানীতে। মীর মাহুৎ তা-থেকে বেছে বেছে কিছু হস্তিসানকে নির্বাচন করত। বৃথবিদ্যায় তাদের শিক্ষিত করে তোলা হত। যে মাহুতের দল এই খন্দরমুখে হস্তিপরিচালনা করতে সেত, তারা পরিবারকর্গের কাজ থেকে লেশ-বিদায় নিয়েই আসত। এই নশসে দৃশ্যটি দেখতে সব মৃগল-সম্রাটই ভাল-বাসতেন।

বৃথিকা-মঞ্জিল থেকে জাহাপনা আসতেন দেওয়ান-ই-আম-এ।

প্রকাশ্য দরবারের কেন্দ্রে শ্বেত-পাথরের সুউচ্চ মণ্ডের উপর সম্রাটের আসন। পিছনে একসার খিদ্মৎ-গার চামর বাজনরত। দক্ষিণে ও বামে শাহজাদারা। একথাপ নিচে উজীর-এ-আজম আসফ খাঁ, অর্থাৎ মমতাজমহলের পিতৃদেব। একপাশে চাঁদির রেলিং ঘেরা অংশে সিপাহী-সালারদের জমায়েত। বাদিকে নিশানধারী একসার পতাকাবাহী—নিশানে মৃগল বাদশাহীর প্রতীক : উদীয়মান সূর্যের সম্মুখে নত-জান্দ সিংহ। তার ও-পাশে আহাদী আর মনসবদার-দের দল। মীর মুনশী, মীর আতিশ্ অথবা তোপ-খানার মীর মুনসিফ। অর্জ-ই-মুখাররার অর্থাৎ মূখ্য তথ্য-অধিকারিক দাখিল করত বিশাল সাম্রাজ্যের দূর-দূর প্রত্যন্তদেশের নানান সংবাদ। শুনে বাদশাহ্ যদি কোনো ফরমান দিতেন তাহলে তা প্রতহস্তে লিপিবদ্ধ করে চলত একাধিক প্রতীধর। সেগদলি মিলিয়ে দেখে, সংশোধন করে মীর মুনশীকে প্রস্তুত থাকতে হবে, সুযোগমত জাহাপনার পাঞ্জাছাপ সংগ্রহের জন্য। সভা স্তব্ধ চলছে ততক্ষণ অতি মৃদু আলোপে আবহ-সঙ্গীত বাজিয়ে চলত একদল নেপথ্য সঙ্গীতজ্ঞ। তাদের সঙ্গীত যদি প্রতীগোচর না হয়, অথবা রাজ-কার্যে বাধার সৃষ্টি করে তাহলে তাদের গর্দানা যাবে নির্ঘাৎ।

বেলা সাড়ে-এগারোটা নাগাদ শাহ-য়েন-শাহ্ এসে বসতেন দেওয়ান-ই-খাশ্-এ। নিভৃত দরবারে। সেখানে প্রবেশাধিকার কিছু উচ্চপদস্থ পেয়ারের লোকের এবং বাদশাহ্-জাদাদের। উজীর-এ-আজম আসফ খাঁ, প্যারের-দোস্ত্ আফজল খাঁ, আবশ্যিকভাবে সম্রাটের ব্যক্তিগত চিকিৎসক—হাকিম-উল-মুলুক ওয়াজির খাঁ। দারা, সুজা, মুরাদ অথবা ঔরঙ্গজীব, যে যখন রাজধানীতে আছে। বাহিরে প্রতীক্ষা করত বিশ্বস্ত দৃ-একজন জাসদুসী (গদুস্তচর) কিংবা হসীসিয়ুন (গদুস্তঘাতক)। তল্বে হলেই আওরাখায় মূখ ঢেকে ভিতরে যাবে কুর্নিশ করতে করতে। তবে তাদের তল্বে পড়ার আগে মন্ত্রণাসভা আরও জনবিরল হয়ে পড়ত ; ক্ষেত্র-বিশেষে বাদশাহ্-জাদা অথবা উজীর-এ-আজম পর্যন্ত থাকবেন কি না কস। কঠিন। তেমন তেমন ক্ষেত্রে

অর্থাৎ হসীসিয়ুনকে যে আদৌ আহবান করা হয়েছে এ খবরটাও গোপন রাখতে সম্রাট ও প্রকাশ্য দরবার ভেঙে দিয়ে এসে বসতেন হামায-এ। তৈজমদর্শনরত শাহ-য়েন-শাহ্-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসত আপাদ-

মস্তক কালো কাপড়ে ঢাকা কেউ। না-টোলমর্দন-কারী ক্রীতদাসের মাধ্যমে কথাটা জানাজানি হয়ে যাবার আশঙ্কা নেই। লোকটা অত্যন্ত বিশ্বস্তই শব্দ নয়, বোবা এবং কাপা।

কোনো কোনো দিন স্নানের আগে সম্রাট সফর-তদারকীতে যেতেন। সঙ্গে থাকত দারোগা-ই-ইমারৎ আলি মর্দন খাঁ। কিল্লার ভিতর যে-সব মোকামে কাজ হচ্ছে তার তিল তিল বৃদ্ধি দেখতে দারুণ আমোদ পেতেন শাহ-জাহাঁ। ক্রমাগত বিশ-বিশ বছর এ-ভাবে কাজ দেখে দেখেই ঐ চারুশিল্প সম্বন্ধে তাঁর বেশ কিছুটা এলোম পয়দা হয়েছিল।

বলতে ভুলেছি, ঐ দেওয়ান-ই-আমের কেন্দ্রস্থলে প্রতীক্ষা করত 'তন্ত-ই-তোস' বা ময়ূর সিংহাসন। 1628 সালে শাহ-জাহাঁর অভিষেক উপলক্ষ্যে এটি নির্মিত। এ সিংহাসন আজ নিশ্চিহ্ন; এর একটি ব্যর্থ অনুকরণের উপর এই সেদিনও বসেছেন ইরানের শাহ, থোমেনি কর্তৃক বিতারিত হবার পূর্ব পর্যন্ত। ময়ূর সিংহাসন নিশ্চিহ্ন হলেও তার পূর্ণ ইতিকথা ধরে রেখেছে ইতিহাস। সে-আমলে এজন্য খরচ পড়েছিল দশ লক্ষ তুকা, গোটা লাল-কিল্লার যাবতীয় নির্মাণব্যয়ের দশভাগের একভাগ! জমি থেকে কিছুটা উঁচুতে একটি আয়তক্ষেত্রের আসনে শ্বাদশটি স্তম্ভ। উপরে 1.6×1.2 মিটার (প্রায় 6'×4') মাপের একটি সুবর্ণচন্দ্রাতপ—মণিমুক্তাখচিত শ্বাদশটি কনকস্তম্ভ, বৃক্ষকান্ডের অনুকরণে। তা-থেকে সুবর্ণ শাখায় প্রতিটি পত্র হীরকখচিত। প্রতিটি স্তম্ভের উপর এক-জোড়া করে বিকচ-কলাপ ময়ূর—হীরা-মুক্তা-পান্নায় ঠাণা। সিংহাসনে আরোহণ করতে হত একটি রক্ত-সোপান বেয়ে। মৃগল সভাকবি দর্শককে সর্বিনয়ে বলেছেন—বাণীটা খোদাই করা ছিল সোপানের গায়ে : "মণিকার আর কতটুকু মূল্যবৃদ্ধি করতে পেরেছে? এই দীন আসনের তো এটুকুই দাম—ও শাহ-য়েন-শাহ-এর চরণচুম্বনধন্য!"

চাটুকারিচ্ছে এ শ্লোক সিংহাসনের উপযুক্ত!

শিবপ্রহরে হারেমের এক সুসজ্জিত কক্ষে বড়-হাজিরির আয়োজন।

জাহাঁপনা এসে বসতেন তাঁর চিহ্নিত আসনে। সমুখে নানান পদ থরে থরে সাজানো। ইতিপূর্বেই একদল তাতারী 'খানা-তদারিখ' এসে প্রতিটি পাঠ থেকে এক-এক টুকরো তুলে নিয়ে মুখে দিয়েছে, স্বয়ং আজুর্বান্দ বেগমের উপস্থিতিতে। পরীক্ষিত হয়েছে, রত্ননশালায় কোনো আহার্য গোপনে বিষ মেশানো

হয়নি। এসব সম্রাটের নৈপথ্যে। তিনি এসে সিকি-পিরিচ শাহী-পোশাও, আধ-টুকরা মৃগ-মুসল্লম্, অথবা এক চামচ ফিরনি মৃগ দিলেন-কি-দিলেন না। সামান্য দিবানিদ্রা সেরে উঠে দেখতেন, শাহী-পালঙ্কের পায়ের কাছে নিশ্চুপ বসে আছেন আজুর্বান্দ। নিত্য তিশ-দিন। এ সময় হারেমের তরফ থেকে বেগম-সাহেবা কিছু আর্জি পেশ করতেন। কারও মেয়ের সাদির জন্য খিলাৎ, কারও পিতৃশ্রাঘের খয়রাৎ, কখনও বা কোনও বিগতভর্তা মেহেজবানের ভরণপোষণের মাসো-হারা। শোনা যায়, মমতাজমহল অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। তাঁর শীরীন-খয়রাতে অনেক অনাথা আবার পায়ের নিচে জমিনের স্পর্শ পেয়েছে।

মৃগল-হারেম সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই অস্পষ্ট ধারণা। হারেম মানে কিছু ইমারৎ নয়—হারেম একটা 'ইন্সটিটিউশন', একটা প্রতিষ্ঠান। সেখানে বাজার আছে, ধোপাখানা আছে, দর্জিখানা আছে, নাপিত আছে, রান্নাঘর, ভাঁড়ার, খেলার মাঠ, স্নানাগার, শিক্ষায়তন কী নেই? মায় ছোট ছেলে-মেয়েদের 'ক্লেব'। পৃথক তহখানা, পৃথক দফতর,—একটা স্টোটা স্বায়ত্বশাসনব্যবস্থা। হারেম-তন্তের মধ্যমণি তথা প্রশাসনিক প্রধান হচ্ছেন সারাহ-বেগম, পাটরানী। হুমায়ূন থেকে আলমগীর, গোটা গ্র্যান্ডমৃগল জমানার এ-পদে পর্যায়ক্রমে অধিষ্ঠিতা ছিলেন : গুলবদন, মরিয়াম জামানী, সালিমা, নূরজাহাঁ, মমতাজ ও উর্দু-পুরী বেগম। একটা প্রকান্ড ফাঁক থেকে বাছে—মম-তাজের মৃত্যু থেকে শাহ-জাহাঁর মৃত্যু পর্যন্ত, পশ্চিমা বছরের। যতদূর আন্দাজ করতে পারি, ঐ সময়কালে হারেমের মধ্যমণি ছিলেন চিরকুমারী জাহান-আরা, শাহ-জাহাঁর অন্য কোনো পত্নী নন।

হারেমের নিরাপত্তার জন্য তিন জাতের ব্যবস্থা। প্রথমতঃ, তাতারী রমণীদের একটি অল্লর-বেস্টনী। উজ্জ্বলগিস্তান ও তুর্কীস্থান থেকে এদের আনা হত। অত্যন্ত বলশালী, অস্বচালনায় দক্ষ এবং বিশ্বস্ত। বার্নিয়ার বলেছেন, "in comparison the Amazons were soft and timorous" (বাগের ভুলানার স্কিথিয়ার পৌরাণিক নারী যোদ্ধা আমাজন-দেরও মনে হবে পেঙ্গব ও গুঁড়ানম্ব)। দ্বিতীয়তঃ, খোজা-বাহিনী। তারাও হারেমভূক্ত। তৃতীয়তঃ, বিশ্বস্ত এক পুরুষ-বাহিনী; কিন্তু তারা থাকত হারেমের বাহির দিয়ে বেচন করে।

সে রাইহোক শাহ-জাহাঁর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার

ফিরে আসা থাক। অপরাহ্নে বাদশাহ্ যে কবে কোন-
দিকে সফর-তদারকিতে যাবেন, তা কাকপক্ষীতে জানে
না। হয় পুতীবাদগে, নয় দফতর-খানায়, কিম্বা
অম্বাবাসে, পিলখানায়—স্বচক্ষে দেখতে, পোখা
জানোয়ারগুলো ঠিকমতো দানাপানি পাচ্ছে কি না।
সে সময় 'কার কপালে কী যে আছে বলা নাই যায়।'

তদারকিতে যাবার মন না হলে আবার এসে বস-
তেন শাহ্ বৃজ্-এ। দিনের শেষ রাজকাৰ্যে। সারা-
দিনে সঞ্চিত জরুরীবার্তা কিছু থাকলে শুনতেন ও
নির্দেশ দিতেন। কখনও বা আলিমদীন খাঁ, আহমেদ,
হামিদ প্রভৃতি স্থপতিবিদদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ
হত—তাজমহল অথবা অন্য কোন স্থাপত্য বিষয়ে।
পঞ্জাবে একটি আড়াই শ' কিলোমিটার দীর্ঘ খাল
খনন করার প্রস্তাব নিয়ে অনেক দিন তিনি বাস্তুবিদ-
দের সঙ্গে কথা বলেছেন, নকশা ও হিসেব-নিকেশ
পরীক্ষা করেছেন। সে কাজে হাত দেওয়া হয়নি শেষ
পর্যন্ত। তাজমহলের আকাশচুম্বী খরচের জন্যই।
পঞ্জাবের কৃষক চাষের জল পেল না, কালের কপোল-
তলে একবিন্দু নসনের জলের খাতিরে!

শাম-ওস্তুর নামাজের সময় হলে সভা ভঙ্গ হত।
শাহ্ জাহাঁ ছিলেন অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ সুন্নি মুসলমান।
নামাজ ফাঁক কেত না তাঁর। যৌথ নামাজান্তে বাদশাহ্
এসে বসতেন নৃত্য-গীতের আসরে। তারও জমিদার
বদলেছে। আকবরী-আজমে ফতেপুর-সিক্রিতে সঙ্গী-
তের আসর বসত অন্দুপ-তালো-এ, হারেমের বাহিরে।
তানসেন, কৈজ, বাওরা প্রভৃতিদের ঘিরে বসত শূদ্র-
মাত্র পদরূষ শ্রোতা। হারেম থেকে কোনো সঙ্গীতানু-
রাগিনী হয়তো এসে বসতেন; কিন্তু তাঁরা থাকতেন
পিছনের ঝরোকা-ঘেরা পর্দার আড়ালে। এখন ধ্রুপদ-
ধামার-বেয়াল নিয়েছে বিদায়, এসেছে ঠংরী। এখন
পাখোয়াজ-বীণ-তানপুরা গেছে অনাদরের নেপথ্যে,
আসর জমিয়েছে এস-রাজ-ডুগি-তব্জা ও ঘুংঘুট!
তাই সঙ্গীত-সরস্বতী এখন স্কয়ং পর্দানশীন। কাম-
দার মখমলের তাকিয়ায় ঠেঁশ দিয়ে বসেছেন বাদশাহ্
—সামনে সুবর্ণপাত্র ইম্পাহানী ভুঙ্গার, আর বাগ্-
দাদী চষক,—ঠিক যেমনটি দেখেছি ইতমদ্-উদ্দৌলার
প্রাচীর-চিত্রে। আলবোলায় সুগন্ধী তাম্বাকু। আতরের
গন্ধ পাল্লা দেয় বস-রাই গোলাপের সৌগন্ধ্যের সঙ্গে।
প্রকাণ্ড মসুরপাখায় বীজন করে বিকচ-যৌবনা সুন্দরী
বাদী। হারেম-সুন্দরীরা থাকেন আশেপাশেই। আর
সামনের পাখা-চক্কর নিত্য-নতুন-নতুন নূপুর-

নিকণে সর্চকিত হয়ে উঠত সাম্ভা-আসর। শীশ-মহলের
হাজরো দর্পণে প্রতিবিম্বিত হত নৃত্যরতা বাঈজীর
হাস্য-ল্যাস্য-বিমন্ডিত যৌবনোচ্ছ্বাস।

রাত দশটায় ভেসে আসত অনতিদূর নকরখানা
থেকে যামঘোষণা অথবা যমুনার পরপার থেকে
শিবাধবনি। আসর ভাঙত এবার। ওড়না সামাল দিয়ে
সার বেঁধে দাঁড়িয়ে পথ করে দিত বেহেস্ত-হরুর
দল। বস-রাই-গুল্টি হাতে নিয়ে জাহাঁপনা সেই
সারবন্দি অনিন্দ্যসুন্দরীকুলের আদাবকে ম্বিধাবিভক্ত
করে এগিয়ে যেতেন খোয়াবগাহ্-এ। শয়নকক্ষে।

এই মদহর্তৃটির জন্য গোটা হারেম রুদ্ধ নিশ্বাসে
সারাদিন প্রহর গুনত।

সকলেই ইতি-উতি চাইতে থাকে, যেন অন্যমনস্ক,
—কিন্তু সকলেই অলক্ষ্যে লক্ষ্য করে বিশেষ এক-
জনকে। সে বাদশাহ্-র সারাহ্-বাদী—একান্ত-পরি-
চারিকা। সে কোন ভাগ্যবতীর দিকে এগিয়ে যায়।

সম্রাটের আহার পাঠে নিত্য-নতুন খাদ্য,
সঙ্গীতজুরা শোনায় নিত্য-নতুন রাগ-রাগিনী, নর্ত-
কীর বদল হয় প্রত্যহ—শূদ্র মাত্র শয্যাসজ্জিনী বদল
হবে না? এত কড় বেরসিক কোন বাদশাহ্? নিত্য-
নতুন নারীদেহের গোপন রহস্য উন্মোচনের উদ্দীপনা
না থাকলে কিসের এ বাদশাহী?

অবশ্য অধিকাংশ দিনই ডাক পড়ত সারাহ্-
বেগমের : মমতাজ মহলের।

এমন কি রাত্রের প্রথম প্রহর অন্য নারী সঙ্গে যাপন
করার পরেও।

প্রকাণ্ড মর্মরমন্ডিত কক্ষের কেন্দ্রস্থলে বিরাটাকার
শাহ্-পালঙ। শ্বেতশয্যা—পাখির পালক-ঠাসা নরম
গদী, মখমলজড়ানো কামদার তাকিয়া। পাশের
মেজ-এ রাখা আছে সুরা-ভুঙ্গার, চষক, তবক-মোড়া
পান, গোরে মালা, আতরদান। অন্তরালবর্তিনী
খিদমদগারের হেপাজতে-রাখা তাম্বাকুর প্রসারিতবাহু
আলবোলার নলমুখ। সম্রাট কিন্তু সরাসরি শয্যায়
উঠে বসতেন না। এ কক্ষে সারাহ্-বেগমের নিজস্ব
তত্ত্বাবধানে সায়মাশটা সারতেন। এই সময় ঝরোকার
বাহিরে উপস্থিত থাকত কিছু নিপুণ কথাকোবিদ
অথবা উস্তাদ গায়ক। কক্ষের অভ্যন্তরভাগ তাদের
দৃষ্টিগোচর নয়; কিন্তু এ-পাশ থেকে তাদের কণ্ঠস্বর
শোনা যেত। বাদশাহ্-র অভিরুচি অনুযায়ী উস্তাদ
ইমন অথবা কানাড়ায় তান ধরত, অথবা কথাকোবিদ
কিছু পাঠ করে শোনাতো। ফাসীতে। শাহ্ জাহাঁ

আরবী, ফার্সী দুটোই জানতেন। মমতাজও। কোনো কোনো দিন গল্প পাঠ হত—গল্প-ও-বদল-বদল, শিরিন-ও-ফরহাদ, কিম্বা লায়লা-ইয়ে-মজনুন। শাহজাহাঁর আর একটি গ্রন্থ বড় প্রিয়—বাবুর-বাদশাহর আত্ম-জীবনী। না, চুফতাই তুর্কী ভাষায় লেখা মূল গ্রন্থটি নয়, মহাপণ্ডিত আবদুর-রহিম খান-ই-খানান অনূদিত ফার্সী গ্রন্থটি।

হঠাৎ নজর হয় বাদশাহর—বিস্মোষ্ঠে চম্পকাঙ্গারুলি চাপা দিয়ে আল্লেমশয়না মমতাজ একটি বিজ্জ্বলগকে রোধ করবার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন। বাদশাহ হাসেন, বলেন, নিদ্ আসছে ?

সলজ্জ মাথা নেড়ে বেগম-সাহেবা বলেন, না না, চলক না আরও কিছুক্ষণ : জাহাঁপনার যখন অভিরুচি—

বাদশাহ ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলেন, ভুল বলছ ! তোমার জাহাঁপনার অভিরুচিটা অন্য-জাতের।

করতালি দিয়ে ওঠেন আচম্কা। তৎক্ষণাৎ স্তব্ধ হয়ে যায় পাঠকের কণ্ঠস্বর। দ্রুতচ্ছন্দ কিছ্র পদধ্বনি মিলিয়ে যায় পাষণচ্ছব্রে।

বাদশাহ উঠে আসেন তাঁর নয়নের-মণি, দিল্-কা-কলিজা মমতাজের পালঙ্কে। অথবা তার হাতটি ধরে বেরিয়ে আসেন খোয়াবগাহ-সংলগ্ন পূর্বদিকের চব্দ-তরায়। বিশেষ, যে-রাতে চাঁদ ওঠে—যমুনার ঢেউয়ে ঢেউয়ে ঝিকিমিকি নাচতে থাকে চাঁদনীর কণ্ঠক ! সেখানে, সেই জ্যোৎস্নাস্নাত আলিন্দে হয়তো কেঁপে-ওঠা আঙুল দিয়ে শাহ-য়েন-শাহ বসিয়ে দিতেন সেই বসুঁরাই-গুলাবাটি ভারতসম্রাজ্ঞীর আনন্দে-রাঙা কর্ণমূলে।

প্রতিভাবান স্থাপত্যবিশারদ না হলেও শাহজাহাঁ প্রখর বুদ্ধিমান ছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। স্থাপত্য-বিষয়ে শেরশাহ অথবা আক-বরের মতো আলিম ছিলেন না বটে ; কিন্তু ও বিষয়ে জাহাঙ্গীরের মতো উদাসীন অথবা আলমগীরের মতো নিরেট ছিলেন না। গৃহ-নির্মাণ-শিল্পকে আন্তরিক ভালবাসার জন্য ও নিয়ে ভাবতেন, অধিকারীর শলাহ শুনতেন। দীর্ঘদিন এই প্রয়োগবিদ্যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখায়, ঘষে ঘষে যতদূর হয়, ততদূর শিল্প-সচেতনতা তাঁর জন্মেছিল। কিন্তু অভ্যাসের অন্বগে বর্ণিকাভঙ্গে নিপুণতা লাভ করা যায়, ক্যালিগ্রাফীতে

দক্ষতা আনা যায়, মৌলিক স্থাপত্যদৃষ্টি আসে না ! শাহজাহাঁর সৃষ্টিগুণ লক্ষ্য করে দেখুন—শুধুই পৌনঃপুনিকতার ক্রমাবর্তন। অধিকাংশই একতলা মোকাম, ম্বিতল-ম্বিতল-পণ্ডল পরিকল্পনা নেই। উপরে সচরাচর গম্বুজ নেই, সবই জমির সমান্তরাল ছাদ। তাতে একই ধরনের ছত্ৰী। ভিতরে নয় বাক-ওয়ালা খিলান। খিলানের ভার যেসব প্রায়স্তম্ভের (pilaster) উপর পড়ে তার দুই প্রান্তে দুটি অনিবার্য কভেটো। খিলানগুলি প্রায়স্তম্ভের উপর সমান্ত-রালভাবে সাজানো। তারা ইমারতের দৈর্ঘ্যের দিকে এবং প্রস্থের দিকে পরস্পরকে সমকোণে ছেদ করে। আগ্রা-কিল্লার—দেওয়ান-ই-খাশ, খাশ মহল, দেওয়ান-ই-আম, মতি মসজিদ ; দিল্লী লাল-কিল্লার খাশ-আম, রঙমহল, খোয়াবগাহ, হামাম সর্বত্রই ঐ একতলা পরিকল্পনা। সর্বত্রই প্রসারিত-বাহুর ছম্ভা, নয় বাক-ওয়ালা খিলান এবং আদান্ত সাদা মার্বেল ! বৈচিত্র্য নয়, পৌনঃপুনিকতায় বে-এক্টিয়ার এই বাদশাহ। তাই তাঁর দিল্লী-আগ্রা-কাবুল-কাশ্মীর-লাহোরের স্থাপত্য-কীর্তিতে নেই ফতেপুর-সিক্রির বাদগীরের মতো পাঁচ-তলা পিরামিডী পরিকল্পনা, সেখানকার খাশ-মহলের সেই একস্তম্ভের অতুলনীয়তা, বীরকল-প্রাসাদের মতো ম্বিতল-মোকামে ম্বিত-বাঞ্জন্য বৈচিত্র্য, তুর্কী-সুলতানা কোঠির কৃত্রিম পাথরের বাঙলো ধরনের একচালা, বুলন্দ-দরওয়াজার মতো আকাশচুম্বী দাচের সজ্জনা কিম্বা হিরণ-মিনারের মতো রোমান্টিভতন্দ্ স্মারক-স্তম্ভ !

শাহজাহাঁ-শৈলীর আর এক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—আগেই বলেছি, তারা শুধু অন্তরেই নয়, বাহিরেও ‘মমতাজ-নারী’। মসজিদ বর্জ অথবা দিল্লীর জাম-ই-মসজিদ নিতান্তই ব্যতিক্রম—প্রথম ক্ষেত্রে আব-ওয়া-অজদাদকে, ট্রাডিশানকে, অস্বীকার করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল তরুণ সম্রাটের পক্ষে ; ম্বিতীয় ক্ষেত্রে সক্রিয়তী কানুনকে। বাদ বাকি মোকাম কিল্লুল ঔরং !

হিন্দু যুগে স্থাপত্যে পুরুষ-প্রকৃতির সহাবস্থান ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। নাগর-স্থাপত্যে শিখর-সমম্বিত রেখ-দেউল পুরুষ-প্রতীকী, তার কণ্ঠলগ্না পীড়-মণ্ডিতা জগমোহন আবশ্যিকভাবে স্ত্রী-জাতীয়া। হিন্দু-স্থপতি—বিশেষ করে নাগর-স্থাপত্যে, হর্মের লিপ্যন্তর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। রেখ-দেউল ও পীড়-দেউলকে পাশ থেকে দেখলে মনে হত একটি মিথুন, যেন সদা-বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী অগ্নিতে ঘৃতাহতি

দিচ্ছে (চিত্র-11.2)। মুসলমান স্থপতি ইমারৎকে পূরুষ হিসাবে কল্পনা করে এসেছে এতদিন। আক-বরী-জমানা-তক্ ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্য ছিল মূলতঃ পুরুষপ্রতীকী। ইতমদ্-উদ্-দৌলা হচ্ছে প্রথম সংক্রামণ-ধর্মী—‘টোনজিশন-ফেজ’ ; তারপর শাহ-জাহাঁর যুগে স্থাপত্য নিছক প্রমীলারাজ্য।

তাই বলব, স্থাপত্যের নিরিখে আকবর ও শাহ-জাহাঁর পার্থক্য শেক্সপীয়র ও শেলীর! দুজনেই বিশ্বতকীর্তি—কিন্তু মেজাজের ফারাক আশমান-জমিন্। আকবর ভূয়োদর্শী—নিতা-নুতন পরীক্ষায়



চিত্র-11.2 হিন্দু-স্থাপত্যে ইমারতের লিঙ্গভেদ ;
রেশ-পীড় কিংবদন্তি।

উৎসাহী—‘রোপিটেশান’ তাঁর ধাত্তে সয় না। বিশদ্বন্দ্ব হিন্দু-শৈলী, হিন্দু-মুসলমান মিশ্রিত শৈলী, বিশদ্বন্দ্ব মুসলমান-শৈলী তিনই বানিয়েছেন। মজ্জতবা আসী-সহস্রকের ভাবায় ‘কতুবা মুসলমানের প্রাধান্য বেশি, কতুবা হিন্দুর’। মাঝে-মাঝে এ-তিনের মার-দলছট বুলন্দ-দরওয়াজা অথবা হিরণ-মিনার। সেন অসামান্য ট্রাজেডি, কমেডি, মেজোড্রামা-রচনা করার পরেও অবদান সনেট রচনা করছেন শেক্সপীয়র। অপরপক্ষে শাহ-জাহাঁর অভিব্যক্তি একমুখী, শেলীর মতো গিরিক-কবিতার মাদকতা। আল্পদেব দিক থেকে আকবর সর্বত্রগামী না হলেও বিচিরাগামী। একটু হাতে গড়া

এত বিভিন্ন আঙ্গিকের, বিভিন্ন মেজাজের সার্থকসৃষ্টি বিশ্বললিতকলায় অতি অল্পই সৃষ্টি করতে পেরেছেন কোনও মরমানুষ! এখনই যে দীর্ঘ তালিকাটি পেশ করেছি : ঐ আগ্রা-কিল্লার দিল্লী গেট, জাহাঙ্গীরী মহলের বাঙলা-চালা, ফতেপুর-সিক্রির দেওয়ান-ই-খাশ্, দেওয়ান-ই-আম, প্রতিটি বেগমের ভিন্ন ভিন্ন জাতের প্রাসাদ, সেলিম-চিস্তির কবরের ব্র্যাকেট, জাম-ই-মস্-জিদেব করবেলিং, হিরণ-মিনার, বুলন্দ-দরওয়াজা এবং সেকেন্দ্রা প্রবেশ-তোরণের ঐ মিনারিকা-চতুষ্টয়ের পরি-কল্পনা যে একই ব্যক্তির ধ্যানে ধরা দিতে পারে তা যেন বিশ্বাসই হয় না। সমান্তরাল ঐতিহাসিক নজির হিসাবে তিনটি বিচিরাদর্শন শতনরীর কথা মনে পড়ছে, যা তিনজন যুগপুরুষ তিন যুগে পরিয়ে দিয়েছেন বিশ্ব-ললিতকলার কস্বকণ্ঠে : ভার্জিন-অব-দ্য-রক, শেষ সায়মাশ, মিলানের অশ্বারূঢ় মূর্তি, মোনালিজা ও নোটবুক। ডেভিড, পীতা, মোজেস্, সেন্ট পীতর গীর্জা, লরেঞ্জান্তির সমাধিসৌধে উষা-রাত্রি-দিবা-গোধূলী, সিস্তিন চ্যাপেল সিলিঙ ও শেষবিচার। গীতাঞ্জলি, গোরা, গল্পগদ্য, শেষের কবিতা, শান্তি-নিকেতন প্রবন্ধাবলী, কণিকা, বিশ্ব-পরিচয়, সহজপাঠ, ও সভ্যতার স্ফুট!

সম্রাট শাহ-জাহাঁর দীর্ঘ একত্রিশ বছরের সাধনা-প্রসূত অসংখ্য ইমারৎ থেকে এমন একটি বৈচিত্র্যমালিকা রচনা করতে পারবেন না কিছতেই।

তবে হ্যাঁ, জানি, এ তর্কে সুপ্রীম কোর্টের আখেরি রায়টাও জানা আছে আমার ; সে ‘রায়’ : ‘তথ্যপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়!’

তর্কে আমাকে হার মানতে হবেই।

কারণ অন্ত্যাত ঈশা-আফান্দ-নামক তুরূপের টেকা-খানা ঘটনাচক্রে হাতফিরির সময় পড়েছিল ও হাতেই—মার মার নেই : তাজমহল।

আগ্রা-কিল্লার ভূমি-নকশা বা ‘লে-আউট প্ল্যান’ আকবর পরিচ্ছেদেই আলোচিত হয়েছে (চিত্র-9.7)। আকবরের আগলে নির্মিত জাহাঙ্গীরী-মহল ও আক-বরী-মহলও আমরা খুঁটিয়ে দেখেছি। এবার ঐ কিল্লার শাহ-জাহানী ইমারৎগুলি আলোচনা করা যাক। পাবেই বলেছি (পৃঃ 114) আকবর-নির্মিত বহু টঙ্গাবৎ ভূমিসাৎ করে শাহ-জাহাঁ হালফ্যাশানের মার্বেল-মোক্ষাধ টঙ্গরী করেন। সেগুলিই এখানে পরীক্ষামূলক বর্ণনা করা হচ্ছে :

খাশ-মহল : জাহাঙ্গীরী মহলের উত্তরদিকে এবং আঞ্জুরীবাগের পূর্বদিকে এই মোকাটি শাহজাহাঁর ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য নির্মিত। আদ্যন্ত সাদা-গার্বেলের। সম্মুখদৃশ্যে পাঁচটি খিলান, পাশ থেকে তিনটি—যথারীতি নয় পাপড়ি-ওয়ালা ; সমতল ছাদ, দু-পাশে দুটি ছত্রী। এর সঙ্গে এইবার তুলনা করুন দিল্লীতে অবস্থিত লাল-কিল্লার দেওয়ান-ই-খাশের। হুবহু একই বাড়ি ; যেন একে অপরের 'জবাব'। এই দুটি ইমারৎ—যা ভিন্ন দশকে, ভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে নির্মিত—তাদের সম্মুখ বা পার্শ্বদৃশ্য দেখে, প্ল্যান দেখে, যে-কোনও সেকশনাল এলিভেশন দেখে যদি কোনও গোয়েন্দা বলতে পারেন কোনটি 'হাম্‌টি' আর কোনটি 'ডাম্‌টি' তবে তিনি হয় শার্লক হোমস্‌ নয় ব্যালাস্টিক এক্সপার্ট! এক দশক আগে-পিছে যমজ-সন্তান পয়দা করা যদি কৃতিত্ব হয়, তবে সে কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন শাহজাহাঁ। যে কারণে আজকের দিনে বিভিন্ন স্টেট পি. ডাব্লু. ডি., রেলওয়ে, বা সি. পি. ডাব্লু. ডি. ভিন্ন দশকে, ভিন্ন পরিবেশে 'টাইপ কোয়ার্টার্স' তৈরী করেন সে প্রয়োজন নিশ্চয় ছিল না শাহজাহাঁর। তাহলে এ-দুটি সৌধ হুবহু একই রকম হল কেন? স্থপতি হিসাবে জাহাঁপনার দেউলিয়া-পনাই কি এতে ধরা পড়ছে না?

শীশমহল : আঞ্জুরীবাগের উত্তর-পূর্ব কোণে, দেওয়ান-ই-খাশের সম্মুখে নির্মিত এই ইমারতে এত ভালো 'গ্লাস-মোজেইক'-এর কাজ আছে যা ভূভারতে বিরল। দু-পাশে দুটি কক্ষ, একই মাপের (11.55 মি. × 6.40 মি.)। তার মাঝখান দিয়ে নয়-পাপড়ির খিলান-সমন্বিত গমনাগমনের পথ। কাচের কাজের এই নয়নাভিরাম প্রয়োগ কৌশলটি শাহজাহাঁর উৎসাহে বাইজেন্টাইন থেকে ভারতবর্ষে আসে। ভারতীয় শিল্পীরা প্রয়োগ-কৌশলটুকুই এনেছেন—নকশার ডিজাইনে স্বকীয়তার ছাপ। এই ইমারতের মেকের তলা দিয়ে একটি প্রবহমান পয়ঃপ্রণালী থাকায় কোনো কোনো গাইড বইতে একে 'হামাম' বা স্নানাগার বলা হয়েছে। সেটা ঠিক নয় ; জলকে আনা হয়েছে অন্য-কারণে—মূলতঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কক্ষটিকে শীতল রাখতে।

মসজিদ বৃজ : শাহজাহাঁর প্রথম পর্বারের কীর্তি। নিম্নাংশ গোলাকৃতি। আকবরী প্রাচীরের

সঙ্গে ঐকতান রচনা করে একই ধরনের নিরেট পাথরে, একই শৈলীতে নির্মিত। লক্ষণীয়, এটির নির্মাণ সময়ে শাহজাহাঁ তাঁর নিজস্ব স্টাইলটা খুঁজে পাননি। তখনও তিনি আকবরী প্রভাবমুগ্ধ নন। তাই এর স্থাপত্য পুরুষধর্মী। নিম্নাংশে যে অস্ট্রোকর্কিত অলিন্দ তার তলার হিন্দু-শৈলীর ব্যাকেট। এমন কি উর্দাংশের আট-কোণা স্তম্ভবিধিত কিয়দলসম্মিলিতও নয়-পাপড়ি-ওয়ালা ম্যানারিজম্‌ নেই। সেসম্মিলি কবেলিঙ-করা, নিছক হিন্দু বা আকবরী রীতিতে তৈরী। উভয় তলেই ছজ্জার নিচে হিন্দু-ব্রাকেট।

এখানেই শাহজাহাঁর বন্দীজীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়। এর পাশের অলিন্দেই তাক দেখতে দেখতে তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পড়ে। যে দৃশ্যটি অবনীন্দ্রনাথের বিশ্ববন্দিত 'সন্ন্যাসের মৃত্যুতে ধরা পড়েছে।

একটা কথা। অবনীন্দ্রনাথ যদি তাঁর দৃষ্টিকোণ কয়েক মিটার পিছনে সরিয়ে নিতেন তাহলে একটা অদ্ভুত জিনিস ধরা পড়ত তাঁর ছবিতে, যে জিনিস অবনঠাকুরের অতি আপন, অতি আদরের : বাঙলা-দেশের খড়ো চালা! (চিত্র—11.3)।

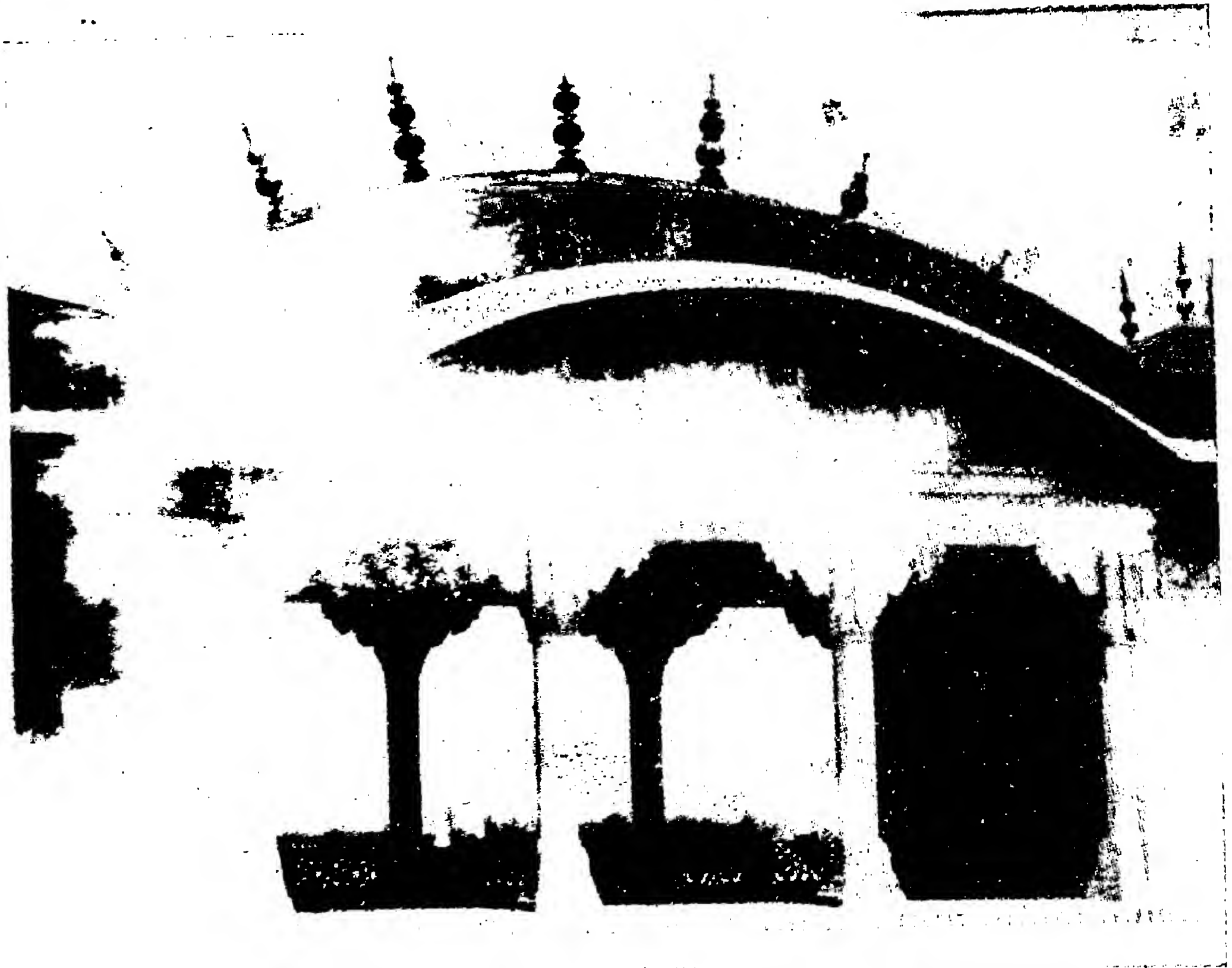
ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যে এটির আয়তনীয় করেন আকবর। ইতিহাস তার সাক্ষী। এ রীতির প্রথম প্রয়োগ খাশমহল সংলগ্ন চবুতরার (বর্তমানে নিশ্চিহ্ন)। আবুল ফজল তাঁর গ্রন্থে একে 'বাস্তুখালী মহল' বলে উল্লেখ করেছেন। সেই বাঙালী কারিগর—যে চাঁদ-পানা বাঁশের ছাউনির 'বাঙলা-চালা'র অনুকরণে এই পাথরের ছাদ বানিয়েছিল, তার নাম ইতিহাস জানে না। তবুটা জানা থাকলে হয়তো সত্যেন্দ্রনাথের 'আমরা' কবিতায় আরও দুটি ছত্র বোগ হত। কিন্তু তাঁর হাতের কাজ শাহজাহাঁকেও মুগ্ধ করেছিল। তাই এই বাঙলা-চালা আগ্রা-কিল্লার মাঝে মাঝে রূপান্তরিত হয়েছে, যেমন এখানে, যেমন নাগিনা মসজিদে। এমন কি ধর্ম্মাশ্রয় আলমগীর এই ছাদে তাঁর মতি মসজিদ বানিয়েছেন লাল-কিল্লায়। সম্ভবতঃ অজ্ঞাতে!

দেওয়ান-ই-খাশ : সম্মুখদৃশ্যে যথারীতি নয় পাপড়ির পাঁচটি খিলান। হুজুমাত্ত সমতলছাদের একতলা মোকাম। তফাতের মধ্যে এখানে স্তম্ভগুলি জোড়ায় জোড়ায়। ছাদের উপর ছত্রী নেই। জোড়াস্তম্ভ নিচেরই একটা নুড়ন আইডিয়া ; কিন্তু ছত্রীর অনুপস্থিতি যৌবন বৈচিত্র্যের পরিচায়ক নয়। মনে

হয়, ছত্ৰী ছিল, ভেঙে গেছে। আর তাই ছাদটা এত নেড়া-নেড়া লাগে।

ফেওয়ান-ই-আম : বৃহত্তর আয়তক্ষেত্র। সম্মুখ-দৃশ্যে নয়টি, পার্শ্বচিত্রে তিনটি শাহজাহানী পাৰ্শ্ব-ওয়াল খিলান। এখন বোধকরি জোড়া স্তম্ভের ফ্যাশন চলছে, এখানেও তাই। একই রকম প্রসারিতবাহু ছল্লা, ছত্ৰীহীন সমতল ছাদ।

নেই, সে চতুর্ভুজ মতি মসজিদে সংশোধিত। প্ল্যানিং-এ কোন বৈচিত্র্য আশা করাই অন্যায্য ; কারণ সেটি ইন্দো-ইসলামী মসজিদ-এর চিরাচরিত ছন্দ-মোতাবেক। শ্রী আর. নাথ বলেছেন, "তাজমহল সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে যেহেতু-এ মসজিদের কাজ শুরুর হয়, তাই আশা করছি তাজের স্থপতিই এ কাজ করেছেন।"^৩ আমরা তাঁর সঙ্গে আদৌ একমত নই। তাজের যে বৈশিষ্ট্য—যার কথা পরে বিস্তারিত আলোচনা করেছি—তার



চিত্র-11.3 আগ্রা-কিল্লার যে অঙ্গিন থেকে শাহজাহাঁ তাজমহল দেখতেন। উপরে বাঙলা-চালা।

নাগিনা মসজিদ : ছোট, কিন্তু নয়নাভিরাম। তিনটি গম্বুজ, মাঝেরটি কিছু বড়। মার্বেলের মোকরর। এখানকার বাঙলা-চালার কথা বলছি। নাগিনা মসজিদে ছত্ৰী-পরিপূরক গম্বুজতা বৃদ্ধ হয়েছে।

মতি মসজিদ : অতি নয়নাভিরাম। নাগিনা মসজিদে কিল্লা-সম্বন্ধিত মিহরাবটি ঠিক পশ্চিমে

কোনও চিহ্ন নাই এ ইমারতের স্থাপত্যে। মতি মসজিদের প্রবেশ পথে ফারসীতে একটি দীর্ঘ বাণী উৎকীর্ণ করা। ইংরাজী অনুবাদে—গুণে দেখছি তাতে ৫৫০টি শব্দ। তাতে অনেক কথাই বলা হয়েছে—‘আব্দুল মুজাফফর শিহাবুদ্দীন সাহিবকিরান-ই-খানি শাহজাহাঁ পাদশাহ্ গাজী’কে এর নির্মাতা বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং তাঁর নানান গুণের কথা বলা হয়েছে। জানানো হয়েছে, এর নির্মাণ ব্যয় তিন লক্ষ তুংকা,

শাহজাহাঁর রাজত্বের ছাব্বিশতম বৎসরে, হিজরা 1063-তে (অর্থাৎ 1654 সালে) এটি সমাপ্ত তাও জানানো হয়েছে। শুধু জানানো হয়নি বেতনভূক স্থপতির নামটা !

আগ্রা-কিল্লায় শাহজাহাঁ নির্মিত ইমারতে মার্বেলের উপর যে-সব নকশা তোলা হয়েছে, তার নৈপুণ্য অসাধারণ। নকশাগর্দল অধিকাংশই পারস্য-রীতির, কিছু আকবরী-চণ্ডের। অল্টো রিলিভো (অর্ধোৎকীর্ণ) কিম্বা 'ইন্লে'-কাজ (মর্মর খোদাই করে ভিন্ন রঙের পাথর বসানো)। মাঝে মাঝে জলাধারে, ফোয়ারায় অথবা পয়ঃপ্রণালীর বিন্যাসছন্দে প্রয়োজনের

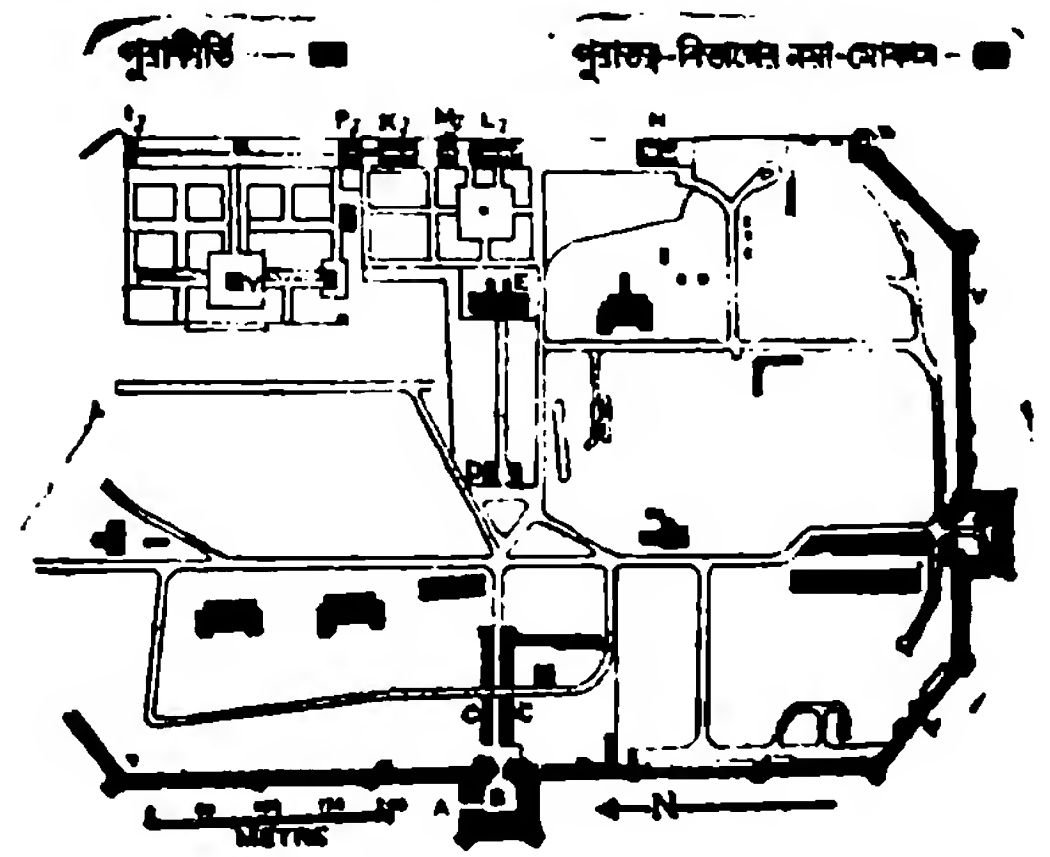
সঙ্গে সৌন্দর্য চমৎকার মিশ্রণ করছে। নিদাঘ শ্বপ্রহরে এখন দর্শকের কাছে কক্ষাভ্যন্তরের শূন্যতা সুর্বলোক প্রাণফলন-জ্ঞানত কারণে পীড়াদায়ক মনে হতে পারে, কিন্তু সে আমলে ওখানে শস্যসের বরোকা টাঙানো থাকত ; তাই ঘরগর্দল স্নিগ্ধ, শীতল ও মনো-রম ছিল। কীচিং কখনও সম্রাট বৌচিত্র্য আনবার চেষ্টা করেছেন—জোড়াস্তম্ভের আমদানীতে, নাগিনা মস্-জিদের বাঙলা-চালায় অথবা নয় পার্শ্বের ক্রান্তিকর খিলান কোথাও কোথাও বর্জন করে। নকশার কাজ সর্বত্র নিখুঁত। সংক্ষেপে বলা চলে, আগ্রা-কিল্লার শাহজাহানী কীর্তি ভাব ও লাভণ্যবোজনায় প্রত্যাশিত সার্থকতা লাভ না করলেও সুনিপুণ বর্ণকাতলে মনোমুগ্ধকর।

লাল-কিল্লা

লাল-কিল্লা দেখতে গিয়ে আজকের দিনে দর্শকের মনে দুটি প্রশ্নের উদয় হয়। এক,—মুগল প্ল্যানিং-এর প্রত্যাশিত সুসম ছন্দ, বাবরী চাহর বাগ-এর জ্যামিতিক বিন্যাসটা কোথায় হারিয়ে গেল? ইমারৎ-গর্দল আদৌ সুবিন্যস্ত নয়। বিক্ষিপ্ত, ছন্দবর্জিত-ভাবে ইতস্ততঃ ছড়ানো। দুই,—স্তম্ভ-সমন্বিত ইমারৎগর্দলিতে দেওয়াল নেই কেন? শীতাতপ থেকে কী-ভাবে রক্ষা পেত ঘরের বাসিন্দা এবং কোতুহলী দৃষ্টির অন্তরালে কেমনভাবে যাপিত হল গৃহবাসীর গাহস্থ্য এবং বিশেষ করে দাম্পত্য জীবন?

প্রথম প্রশ্নটির জবাব : লাল-কিল্লার 'টোউন-প্ল্যানার' হামিদ ও আহমেদ (নাম দুটির উল্লেখ ছাড়া ইতিহাস প্রায় নীরব) আদৌ হর্ম্যগর্দলিকে এনোমেলো ভাবে সাজাননি। সুসম ছন্দটি আজ আমাদের নজরে পড়ে না এজন্য যে, অনেকগর্দল ইমারৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, বাগিচা নিমূর্ল হয়েছে এবং তার চেয়েও বড় কথা—পরবর্তী যুগে যারা মেরামতি করেছেন, রাস্তা বানিয়েছেন, তারা সেই প্রাচীন ছন্দটি না-বুঝে অথবা না-মেনে কেরামতি দেখিয়েছেন। চিত্র-11.4-এ লাল-কিল্লার বর্তমান ভূমি-নকশাটি দেখা যাচ্ছে—নিঃসন্দেহে তা ছন্দ-বিরহিত। কিন্তু ফাগুদ-সন-সাহেব তাঁর কালজয়ী গ্রন্থে 'একটি ভূমি-নকশা ছাপিয়েছিলেন 1910 খ্রীষ্টাব্দে। লেখক জানিয়েছেন, এই 'লে-আউট-প্ল্যানটি' প্রাচীন ফার্সী ভাষায় লিখিত একটি মূল

নকশার অনুসরণে (সেটি ফাগুদ-সনের অধিকারে এই শতাব্দীর প্রারম্ভে ছিল, আশা করছি বর্তমানে পুরা-



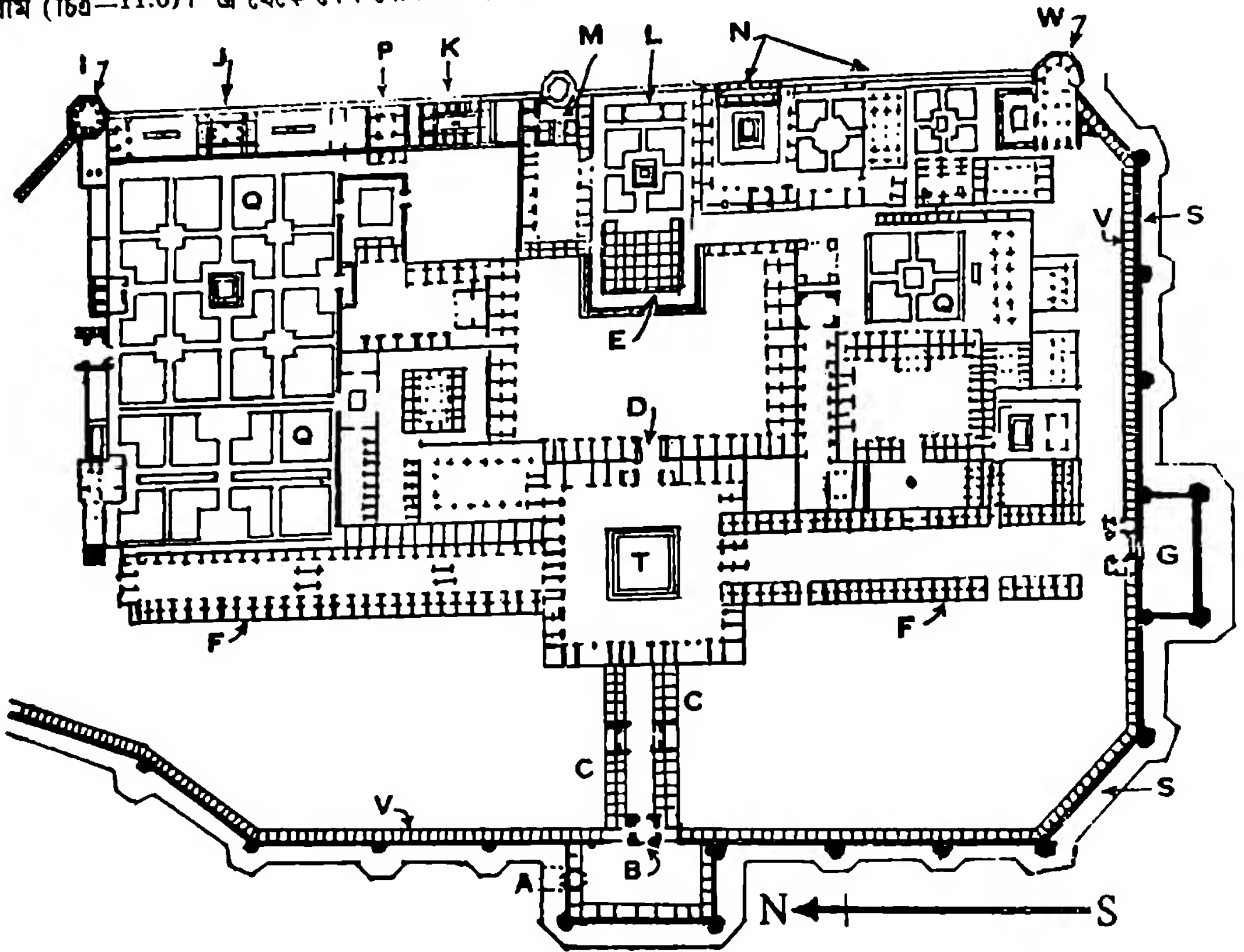
চিত্র-11.4 লাল-কিল্লার ভূমি-নকশা।
বর্তমান অবস্থা।

- | | |
|-----------------|-----------------|
| A—প্রাঙ্গণ | K—দেওয়ান-ই-খাস |
| B—মাহোর গেট | L—রুমহল |
| C—মীনাবাজার | M—খোরাবগাহ |
| D—নকশ-খানা | N—মিউজিয়াম |
| E—দেওয়ান-ই-আম | P—হামাম |
| G—দিল্লী-বরগোরা | V—প্রাঙ্গণ |
| I—মাহ-বুর্জ | |

তত্ত্ববিভাগে সংরক্ষিত আছে)। সেই ভূমি-নকশার একটি অনুলিপি আমরা চিত্র-11.5-এ পরিবেশন করেছি। জ্ঞান দেখে হয়তো সাধারণ পাঠক তদানীন্তন অবস্থাটা ঠিকমতো হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন না, তাই সেটি অবলম্বন করে গরুড়াবলোকনে-দেখা একটি 'আন্দাজী-চিত্র' বা 'কন্জেক্চারাল ড্রইং'-ও যোগ করে দিলাম (চিত্র-11.6)। এ থেকে বেশ বোঝা যায়, হামিদ

চিত্র 'সেক্টারওয়াইজ'-বিভাগ, তার স্বরূপটা বোঝা যাবে চিত্র-11.7 লক্ষ্য করলে। এখানে আমরা 'টোটেল প্ল্যানিং'-এর, অর্থাৎ বিন্যাসছন্দের আখ্যাটিকে তুলে ধরতে চেয়েছি—কোন প্রয়োজনের দিক থেকে কী-ভাবে অঙ্গগদলি সাজানো হয়েছে।

ফিরোজশাহ কিল্লার অনুসরণে পারিবারিক প্রয়োজনের ইমারৎগদলি শহরের পূর্বপ্রান্তে, নদীকিনার



চিত্র-11.5 লাল-কিল্লার ভূমি-নকশা ; শাহজাহানী জমানায়।

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------|
| A—দ্ব-বীজ বা কঠোর সাকো | G—দিয়ারী-দরওয়াজা | P—হামাম |
| B—মাহার গেট | I—শাহ-বুর্জ | Q—চাহ-র বাগ |
| C—দুইসারি হলের মাকশান দিবে প্রবেশপথ | J—মতিমহল | S—পরিখা |
| D—নক-করখানা | K—দেওয়ান-ই-খাশ | T—তালো |
| E—দেওয়ান-ই-আম | L—রঙমহল | V—দর্গ-প্রাচীর |
| F—মীনাবাজার | M—খোরাবগাহ | W—আসাদ বুর্জ |
| | N—বেগম মহল | |

বা আহমেদ লাল-কিল্লার ভূমি-নকশা ছকবার সময় বাবদুরী চাহ-র বাগ প্রথাকে অস্বীকার করেননি।

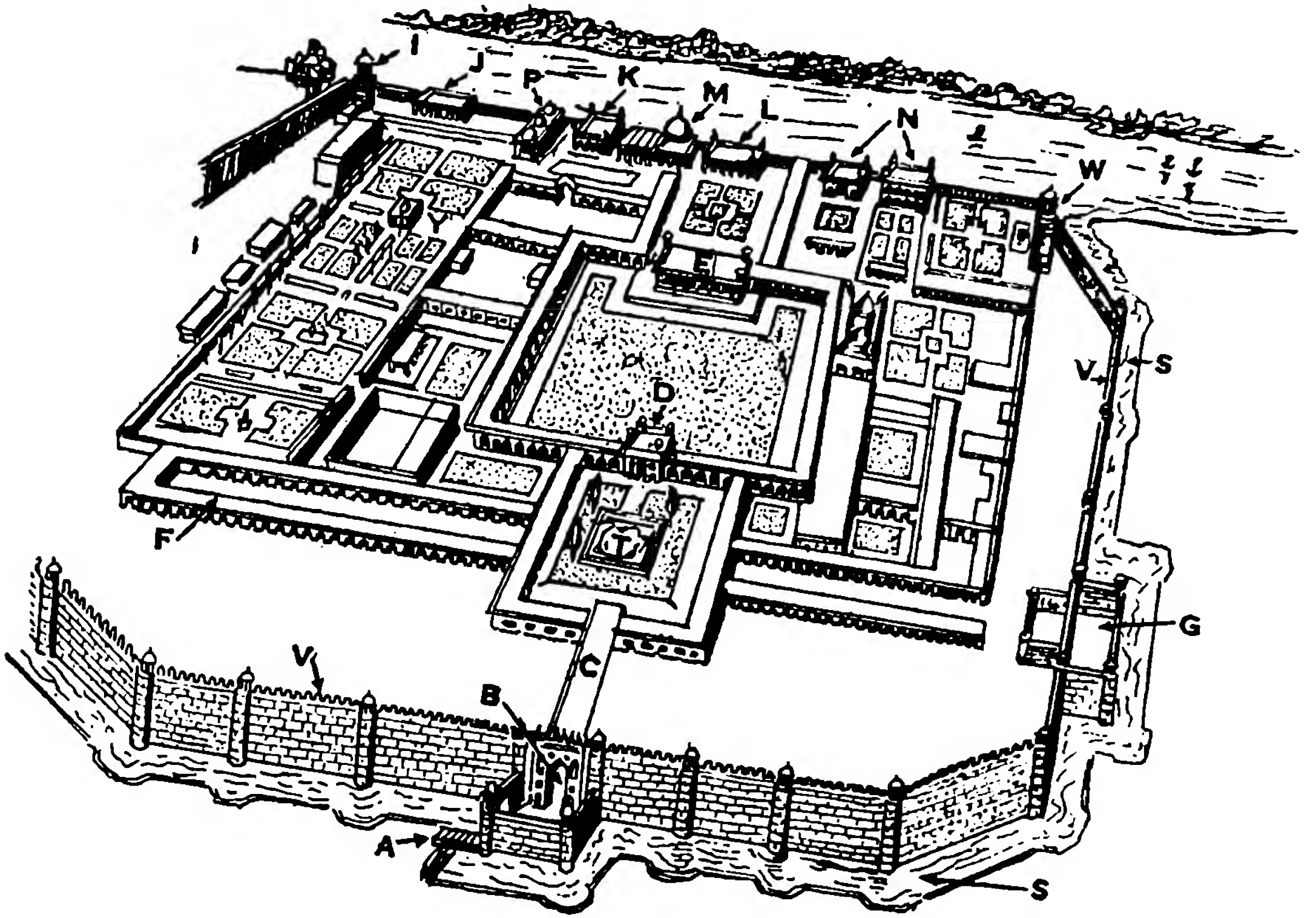
প্রকৃত প্রস্তাবে বিন্যাসছন্দটি রাজনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক—এই তিন প্রাথমিক প্রয়োজনের দিক থেকে অত্যন্ত সুবিন্যস্ত। নগর পত্তনের যে মৌল

বরাবর। মাঝখানে সম্রাটের আবাস, তার উত্তরে শাহজাদা এবং দক্ষিণে বেগমমহল। পশ্চিমপ্রান্তের কেন্দ্রবিন্দুতে (চিত্র-11.7) প্রবেশপথ (1); যেখান থেকে চওড়া সড়ক (2) বেয়ে আসতে হবে একটি বর্গক্ষেত্র আকারের উদ্যানে। তার কেন্দ্রস্থলে একটি জলাশয় (3) এবং

পশ্চিমপ্রান্তে নক্করখানা (4)। ঐ জলাশয়টির (3) দক্ষিণে উত্তর-দক্ষিণ লম্বা বিপণীর সারি-বাজার (12); দক্ষিণদিকে বাজারের শেষ প্রান্তে নিরাপত্তার জন্য দ্বিতীয় নিষ্করণম্ভার (15)। বাজার ও প্রাচীরের মাঝখানে সদপারিসর স্থানে নিরাপত্তার জন্য আরক্ষা-বাহিনীর ছাউনি (14)।

সম্ভাবনা নেই।

আম-দরবারের পিছনে একটি ক্ষুদ্র বাগিচা (6); তার উত্তরে জাহাপনার একমুখ দরবার (8), দক্ষিণে বেগমদের (9) এবং সরাসরি নদীকিনারে প্রমোদকক্ষ (7)। শাহজাদাদের আবাস গণপটে দ্রুত রেষে (11) সম্রাটের বাসস্থান নদীকিনারে (10)।



চিত্র-11.6 লাল-কিল্লার ভূমি-নকশা, গরুড়াবলোকনে।

A—ড্র-বীজ বা সাঁকো	I—শাহ-মহল	Y—চাহ-রবাগ
B—লাহোর গেট	J—মতিমহল	S—পরিখা
C—প্রবেশপথ	K—দেওয়ান-ই-খাশ	T—তলাও
D—নক্করখানা	L—রঙমহল	V—দুর্গপ্রাকার
E—দেওয়ান-ই-আম	M—খোয়াবগাহ	W—আসাদ বজ
F—মীনাবাজার	N—বেগম মহল	
G—দিল্লী-দরওয়াজা	P—হামাম	

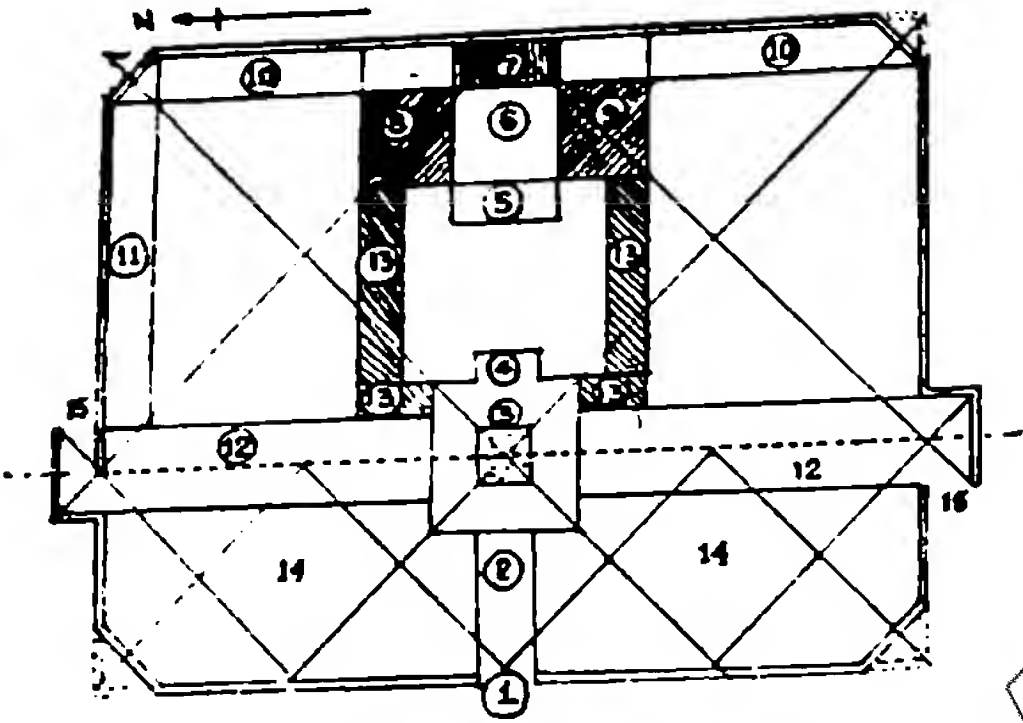
নক্করখানার পিছনে পুনরায় একটি প্রশস্ত উদ্যান, দফতরখানার কক্ষ (13) দিয়ে ঘেরা। তার সমুখে দেওয়ান-ই-আম (5)। এই পর্যন্ত বহিরাগতদের প্রবেশাধিকার, যেহেতু 12-চিহ্নিত বিপণীর পূর্বপ্রান্তে উত্তর-দক্ষিণ লম্বা নিশ্চিহ্ন টানা প্রাচীর; তাই কোন বহিরাগতের পক্ষে অন্দরমহলে ঢুকে পড়ার কোনও

এইবার চিত্র-11.4-এর সঙ্গে চিত্র-11.5 মিলিয়ে দেখুন : নক্করখানার সম্মুখস্থ তলাওটি (T) নিশ্চিহ্ন। ইতস্ততঃ সড়ক নির্মাণ করায় মূল ছন্দটা অবলুপ্ত। তার চেয়েও করুণ অবস্থা হয়েছে এখানে-ওখানে নয়া-কোঠি বানানোতে। এছাড়া বেগম মহলের ইমারৎগুলি ভূমিসাং হওয়ায় এখন মনে হয় নগর-বিন্যাস অহেতুক

উত্তর ঘেঁষা।

দ্বিতীয় প্রশ্নটির জবাব : অধিকাংশ ইমারতের বাইর দিয়ে জালিকাজ-করা করোকা প্রাচীর ছিল। এ বিষয়ে ফতেপুর-সিক্রি দর্শনকালে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে। সেই জালিকাজ-করা মর্মর-প্রাচীরের ভিতরদিকে খশখশ টাঙিয়ে ভিজিয়ে দেওয়া হত। ফলে শীতাতপ থেকে রক্ষা পাওয়ার বিকল্প ব্যবস্থা ছিল।

এই প্রসঙ্গে আরও বলি—অনেকের ধারণা, গাইড-রাও তাই বলেন,—দরজাগুলিতে পাল্লা থাকত না। শব্দ অস্বচ্ছ পর্দা কুলত এবং তার বাহিরে নগ্ন কৃপাণ



চিত্র—11.7 লাল-কিল্লার প্ল্যানিং-এ ব্যবহারিক বিন্যাসছন্দ।

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. মূল প্রবেশদ্বার | 8. গোপন মন্ডপা |
| 2. প্রবেশপথ | 9. বেগম মহল |
| 3. বাহকের পানীয় | 10. সম্রাট মহল |
| 4. ঘোষণার আয়োজন | 11. শাহজাদা মহল |
| 5. জনসংযোগ | 12. মীনাবাজার |
| 6. চাহর বাগ | 13. দফতর |
| 7. নৃত্যগীতের আসন | 14. নিরাপত্তা |
| 15. আপেক্ষালীন নিষ্করণদ্বার। | |

হস্তে খোজাপ্রহরী পাহারা দিত। ঐতিহাসিক উপ-ন্যাসগুলির বর্ণনাও সেই ইঙ্গিতবাহী। আমার এ বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। নগ্ন কৃপাণহস্তে খোজা-প্রহরী স্বাদের বাহিরে অষ্টপ্রহর প্রহরায় থাকলে নিরাপত্তা নিশ্চয় রক্ষিত হয় ; কিন্তু তা সত্ত্বেও গৃহ-ভয়ঙ্কর নয়নারীর গহস্থ—বিশেষ করে দাম্পত্য-জীবনে একটা কাজি বিধে থাকবেই। সে-কাজি মানসিক, 'সাইকোলজিকাল'। প্রহরী তা দূর করতে পারে না, পারে শব্দ অঙ্গসন্ধ কবাট। একজন আমি ফতেপুর-সিক্রিও বিশেষভাবে লক্ষ্য করে দেখেছি। বহু স্বেদে 'হিজ' এবং

'টাওয়ার বোল্ট' বা ছিটকানির চিহ্ন স্পষ্টে দেখা যায়। দু-একটি ক্ষেত্রে—যোধবাঈ-মহলে, তুর্কী-সুলতানা কোঠিতে এবং বুলন্দ-দরওয়াজায় সে-আমলের কাঠের চোকাঠ অথবা পাল্লার ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যায়। তাতে হিজ, ছিটকানি অথবা হুড়কোর অস্তিত্ব নজরে পড়ে। আগ্রা-কিল্লা এবং লাল-কিল্লাতেও তা দেখেছি ; কিন্তু সেই মোকামগুলি ব্রিটিশযুগে ব্যবহৃত হয়েছিল, ফলে তা পরবর্তী যুগের সংযোজন কিনা বোঝা যায় না। অপরপক্ষে পরিত্যক্ত ফতেপুর-সিক্রির ঐ চিহ্ন প্রমাণ দেয় যে, মৃগল যুগে দরজায় পাল্লা থাকত। তাছাড়া ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাসের বর্ণনা যেরকমই হোক, সমসাময়িক ইতিহাসে আমরা রুম্মস্বাদের বর্ণনা একাধিকবার পেয়েছি। আধম খাঁকে আকবরের অন্তর-মহলে প্রহরী ঢুকতে দেয়নি কবাট রুম্ম করে ; বৃহন্নপূর দরগে খুররম-নিয়ত গন্তঘাতক নির্দিষ্ট শাহজাদা খসরুকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করতে পারেনি, কপাট রুম্ম থাকায়।

দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করার পর (1638) প্রায় দীর্ঘ দশ বছর সময় লেগেছে লাল-কিল্লার বিভিন্ন ইমারৎ, উদ্যান, পরিখা ও প্রাচীর নির্মাণ করতে। সে-আমলে খরচ হয়েছিল দশ কোটি তক্ষা। লাল-কিল্লায় দুটি দরওয়াজা। শহরের দিকে, পশ্চিমপ্রান্তে লাহোরী দরওয়াজা। সেটাই বর্তমানে প্রবেশপথ। এখন তার উপর আছে পাকা সাঁকো। শাহজাহানী জমানায় সেখানে ছিল একটি কাঠের 'ড্র-ব্রীজ', যা প্রতিদিন ওঠানো-নামানো হত। নগরের দক্ষিণপ্রান্তে 'এমার্জেন্সি এক্সিট' : দিল্লী-দরওয়াজা। তার বাহিরের দিকে যে হস্তিমূর্তি দুটি দেখছেন, যার কথা পূর্বেই বলেছি (চিত্র—9.9) তা নিতান্ত হাল-আমলের, শাহজাহানীর গড়া নয়। ঔরঙ্গজেব তক্ত-তাউসে উঠে বসে যখন কালাপাহাড়ী ধ্বংসলীলার প্রাচীন শিল্পগুলি মূছে ফেলতে বন্দ-পরিকর হয়,—সেকেন্দ্রা ও ফতেপুর-সিক্রির মন্ডাল-গুলি চুনকাম করিয়ে দেয়, তখন ঐ পাথরের হাতী-দুটিকেও ভেঙে ফেলা হয়। বর্তমান শতাব্দীতে লর্ড কার্জন লাল-কিল্লা সংস্কারের সময় একই রকম দুটি হস্তিমূর্তি নির্মাণ করিয়ে ওখানে বসিয়ে দেন।

নক্করখানা : বাস্তু-নকশায় আয়তক্ষেত্র, উচ্চতায় দ্বিতল, রক্তিম বাগিপাথরে তৈরী এই সৌধ থেকে প্রহরে প্রহরে যামঘোষণা করা হত (D)। সম্মানীয়

কোনও অতিথি এলে এখান থেকে নাকাড়াবাদক তাঁর আবির্ভাব ঘোষণা করে সবাইকে জানিয়ে দিত। আগন্তুক হস্তিপৃষ্ঠে এলে এখানে তাঁকে অবতরণ করে বাকি পথ পদব্রজে বা পাল্কিতে যেতে হত। এটি নহবৎখানাও বটে। নক্করখানার পাশে ফসকে একাধিক রাজরত্নের মত্যা-স্বাক্ষর। জাহান্দারশাহ (1773) এবং ফারুকশিয়ার (1719)।

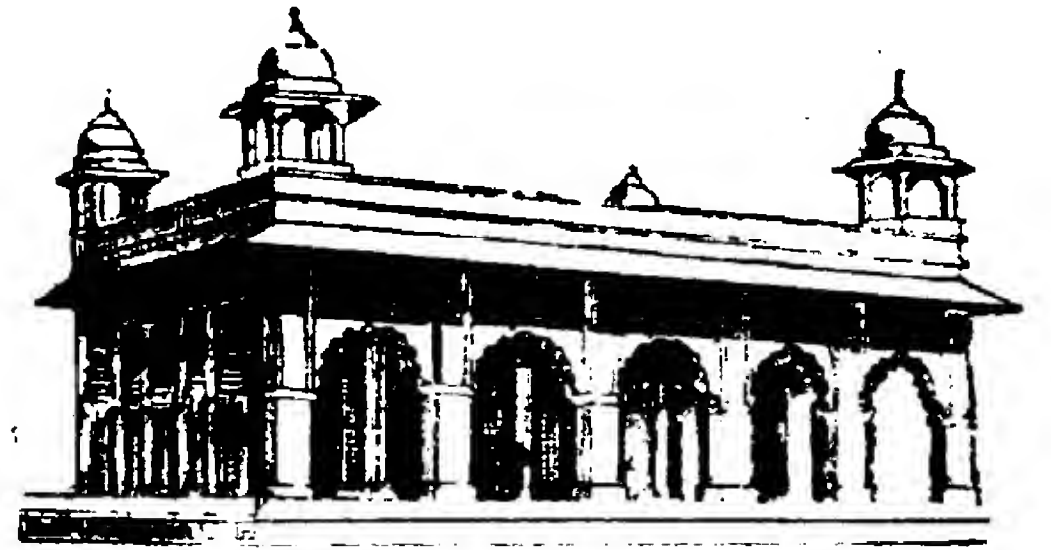
দেওয়ান-ই-আম : প্রকাণ্ড বাগিচার পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত এই ইমারতের (E) আকারও আয়তক্ষেত্রের। সম্মুখদৃশ্যে নয়টি খিলান, পার্শ্বদৃশ্যে তিনটি। সব-গর্দুলিই নয়-পাপড়ি-ওয়ালা শাহজাহানী খিলান। কেন্দ্রস্থলে পূর্বপ্রান্ত ঘেঁষে মর্মর সিংহাসন। পিছনে নানান কারুকার্য-শোভিত একটা পশ্চাদপট। তাতে নানান রঙিন-পাথরে 'ইন্লে'-কাজে ফুল-লতা-পাতা-পাখি। সঙ্গে বাইনোকুলার থাকলে কেন্দ্রীয় প্যানেল-টিকে সন্ধ্যা করবেন। খালি চোখেও অস্পষ্ট দেখা যায় : একটি বৃক্ষতলে গ্রীক দেবতা অরফিউস্ বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছেন। চিত্রটি রাফায়েল অনুসরণে। এটি তদানীন্তন দক্ষ শিল্পী Austin de Bordeaux-এর হাতের কাজ। 'বোর্দো' নামটা মনে রাখবেন, কারণ তাজমহলের মূল পরিকল্পনাকার হিসাবে এ'রও একটি 'ক্যান্ডিডেচার' আছে! খোদার কুদ্রতে এই শিল্পটি শাহ-য়েন-শাহ আলমগীরের নজরে পড়েনি। তাই আজও অরফিউস বাজিয়ে চলেছেন : "Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter/ Therefore, ye soft pipes play on..."

মমতাজমহল : এখানে নয়টি ইমারৎ ছিল (N) ; যার তলা দিয়ে প্রবাহিত হত একটি স্বচ্ছতোয়া মর্মর পয়ঃপ্রণালী : নহর-ই-বিহিস্ত। স্বর্গীয় স্নোতস্বিনী! এই নয়টি ইমারৎ সম্মিলিতভাবে ছিল হারেম। ষেটুকু টিকে আছে তাতেই বর্তমানে অবস্থিত : 'দিল্লী মার্জিয়ম অব্ আর্কিওলজি।' মৃগল যুগের অনেক দুলভ বস্তু ও চিত্র সেখানে সংরক্ষিত। এটি দেখতে ভুলবেন না যেন।

রঙমহল : স্থাপত্যের নিরিখে বিশেষ কোনও বৈচিত্র্য নেই (L)। সেই সারি সারি নয়-পাপড়ি-ওয়ালা খিলানের তলা দিয়ে প্রবাহিত নহর-ই-বিহিস্ত। মাঝখানে একটি মর্মরপদ্ম, মেঝেতে খোদাই করা। তাতে চম্বিশটি পাপড়ি। কেন্দ্রস্থলে সে-আমলে ছিল একটি

গজদন্ত-নির্মিত ফোয়ারা। তা দিয়ে গোলাপজল নির্গত হত। উপরের সিলিংয়ে ছিল ছোট ছোট আরসি। একক্ষণটিকে কেউ কেউ গাইড বইতে শীলনহল বলে-ছেন।

খাশ্মহল : তিনটি বিভাগ : খোয়াবগাহ (M), তস্বিখানা ও তোশখানা। শাহজাহান দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রাথমিক পর্যায়টা স্মরণ করুন—নিদ্রাস্থলে তস্বিখানায় মালাজপ এবং তোশখানায় গল্পগাছা করা। খোয়াবগাহ পূর্বপ্রান্তে অষ্টভুজাকৃতি টাওয়ার থেকে সন্ধ্যাট প্রীতিদিন প্রজাবন্দকে 'করোকা-দর্শন' দিতেন (M)। আম-জনতা সন্মিল হত কিল্লার বাহিরে—যমুনাতে, প্রশস্ত ময়দানে। এখানে যে ঝোলা বারান্দাটা দেখছেন ওটা শাহজাহানী আমলে ছিল না। দ্বিতীয় আকবরের (1806-37), পরবর্তী সংযোজন। এই ঝোলা-বারান্দা থেকে ইংল্যান্ডের পঞ্চম জর্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরী দিল্লীবাসীদের দর্শন দিয়ে ধন্য করেছিলেন!



চিত্র-11.8 দেওয়ান-ই-খাশ্ম, লাল-কিল্লা।

দেওয়ান-ই-খাশ্ম (K) : আগেই বলেছি, স্থাপত্যের বিচারে আগ্রার খাশ্ম-মহলের সঙ্গে এর কোনও কার্যক নেই (চিত্র-11.8)। উপরে কাঠের সিলিংয়ে যে সোনালী নকশা দেখতে পাচ্ছেন ওটা মৃগল-জমানার নয়। 1911-এ ইংল্যান্ডের এখানে আসার সময় ঐ সিলিংটা সোনালী রঙে গিল্টি করা। ফার্দুসনের মতো পণ্ডিত দিল্লীতে উপস্থিত থাকতে ইংরাজ কেন এতবড় ভুল করেছিল জানি না। যে মুসলমান সম্রাটের কাছ থেকে শাসনদণ্ড ছিনিয়ে নিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের তাঁর পূর্ব-পদব্র্শ ঠিক এই কক্ষেই উপবেশন করতেন বিশ্ববিখ্যাত সোনার ময়ূর সিংহাসনে। সিলিং-এর সোনালী গিল্টি-করা নকশায়, তুলনামূলক বিচারে সেদিন বিদ্যুৎ ভারতবাসীর দৃষ্টিতে ইংল্যান্ডের যে শব্দ

উপহাসাস্পদ হলেন এটা কি কোন ইরাজ খেয়াল করেনি?

এখান থেকেই নাদিরশাহ মস্জিদ সিংহাসন লুট করে নিয়ে যান (1739)।

আর এখানেই ইমারতের কোণায় উৎকীর্ণ করা আছে কবি আমীর খসরোর সেই বহুশ্রুত বসে :

“অগর কিসেসি বার রু—স্বী জমিন অস্ত্

হমিন্ অস্ত্ বহ্ হমিন্ অস্ত্

বহ্ হমিন্ অস্ত্।”*

হামাম : দেওয়ান-ই-খাশের উত্তরে হামামের (P) তিনটি অংশ। দ-পাশের দুটি ঘর হচ্ছে শাহজাদা-শাহজাদীদের স্নানাগার। পূর্বদিকের ঘরটি—যাতে তিনটি ফোয়ারা আছে, সেটি বস্তু-পরিবর্তন-কক্ষ। মাঝের ফোয়ারাটি দিয়ে নাকি গোলাপজল নির্গত হত। পশ্চিমের স্নানঘরে গরমজলের বাষ্প শীতের দিনে স্নানের আয়োজন। জল গরম করার যান্ত্রিক ব্যবস্থার ষেটুকু চিহ্ন আছে তা গাইড আপনাকে দেখিয়ে দেবে।

মস্জিদ : শাহজাহাঁ প্রতি শুক্রবারে কিল্লার বাহিরে জাম-ই-মস্জিদে গিয়ে আম-জনতার সঙ্গে একসাথে নামাজ পড়তেন। প্রাত্যহিক উপাসনার আয়োজন ছিল, আগেই বলেছি, খোয়াবগাহ সুলতান তসবিখানায়। ব্যক্সাটা পছন্দ হল না আলমগীরের। তার মূল হেতু কী, তা বলা কঠিন—জনসাধারণ থেকে দূরে থাকার প্রেরণা, নিরাপত্তার প্রয়োজন অথবা নিছক ধর্মান্ধতা। সে যাই হোক—এই তিন গম্বুজওয়ালা মর্মর-মস্জিদটি আলমগীর জমানায়, লাল-কিল্লায় একমাত্র উল্লেখযোগ্য সংযোজন। গম্বুজ তিনটিকে লক্ষ্য করুন—এক পুরুষেই তাজমহল মনোরম পেয়াজী চঙটি অন্তর্হিত। সে যেন মিতালী করতে চায় অনাগত যুগের সফদর-জঙ্ঘ গম্বুজের সঙ্গে। এক পুরুষেই আলমগীর গম্বুজের গলা টিপে ধরেছে!

প্রসঙ্গটা যখন উঠেই পড়ল তখন সংক্ষেপে শেষ ‘গ্র্যান্ড মগল’ আলমগীরের স্থাপত্যচিন্তার কিছু ইঙ্গিত এখানে রেখে যাই। আলমগীর অত্যন্ত ধর্মান্ধ। গোঁড়া মুসলমানই শাহ নন, সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন সুন্নি মুসলমান। তাই শূদ্দ হিন্দু নয়, সিয়া-সম্প্রদায়-ভুক্ত মুসলিম রাজাগুলিকেও তিনি পদানত করতে

* স্বর্গ যদি মনের জ্বল ধরায় বাক্যে সেমেন্ট থাকে, এইখানেই, এইখানেই, এইখানেই দেখুন তাকে।

বস্তুপরিষ্কার হয়ে পড়েন। এই ধর্মান্ধতাই তাঁর, তথা মগল-সাম্রাজ্যের পতনের সর্ববৃহৎ কারণ। হিন্দুদের মন্দির ধ্বংস করে সেখানে মস্জিদ বানানোর জন্য আলমগীর পাগল। কাশীতে বিশ্বেশ্বরের মন্দির ধ্বংস করে একটি মস্জিদ তৈরী করেন। তার সুউচ্চ মিনারটি যতদিন টিকেছিল ততদিন,—দুর্ভাগ্য আলমগীরের—পরিচয় বহন করত : ‘বেণীমাধবের ধ্বজা’! তারপর আলমগীর মথুরাতে ‘কেশবদেব’-এর একটি অপূর্ব মন্দির ধ্বংস করেন। জাহাঙ্গীরের আমলে সেটি নির্মাণ করিয়েছিলেন বৃন্দেদারাজ বীর সিং। তেরিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে। বিদেশী পর্যটক তাভার্নিয়ের সেটি দেখেছিলেন 1650 সালে, বার্নহার 1663-তে। দুজনেই উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করেছেন। নামসায়ুজ্যে সাহস করে বলতে পারছি না, এই বীর সিং-ই আবুল ফজলকে হত্যা করেছিলেন কি না। কারণ ফাইল-কপি যতদূর ছাপা হয়েছে তা পাঠ করে জনৈক ইতিহাসের পণ্ডিত আমাকে জানিয়েছেন যে, সুলতান জালাল-উদ্দীনকে যে স্বহস্তে হত্যা করে তার নাম ‘মালিক কাপুর’^{১৫}। কিন্তু সে ইতিহাসখ্যাত ‘মালিক কাপুর’ নয় (পৃঃ 45)। কেশবেশ্বরের মূর্তিটি অবশ্য সন্যোগ-স্বপ্নে মন্দির ধ্বংস হবার পূর্বেই অপসারিত করতে পেরেছিলেন উদয়পুরের রাণা রাজসিংহ। জীবনের শেষ পঁচিশটা বছর ঔরঙ্গজীবের কেটেছিল দাক্ষিণাত্যে। সেখানেই ঔরঙ্গাবাদে তাঁর একমাত্র উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য-কীর্তি : বিবি-কা-মক্‌বারা। তাজমহলের বার্থ অনাকরণ! দাক্ষিণাত্য বিজয়ের বার্থ তার স্মারক যেন!

দিল্লীর জাম-ই-মস্জিদ : লাল-কিল্লার বাহিরে, প্রায় 500 মিটার পশ্চিমে শাহজাহাঁ নির্মিত জাম-ই-মস্জিদ ভারতবর্ষের বৃহত্তম মস্জিদ। শুরুর হয় 1650 সালে, শেষ হয় ছয় বছর পরে। শাহন-এর মাপ প্রায় 100 বর্গমিটার। পশ্চিমপ্রান্তে প্রার্থনাকক্ষটি দৈর্ঘ্যে 61 মি., প্রস্থে 27.5 মি.। তার সম্মুখভাগে এগারোটি খিলান, কেন্দ্রীয়টি লিয়ানধর্মী, প্রায় ডবল উচ্চতায়। এখানেও সেই শাহজাহানী ‘ম্যানারিজম’, অর্থাৎ নয়-পাপড়ি-ওয়ালা খিলান। মূল প্রার্থনাকক্ষের দুই প্রান্তে দুটি মিনারিকা এই ইমারতকে একটি অপূর্ব মাধুর্যে মণ্ডিত করেছে। শাহনের তিন দিকে তিনটি প্রবেশ-তোরণ, পূর্বদিকেরটিই মূল প্রবেশদ্বার। এ স্থাপত্যে সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করেছে স্থাননির্বাচনে। পুরাতন দিল্লীর সর্বোচ্চ ভৌগোলিক অবস্থানে অতি উচ্চ কুর্সির উপরে

শেহান-তল পাতা হয়েছে। এজনা প্রবেশ-তোরণের সম্মুখে বুলন্দ-দরওয়াজার অনুরূপ অসংখ্য সোপান। লক্ষণীয়, প্রবেশ-তোরণের খিলানে কিন্তু নয় পাৰ্শ্বের অলঙ্করণ বর্জন করা হয়েছে। চিত্তসং পরিকল্পনায় দ-পাশে তিন-তিনটি ছোট ছোট খিলান।

যদুগল মিনারিকা, প্রবেশ-তোরণে খিলান-পার্শ্ব বর্জন, অত্যুচ্চ কুর্সি (plinth), গম্বুজে এবং মিনা-

রিকায় উদ্ভাসঃ অলঙ্করণ-রেশা প্রতিটি বৈচিত্র্য অম-
দানি করে বেশ কিছুটা রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে।
অসম্ভব নয়, এর ডিজাইন-এ প্রাজ্ঞ পরিকল্পনাকারের
কিছুটা হাত আছে। সমগ্র পরিকল্পনাটি বর্জিত, মহান
ও নয়নাভিরাম। নিঃসন্দেহে জাম-ই-মসজিদ-তাজ-
মহল ব্যতিরেকে, শাহ-জাহানী-জমানার শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য-
কীর্তি।

৩১ জুলাই

ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্য-ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ উদা-
হরণ বললে যথেষ্ট বলা হয় না, তাজমহল সম্ভবতঃ এই
পৃথিবীতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থাপত্য-কীর্তি।
এ-কথা বলার জন্য বিশেষ পার্শ্বতোর প্রয়োজন নেই।
যুগ-যুগ ধরে দেশী-বিদেশী মনীষীরা সে-কথা
সোচ্চারে বলে গেছেন। সকলেই অভিধান ঘেঁটে বাছা
বাছা বিশেষণ খুঁজে পরিপাটি করে সাজিয়েছেন তাঁদের
বক্তব্য। তার মধ্যে বিশেষ করে আজ মনে পড়ছে
মিসেস রুজভেল্টের কথা ; কারণ তিনি যা বলেছেন
তা নিতান্তই অন্তর-নিঙড়ানো তাত্ত্বিক উচ্ছ্বাস।
সাজিয়ে-গুছিয়ে নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট
সম্রাট তাজমহল দেখে এলে সাংবাদিকরা মিসেস রুজ-
ভেল্টকে প্রশ্ন করেছিলেন, কেমন দেখলেন ?

মিসেস রুজভেল্টের চট-জলদি জবাব : ‘ফ্র্যাঙ্ক
যদি কথা দেয় আমার কবরের উপর অমন একটা স্মৃতি-
সৌধ বানিয়ে দেবে তাহলে আমি আজ রাতেই আত্ম-
হত্যা করতে রাজী।’

এর চেয়ে সহজে বোধহয় কেউ বোঝাতে পারেননি
—তাজমহল দেখার পর মনের অবস্থা কেমন হয়।

একটু অপ্রাসঙ্গিক হচ্ছে, তবু বলি, ঠিক এই
জাতের কথা বলেছিলেন আর একজন শিল্পরসিক, আর
একটি অপূর্ণ শিল্পের আবেদনে অভিভূত হয়ে। কবি
সত্যেন দত্ত প্রয়াত হলে একটি শোকসভায় রবীন্দ্রনাথ
‘বর্ষার নবীন মেঘ...’ কবিতাটি আবৃত্তি করে তাঁর
শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন
দুই বন্ধু—শিশির ভাদুড়ী আর দিলীপকুমার রায়।
নাট্যাচার্য সঙ্গীতাচার্যের কানে কানে ঠিক ঐ কথাই
বলেছিলেন সেদিন : ‘গুরুদেব যদি অমন একখানা
কবিতা দ্বিতীয়বার লিখতে রাজি থাকেন, তাহলে আমি
আজই আত্মহত্যা করতে পারি।’

অবশ্য কবিতাই যে নিয়মের পরিচায়ক তার প্রমাণ-
স্বরূপ দ-একটি নিরুদ্বেগ ও আছে ; যথা রাইজার
কিপ্লিঙ কিম্বা আলডুস্ হাক্সলে। তা হোক, তবু
ফাগুসন, হ্যাভেল, কুমারস্বামী থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত
সকলে মিলে তাজমহলের যে ভাবরূপ প্রতিষ্ঠা করে-
ছেন তারপর এর মূল্যায়নের প্রচেষ্টা ধ্বংস মনে হতে
পারে। তবু এটা আমাদের অবশ্য করণীয়—এ-প্রশ্নের
উপসংহার হিসাবে।

স্থাপত্যের ইতিহাসে তাজমহল কোনো যুগান্ত-
কারী মৌলিক আবিষ্কার নয়। অর্থাৎ যে অর্থে
বিজ্ঞানের ইতিহাসে নিউটনের গতিসূত্র, ডারউইনের
বিবর্তনবাদ অথবা আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ এক-
একটি যুগান্ত-উত্তরণের মৌলিক পদক্ষেপ, সেই
অর্থে তাজমহল স্থাপত্য-ইতিহাসে এক অচিন্ত্যপূর্ব
আবিষ্কার নয়। তবে তা কী-করে বিশ্বস্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ
সম্পদরূপে চিহ্নিত হল ? একটিমাত্র শব্দে যদি এ-
প্রশ্নের জবাব দিতে বলেন, তবে আমি বলব, তাজ
হচ্ছে : তিলোত্তমা !

প্রাণবর্তী স্থাপত্য-চিন্তা—কী হিন্দু, কী পার-
সিক, কী ইন্দো-ইসলামী—প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে তিল
তিল করে তাদের গগনগলি এখানে সঙ্কলিত, দোষ-
গলি বর্জন করে। আর ভিন্ন দেশ-কালের শ্রেষ্ঠ সম্পদ-
গলি এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে, কোথাও জোড়ের
দাগ নেই ! এখানেই পরিকল্পনাকারের অসীম কৃতিত্ব।
সেই কৃতিত্বের মূল্যায়নের একটিই রাজপথ : সামগ্রিক
আবেদনে মিসেস রুজভেল্ট-এর মত মন্থতার মতোকামী
না হয়ে এ সৌধের প্রতিটি প্রত্যঙ্গকে বিচার করতে
হবে। খুঁড় খুঁড় করে। ‘ডিসেক্ট’ করে। দেখতে হবে—
কী-ভাবে, কোথা থেকে কোন অনভাবনাটি সামগ্রিক
রূপায়ণে সুবিন্যস্ত। ইংরাজীতে একটা কথা আছে—

'An apt quotation is almost as good as an original work' (সুপ্রসিদ্ধ উদ্ভৃতি মৌলিক রচনার প্রায় সমপরিমাণের সম্পদ।)

ডাক্তারহল এ প্রবাদবাক্যের প্রকৃষ্টতম উদাহরণ।

কিন্তু! একটা খটকা রয়ে গেল বে!

যতই সুকিনাস্ত হ'ক, যতই সুচরনে কোনও শিল্পকর্ম কি কালজয়ী হতে পারে? 'বুক অব কোম্পেনস' হতে পারে ক্লাসিকাল সাহিত্য? শিশির জন্মভূমি বা অহীন্দ্র চৌধুরীর হৃদয় নকল করে কেউ হতে পারে নর-নাট্যাচার? না, পারে না। আর সেজন্যই প্রবাদবাক্যে বক্তৃতা হয়েছে এই শব্দটি : almost (প্রায়)। মৌলিকতা প্রেস্ট-জিগলার এক আবশ্যিক উপাদান! ডাক্তারহলও কালজয়ী হয়েছে মৌলিকতা বিহীন হতে নয়। দুটি বিশেষ ক্ষেত্রে ডাক্তারহল পরি-কল্পনাকর্ম ছদ্মস্ত মৌলিকতার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন যা, ন ভুল ন ভবিষ্যতি—ডাক্তার মিনারিকার এবং ডিম-কম্পন সাময়িক কিস্তি। সে-কথা বখাষ্যানে।

আমদ, সাময়িক মূল্যায়নের পূর্বে বিভিন্ন দৃষ্টি-কোণ থেকে এই স্থাপত্য-কীর্তিকে প্রকৃত খণ্ড খণ্ড-রূপে বিচার করে দেখি। প্রথমেই ঐতিহাসিক পট-ভূমি। অর্থাৎ সম্ভার বীপাকলীর আগে সকল বৈশা-কর সজতে পাঠানোর ইতিহাস :

আজুদ্দীন বান্দ-বেগমের বিবাহিত জীবন : ডাক্তারহলের মূল আবেদন—সম্রাটের প্রেম। সুতরাং হিসাব মতো প্রথমেই দেখা দরকার, শাহজাহাঁ ও মমতাজের বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে ইতিহাস কী বলেছে। কোন প্রেক্ষার শাহজাহাঁর অন্তরে এমন একটি সৌখ-নির্মিত কসনা জাগল।

আজুদ্দীন হাফেজ আসফ, আলীর কন্যা, অর্থাৎ ইতিমধ্যেই বোলা মীর্জা গিয়াস বেগের নাতনি। তার মনে নুরজাহাঁর আপন ভাইবো। তার চোখের প্রথম মিলন 1607 সালে—আর আশ্চর্যের কথা, পরিকল্পনা ঠিক সেই একই, অর্থাৎ ঠিক যেখানে প্রথম চার-চক্রে মিলন হয়েছিল শাহজাহাঁ সেলিম ও মেহেরউম-মার।

সম্রাট চিহ্নিত করা গেছে : 1607; কিন্তু তার অর্থাৎ একটু সমীক্ষার নিমিত্ত দিন। পূর্ববঙ্গের অকল্প প্রসাদ। ঐ বছরেই আস করক আস কখ-মানের জাহাঙ্গীরের শেষ জন্মকন নিহত হয়েছেন। মেহের তখনও নিজের কসনিন : কন্যা, লাভাল সজত

আছেন জাহাঙ্গীরের হাফেজে। শাহজাহাঁ খুর্শমের বরস ওখন বোলা আর আজুদ্দীন পনের। নওরোজ বাজারে ঘুরতে ঘুরতে শাহজাহাঁ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েন একটি দোকানের সম্মুখে। স্তম্ভ বিস্ময়ে দেখতে থাকেন পঞ্চদশী পশারিণীকে। কয়েকটি খণ্ড মূর্তির পর মেয়েটি বললে, কী দেখছেন? কিছু কিনবেন?

শাহজাহাঁ সন্তুষ্ট হয়ে পান। বুকতে পারেন, প্রথম প্রশ্নটির উত্তর বাহুলা। বহু বহু দর্শকের মন্থ দৃষ্টির দর্পণে মেয়েটি জানে প্রথম প্রশ্নের কী জবাব। তাই তাড়াতাড়ি ওর ক্ষেত্র থেকে একটি কাচখণ্ড হাতে তুলে নিয়ে দ্বিতীয় প্রশ্নটির জবাব দেন, এই নকল হীরেটার দাম কত?

মেয়েটি মূখ লুকিয়ে হাসল। বলল, ওটা থাক, আপনি আর কিছু পছন্দ করুন?

—কেন? এটার কি দোষ হল? এটা তো চমৎকার নকল-হীরে?

আজুদ্দীন বলল, ওটা আপনাকে বেচব না।

—কেচবে না, তাহলে সাজিয়ে রেখেছ কেন?

—বেচব না তো বলিনি, বলেছি 'আপনাকে' বেচব না।

সংগাৎ কিছু নয়, মীনাবাজারের মূল বেসাতি : রঙ্গারস। খুর্শম মন্থ হলেন পশারিণীর বাকপট-তায়। রঙ্গারের বললেন, তোমার নসীবে দরখ আছে! স্বয়ং বাদশাহজাহাঁকেই যদি না বেচ তো তামাম দুনিয়ার খরিদার কোথায় পাবে?

খন্দেরের চোখে-চোখে রেখে মেয়েটি বললে, খরিদার এখনই আসবেন। খোদ শাহ-রেন-শাহ! পাদশাহ!

মূখ কালো হল খুর্শমের। মেয়েটি মূখের মতো জবাব দিয়েছে! মীনাবাজারে সে এক-নম্বর খরিদার নয়। তবু, বাকবন্দে নীরবতা মানেই হার স্বীকার। তাই বলে, কেমন করে জানলে তিনি এটা কিনবেন?

চট-জলদি মূখে-মূখে জবাব : কেহুত আমি জানি, শাহ-রেন-শাহ সাজা জহুরি। ইমান-ইনসাফের মালিক এক নজরেই বুঝতে পারেন : কোনটা আসল হীরে, কোনটা নকল।

চমকে ওঠ খুর্শম। আলোর সামনে তলে ধরল কাচখণ্ডটা। মেয়েটি নিঃশব্দে এগিয়ে দিল একটা অহীস কণ্ড। হল! মারাত্মক ভুল হয়েছে খুর্শমের! এটা আসল হীরে! তবু উপস্থিত দৃষ্টি কম নেই শাহজাহাঁর : চট করে রঙ্গারীতি বদলে নিয়ে বলে, এটা

যে সাচ্চা বাদাখশান তা তোমার শাহজাদাও জানে -
কিন্তু এত জানো আর এতটুকু জানো না যে, সাচ্চা কমল-
হৌরের পাশাপাশি রাখলে সব বাদাখশানই হয়ে যায়
নকল হীরে? এবার অবাক হবার পালা আজীবান্দুর।
বলে, কমলহীরে? সে কোথায়?

খুর্রম এবার ওর মেজ থেকে তুলে নেয় এক
সুবর্ণদপণ। মেলে ধরে মেয়েটির মুখের সামনে!
দেখে, কমলহীরে চুনীতে রূপান্তরিত হয়ে যায়!

কথা ঘোরাবার জন্য শাহজাদা বলে, 'কিন্তু শাহ-
সেন-শাহ' যে একজন সাচ্চা জহুরি এ-কথা শুনলে
কর কাকে?

মেয়েটি সামলে নিচ্ছে ততক্ষণে। বলে, আমার
করকার কাকে।

তৎক্ষণাৎ ওকে সনাক্ত করলেন খুর্রম। এ আসক
আলীর আত্মজা, মেহেরউমিসার প্রাতুষ্পুত্রী; আর তাই
ওর এত সাহস! নিঃশব্দে কটিবন্ধ থেকে মোহরের
ধলিটা টেনে বার করে বলেন, কত?

: দশ হাজার।

কিনা দরদস্তুরে এক মুঠো স্বর্ণমুদ্রা বিছিয়ে দেন
ওর মেজ-এর উপর। অক্ষুটে যোগ করেন, বাপ্ কো
বেটা—সিপাহী কো বোড়া। জোহুরি হই না হই, হুরী
দেখলে আঁমিও কিন্তু চিনতে পারি।

আজীবান্দুর গন্ডম্বর আবার রক্তিম হয়ে ওঠে।
ইতিমধ্যে কৌতূহলী পশারিণীর দল ঘনিষ্ঠে এসেছে
শাহজাদাকে দেখতে পেয়ে। তাই আজীবান্দু কোন
জবাবই জবাব দিতে পারেন না। মুখ নিচু করে আদাব
জানালো শব্দ।^১

পরদিনই বাদশাহর দরবারে এসেলা দিল খুর্রম।
এক নিঃশ্বাসে দাখিল করল আজি : উজীর আসক
আলীর কন্যাকে সে বিবাহ করতে ইচ্ছুক।

ইতিপূর্বেই মীনাবাজারে কলিজা-বিকিকিনির কট-
নাটা সর্বিস্তারে শুনিয়েছিলেন মেহেরউমিসা। কমে,
জাহাঙ্গীরও। রোমান্টিক কাহিনীটি সর্বিস্তারে নিক-
দন করে মেহের বলেছিলেন, পুত্রের কাছে কিন্তু হার
হয়েছে আপনার!

আফিঙের নেশার বৃন্দ শাহ-সেন-শাহ শব্দ কল-
লেন, এ-কথা কেন?

—বাঃ! তা নয়? মীনাবাজারে গিয়ে আপনি
জোড় কবুড়র খুঁজিয়েছিলেন! আর খুর্রম জোড়-
হীরে ধরে আনতে চাইছে! কয় কুড়ি কেশী?

নেশার আক্ষেপে জাহাঙ্গীর ওকে বুকে টেনে নিয়ে
বলেছিলেন : আমার! জোড়-কবুড়র আমার খোলা

বারান অদৌ।

সুতরাং এমন একটা প্রস্তাব যে শাহজাদার কব
থেকে আসছে, সে-কথা অজানা ছিল না ওদের। এক
কথার সম্মত হলেন সম্রাট। আসক আলী অবশ্য তার
কন্যার মতামত গ্রহণ করার কথা করত মনেও এনে না।
বাদশাহী বাসনার সেদিন থেকে আজীবান্দু হস্ত ফেল
খুর্রমের ককমজর কর।

তবু ইতিহাস বলে দেখে—ওদের বিবাহ হয়েছে
দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে, 1612 খ্রিষ্টাব্দে। কেন? কেহনু
মেহেরউমিসা এ পাঁচ বছর নিজের কসতে রানী হইনি।
মেহের দর না দিলে তার ভাইকে কোনকম হবে না
ভারতসম্রাজ্ঞী! পাঁচ বছরে জাহাঙ্গীর! শব্দ তাই
নয়, এই দীর্ঘ পাঁচ বছরে শাহজাদা খুর্রম একটি
দিনের ভেতরে তার বাকমজর করকে দেখতে পারেন।

না, তুল বললাম। এ পাঁচ বছরে একবার—অন্তত
একবার, আরও চরিত্রকর মিলন হয়েছিল। কেবলমি
না হলেই শব্দ হত আজীবান্দু। এক শাহজাদা!
একটি বিবাহ সময়ে। সেখানে উজীর-উমর আজীব-
বান্দু এসেছিল নির্মমিতারূপে, আর খুর্রম শূন্য-
রূপে! শাহজাদা খুর্রমের সঙ্গে কাকহার রক্ত-
কুমারীর সে বিবাহ বাসরে (1608) খুর্রমের সঙ্গে
আজীবান্দুর কোনও কথোপকথন হয়েছিল কি না ইতি-
হাসে লেখা নেই। তাই সে সম্বন্ধে যে কটনটো সিপি-
বন্দ করলাম তা নিছক কল্পনার আশ্রয় :

বাসরে ইঠাং আজীবান্দুর দর্শন পেয়ে মুক হয়ে
গিয়েছিল খুর্রম। বাসরের বন্দবস্তের আসরে
সবাই ককবোশ বাঁধন-হাওয়া। আজীবান্দু এখানে এসে
দাখিল করেছিল এক বছর অধিকার কৌতুক-কথার
জবাব : এতদিনে বুকলাম, জহুরি হোন না হোন, শাহ-
জাদা হুরী চিনতে তুল করেন না।

অবশ্যই হইনি ককবোত ঘোঁড়বন্দে—ওর
ভেবেছিল, এ-বুকে পরসময় রক্তকুমারীর রূপের
ওষধিক প্রসঙ্গ। শব্দ ককপটে খুর্রম মুখের
আর তুলতে পারেনি।

পারস্য রক্তকুমারীর সঙ্গে খুর্রমের বিবাহ হকর
আরও তিন বছর পরে মেহেরউমিসা কন্যাস্বর করলেন।
বুকলেন, তিনি নিজের কসতে সম্মত না হলে তার
ভাইকে চিরকুমারী থাকতে হবে। খুর্রমের সঙ্গে
জাহাঙ্গীরের বিবাহ হল 1611-তে। পরের বছর
খুর্রম ও আজীবান্দুর।

উক্ত বিবাহিত জীবন-হিসাব করে দেখছি,
উনিশ বছর বৃই ময় এখানে দিনের। উক্ত ককমজর

হয়েছিল সাতশে মার্চ 1612; এবং চতুর্দশ সন্তানকে জন্ম দিতে গিয়ে মমতাজের মৃত্যু হল সাতই জুন, 1631 তারিখে। সাতটি সন্তান আঁতুড়ে অথবা আঁত শৈশবে মারা যায়। যে সাতজন শিশু মৃত্যু এঁড়য়ে ঝেতে পেরেছিল তাদের নাম নিচে দেওয়া হল।

অক্ষর হিসাব কলছে—ঐ উনিশ বছর দুই মাস এগারো দিনের মধ্যে চৌদ্দটি সন্তানকে জন্ম দিতে হলে (যে-হেতু তাঁর কখনও যমজ-সন্তান হয়নি) গর্ভিণী সময়ের ব্যবধান পায় গড়ে এক বছর চার মাস বাইশ দিনের। হয়তো আরও কম, যদি তাঁর দু-একবার গর্ভপাত ঘটে থাকে।

উল্লেখ্য, আজীবনকে বিবাহ করার পূর্বেই প্রথম স্ত্রীর গর্ভে পারভেজ বানুর জন্ম হয় (1611) এবং চতুর্থ জীবিত-সন্তান রোশন-আরার জন্মের পর শাহজাদা তৃতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন (1617); এবার নববধূ ছিলেন আবদুর রহিম খান-ই-খানান-এর নাতনী। ফলে, শাহজাহাঁর বহু প্রশংসিত একান্তপ্রেম কালিদাসের ভাষায় ‘সকুৎকৃতপ্রণয়োহয়ং জনঃ’!

চতুর্দশতম সন্তানকে জন্ম দিতে গিয়ে কী-ভাবে মমতাজের মৃত্যু হল, এবং সম্রাট কী পরিমাণ মর্মান্বিত হয়েছিলেন তার বিস্তারিত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা আছে। শুধু একটি কথা ইতিহাসে বল হয়নি। বর্হানপুর দর্গের ঐ ঘরটা ছিল অভিশপ্ত। ক্ষুধিত পাষণ!!

1631 সাল। শাহজাহাঁ এসেছেন দক্ষিণাত্য বিজয়ে। বর্হানপুর মালোয়া রাজ্যে, গোলকুন্ডা ও বিজাপুরের সিং-দরওয়াজায়। শাহজাহাঁর উদ্দেশ্য বিদ্রোহী খান জাহান লোদীকে শাস্তে করা। যথারীতি মমতাজও এসেছেন। সম্রাট যে তাঁকে ছাড়া থাকতে পারেন না! মুরাদ বক্স-এর জন্মের পর তিন-তিনটি সন্তান হয়েছে মমতাজের গত পাঁচ বছরে, 1625 থেকে 1630-এর ভিতর। তিনটিই সত্যিকাগারে

মারা গেছে। মমতাজের বয়সও তখন প্রায় চল্লিশ। বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছেন তিনি। রক্তাঙ্গতা। যদিও শাহজাহাঁর অন্যান্য পত্নীরা তাঁকে ক্রমাগত সন্তান উপহার দিয়ে যাচ্ছিল এবং হারেম-উপপত্নীর সংখ্যাও অপরিমিত, তবু অসুস্থ শরীরে আজীবন বেগমকে আগ্রা থেকে আসতে হল বর্হানপুর।

এবং এসেই তিনি গর্ভিণী হয়ে পড়লেন।

সাতই জুন যম্মশিবিরে সংবাদ এল মমতাজ মহল চতুর্দশ সন্তানের মা হয়েছেন। কন্যারত্ন। শিশু ভালই আছে!

—আর তার মা? —প্রশ্ন করলেন বাদশাহ।

সংবাদবহ নর্তকিরে জানায়, তিনি অত্যন্ত কাহিল। দ্রুতগতি অবস্থায় শাহজাহাঁ যম্মক্ষেত্র থেকে ফিরে এলেন বর্হানপুর কিল্লায়। দ্বিতলের একটি কক্ষে প্রসূতি শায়িত। সম্রাটকে সে কক্ষে প্রবেশ করতে দিলেন না হাকিম-উল-মুলক ওয়াজির আলি খান। বললেন, প্রসূতি নিদ্রাগত, অত্যন্ত দুর্বল। কোন রকম উত্তেজনা তাঁর বরদাস্ত হবে না। জাহাঁ-পনা বরণ বিগ্রাম নিতে যান। বেগম-সাহেবা একটু সুস্থ বোধ করলেই তাঁকে সংবাদ দেওয়া হবে।

সম্রাট সম্মত হলেন। বর্হানপুর কিল্লার দ্বিতলে দক্ষিণদিকের মেহমানখানায় বিগ্রাম নিতে গেলেন। এই বিলাসকক্ষটি সচরাচর তালাবদ্ধ থাকে। বিশেষ সম্মানীয় কোনো অতিথি এলে কিল্লাদার এই মেহমানখানায় তাকে থাকতে দেয়। সুসজ্জিত সুন্দর কক্ষটি—কিন্তু শাহজাহাঁ আদৌ জানতেন না : কক্ষটি অভিশপ্ত!

রাজরক্তের স্বাক্ষর বৃকে নিয়ে রত্নম্বার মেহমান-খানার চার-চারটি পাষণ প্রাচীর ক্ষুধিত প্রতিহিংসায় লোলদপ হয়ে প্রহর গুণছে!

ক্রান্ত শরীরে নরম কামদার পালঙ্কে গভীর নিদ্রায় ঢলে পড়লেন যম্মক্রান্ত সম্রাট। মধ্যরাতে কে যেন এসে করাঘাত করল রত্ন-কপাটে। সম্রাট দ্বার খুলে দিলেন।

নাম	জন্ম স্থান	জন্ম তারিখ
জাহান-আরা	আজমীর	23. 3. 1614
দারাবকো	ঐ	20. 3. 1615
শাহ-সজা	ঐ	23. 6. 1616
রোশন-আরা	বর্হানপুর	24. 8. 1617
ঔরঙ্গজেব	সোহাদ (যোম্বাই)	24. 10. 1618
মুরাদ বক্স	রোহতাস	29. 8. 1624
মৌতান-আরা	বর্হানপুর	7. 6. 1631



ফিল্ম : ইক হাউস

(ইক হাউসের সৌজন্যে প্রাপ্ত)

কে? কী চাই?

সংবাদ গুরুতর। মমতাজ-মহল মৃদু! সম্রাটের সাক্ষাৎপ্রার্থী।

কক্ষের প্রাচীর চতুষ্টিয় যেন ঘানিয়ে এল বাদশাহের বেদন-বিধুর পান্ডুর মৃদুখানা দেখতে!

শাহজাহাঁ তৎক্ষণাৎ নেমে এলেন প্রসূতি-আগারে। মৃদুতে নিজন হয়ে গেল সেই মৃত্যুশীতল কক্ষটি—শুধু দাঁড়িয়ে রইল সান্টিউমিসা, সম্রাজ্ঞীর একান্ত-সহচরী; আর রইলেন হাকিম ওয়াজির আলি খান। সম্রাট নীরবে এসে বসলেন মৃত্যুপথযাত্রিণীর শয্যা-পাশে। তুলে নিলেন তার রোগপান্ডুর শীর্ণ হাতটি। মমতাজের বাকশক্তি রোধ হয়নি। মনে হল, তিনি কী-যেন একটা কথা বলতে চান।

শাহজাহাঁ বৃকে এলেন।

মমতাজ সেই মৃত্যুতীরের সর্বোচ্চ সোপানের উপর দাঁড়িয়ে শাহজাহাঁকে কী বলেছিলেন তার ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। লোকগাথা বলে, তিনি বিদায়-মৃদুতে একটি আখির আর্জি পেশ করেছিলেন : তাঁর মক্কারা যেন সম্রাটের মহশ্বতের উপযুক্ত হয়।

সূর্যোদয়ের পূর্বেই রক্তহীন প্রসূতির সব যন্ত্রণার অবসান হল।

ধীর পদক্ষেপে সম্রাট ফিরে এলেন সেই চিহ্নিত মেহমানখানায়। অর্গল বন্ধ করে দিলেন ভিতর থেকে।

ঐতিহাসিকার আব্দুল লাহোরী বলছেন, পুরো আটদিন সেই রুদ্ধশ্বাস কক্ষের অর্গল উন্মোচিত হয়নি। মেহমানখানায় সঞ্চিত পানীয় তিনি গ্রহণ করেছিলেন কিনা জানবার উপায় নেই, কোনও খাদ্য-দ্রব্য কেউ নিয়ে যায়নি কামরার ভিতর। সমস্ত ভারত-বর্ষ রুদ্ধ-নিশ্বাসে প্রহর গুণছিল সে কয়দিন। অষ্টম দিনে নিজে থেকেই দ্বার খুলে বেরিয়ে এলেন শাহ-য়েন-শাহ।

রুদ্ধবাক বিস্ময়ে সবাই বজ্রাহত হয়ে গেল!

"A strange physical transformation had also taken place. The Emperor's back was now bent in a peculiar way and his hair, which had been raven black, had turned totally white. Whispers in the Hall of Audience hinted at something even stranger: was it an illusion or had the Emperor grown smaller in size since the queen's death?"¹⁰ (তাঁর দেহাকৃতিতে এক আশ্চর্য

রূপান্তর ঘটেছে : সম্রাট কেমন যেন কুঁজো হয়ে গেছেন। তাঁর বায়সক্ক কেশরাজী কিল্কুল সফেদ। দেওয়ান-ই-আমে সবাই কানাদুবায়ে তাঁর চেয়েও খদ্দুত একটা কথা কানাকানি করত : এ কী তাঁদের দৃষ্টান্ত, নাকি মমতাজের মৃত্যুর পর সম্রাট আকারে সতর্ক ছোট হয়ে গেছেন?)

যে তথ্যটা আবদুল লাহোরী উল্লেখ করতে ভুলে-ছেন তা এই :

বুহানপুর কিল্লার ঐ মেহমানখানার চার-দেওয়াল পূর্ববর্তী দীর্ঘ নয় বছর ধরে রুদ্ধশ্বাস গুমরানিতে ফুসছিল।

কথাসাহিত্যের অলিখিত আইন : চরমতম করুণ-রস পরিবেশনের পর সময়ে থামতে জানা চাই। কিন্তু মহাকাল সে আইনের তোয়াক্কা রাখেন খোড়াই! তাই ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখলে যেখানে আমায় থামতে হত, ইতিহাস লিখতে বসে সেখানে থামতে পারছি না :

ঠিক নয় বছর পূর্বে বুহানপুর কিল্লার ঐ মেহমানখানায় আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন আর এক মাননীয় শাহজাদা—সম্রাট জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠপুত্র! যুবরাজ। দৃষ্টিহীন খস্রো! একইভাবে মধ্যরাত্রে কে-যেন এসে রুদ্ধশ্বাসে করাঘাত করেছিল। নিরস্ত্র আতঙ্কগ্রস্ত অন্ধ মানুষ্টা প্রথমে দ্বারের অর্গল মোচনে স্বীকৃত হয়নি। আগন্তুক তখন জানিরেছিল নিজের পরিচয় : সে শাহজাদা খুর্রুমের দূত, এসেছে সম্রাটের আদেশে খস্রোকে মৃত্তি দিতে।

ছোটভাই খুর্রুমের প্রতি কৃতজ্ঞতায় শাহজাদা খস্রোর অন্ধ দৃষ্টি চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল! হাৎড়ে হাৎড়ে এসে খুলে দিয়েছিল মেহমানখানার দ্বার।

আগন্তুক বাস্তবে ক্রীতদাস আলি রেজা, দানবাকৃতি এক নিষ্ঠুর পেশাদারী নরঘাতক। এসেছে খুর্রুমের গোপন নির্দেশে খস্রোকে খুন করতে।

"পেশীবহুল দৃষ্টি হাতে হিংস্র নখর-লাঙ্ঘিত দৃষ্টি মৃত্যু থাবা! থাবা নেমে এল খস্রোর মূখের উপর, তাঁর নীল রক্ত করে যাওয়া শূদ্র কণ্ঠনালীর উপর চেপে বসল। সম্রাট জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠপুত্র খস্রো, বিজ্ঞ, চরিত্রবান খস্রো, সর্বস্বনৈশ্বন্য মহান খস্রোর...নাক দিয়ে হয়তো দু'ফোটা রক্ত গড়িয়ে পড়ল, নিশ্চল দৃষ্টি হাত পালঙ্ক থেকে দু'পাশে বুলে পড়ল।"¹¹

সেই পালঙ্ক, সেই অতিথি-শয্যা, সেই প্রায়-মৃদে-যাওয়া দু'ফোটা রক্তচিহ্ন বৃকে নিয়ে মেহমানখানার

চর-দেওরাল দাঁঘ নর বৎসর প্রতিহিংসা পূর্বে রেখেছে।
বেশমাবরহাভুর শাহ-আহার সন্তরজনাখাপা মনস্তুদ
কলাপ উপভোগ করে, নেঃশদ-ঘেরা অতঃসংগে ফেটে
ফেটে পড়েছে! অতঃ শাহ-রেন-শাহ-র সঙ্গে সম-
বেদনায় তাম্রা হিন্দুস্থান যখন কেঁদেছে তখনই সেই
কৃষ্ণত পাখা দাঁঘ নর বছরের রোজা ভেঙে স্বগতঃ
খস্গোর সঙ্গে একপাতে ইফতারি করেছে।

সমকালীন ঐতিহাসিক আবদুল হামিদ লাহোরী
জানাচ্ছেন—মমতাজের মৃত্যুর পর পুরো দুই-বছর
মোটো হিন্দুস্থানে কোন আনন্দ অনুষ্ঠানের আয়োজন
বে-আইনী ছিল। সুদূর দক্ষিণাত্য বা বঙ্গদেশেও
কোন উৎসবে গৃহসম্ভা, শোভাযাত্রা বা আলোকমালা
নিষিদ্ধ ছিল। সম্প্রতি, ক্রীড়া, আমোদ-আহ্লাদ
সব বন্ধ। প্রকল্পে কেউ বর্ণাঢ্য পরিচ্ছদ পরতে পারত
না, সবরকম প্রসাধন-স্বকোর ব্যবহার বন্ধ!

ছয় মাস পরে বৃহানপুর থেকে কফিনটাকে নিয়ে
আসা হল আগ্রায়। ইতিমধ্যে মমতাজ-মক্কারার
স্থান-নির্বাচন খতম হয়েছে : দার-উল-খিলাফৎ, আক-
করবাদে।

আজ্জামুদ্ বান্দু-বেগমের কথা এই পর্যন্তই।
এবার তাজের কথা। কিন্তু এতক্ষণে খেয়াল হচ্ছে
একটা কথা কিল্কুল করতে ভুলেছি। তা আমার আর
দোষ কি? সমকালীন ঐতিহাসিকও যে সে-কথা বে-
মতমে করতে ভুলেছেন! আতুড় ঘরের সেই সদ্যো-
জাতর—কি বেন সেই বাচ্চা মেয়েটার নাম—তার
কী হল? না, তার শিশু-মৃত্যু হয়নি। যার আগমন-
জনিত কারণে তাজ মাঝা ভুলে দাঁড়ালো সেই মেয়েটি
তাজ-ইতিকথার কাছে উপেক্ষিত। তার কী হয়েছিল?
জানি না। সে-কথা লাহোরী-সাব লিখে যাননি।
মরোনি, এটুকুই জানিয়েছেন। আন্দাজ করি, কোন
দৃশ্যবতী ধাত্রীর কানকতার মা-দ্বারা মেয়েটা আপন
জীন্সীশক্তিটুকু তার ছোট্ট মৃত্যুর নিয়ে হারেমের
এককোণে কোনকোণে ঢেকে ছিল। বালিকা বয়সে, একটু
বৃদ্ধ শিশু সে হরুতা আন্দাজ করেছিল তার প্রতি
এই জনীহর হেতু। মৃত্যুনা কেবল লুকবে ভেবে
পারনি! তাজমহলের যেদিন অ্যাক্সেসার্টন হল,
সেদিন হিসাব করে দেখছি, মোহান-আরা বেসমের
করস প্রেইস। সেই একটি দিন বেধকার সে হারেমের
পাখা-চক্রে লটিয়ে পড়ে তার অসৎ-মারের জন্য
প্রাণ-কালে কালে পেরেছিল—করল মোটা হারেম
সেদিন পল্লবী রূপে গিরেছিল অকস্মিকমে, আরো-
স্বকোর জন্ম উৎসবে রোগ দিতে। ঐ অপরা মেয়ে-

টাকে সঙ্গে নেবার কথা কারও মনে পড়েনি।
মা-খাকী মেয়ে যে।

তাজ-পরিষ্করণকার কে? এ-প্রশ্নের চূড়ান্ত
সমাধান হয়নি। বোধকরি হবেও না কোনদিন। কারণ
সব প্রমাণ, সব নথী কে বা কারা কি-জানি-কেন সময়ে
বিনষ্ট করে গেছে। বিভিন্ন তথ্য, নজীর, প্রমাণ নিয়ে
অনুমান-নির্ভর আলোচনা হতে পারে মাত্র। অনেক-
গদলি 'খিয়োরি' আছে—আমরা নেতি-নেতি পক্ষাতিতে
অগ্রসর হব। তবে শেষ ফলাফলটা প্রথমেই জানিয়ে
রাখি : তিনি অর্চিহিত!

প্রথমে দেখা যাক : ইতিহাস কতটুকু বলতে পারে?

মমতাজের মরদেহ আগ্রায় নীত হওয়ার পূর্বেই
সম্রাট 'সাইট-সিলেকশান'-টুকু সমাপ্ত করেছিলেন—
দারউল খিলাফৎ, আকবরাবাদে, ঐ যাকে আপনারা
বলেন 'তাজমহলের সাইট'। যমুনা তীরে; শহরের
উপকণ্ঠে। এমন স্থানে, যেটা আগ্রা-কিল্লা থেকে
দেখা যাবে। জমিটি রাজা মানসিংহের বংশে, সে-
আমলে তাঁর পৌত্র রাজা জয়সিংহের দখলদারীতে।
সম্রাট এই জমিটি পসন্দ করেছেন শুনে জয়সিংহ
সানন্দে জমিটি দান করতে চাইলেন। কিন্তু পত্নীর
মক্কারা প্রসঙ্গে প্রতিগ্রহ নিতে অনিচ্ছুক সম্রাট এজন্য
সমমূল্যের খাস-জমি জয়সিংহকে লিখে দিলেন। বোধ-
করি সেখানে জয়সিংহের কিছ্র আউট-হাউস সহ
বাগানবাড়ি ছিল; সেগদলি ধূলিসাৎ করা হয়।

ঐতিহাসিক মীর মদুগল বেগ বলছেন, অতঃপর
শাহ-রেন-শাহ মমতাজমহলের জন্য এমন একটি
মক্কারা বানাতে চাইলেন, যা হবে 'নায়াব' (মৌলিক,
নতুন), 'কামাল' (সার্থক), 'লতিফ' (উৎকৃষ্ট) এবং
'আজীব-ও-ঘারিব' (বিস্ময়কর ইমারৎ)। তারপর মদুগল
বেগ ফাসীতে যা লিখেছেন আজকের দিনে তার সহজ-
বোধ্য ভাষান্তর : এই স্পেসিফিকেশনটুকু বিজ্ঞাপিত
করে সম্রাট একটি 'গ্লেবাল টেন্ডার ফ্রোট' করলেন।
অর্থাৎ এটুকু মনোবাসনা জ্ঞাপন করে দেশ-বিদেশের
প্রখ্যাত স্থপতিবিদদের কাছ থেকে প্রতিযোগিতা-
মূলক নকশা আহ্বান করলেন। অতঃপর : কাবুল-
কন্দাহার-ইরান-তুরান থেকে "কাগজ-নকশায়ে মক্-
কারা হর-এক উস্তাদ মে' আআভদার্দ" (বহু ওস্তাদ
কাগজে নকশা ছকে দাঁখস করলেন)। পরের পংক্তিটি
"চপ-ইক নকশা-পসন্দ আলিজা-হজরৎ" (যেহে
মিলেন একটি পছন্দসই নকশা মহান সম্রাট)। বাদ-
শাহের ইচ্ছামুতাবে নির্বাচিত নকশা এবং আরও দু-

একটি উৎকৃষ্ট নকশা অবলম্বনে কয়েকটি কাঠের মডেল তৈরী করা হল। বাদশাহের চূড়ান্ত অনুমোদন-সাপেক্ষে কয়েকজন উস্তাদ-ক-উস্তাদ স্থপতি-বিদ যৌথভাবে সেগুলির মধ্যে কিছ্ৰ অদল-বদল, পামর্টেশন-কম্বিনেশান করে এক 'তিলোস্তমা' পয়দা করলেন। তাকেই বাস্তবরূপ দেওয়া হল।

মীর মদুগল বেগ সরকারী ঐতিহাসিক। সুতরাং এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, অনেকগুলি প্রতি-যোগিতামূলক নকশা দাখিল করা হয়েছিল, তার ভিতর একটি পছন্দ করা হল এবং অন্যান্য কয়েকটি উৎকৃষ্ট ডিজাইনের দৃ-একটি অঙ্গ তাতে সংযোজন করা হল। তারপর একটি চূড়ান্ত কাঠের মডেল বানানো হল।¹¹ সবই মানছি, কিন্তু কিছ্ৰতেই যে ভুলতে পারছি না মদুগল বেগ-এর ঐ মর্মবিদারী একটি পংক্তি : "চুগ-ইক নকশা-পসন্দ আলিজা-হজরৎ।" তিন নয়, দুই নয়—এক! কার নকশা? কী তার নাম? পরবর্তীকালে তাতে ষতই বদল করা হোক, যে আলিমশিল্পীর ধ্যানের দৃষ্টিতে ঐ মর্মরসোধ প্রথম ধরা দিয়েছিল, তার নামটি কী?

লোকগাথা বলে,¹² "Shah Jahan was overwhelmed with the magnificence of what they had accomplished—so overwhelmed that, to demonstrate his approval he chopped off the hands of the Master Builder, blinded the Calligrapher and cut off the Chief Architect's head so that none of these people could build an edifice to rival the Taj Mahal...That at least, is the legend." (সমাপ্ত তাজমহল দেখে শাহজাহাঁ ষ্ঠির বন্যায় ভেসে গেলেন; এতই উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠলেন যে, তৎক্ষণাৎ হুকুম দিলেন : প্রধান বাস্তুবিদের হাত দুটি কেটে ফেলা হ'ক, লিপিকারদের অন্ধ করে দেওয়া হ'ক এবং মধ্য-স্থপতিবিদের গর্দানা নেওয়া হ'ক। যাতে ওরা কোনদিন তাজমহলের জুঁরি না বানাতে পারে।...এ সবই অবশ্য নিছক লোকগাথা।)

মানছি। লোকগাথা। কিন্তু লোকগাথার মূল উপাদান কী? আদ্যন্ত কল্পনা? লোকের মনে যা গাঁথা হয়ে যায় তাই তো লোকগাথা? যা রুটে, তার কিছ্ৰও কি 'ফটে' নয়? এই লোকগাথার উৎসমুখে হয়তো আছে মদুগল-বেগ-এর ঐ 'চুগ-ইক নকশা-পসন্দ আলিজা-হজরৎ'-এর পরের না-লেখা পংক্তির অন্তিমত্ব। সেই—নেই তাই খাছ, থাকলে কোথায় পেতে?—র কালিদাসী হে'মালীর ছন্দ!

বেশ অমৃদব করা যায়, সন্ন্যাসের লিখিত নির্দেশে

না হলেও, আভাসে-ইপিপ্তে মদুগল বেগ-এর সরকারী ইতিবৃত্তের মশানে তাজ-পরিষ্কল্পনাকারকে কুস্বাণি করা হয়েছে! তাকে সম্পূর্ণ মছে কেঁজা হয়েছে : টোটোল এ্যান্‌হিলিয়েশন! না হলে যে ঐতিহাসিক কত হাজার কতশ কতটি প্রবাল-মুক্তা-পাশা কোথা থেকে খরিদ করা হল, কে কত মজুদরি পেল, কোথা থেকে কত ব্যয়ে কোন দুবাটি সংগৃহীত হল তার নিখুঁত হিসাব লিপিবদ্ধ করে গেছেন, তিনি কেমন করে ভুলে যান লিখতে—কার ধ্যানের দৃষ্টিতে ঐ 'আজীব-ও-বারিব' প্রথম ধরা দেয়!

তা যদি সত্য হয়, তাহলে—ভেবে দেখুন, তার একটিমাত্র সম্ভাষা হেতু : স্বার্থসর্বস্ব শাহজাহাঁ চেয়েছিলেন, কৃতিত্বের ষোলো-আনা অংশ বেন তাঁতেই বর্তায়। লোকে বেন মদুগল ফস্কেও কোনদিন না কলে বসে,—'ঈশা আফান্দির তাজমহল! বরং অনাগতকাল শব্দ বলুক : 'তোমার কীর্তির চেয়ে ভূমি যে মহৎ!'

ভুল বুঝবেন না আমাকে। এ উদ্ঘৃতি এ-গ্রন্থে আমি ইতিপূর্বেও ব্যবহার করেছি। এ বক্তোক্তি রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রযুক্ত নয়। তাঁর ভক্তপাঠকের হাত থেকে আশ্রয়ক্ষার্থে নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা দিচ্ছি : গীতিকাব্যের সত্য ঐতিহাসিক অথবা সাংস্কৃতিক তথ্য নয়। কাব্যসত্য সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের সম্পদ। সেখানে বামির হাতে নিবে-ষাওয়া প্রদীপ বিশ্বপ্রপঞ্চের মহা-অবলম্বিতর দ্যোতক হতে পারে, সেখানে বালিকার কণ্ঠে উচ্চারিত 'ষেতে নাছি দিব' ধ্বনি এই মর-দুনিয়ার জীবনের প্ৰকার হতে পারে, সেখানে কিলামের তাঁরে ক্রৌঞ্চককের পাখার স্পন্দনে 'অস্পষ্ট অতীত হতে অক্ষুট সূদূর ষ্ঠগান্তরে' মহাকালের ষতিহীন পদধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে পারে! 'শাহজাহান' কবিতার শাহজাহান কে? মিছারির দানায় সুতোটি বই-জে নয়? রবীন্দ্রনাথের কাছে ঐ কবিতা-রচনার রোমাঞ্চিক মহত্বে শাহজাহাঁ এক শাস্বত বিরহী-আশ্রয় বিমূর্ত প্রতীক! কবি যদি ইতিহাসের নিরিখে, সাংস্কৃতিক মূল্যায়নে বিশ্বাস করতেন যে, কৃতি-শাহজাহাঁ তাজমহলের চেয়ে মহোত্তর, তাহলে তিনি কবিতা লিখতেন না—'চারিত্রপুজার' আর একটি প্রবন্ধ রোপ করতেন। রাসমোহন, বিদ্যাসাগর, বেবেশ্বরনাথের পাশাপাশি একই সারিতে বসিয়ে দিডেন সেই তাজমহল কবিতাসত্বে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অসম্পূর্ণ পাঠকের একমুখ ঐ বহুপঠিত কবিতার প্রভাবে এখনে আমাকে হরুডো ধমকে উঠবেন : 'স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন শাহজাহান তাজমহলের চেয়ে মহোত্তর; ভূমি কে যে ইলিয়াস পাল এসেছে হান্দ-গাইতে : তাজমহলের নির্মাণ-কৃতিত্বের

ঝোলো-আনা হিসাদার সম্রাট শাহজাহান নন, কে-
এক নাম-না-জানা ঝৈশা আফানি ?

তাই এত কথা কলা। পুনরুজ্জ্বিত দোষ হচ্ছে জেনেও
একই উদ্ভৃতি বারে বারে শোনানো।

হতে পারে—তাজমহলের পরিকল্পনাকার একজন
নন, একটি টীম। কিন্তু মানবসভ্যতার ইতিহাস বলে,
যৌথ-প্রচেষ্টার যেখানে যখনই মহৎ কিছু সৃষ্টি হয়েছে,
দেখা গেছে, সেখানে কেন্দ্রবিন্দুতে আছেন অসীম
প্রতিভাধর একটিমাত্র, অস্বীকার্য মানব। রাশিয়ার
বিস্তার একটি যৌথ-প্রচেষ্টা। কিন্তু কেন্দ্রস্থলে এক-
জনমাত্র মানব : লেনিন। আর তাঁর পশ্চাদপটে
মার্কস। আর একটি যুগান্তকারী যৌথ-প্রচেষ্টার
কথা বিবেচনা করুন—পারমাণবিক শক্তি। মার্কিন যুক্ত-
রাষ্ট্রের আটপ্রান্তে অবস্থিত আটটি গবেষণাগারে
অসংখ্য বৈজ্ঞানিকের নিরলস পরিশ্রমের ফলশ্রুতি।
কিন্তু তার ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্ভবপর হয়েছে একা-
ধিক বিজ্ঞানভিক্তর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার বিবর্তনে—
রাদারফোর্ড-চ্যাডউইক-জোলিও কুরি-এনরিকো ফার্মি-
অটো হান! তাজমহলের ক্ষেত্রেও সেই ধারাবাহিক
ইতিবৃত্তটা ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে : হুমায়ূন ও খান-ই-
খানান মক্কারা—চন্ডীসেবা দেউল—তাণ্ডোর মন্দির—
ইতমদ্-উদ্দৌলা—সেকেন্দ্রার প্রবেশ-তোরণ। কিন্তু
লেনিনের পশ্চাদপটে যেমন Das Capital-গ্রন্থ হাতে
একজন, এ্যাটম-বোমার পশ্চাদপটে যেমন $E=mc^2$ -
কর্মী হাতে একজন—এখানে এই আজীব-ও-ঘারিব-
এর পশ্চাদপটে কে সেই মহামহিম মূল স্রষ্টার :
তাজমহলের মহাপুরুষ ?

যদি বলেন : শাহজাহাঁ, তাহলে কল্ব, সে-ক্ষেত্রে
স্বীকার করুন—‘পারমাণবিক শক্তি’-র আবিষ্কারক
প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট। খরচের বাস্তববাদ তো তাঁরই
সই-এর জেরে! না কি ?

শাহজাহাঁ নিশ্চয় নয়। তবে কে ? মোটামুটি
পাঁচটি ঝিয়োরি আছে। তিনটি অর্বাচীন উক্তি, দুটি
স্বিবেচনাযোগ্য। প্রথমেই অর্বাচীন মতগুণি শোনাই :

এক : জেরোনিমো ভেরোনিও। ভেনিস-এর এক-
জন জহুরী। শাহজাহাঁর রাজত্বকালে তিনি ভারত-
কর্ষে আসেন, লাহোরে মারা যান। তাঁর এ দাবীর মূলে
জর্নৈক সমকালীন ক্রীষ্ট ধর্মপ্রচারকের দিনলিপি—
ফাদার সিবিস্টিয়ান। সমসাময়িক অন্য কারও দিন-
লিপি বা চিঠিপত্র এ-কথার উল্লেখ নেই।

দুই : অস্টিন দ্য বোর্দো। ফরাসী। পেশায়
স্বর্ণকার এবং চিত্রকর। এঁর হাতের কাজ জাল-
কিল্কর আছে, সে-কথা আগেই বলেছি (পৃঃ 171)।
এঁর দাবীর কথা উঠেছে একজন ইংরাজ মেজরের রচনা

থেকে মেজর স্লিম্যান।

দুটি দাবীই অগ্রাহ্য। প্রথম ক্ষেত্রে ফাদার
সিবিস্টিয়ান এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মেজর স্লিম্যান ছাড়া
আর কোনো বিদেশী এ-কথা বলেননি। তাজমহল
পরিকল্পনার কৃতিত্বটাকে যদি এশিয়াখন্ড থেকে যুরোপে
নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হত, তাহলে এত-এত বিদেশী
বণিক, পর্যটক, রাজনীতিক কি নীরব থাকতেন ?
দ্বিতীয়তঃ তাজমহল-নির্মাণের যে বিস্তারিত খরচের
খতিয়ান আছে তাতে ঐ দুটি বিদেশী নামের কোন
উল্লেখ নেই। শেষ যুক্তি—স্থাপত্য-সম্বন্ধে যার কোনো
প্রাথমিক শিক্ষার বনিয়াদই নেই, ইন্দো-ইসলামী
স্থাপত্য কী তা যে দেখেনি, জানে না, বোঝে না, তার
পক্ষে আন্দাজে এ-কাজ করা অসম্ভব—তা সে যতবড়
মণিকার, জহুরী অথবা চিত্রকরই হোক না কেন। স্যার
জেম্‌স্‌ জীনস্—যিনি বলেছেন, অশ্বশাস্ত্রমতে একটি
বানর যদি কোটি কোটি বছর ধরে একটি টাইপ-রাই-
টারের চাবি এলোমেলোভাবে টিপে যায়, তাহলে শেষ-
মেশ সে হয়তো একটি শেক্সপীয়রের সনেট পয়দা করে
ফেলতে পারে, তিনিও বোধহয় মেনে নিতে পারতেন
না যে, একজন ইতালীয় মণিকার এলো-মেলো লাইন
টানতে টানতে আথেরে ঘটনাচক্রে তাজমহলের প্ল্যানটা
ছকে ফেলবে। অশ্বশাস্ত্রমতে পারবে, যদি ‘কোটি-কোটি’
বছর ধরে সে এলোমেলো লাইন টেনে যায়।

প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ছে গোডস্‌মিট-এর কথা।
মার্কিন নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট। পরাজিত বিধ্বস্ত
জার্মানীতে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল অনুসন্ধান করে
জানতে, জার্মান নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্টরা এ্যাটম-বোমা
তৈরীর পথে কতদূর অগ্রসর হয়েছিলেন। দীর্ঘদিন
অনুসন্ধান করে গোডস্‌মিট তাঁর রিপোর্ট পাঠালেন
ওয়াশিংটনে—যুদ্ধচলাকালে জার্মান বৈজ্ঞানিকেরা ইউ-
রেনিয়াম অথবা প্লুটোনিয়াম পরমাণুকে ক্রমাগত
বিদীর্ণ করতে কোনও ‘চেইন-রিয়াকশন’ পদ্ধতি বার
করতে পারেননি। বন্দিশালায় অটো হান, ভন লে,
উইজেকার অথবা হেইজেনবেগ প্রভৃতির সঙ্গে কথা
বলে তিনি এ সিদ্ধান্তে এসেছেন। জবাবে মার্কিন
সমর-পরিষদ টেলিগ্রাফ করে জানালেন...“এমনও তো
হতে পারে ঐ চার-পাঁচজন বিজ্ঞানী ছাড়া কোন অজ্ঞাত
বৈজ্ঞানিক নিজের সাধনায় জার্মানীতে বসে ঐ আবি-
ষ্কারটা করেছিলেন, যার কথা আপনি কল্পনাও করতে
পারছেন না।”

এ-কথার জবাবে গোডস্‌মিট একটি মর্মান্তিক
টেলিগ্রাফ করেছিলেন¹⁸—“A paper-hanger may
perhaps imagine that he has turned into a
military genius overnight, and a trader in

champagne may be able to disguise himself as a diplomat. But laymen of that sort could never have acquired sufficient knowledge, in so short a time, to be able to construct an atom bomb" (কোন রঙমিষ্ট হয়তো মনে করতে পারে রাতারাতি সে একজন সামরিক ধ্বংসর হয়ে উঠেছে, অথবা কোনও ভাটিখানার শাড়ি রাত-পোহালে বিখ্যাত রাজনীতিকের ছদ্মবেশ হয়তো ধারণ করতে পারে—কিন্তু একজন রাস্তার লোক এত অল্পসময়ে এতটা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কিছতেই লাভ করতে পারে না যাতে সে পরমাণু-বোমার নির্মাতা হয়ে পড়বে!)

তাজমহল ডিজাইন করার প্রসঙ্গে ভেরোনিও এবং বোর্দোর দাবী সম্বন্ধে ঐ একই কথা।

তৃতীয় অর্বাচীন থিয়োরিটো হচ্ছে—এটি রাজা মানসিংহের একটি প্রাসাদ, যা কিছু অদল-বদল করে তাজমহলের রূপ দেওয়া হয়েছে। এ থিয়োরির মূল কোথায় তা আন্দাজ করা কঠিন নয়—মতাবলম্বীদের বিশ্বাস 'ওক'-গাছের মতো সুদৃঢ়। সম্ভবতঃ রাজা মানসিংহের জমিটি যখন শাহজাহাঁ গ্রহণ করেন, তখন সেখানে কোনো আউট-হাউস জাতীয় মোকাম ছিল, অথবা বাগানবাড়ি, যা নিঃসন্দেহে ধ্বংস করা হয়। একদা-উপস্থিত সেই ইমারৎটি হয়তো এ অর্বাচীন উদ্ভির গণ্যগাত্রী। এ জাতীয় চিন্তা হিন্দুদের কটুর ধ্বংসকারীদের কী-ভাবে প্ররোচিত করে তা কুৎসিত মিনার প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

সম্ভাবনাময় দুটি নাম এবার পেশ করি :

একটি মত : উস্তাদ্ আহমেদ তাজের জনক। তথ্যটা পরিবেশন করেছেন আহমেদের পুত্র। উস্তাদ্ আহমেদ লাল-কিল্লার প্ল্যানিং-এ গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়েছিলেন, তিনি প্রখ্যাত ক্ষমতাবান স্থপতি। কিন্তু তাঁকে তাজমহলের পরিকল্পনাকার বলে মেনে নিতে পারছি না। কারণ লাল-কিল্লার ইমারৎগুলির সঙ্গে তাজ-স্থাপত্যের ফারাকটা আশমান-জমিন। লাল-কিল্লা শূন্য হয়েছে তাজমহলের পরে, ফলে এ-কথা কিছতেই মেনে নেওয়া যায় না যে, কোন একজন স্থপতি যার ধ্যানের দৃষ্টিতে তাজমহল ধরা দিয়েছে, তিনি দশ-পনের বছর পরে লাল-কিল্লায় দেওয়ান-ই-খাশে আগ্রা-কিল্লার খাশমহলের হাবহুদ নকল করবেন।

নেতি-নেতি করে শেষ যে নামটিতে এসে ঠেকলাম সেটি : উস্তাদ্ ঈশা আফান্দি।

তাজমহল প্রসঙ্গে তাঁর নাম নানাভাবে উল্লিখিত হয়েছে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশতি শতাব্দীতে : উস্তাদ্ খান আফান্দি, ঈশা মুহম্মদ আফান্দি, উস্তাদ্ মুহম্মদ

ইসফাহান্দি, ঈশা খান ইত্যাদি। তাঁর জন্ম নিবাস সম্পর্কে নানা মতামত নানা মত : ইসফাহান, শিরাজ, ইসফাহান, সমরকন্দ, কান্দাহার এবং দিল্লী-আগ্রা। পরিচয় দিতেও অনেক অনেক কথা বলেছেন—তিনি ক্রীষ্টান, ইহুদী, আরবী, এমন কি মুসলমান কাকির অথবা হিন্দু সন্ন্যাসী। মোটকথা ইতিহাস হাফে কোনও সিদ্ধান্তে আসা যায় না।

ইতিহাস নয়, ইমারৎ ঘেঁটে ঘেঁটে আমি কিন্তু কয়েকটি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। সেগুলি দাখিল করি। মানা-না-মানা আপনাদের অভিযুক্তি।

আমার ব্যক্তিগত আন্দাজ : তিনি বিদেশী, সম্ভবত ইসফাহানী, ভারতবর্ষে ছিলেন বছর তিনেক ; 1628 থেকে 1658 সালে। এই অনুমানের সপক্ষে বক্তব্য :

তাজের নকশাতে একটি অত্যন্ত পরিণতমনা স্থপতির স্বাক্ষর, অর্থাৎ তাজপরিকল্পনাকারের বয়স 1630-এ অন্তত ত্রিশ। তিনি যদি ভারতীয় হন তাহলে দিল্লী-আগ্রাতে তাঁর বৌবনের হাতের কাল নেই কেন? জীবনের প্রথম নকশাতেই কি তাজের ডিজাইন সম্ভব? এবং এটা তাঁর প্রথম ডিজাইন হলে তিনি কেমন করে প্রতিযোগিতায় অংশ নিলেন? অখ্যাতনামা স্থানীয় স্থপতি এমন 'প্লেবাল-টেডারে' ডিজাইন দাখিল করার সুযোগ পায় না। ফলে তিনি বিদেশী। ইসফাহান-এর লোক অনুমান করছি তাঁর নাম থেকে—'আফান্দি', যা 'ইসফাহান্দী' থেকে। 'শিরাজ'-এর লোক 'শিরাজী', লাহোরের লোক 'লাহোরী' হয় যেমন। তাজ নির্মাণের পর হয় তিনি যাত্রা যান, নয় ভারতবর্ষ ত্যাগ করে যান। কারণ তাজের পরবর্তী কোনও বড় কাজে তাঁর হাতের স্পর্শ নেই।

হাজারির খাতায় দেখছি, প্রতি পাতায় তাঁর নাম লেখা হয়েছে সবার প্রথমে ; তাজনির্মাণের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মাসিক এক হাজার তক্ষা বেতনে। মজা হচ্ছে, খাতায় ঈশা আফান্দি ছাড়া আরও তিনজন হাজার তক্ষা মাস-মাহিনায় বেতন নিয়েছেন। প্রশ্ন হতে পারে, চীফ আর্কিটেক্ট বা মূল পরিকল্পনাকার হিসাবে তাঁর মাহিনা কিছ্ বেশি হওয়া স্বাভাবিক ছিল না কি? কিন্তু সে যুক্তিটাই কি ধোপে ঢেকে? যদি আগেই ধরে নিই—এবং ধরে নেবার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে যে, শাহজাহাঁ মূল পরিকল্পনাকারের নামটা ইতিহাস থেকে মুছে দিতে ব্যর্থপরিচর, তাহলে তিনি কী করবেন? 'আর্কিটেক্টস্-ফি-টা কালোটাফর নগদে ফেলবেন। এক-নম্বরী খাতায় তার উল্লেখ থাকবে না, থাকবে দু-নম্বরে। প্রকাশ্য হিসাবের খাতায় শূন্য 'সুপারভিশন চার্জ'-টুকু দেখানো হবে—আর পাঁচজনের সঙ্গে সমান অঙ্ক। 'আই. টি. ও.'-কে বড়বক বানাতে।

এখানে শাহজাহাঁর আই. টি. ও.--অনাগতকাল! ইতি-
হাস!

এছাড়া আরও ছাব্বিশ জন মাসিক 675 থেকে 200 তাকায় নিযুক্ত ছিলেন। বাকি কর্মীরা 'ফরনে' কাজ করেছে, কিম্বা দৈনিক হারে অস্থায়ীভাবে। প্রতি পৃষ্ঠায় প্রথমেই ঈশা আফান্দির নাম। কাজের পরিচয় হিসাবে মূল ফাসীতে কী-লেখা আছে তা পড়বার মতো বিদ্যো আমার নেই; ইংরাজী অনুবাদে দেখছি 'Chief Designer' বাস্তবায়ন যাকে 'মূল পরিকল্পনাকার' বলতে হয়।

সম্ভবতঃ শিল্পীরা বুদ্ধিতে পেরেছিলেন শাহজাহাঁর ষড়যন্ত্রটা। তার একটি প্রমাণ রয়ে গেছে তাজের গম্বুজে--অনেক উঁচুতে। সেখানে তুষরা হরফে খুঁদে খুঁদে অক্ষরে লেখা আছে : 'লিপিকার--অতি অভাজন আমানৎ খান শিরাজী'।

প্রকাশ্যস্থানে আত্মঘোষণার সুযোগ পাননি বলেই অন্ত উঁচুতে তিনি লুকিয়ে লুকিয়ে নিজের নামটা লিখে গেছেন; যা অতি সম্প্রতি মেরামতির সময় আবিষ্কৃত হয়েছে। শিল্পীমাত্রেই বেষ্টকু চান--একটু স্বীকৃতি, একটু দরদ--সেই আকৃতিতেই তিনি রেখে গেছেন নিজের স্বাক্ষর।

সে সুযোগ কোথাও পাননি মূল পরিকল্পনাকার ঈশা আফান্দি অথবা উস্তাদৌ-কি-উস্তাদ্ মীর মহম্মদ গাজী মিক্রা অজ্ঞাতনামা!

তা হোক, নাম না থাক, তাঁর ব্যক্তিত্বের স্পষ্ট স্বাক্ষর তিনি রেখে গেছেন তাজমহলের আপাদমস্তকে :

(ক) এই একটিমাত্র ইমারতে শাহজাহানী 'ম্যানা-রিক্সম্' তিলমাত্র প্রতিকলিত হয়নি। আদ্যন্ত মর্মরে নির্মিত হলেও (সেলিম চিস্তির কবরও তাই এবং ইতমদ্উদ্দৌলা-সমাধিসৌধ) এখানে নয়-বাঁক-ওয়াল কিসান বর্জন করা হয়েছে। শূন্য উপরের চারটি ছোট চব্দতরায় এই ম্যানারিক্সম্-টি মেনে নিয়ে শাহজাহানের মর্যাদা রক্ষা করা হয়েছে। দেবরাজ ইন্দু নাকি একবার ঘ্রাণের মাথায় নারায়ণের বাহন গরুড়কে বস্তু ছুঁড়ে মারেন। মহাবিহঙ্গম সে আঘাত অবিচলচিত্তে গ্রহণ করেন। ইন্দু লজ্জায় অধোবদন হনেন। তখন নারায়ণ গরুড়কে বললেন, বস্তু সম্পূর্ণ ন্যর্থ হলে মহামর্দনি দাঁধচীর অপমান! সে-কথা শুনে গরুড় তাঁর একটি পালক খুঁজে দিয়েছিলেন। ইন্দুর বস্তু সেই পালককে দম্ব করে তুণে ফিরে যায়। বোমকারি ঈশা আফান্দিও অনুভব করেছিলেন ঐ বহুস্বহায়ে-কিউশ্বিক্ত কিম্বু মূলতঃ নয়নাভিরাম নয়-বাঁক-ওয়াল কিসানকে একেবারে অস্বীকার করা হলে শাহজাহানী নয়, সৌন্দর্যবোধের অপমান। তাই চারটি অতিসূত্র চব্দতরায় তার

স্বীকৃতি দিয়েছেন! তাজমহলে ছত্রীবর্জিত সমতল ছাদ কোথাও নেই, প্রসারিত-বাহু ছজ্জা নেই, হিন্দু-শৈলী বর্জনের প্রবণতা নেই। শূন্য মূল ইমারৎ নয়, সংলগ্ন কোনও মোকামেও নেই। ফলে এই ইমারতে শাহজাহানী-স্থাপত্যের তিলমাত্র ছাপ কোথাও পড়েনি।

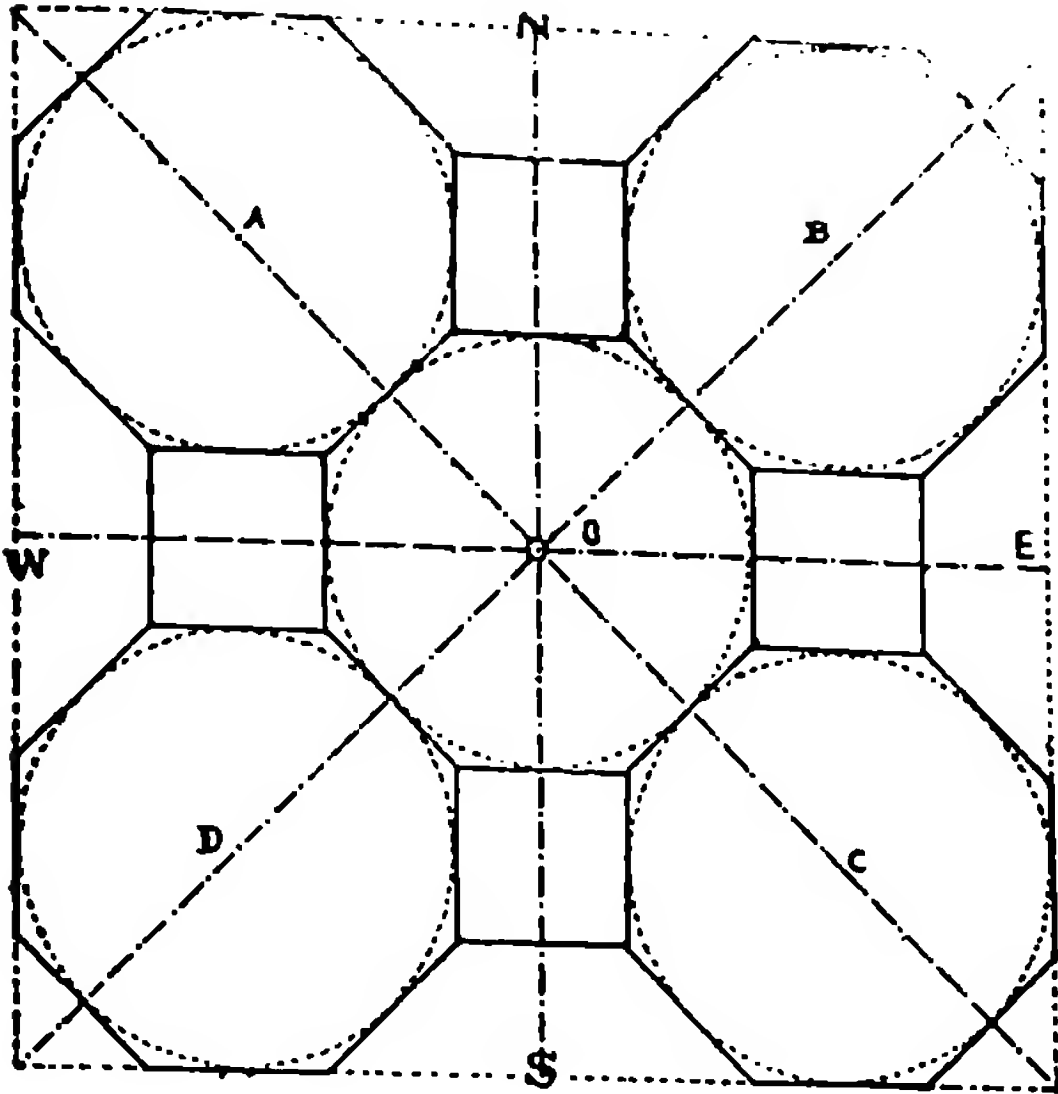
(খ) এই প্রথম এবং এই শেষবার, শাহজাহানী-স্থাপত্যে হিন্দু-স্থাপত্য স্পষ্টভাবে ছাপ ফেলেছে। পণ্ডরত্ন-দেউল বাস্তু-নকশায়, তাজোরী গম্বুজে, মহা-পদ্ম-ঘণ্টা-আমলক-কলস অলঙ্কারের ব্যবহারে। পরিকল্পনাকার যেই হোন তিনি হিন্দু ও ইসলামী স্থাপত্যে আলিম--গভীর জ্ঞানসম্পন্ন। তার চেয়ে বড় কথা, বাদশাহের প্রবণতা কী, তা জানা সত্ত্বেও তিনি শিল্পসত্যকে কোথাও খাটো করেননি : তিনি নির্ভীক। তাঁর এই হিন্দু এবং ইন্দো-ইসলামী জ্ঞানের পরিধি দেখেই আশ্চর্য করেছি, তাজের ডিজাইন ছকার অন্তত বছর তিনেক আগে তিনি ভারতবর্ষে আসেন, অর্থাৎ 1628 নাগাদ।

(গ) 'পার্সপেক্টিভ' বা পরিপ্রেক্ষিত-জ্ঞান তাঁর আকাশচুম্বী, যেটি সমকালীন ভারতীয় কোনও আর্কি-টেঙ্কের অধিকারে ছিল বলে নজরে পড়ে না। 'অপটিক্স-বিজ্ঞান' তাঁর নখাগ্রে। তিনি দর্শককে এমন-এমন স্থানে দাঁড় করিয়ে দিতে পেরেছেন যেখানে সুবিশাল ইমারৎ তার আয়তন ও 'ম্যাস'-কে ত্যাগ করে শূন্য ভাবটুকু ম্ঠায় করে উদ্ভাসিত হয়েছে। মৃত্তোর দিনার মতো! কালের কপোলে একবিন্দু নয়নের জলের মতো। তিনি শূন্য স্থপতি নন, তিনি কবি। মহাকবি!

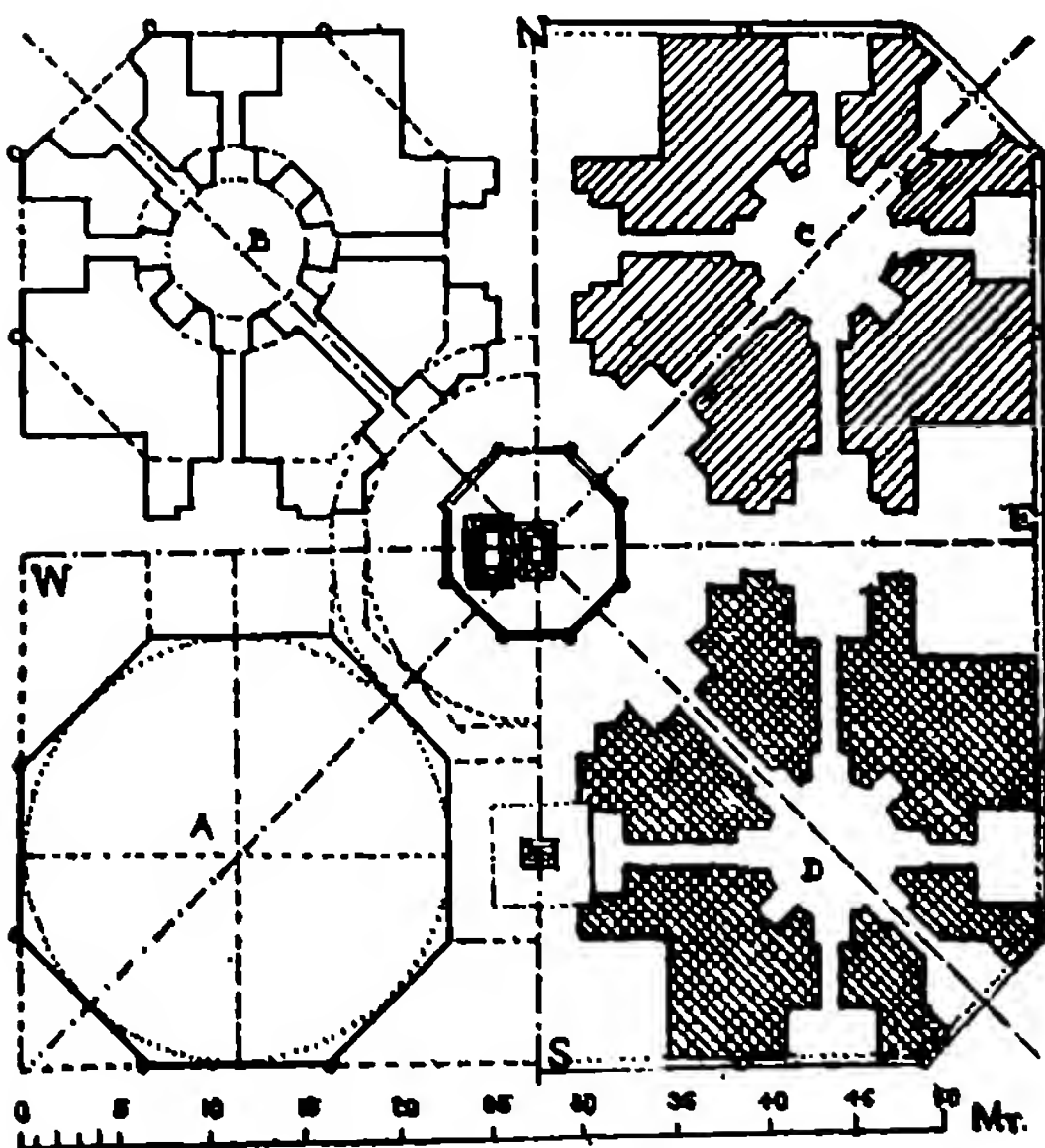
(ঘ) অপটিক্স-বিজ্ঞানের একটি বিশেষ প্রয়োগ-কৌশল--trompe l'oeil--যার সার্থক প্রয়োগ প্রাক-শাহজাহানী ভারতীয় স্থাপত্যে নজর পড়ে না, অথচ যা ইতালীয় হাই-রেনেসাঁতে বহুল-প্রযুক্ত, তা দেখে মনে হয়, শিল্পী বিদেশী। ভারত-আগমনের পূর্বে ইতালীয় রেনেসাঁর সঙ্গে তাঁর অন্তত পরোক্ষ যোগাযোগ ঘটেছিল।

তাজমহলের প্ল্যান : ইতিমধ্যেই আমরা দেখেছি যে, ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যে মক্কার প্ল্যান দু-জাতের : পারস্যরীতির বস্তু-কেন্দ্রিক এবং হিন্দু-শৈলীর রেখ-কেন্দ্রিক। আকবর বরাবর দ্বিতীয় পদ্ধতিতে বাস্তু-নকশা ছকেছেন, তাও দেখেছি। তাজমহলের প্ল্যান কিন্তু পারস্য-শৈলীর। বস্তুকেন্দ্রিক। হুগায়ুন-নক বারান্দা অনুসরণে। মীর্জা গিয়াস্ হুমা-য়ুন-মক্কারা ছকেছিলেন নয়টি বস্তুকে মূলধন করে। সেখানে কেন্দ্রীয় বস্তুটি ছিল তার চতুর্দিশার্ধস্থ বস্তু-চতুর্দৈকে স্পর্শ করে। কিন্তু চার কোণের আটটি বস্তু

পরস্পরকে ছেদ করেছিল। তাহে আছে মাত্র পাঁচটি বস্তু, কিন্তু কেউ কাউকে ছেদ করেনি। বস্তু-সংখ্যার



চিত্র-11.9 তাজ বাস্তু-নকশার পঞ্চবস্তু-মূলক জ্যামিতিক মৌলসূত্র।



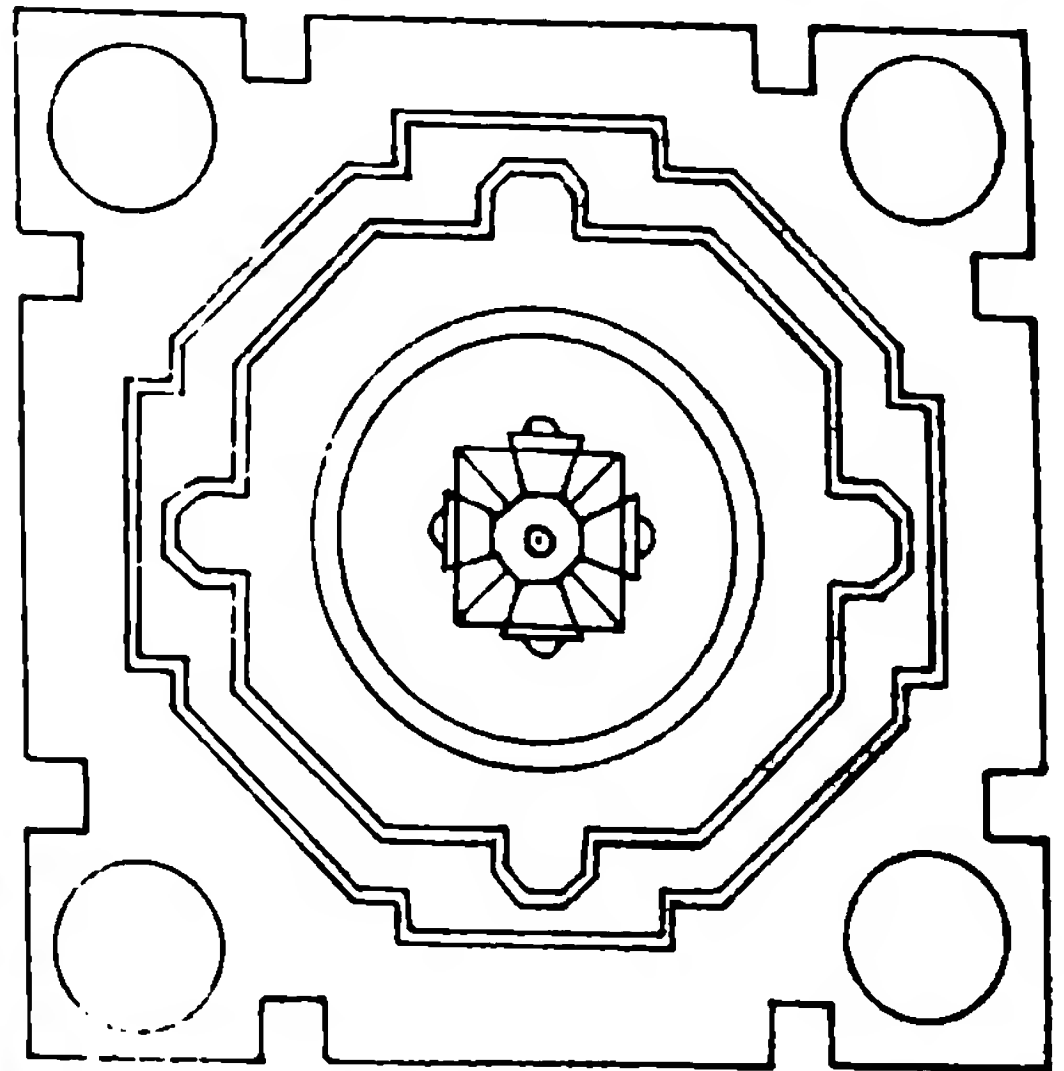
চিত্র-11.10 তাজের বাস্তু-নকশা। কেন্দ্রে মমতাজের ও তার পশ্চিমে শাহজাহান সমাধি।

ফারাকেই শব্দ নয়, তাদের ছন্দবিন্যাসেও মৌলিকতার ছাপ। এই পাঁচটি বস্তুকে মূলধন করে কীভাবে বাস্তু-

শাহজাহান

নকশাটি রূপায়িত তা চিত্র-11.9 এবং 11.10-এ দেখাবার চেষ্টা করেছি। সুতরাং কেউ যদি বলেন, তাজের প্ল্যান ইমারদুন-মক্বারা অনুসরণে পারস্য শৈলীর তা অস্বীকার কারি কেনন করে?

আবার স্বীকারও যে করতে পারছি না; কারণ পঞ্চবস্তুকে মূলধন করে মন্দির-রূপায়ণের নির্দেশ আছে হিন্দু বাস্তু-শাস্ত্রেও। তাকে বলে 'পঞ্চরত্ন-দেউল'। পার্সি ব্রাউনের মতে অবশ্য পঞ্চরত্ন-দেউলের বাস্তু-নকশা বস্তু-নির্ভর নয়, ছাদের ঐ পঞ্চচক্রের জন্যই তার এই নাম। কিন্তু হ্যাভেল-সাহেব যেভাবে দেখিয়েছেন তাতে মনে হয় পঞ্চরত্ন দেউলের ঐ ছাদটি একেবারে ভূমি-নকশা থেকেই উঠে আসে। এই বিষয়ে



চিত্র-11.11 পঞ্চরত্ন দেউল; লিখরের প্ল্যান-চতুর্ভুজ দেউল-1098, স্ববন্দীপ।

যদি স্থাপত্য বা পুরাতত্ত্বে কোনো গবেষণা বা 'অনু-গ্রাফ' প্রকাশিত হয়ে থাকে তবে আমার তা নজরে পড়েনি। যাই হোক হ্যাভেল সাহেবের গ্রন্থ থেকে উদাহরণ হিসাবে স্ববন্দীপের একটি পঞ্চরত্ন-দেউলের ছাদের প্ল্যান চিত্র-11.11-এ সংযোজন করা গেল। এটি একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত-তখনও ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্ব শুরু হয়নি।

এবার আপনারাই বলুন, তাজমহলের বাস্তু-নকশার মূল প্রেরণা কোথায়? পারস্য-শৈলীর ইমারদুন-মক্বারা অথবা হিন্দুদের পঞ্চরত্ন দেউল?

এখানেই সেই অজ্ঞাত তাজ-পরিকল্পনাকারের অসীম কৃতিত্ব। ভিল ভিল করে ভিলোভমা গড়েছেন,

অথচ কোন্‌ ভিল্‌টি কোথা থেকে তুলে এনেছেন তা ভিল্‌মাত্র বৃদ্ধিতে দেননি। নিঃসন্দেহে তাজ ইন্দো-ইসলামী মিশ্রিত শৈলীর। আর তাই হ্যাডেল সোচ্চারে ঘোষণা করেছেন^{১৭} : 'The Taj belongs to India, not to Islam.' (তাজ ভারতবর্ষের সম্পদ, ইসলামের নয়।)

গম্বুজ : তাজমহলে সৌন্দর্যের বৃকোদরভাগ দখল করে আছে তার গম্বুজ। এখানেও পরিকল্পনাকারের কৃতিত্ব অপরিহার্য। এই অপূর্ণ গম্বুজটি কে ডিজাইন করেন এ বিষয়েও নানা মতের নানা মত। একদল দাবী করেছেন, শাহজাহাঁর বিশেষ প্রিয়পাত্র উস্তাদ-স্থপতি এবং সম্রাট-নিযুক্ত দারোগা-ই-ইমারৎ আলি মর্দন খাঁ এটি 'ডিজাইন' করেন। এ মতটা মানতে পারছি না। কারণ ইতিহাসে দেখছি, আলি মর্দন আগ্রাতে এসে কাজে যোগদান করেন ১৬৩৮ সালে। তাজ গম্বুজের কাজ শুরু হবার ছয় বছর পরে। আমার ধারণা তাজের গম্বুজ রূপায়ণ করেন : উস্তাদ আহমেদ। কেন? বলছি।

দেখা যাচ্ছে, এই বিশেষ গম্বুজটি সম্বন্ধে ফাগুদ-সন ও হ্যাডেল কিছু ভিন্ন মত পোষণ করেন। ফাগুদ-সনের মতে তাজমহলের গম্বুজ পারস্যারীতির সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ ; এটি নির্ভেজাল 'স্যারাসেনিক' (অর্থাৎ ইসলামী। 'স্যারাসেনিক' শব্দটা ফাগুদ-সনের আমলে স্থাপত্য পরিভাষায় চালু ছিল। একই অর্থবহ। কিন্তু শব্দটা বিভ্রান্তিকর বলে আমরা পার্সি ব্রাউন অনুসরণে সর্বত্র 'ইসলামী' বলছি)। ফাগুদ-সনের মতে ভারতবর্ষে পেঁয়াজী-গম্বুজ বানানোর কায়দাটা কারও জানা ছিল না। আর্চ, স্ট্যালেক্টাইট প্রকৃতির মতো 'পেঁয়াজী-গম্বুজ'ও ইসলাম ভারতবর্ষে আমদানী করে। কিন্তু 'পেঁয়াজী-গম্বুজ' কী?

আমরা চিত্র-11.12-এ অনেকগুলি গম্বুজ পাশা-পাশি সাজিয়ে দিয়েছি। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তাজের পূর্ববর্তী প্রতিটি ইসলামী গম্বুজের ক্ষেত্রে তার ব্যাস বৃহত্তম ঠিক যেখানে গম্বুজ-কুর্সি অথবা পাদপীঠ থেকে সেটা উদ্ভূতমুখে যাত্রা শুরু করেছে। তাজের ক্ষেত্রে তা নয়। প্রস্তর-নির্মিত গম্বুজের এক-তৃতীয়াংশ উচ্চতায় গম্বুজের ব্যাস বৃহত্তম। এই সরু-থেকে-মোটা এবং তারপর মোটা-থেকে সরু হওয়ার চণ্ডটিকেই আমরা 'পেঁয়াজী গম্বুজ' বলছি। যেন একটা গোটা পেঁয়াজের আকার (bulbous dome)। তাজ নির্মাণের প্রায় সওয়াশ' বছর পরে সফদরজঙ মক্-বারায় দেখছি, উচ্চতার তুলনায় ব্যাসের বৃদ্ধির হার আরও দ্রুতচন্দ্র হয়েছে। লাল-কিল্লার ভিতরে আলমগীর-নির্মিত মতি-মসজিদেও এটা আমরা দেখে এসেছি।

এক্ষেত্রে কিন্তু বলতে পারা যায় না—এই পেঁয়াজী-চণ্ডটি তাজ-পরিকল্পনাকারের একটি মৌলিক চিন্তা। পার্সি ব্রাউন-সাহেব তাঁর গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে যে কয়টি ইন্দো-ইসলামী গম্বুজের ছবি দিয়েছেন এবং আলোচনা করেছেন তার বাহিরে একটি ইন্দো-ইসলামী গম্বুজ বিমিত হয়েছিল যা তাজের আগে এবং যা পেঁয়াজী গম্বুজ কিন্তু পার্সি ব্রাউনে অনালোচিত। মমতাজের পিতা আসফ আলীর সমাধিতে—লাহোরের কাছে সাহাদ্রায়, জাহাঙ্গীর-সমাধির অনতিদূরে। চিত্র-11.12-এ দেখুন উপরের সারিতে আঁকা চারটি ইসলামী গম্বুজের একটিও পেঁয়াজী গম্বুজ নয়। অথচ প্রাক-মুসলিম যুগের হিন্দু-স্থপতি এই পেঁয়াজী-চণ্ডটা জানত। বহু বৌদ্ধ স্তূপের 'অণ্ড' ঐ চণ্ডে তৈরী। তাজোর-দেউল-এর গম্বুজ হুবহু তাজের গম্বুজের চণ্ডে। উত্তর ভারতের ইসলামী যুগে লাহোরে

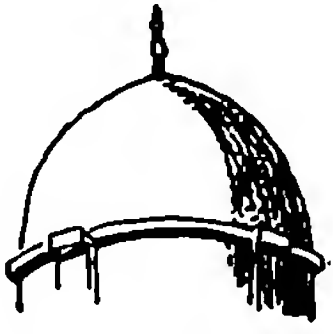
খরচের বিস্তারিত থেকে একটি পৃষ্ঠার ব্যয়ানুবাদ

নাম	আধিনিবাস	কর্ম-পরিচয়	মাসিক বেতন (তুকা)
মুহম্মদ ইনা আমসলি	..	পরিবহনকার	1000
মুহম্মদ খান	..	রেখাকার	1000
মুহম্মদ সিরাজ	..	নকশা বিদ	1000
অম্বান খান শিরাজী	..	তুঘরা লেখক	1000
জাহির জাহান খান	..	শিল্পী	800
শিরাজী লাল	..	মোজাইক শিল্পী	800
বলম ও দাস	..	গুপ্তাকার	690
মাস্তা লাল	..	খোদাই-শিল্পী	680
বমুনা দাস	..	এ	680

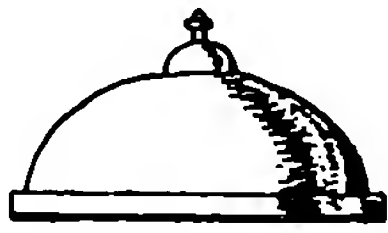
নির্মিত আসফ-আলির মক্‌বারাতে এটি প্রথম প্রবেশ করল ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যে।

এই প্রসঙ্গেই উঠে পড়ছে উস্তাদ্ আহ্মেদের নাম। উস্তাদ্ আহ্মেদ লাহোরের অধিবাসী। তিনি একজন প্রখ্যাত স্থপতি ; লাল-কিল্লার প্ল্যানিং ও অনেকগুলি ইমারত তিনি ছক্‌কেছিলেন উস্তাদ্ হামিদেদ সঙ্গে যৌথভাবে। আসফ-আলী মক্‌বারার 'ডিজাইন'ও তাঁর। আমার তাই ধারণা : তাজের গম্বুজটা তিনিই ডিজাইন করেন। আর এ-থেকেই আহ্মেদের পন্থ

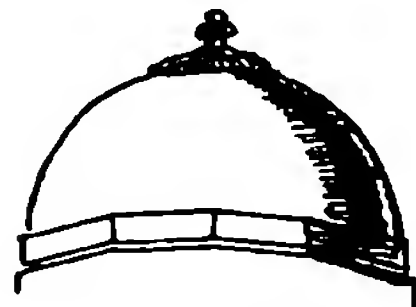
কল্পনাটা পেসেন কোথা থেকে? ফাগুসন বলেছেন-- পারস্য থেকে। হ্যাভেল দৃঢ় মনে বলেন, না। এটা ভুল হয়েছে ফাগুসনের-- "Fergusson made a great mistake in his statement that bulbous domes were not known in India in the fourteenth century." (ফাগুসন বিরাট একটা ভুল করেছেন, বলেছেন, চতুর্দশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে পেঁয়াজী গম্বুজ বানাবার কারদাটা কেউ জানত না।) স্বমতের সমর্থনে হ্যাভেল তাজের মন্দির-শিখরের



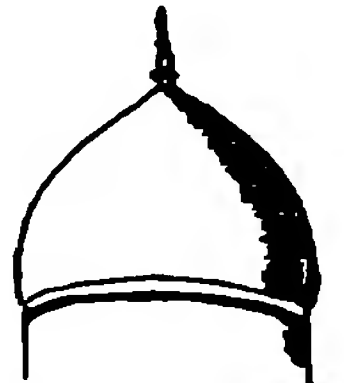
ডোম অব দ্য রক
জেরুসালেম
৭ম শতাব্দী



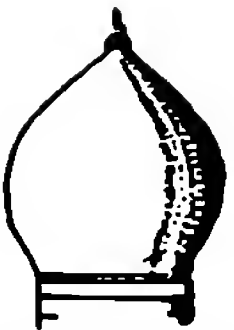
আলাই দরওয়াজা
কুৎব-চত্বর
1310



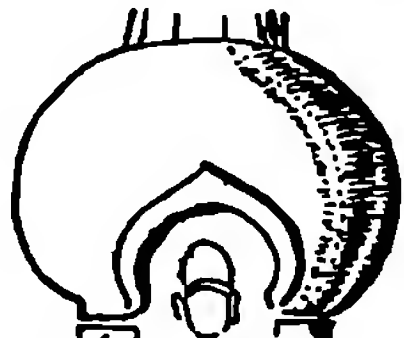
মুহম্মদশাহ সৈয়দ
দিল্লী
1444



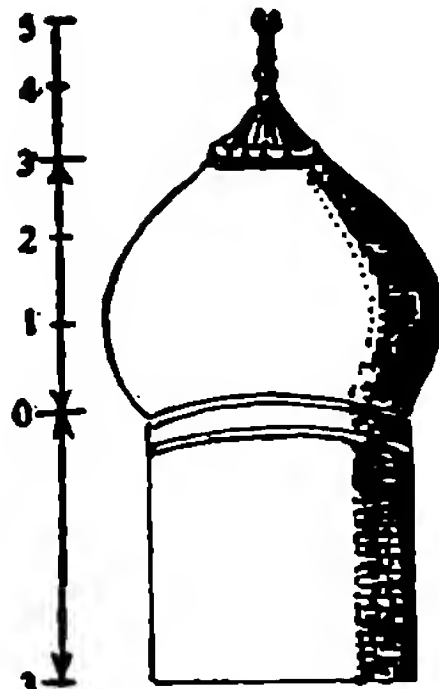
হুমায়ুন মক্‌বারা
দিল্লী
1564



আসফ আলি
লাহোর
প্রাক-তাজমহল



উনবিংশতি চৈত্য
প্রাক-ইসলামী যুগ



তাজমহল
1634



তাজমহল-দেউল
প্রাক-ইসলামী যুগ

চিত্র-11.12 গম্বুজের রূপবিবর্তন।

দাবী করেছেন তাঁর পিতা তাজমহলের পরিকল্পনাকার। কিন্তু উস্তাদ্ আহ্মেদকে গোটা তাজমহলের পরিকল্পনাকার বলে স্বীকার করতে পারছি না। হেতু একটাই : রচনা শৈলী। তাজমহলে যে বৈশিষ্ট্যবিশিষ্ট চিত্তাধারা—শাহাজানী ম্যানারিজমকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করার দৃঢ় মনোভাব, তার চিহ্নমাচ্য কোথাও নেই লাল-কিল্লায়। তাই তাজের পরিকল্পনার হিসাবে হামিদ, আহ্মেদ বা আলিমদানের দাবী মানতে পারা যায় না। কিন্তু উস্তাদ্ আহ্মেদই বা এই অস্বাভাবিক পরি-

একটি নকশা তাঁর গ্রন্থে যোগ করেছেন। হিন্দু শাস্ত্র-সম্মত তার বিভিন্ন প্রত্যঙ্গের নামোচ্চারণও করেছেন। সেই দৃষ্টান্ত গ্রন্থ থেকে আপনাদের সর্বাধার জন্য নকশাটা এখানে একে দিলাম।

এবার এই তাজের-শিখরের সঙ্গে তাজ-গম্বুজের তুলনা করুন। উচ্চতা ও ব্যাস অনেক অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে ; কিন্তু বহিঃসং-রেখা হুবহু এক। তাছাড়া পল্লিকা, মহাপদ্ম, কলস-এর কোন পরিবর্তন করা হয়নি। শব্দমাচ্য ধাতব শিখরচূড়ায় সর্বোচ্চ স্থানে

শুল্পাঙ্গির শিল্পের পরিবর্তে এসেছে ইসলামী ঐদের চাঁদ। যাকে বলে Master Artrium (উস্তাদৌ-কি-উস্তাদ)-এর 'ফিনিশিং টাচ'।

হ্যাভেল এ-প্রসঙ্গে আরও বলেছেন, "Akbar made Moghul Art great not by setting up a new standard of architectural taste, as Babur and Humayun did and as we foolishly do in India today, but by allowing the Hindu builders to weld the Persian and Arabic art tradition on their own." [আকবর যে মুগল রীতিকে মহান রূপ দিতে পেরেছিলেন, তার হেতু এ নয় যে, তিনি বাবুর এবং হুমায়ূনের মতো নবাবগণের নতুন স্থাপত্যচিন্তার প্রবর্তন করতে চাইলেন,—যে ভুলটা আমরা (অর্থাৎ ইংরেজেরা পরাধীন) ভারতবর্ষে আজও করে চলেছি। বরং তিনি স্থানীয় হিন্দু কারিগরদের সুযোগ দিয়েছিলেন পারসিক ও আরবীয় শৈলীকে তাদের নিজস্বের চিন্তাভাবনার জারকরূপে জীর্ণ করে নিতে।]

শাহজাহাঁ সে পথে যাননি। যদিও তিনি আলম-গীরের মত চরম ধর্মাত্ম ছিলেন না, তবু বেশ কিছুটা সোঁড়া ছিলেন। সারা জীবনে হিন্দু স্থাপত্য-শৈলীকে তাঁর স্থাপত্যে পরিহার করে গেছেন। একেবারে আদি যুগে, আকবরী প্রভাবমুগ্ধ হওয়ার প্রাথমিককালে কিছু কিছু বীম-ক্যাপ্টে কবলিঙ ব্যবহার করলেও শেষ দিকে তা সমস্তে পরিহার করেছেন। তাজমহল পারিকল্পনাকার—তা তিনি ঈশা আফান্দি হন, অথবা যেই হন, সম্রাটের এই মানসিকতা বৃদ্ধিতে পেরেছিলেন ঠিকই। অথচ মনে-প্রাণে তিনি আকবরের ঐ নীতিটা, যা প্রতিধ্বনিত হয়েছে হ্যাভেলের কণ্ঠে, সে মতটা বিশ্বাস করতেন। ফলে শিল্পী নিশ্চয়ই মর্যাদাসিক্ত কর্মযাত্রা ভোগ করেছিলেন—নিজের আদর্শ এবং শাহজাহাঁ কাসনার সমঝোতা করতে। এ পরীক্ষায় অসামান্য কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন তিনি। প্রতিটি ক্ষেত্রে হিন্দু-শৈলীকে ইসলামী রীতির জারকরূপে এমন সুনিপুণভাবে জীর্ণ করেছেন যে, কোথাও সে তত্ত্বটা বোঝা যায় না। তাঁর প্ল্যানিং পণ্ডিত-দেউলের অনুসরণে, অথচ দেখলে মনে হয় হুমায়ূন-মক্কারার পারস্য-রীতি অনুসারী! তাঁর গম্বুজে তাজমহলের মন্দিরের শব্দ-বন্দোবস্তের অনুরণন—মায় 'পাস্তিকা-পদ্ম-কলস' সবই গ্রহণ করেছেন দৃঢ়হাত বাড়িয়ে : কিন্তু ফিনিশিং-টাচ-এ শিল্পের বদলে ঐদের চাঁদ। সম্রাট শাহজাহাঁ তো ছাড়, অতি ধূরন্ধর স্থপতি জেমস্ ফাগুদসন পর্যন্ত ধরতে পারেননি ঐন্দুজালির এই অপূর্ণ হস্তশিল্পবৃত্ত! কল বস-

লেন : তাজ-গম্বুজ হচ্ছে নিভেজাল স্যারাসেনিক-রীতির! আরও লক্ষ্য করে দেখুন—কেন্দ্রীয় মূল গম্বুজটি হিন্দু-শৈলীর হলেও চারপ্রান্তের চারটি ছোট ছোট গম্বুজ হচ্ছে নিছক ইসলামী শৈলীর। কেউ সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে না দিলে, বলে না দিলে খেয়ালই হয় না। এমনই বে-দাগ্ মিলাদ-সরীফের অয়োজন করেছেন তিনি ইন্দো ও ইসলামী স্থাপত্যের।

মিনারিকা চতুষ্টয় : স্বীকার্য, মৌলিক চিন্তা নয়। মক্কারার সঙ্গে মিনারিকাকে যুক্ত করার রেওয়াজ এতদিন দিল্লী-আগ্রা অঞ্চলে ছিল না। আকবর সেটা প্রথম আমদানী করতে চেয়েছিলেন নিজের মক্কারায়, তাই দক্ষিণ-তোরণে তাদের রূপায়িত করেছিলেন। কিন্তু নিজ মক্কারার মূল সৌধে সেগুর্লি নির্মাণের পূর্বেই তাঁকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হয়। জাহাঙ্গীর সে তত্ত্বটা বৃদ্ধি প করেননি, পেরেছিলেন নুরজাহাঁ ; আর তাই ইমুদ্-উদ্দৌলায়, নিজ মক্কারায় এবং জাহাঙ্গীরের সমাধিতে তিনি মিনারিকা বানিয়েছিলেন। এসব কথা আগেই বলেছি। কিন্তু রাজধানীর সম্মুখস্থ চৌহন্দীর বাহিরে এই অপূর্ণ অবয়বটি মক্কারায় অঙ্গ হিসাবে বারে বারে রূপায়িত হতে দেখেছি। মিনার-মিনারিকার বিবর্তনটা বোঝাতে চিত্র—11.13-এ সাতটি ছবি দেওয়া হয়েছে। তার প্রথম দুটি বিচ্ছিন্ন মিনার, বাকি পাঁচটি ইমারৎ-সংলগ্ন মিনারিকা। তুলনামূলক বিচারে তাজের মিনারিকাই সবচেয়ে সাদামাটা। তার সম্ভাব্য হেতু সম্বন্ধে মূর্খতবা আলী-সাহেবের মন্তব্য আগেই উদ্ধৃত করেছি (পৃঃ 34)।

তাজের মিনারিকা প্রসঙ্গে লিখতে বসে এখন মনে হচ্ছে, পূর্ব-অনুচ্ছেদের ঐ পংক্তিটা কেটে দিই, ঐ 'তাজমহলের সৌন্দর্যের বৃকোদরভাগ দখল করে আছে তার গম্বুজ'। এখন মনে হচ্ছে, গম্বুজ নয়, ঐ মিনারিকা চতুষ্টয়।

মূল ইমারতের আপেক্ষিকে এই চারটি মিনারিকা, তাদের আকার, উচ্চতা, আয়তন, অবস্থান, তলবিভাগ, এবং 'ম্যাস' চূড়ান্ত সফলতার স্বাক্ষরমণ্ডিত। ভূমিনকশায় কেন্দ্রস্থ ফোয়ারার কাছে দাঁড়িয়ে, অথবা প্রবেশ-তোরণের মধ্যবিন্দুতে দাঁড়িয়ে দর্শক ঐ চারটি মিনারিকাকে ইমারতের আপেক্ষিকে কী-ভাবে দেখবে তা কেমন করে আন্দাজ করলেন স্থপতি? সম্মুখদৃশ্যে (এলিভেশানে) মিনারিকার অবদান নিতান্ত তুচ্ছ। কিন্তু বাস্তবে, পার্সপেক্টিভ-দৃষ্টিতে কেন্দ্রবিন্দু থেকে টানা 'রেডিয়াল-রেখার' উদয়স্তানদূর রশ্মিচ্ছটার মতো তা মহিমামণ্ডিত। এই অবকাশে হুমায়ূন-মক্কারার

ছবিটা (চিত্র-9.5) একবার দেখে নিন। এখন যেন মনে হবে,—হ্যাঁ, এটারই অভাব ছিল কটে।

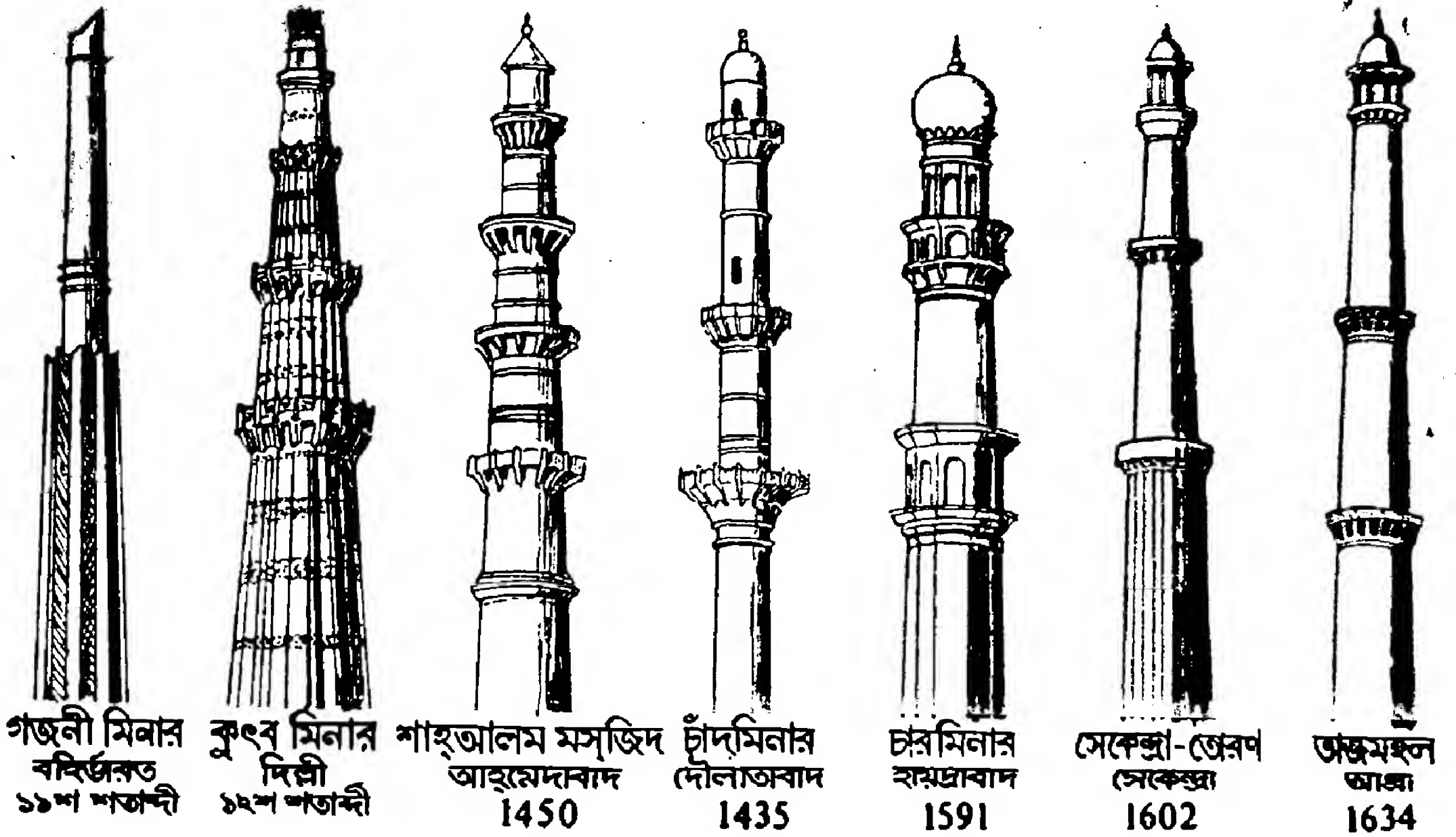
অথচ কী আশ্চর্য—কী অপরিসীম আশ্চর্য, আলডুস্ হাক্সলে তাজ দেখে এসে লিখলেন,¹⁸ "Architecturally, the worst features of the Taj are its minarets. These four thin tapering towers, standing at the four corners of the platform on which the Taj is built are among the ugliest structures ever built by human hands." (স্থাপত্যের নিরিখে তাজমহলের দুর্বলতম অঙ্গ হচ্ছে তার মিনারিকা-চতুষ্টয়। যে প্ল্যাটফর্মের উপর তাজ নির্মিত তার চার-প্রান্তে এই

(খ) জোড়াইশ্বলগদুলি প্যারেন্টে করায় সৌন্দর্য-হানী হয়েছে। (ওর মত। আমরা মানতে পারছি না। তবে ভালো-সাগা না-সাগা নিয়ে তো তর্ক চল না।)

(গ) ক্যালকনির তলায় ব্র্যাকিটেগদুলি অহৈতুকী। (কটেই তো। স্ট্রাকচারালি! আর্কিটেকচারালি নয়। কোরিথিয়ান-কলামের মাথায় পদ্বীপসম্ভার অথবা আয়নিক কলামের মাথায় আয়নিক ডক্সাটো তো অহৈতুকী। হাক্সলের মতে তা কি বর্জনীয়?)

(ঘ) ক্যালকনিগদুলি সম-দূরত্বে নির্মিত নয়। (না কি? মাপ নিতে ভুল হয়ে থাকবে!)

একটু অপ্রাসঙ্গিক হচ্ছে, তবু বলি—যে গ্রন্থের জন্য আলডুস্ হাক্সলে বিখ্যাত তাঁর সেই বইটি ছাপা



চিত্র-11.13 মিনার/মিনারিকার ক্রমবিকর্তন।

চারটি শীর্ণকায় মিনারিকা কোন মরমানুষের হাতে বানানো কুৎসিততম স্থাপত্য-অঙ্গের অন্যতম।) কেন? হাক্সলে-সাহেবের আপত্তি চার-জাতের। সেগদুলি শ্রেণী-বন্ধভাবে সাজিয়ে দিচ্ছি, (আমাদের মন্তব্য সমেত) :

(ক) মিনারিকাগদুলি অহৈতুক মোটা-থেকে-সরু করা হয়েছে। (আজীব-সওয়াল! সারা পৃথিবীতে যে-কোন যুগে যত মিনার-মিনারিকা-স্তম্ভ নির্মিত হয়েছে তা মোটা-থেকে-সরু। গ্রীস, রোম, মিশর, ভারতবর্ষ সর্বত্র। একমাত্র ব্যতিক্রম তুর্কি স্বীপ। সরু-থেকে-মোটা স্তম্ভ দেখার বাসনা থাকলে হাক্সলের তুর্কি স্বীপে যাওয়া উচিত ছিল, রাজা নসস্-এর প্রাসাদ দেখতে।)

হয়েছিল 1931 সালে—'Brave New World'। ছয়-শত বৎসর পরে পৃথিবীর কী অবস্থা হবে তা তিনি কল্পনায় দেখেছেন। গ্রন্থটির বর্তমান বয়স মাত্র পঞ্চাশ বছর। এখনই তা হাস্যকর। লেখক ফর্ডিংশাউ শতাব্দীতে পৃথিবীর জনসংখ্যা কল্পনা করেছেন 200 কোটি,¹⁷ জন্ম-নিয়ন্ত্রণের জন্য মেয়েরা অশ্রুত ব্যায়াম করছে অথবা বেলেট-কম্বছে,¹⁸ পারমাণবিক শক্তির সম্ভাবন পায়নি বিজ্ঞান : এবং লন্ডন থেকে নিউ ইয়র্ক উড়ে যেতে আকাশযানের সময় লাগছে ছয় ঘণ্টা। এই যার কল্পনার দোঁড়, তাঁর কাছে আর কী-ই বা প্রত্যাশা করা যায়?

মিনারিকাগদুলির প্রসঙ্গে আর একটি কথা কলা

বাকি আছে। যা ইতিপূর্বে হয়নি, পরেও কোথাও হয়েছে বলে জানি না। সম্পূর্ণ মৌলিক চিন্তা।

মিনারিকাগর্দলি আলম্ব (ভার্টিকাল) নয়, অতি সামান্য হেলানো। কিন্তু পীসার মিনার অথবা কুংব মিনারও তো হেলে আছে, মৌলিকতা কোথায়? তফাৎ এই : পীসা ও কুংব মিনার হেলেছে প্রকৃতির খেলালে, বনিয়াদ বসে যাওয়ায় ; যেমন কলকাতা শহরে 12 নং ক্যামাক স্ট্রীটের দশতলা বাড়িটি হেলে টিকে আছে! তাজমহলের মিনারিকা চতুষ্টয় হেলে আছে পরিকল্পনা-কারের ইচ্ছানুসারে। প্রমাণ? ওরা প্রত্যেকেই হেলে আছে বাহির দিকে। দক্ষিণ-পশ্চিমের মিনারিকার শীর্ষদেশ কেন্দ্রবিন্দুর উপর দিয়ে টানা আলম্ব-রেখা থেকে 200 মি. মি. বা আট-ইঞ্চি দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে হেলে আছে ; বাদ বাকি তিনটি 50 মি. মি. (বা দুই ইঞ্চি) হেলে আছে ; কিন্তু সর্বদাই বাহির দিকে! অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব মিনারিকা হেলেছে উত্তর-পূর্ব দিকে, উত্তর-পশ্চিম মিনারিকা হেলেছে উত্তর-পশ্চিমে, দক্ষিণ-পূর্ব মিনারিকা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে! উদ্দেশ্য, যদি কোনদিন ভূমিকম্পে মিনারিকা চারটি ভেঙে পড়ে তবে তা পড়বে বাহির দিকে, মূল সৌধের কোনো ক্ষতি না করে!¹⁹

অন্তত এই তথ্যটুকু যদি গাইড জানিয়ে দিতে পারত তাহলে হয়তো পণ্ডিত-প্রবর আলডুস্ হাঞ্চলে সেদিন সগর্বে ঘোষণা করতেন না : 'মোর কী সাহস ভাই/ভারকার মখে আমি দিয়া আসি ছাই!'

কর্মনিরাক্ষিপ্ত প্রয়োগ-নৈপুণ্য : প্রধান ইবানের দু-পাশে উপর-থেকে-নিচে কুরান-সরিফের যে বাণী তুঘ্রা-হরফে কালো-রঙে খোদাই করা (চিত্র-11.18) তাতে একটি অদ্ভুত প্রয়োগকৌশল লক্ষণীয়। হরফগর্দলি দেখলে মনে হয় তারা আকারে সব সমান। বাস্তবে তা নয়। বাস্তবে যদি অক্ষরগর্দলি সমান মাপের হত তাহলে নিচের হরফগর্দলি আমরা বড় দেখতুম, উপরের-গর্দলি অপেক্ষাকৃত ছোট। তার হেতু শব্দ এ নয় যে, উপরের অক্ষরগর্দলি দূরে আছে। তার মূল হেতু দর্শককে ঘাড় উঁচু করে দেখতে হচ্ছে। তত্ত্বটার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে চিত্র-11.14-তে। প্রতিটি অক্ষর সমান মাপের মনে হবে যখন তারা দর্শকের চোখে সমান কোণিক মাপ উপস্থাপন করবে। বাস্তবে TAJ MAHAL যদি বড় থেকে ছোট মাপে লেখা যায়, তবেই প্রতিটি অক্ষর 'এ' মাপের মনে হবে দর্শকের কাছে।

অপটিক্স-বিজ্ঞানের এই প্রয়োগ-কৌশলটি তাজ-মহলে নিখুঁতভাবে রূপায়িত, যদিও প্রাক-তাজ ভারতীয় স্থাপত্য-শাস্ত্রের এটা তেমন নজরে পড়ে না।

অপরপক্ষে য়ুরোপে হাই-রেনেসাঁ যুগে এ-কৌশল বহুলপ্রযুক্ত। যথা, মিকেলান্জেলোর (1475-1564) পীতা, মোজেস মূর্তিতে এবং সিসতিন-চ্যাপেল ম্যুরালে। এর ফরাসী নাম trompe l'oeil। জাহাঙ্গীরকে স্যার টমাস্ রো কিছু য়ুরোপীয় চিত্র উপহার দিয়েছিলেন ; তাতে ভারতীয় চিত্রকরদের 'পরিপ্রেক্ষিত' সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্টতর হতে পারে ; কিন্তু এই trompe l'oeil পদ্ধতি সম্বন্ধে কোনও ধারণা হওয়া অসম্ভব। এটিও অন্যতম কারণ যাতে অনমান করছি, উম্মাদ ঈশা আফান্দি বহিরাগত। পশ্চিম শিল্পজগত সম্বন্ধে তিনি ওয়াকিব্বাহাল ছিলেন। এই প্রয়োগ-কৌশলের কৃতিত্বের ষোলো-আনা হিসাবাদার তুঘ্রা লেখক শিরাজী নন, কারণ এ প্রয়োগ-কৌশল গোটা ইমারতের স্থাপত্যে প্রতিফলিত।

সম্মুখদৃশ্যের গাণিতিক সূত্র : আগেই বলেছি, সম্মুখদৃশ্যে কোথাও শাহজাহানী ম্যানারিজম্ নেই, যা দেখে দেখে দর্শক ক্রান্ত বোধ করেন—আগ্রা-কিল্লায়, লাল-কিল্লায়, দিল্লী, আজমীর, লাহোরে। ইতিহাস যদি হারিয়ে যেত, যদি শব্দ রচনা-শৈলী দেখে-যেভাবে পণ্ডিতেরা মিজ-বড়ু-দীন চন্দীদাসের রচনা সনাক্ত করেন, যেভাবে কুমারসম্ভবের সপ্তম সর্গের পরের রচনা কালিদাসের কি না তা নির্ণীত হয়, সেভাবে যদি বিচার করতে হত, তাহলে শাহজাহাঁর দাবী আদৌ টিকত না। বামির হাতে নিবে-যাওয়া দীর্ঘাশিখাটির মতো বেহেস্ত-আসীন শাহজাহাঁকে আজ আতর্কণ্ঠে পদকার দিয়ে উঠতে হত 'হারিয়ে গেছি আমি!' কারণ তাজে আর যাই থাক—শাহজাহাঁ নেই!

মোকাম-কুর্সি বা প্লিন্থ্ হুমায়ুন-মকবারায় ছিল 6.71 মিটার, সেকেন্দ্রায় সেটা বর্ধিত করা হয়েছিল 9.14 মিটারে। তাজে তা আবার কমিয়ে আনা হল 5.97 মিটারে। তিনটি সৌধের সম্মুখদৃশ্যের তুলনা-মূলক বিচার করলে অনুভব করা যায় যে, বিস্তার ও উচ্চতার অনুপাতে তাজ-কুর্সির মাপটাই শ্রেষ্ঠ। গড়-মানুষের উচ্চতা-অনুসারে অপর দুটি ক্ষেত্রে মোকাম-কুর্সি বড় বেশি হয়ে গেছে। সৌন্দর্যহানী হয়েছে। পার্সি ব্রাউনের Indian Architecture, Islamic Period গ্রন্থে LXII প্লেটে দুটি আলোকচিত্র আছে, হুমায়ুন-মকবারার। প্রথমটি মাটিতে দাঁড়িয়ে তোলা, দ্বিতীয়টি আকাশযানের গবাক্ষ থেকে। এই মাত্র যে দুটির কথা বললাম, তা শব্দ প্রথম ক্ষেত্রেই অনুভব করা যায়, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নয়। বেশ ব্যস্তে পারা যায়, মোকামকুর্সি যে বাঞ্ছনীয় উচ্চতা অতিক্রম করেছে এ তথ্য মীর্জা গিয়াস্ প্রণয়ন করতে পারেননি। কারণ তিনি

ছোট মাপের কাঠের গডেসটা দেখবার সময় মনশ্চক্ষে নিজেই এ মেনে ছোট করে দেখতে পারান দর্শক বাস্তবে কী দেখবে। সেকেন্দ্রা মন্দির সন্মুখের এ একই কথা। অপরপক্ষে তাজ-পরিম্পনাকার এ তথ্যটা বুঝছিলেন। 'এলিভেশান' আঁকবার সময় ধ্যান-নেত্রে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন তার 'পরিপ্রেক্ষিত দৃশ্য'টা কেমন হবে। ধ্যান-নেত্রে নয়, যেহেতু তিনি ছিলেন অপটিক্স-বিজ্ঞানে প্রগাঢ় পণ্ডিত।

এখানে 'এলিভেশান' ও 'পার্সপেক্টিভ' শব্দ দুটিকে কিছুটা ব্যাখ্যা করা দরকার। 'এলিভেশান' হচ্ছে একজাতের সাত্তিক চিত্র, যেখানে প্রতিটি অঙ্গের বাস্তব উচ্চতা দেখানো হয়। সে-চাঁবি হুবহু সামনে থেকে আঁকা—অর্থাৎ প্রতিটি বিন্দু আঁকবার সময় মনে রাখতে হবে, ঠিক সামনে থেকে যেমন দেখাবে তেমনিই আঁকবে। এটি সাত্তিক চিত্র, ব্যবহারিক প্রয়োজনে আঁকা হয়—যা দেখে মিস্ত্রী কাজ করে। এ-গ্রন্থে চিত্র—9.18 হচ্ছে 'এলিভেশান'। অপরপক্ষে 'পার্সপেক্টিভ' বা 'পরিপ্রেক্ষিত' চিত্র হচ্ছে বাস্তবে দর্শক যা সামনে থেকে দেখবে। বিশেষ কোনও দৃষ্টি-কোণ থেকে। এ-গ্রন্থে চিত্র—9.18B হচ্ছে 'পার্সপেক্টিভ' চিত্র। ইতিপূর্বে কোথাও 'এলিভেশান', কোথাও 'পার্সপেক্টিভ' এঁকেছি। তাজের ক্ষেত্রে তিনটি চিত্র আঁকতে হল।

চিত্র—11.15 হচ্ছে তাজের এলিভেশান। লক্ষণীয়, এখানে পিছনের মিনারিকা দুটি দেখা যাচ্ছে না; সামনের মিনারিকাম্বয়ে তারা ঢাকা পড়েছে। এখানে প্রতিটি উচ্চতা বাস্তবে যেমন বানাতে হবে। অর্থাৎ চিত্র—11.14-এ যেমন বাস্তবে 'T' অক্ষরটি বড় ও 'L' অক্ষরটি ছোট।

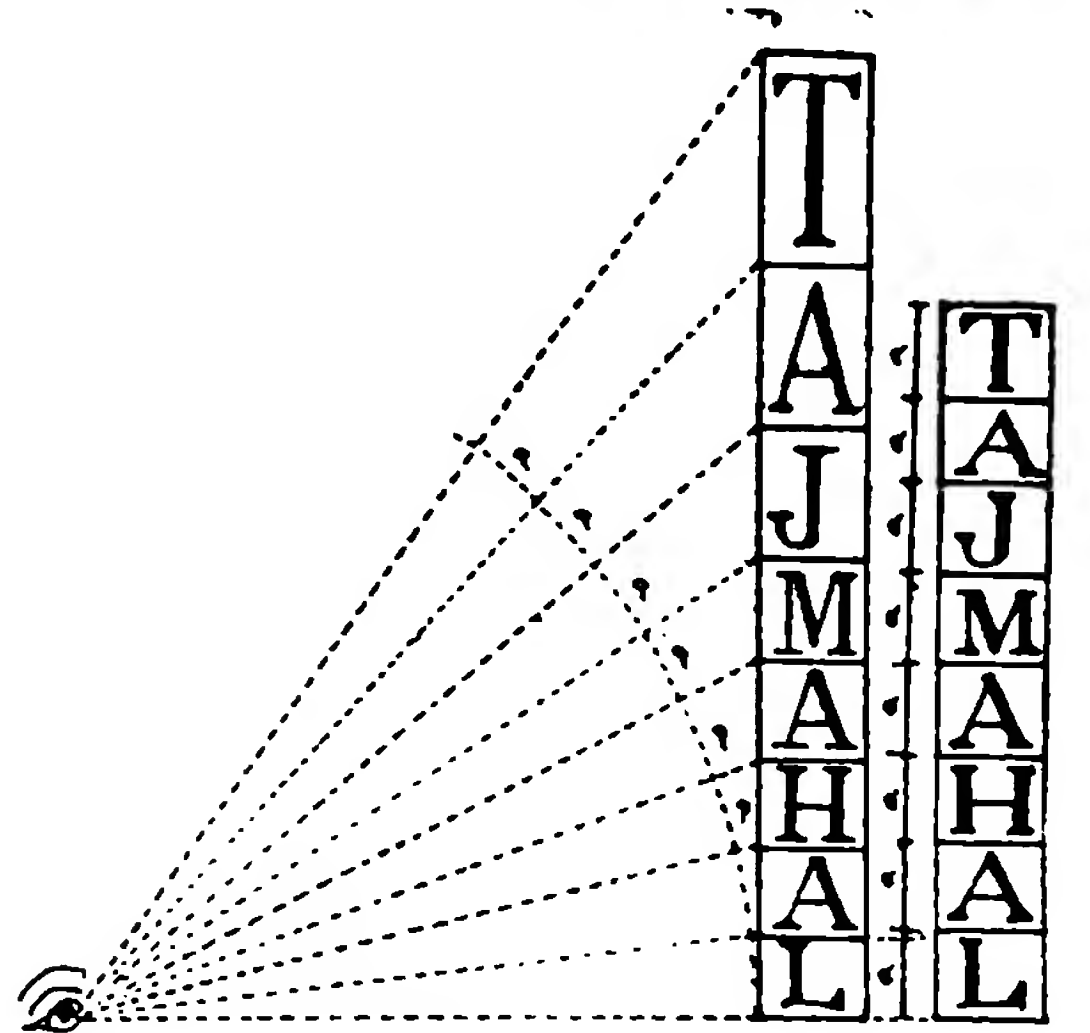
চিত্র—11.16 হচ্ছে পরিপ্রেক্ষিত-দৃশ্য। দর্শক যা দেখবেন। কোথা থেকে? ঠিক সম্মুখ থেকে, কেন্দ্রীয় জলাধারের কাছ থেকে, যখন তাঁর চোখের 'লেভেল' মাটি থেকে 5.97 মিটার উঁচুতে। অর্থাৎ মোকাম-কুর্সির সমতলে।

চিত্র—11.17 হচ্ছে অপর একটি পরিপ্রেক্ষিত। এবার দর্শক আছেন প্রবেশ-তোরণের দ্বিতলে। কিছুটা গরুড়াবলোকনে। তাই এবার মোকাম-কুর্সির শাহন কিছুটা দেখা যাচ্ছে।

পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে পরে আলোচনা করব : আপাতত দেখি 'এলিভেশানে' পরিম্পনাকার রাজমিস্ত্রীদের কী নির্দেশ দিচ্ছেন :

মন্দির সৌধের বিস্তার যতটা (EE'), উচ্চতাও ততটা (P.Q)। অর্থাৎ E এবং E' বিন্দুতে জমির সমান্তরাল-রেখার সঙ্গে দুটি 60 ডিগ্রি কোণ রচনা

করা হল। তারা দেখানে মিলল সেই Q-বিন্দুটি মন্দির-সৌধের উচ্চতম বিন্দু ও দাওবদন্ডের পাদদেশ। PQ-রেখাকে বাস কম্পনা করে একটি বৃত্ত রচনা করা গেল, C হচ্ছে যার কেন্দ্রবিন্দু। ঐ C-বিন্দু দিয়ে জমির সমান্তরাল একটি সরলরেখা টানলে তার শেষ-প্রান্তে পাব D ও D' বিন্দুদ্বয়,—তারা সম্মুখস্থ দুটি শেষপ্রান্তের গুলদস্তার শীর্ষবিন্দু। আরও লক্ষণীয়, P-বিন্দু থেকে যদি সম্মুখস্থ মিনারিকা-শীর্ষের (গম্বুজ-বাদে) মধ্যবিন্দুদ্বয়কে যোগ করা যায়, তাহলে সেই রেখাদ্বয় E ও E থেকে টানা আলম্ব রেখাকে A এবং A' বিন্দুতে ছেদ করে। অপিচ, দ্বিতলের উচ্চতা (h₁) একতলার উচ্চতা (h) অপেক্ষা সামান্য বেশি (যদিও আমার অতি ক্ষুদ্র নকশায় তা বোঝা যাচ্ছে না)। কতটা



চিত্র—11.14 তাজে trompe l'oeil প্রয়োগকৌশল।

বেশি? ঐ trompe l'oeil নীতিতে কতটা দরকার—যাতে দর্শকের চোখে তারা সমান উচ্চতা নিয়ে প্রতীয়মান হয়। মোকাম-কুর্সির দৈর্ঘ্য উচ্চতার দ্বিগুণ।

এবার প্রথমে পরিপ্রেক্ষিত চিত্রটা (চিত্র—11.16) লক্ষ্য করুন :

(ক) সৌধের উচ্চতা সামান্য কমে গেছে, কম্পিত-বৃত্তটা এখন খাতব-কলসের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্রবিন্দু কিছুটা নেমে এসেছে।

(খ) এতকজা ও দোতলার মাপ সমান মনে হচ্ছে।

(গ) পূর্ব ও পশ্চিম ফাসাদের ইবানের দু-প্রান্তে দুটি গুলদস্তা (D₃, D₃) বর্তমানে দেখা যাচ্ছে। তারা সন্দের একটি হৃদয় রচনা করেছে। P-বিন্দু থেকে একটি সরলরেখা টানলে তা D₁ D₃-কে ছুঁয়ে যাচ্ছে।

(ঘ) পূর্ব ও পশ্চিম ইবানের উপর যে পাঁচিল তাও দেখা যাচ্ছে। সেই তেড়ছা-পাঁচিলের রেখাটি বর্ধিত করলে তা একদিকে P-বিন্দু, অপরদিকে মিনারিকার শীর্ষবিন্দুস্বয়ংকে স্পর্শ করছে।

(ঙ) P-বিন্দু থেকে সম্মুখস্থ মিনারিকার এক-তলা, দোতলা ও তিনতলার প্রান্তদেশকে স্পর্শ করে যদি যদি একাধিক রেখা টানা যায় তবে তারা পিছনে অবস্থিত মিনারিকার ঐ ঐ তলকে ছুঁয়ে যায়।

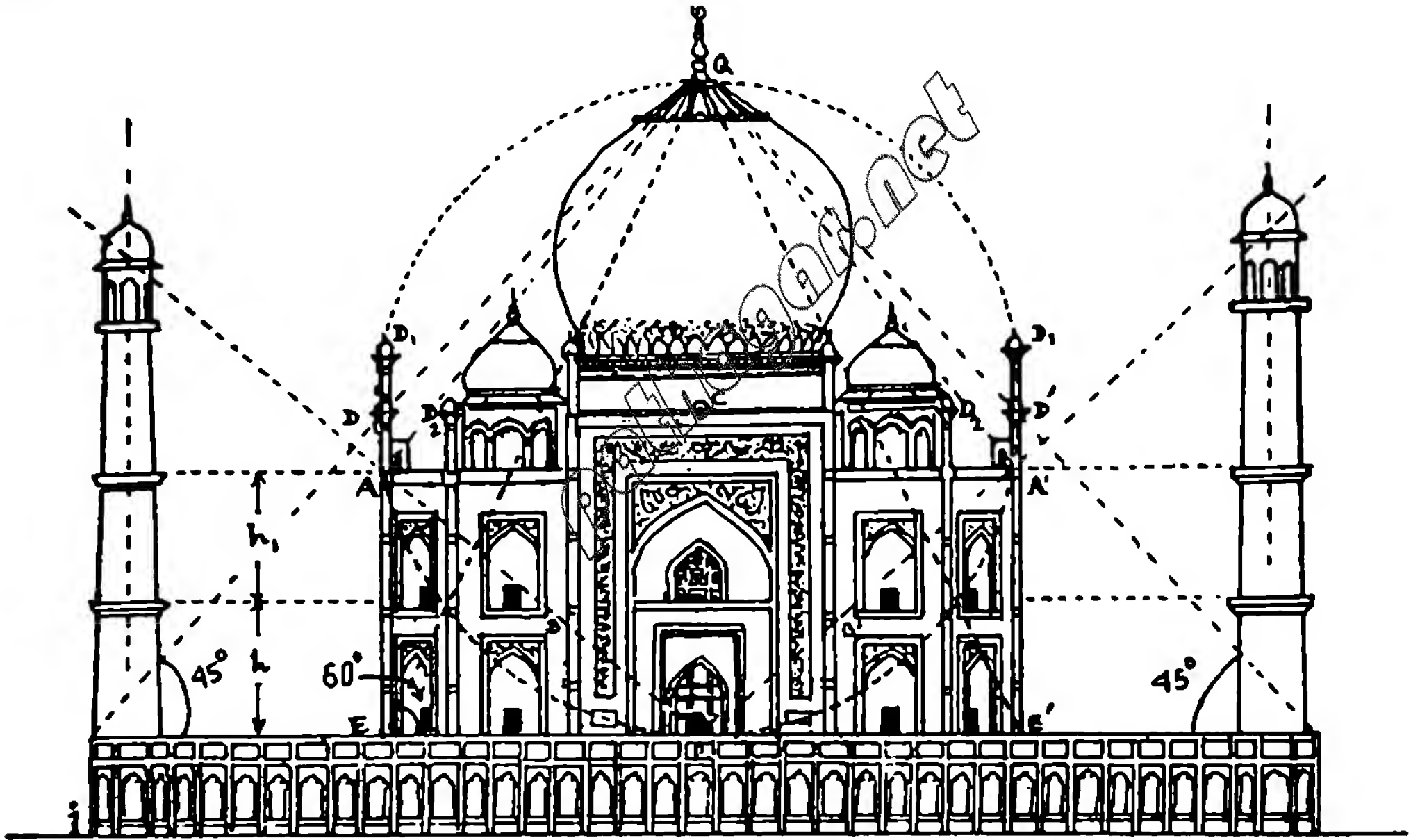
(চ) সামনের দুটি ছোট ছোট গম্বুজ (ইসলামী শৈলীর) যারা এলিভেশান-চিত্রে অনেক দূরে ও অনেক নিচে ছিল, তারা কেন্দ্রীয় গম্বুজের (হিন্দু-শৈলীর) কাছে ঘনিষ্ঠে এসেছে মিতালী করতে, যেন চুম্বন করছে।

(গ) তেড়ছা ইবান প্যারাপেটের রেখাদুটি বর্ধিত করলে তা মিনারিকাস্বয়ের তিনতলার শীর্ষবিন্দুস্বয়ংকে ছুঁয়ে যাচ্ছে।

(ঘ) বিভিন্ন মিনারিকার তল-নির্দেশক রেখা একই মিলন-বিন্দুর দিকে অভিয়াতী।

(ঙ) মোকাম-কুর্সির শাহন এখন দৃশ্যমান। তার দৃ-প্রান্তের রেখা বর্ধিত করলে ঐ একই বিন্দুতে এসে মেশে।

‘অল রোডস্ লীড টু রোম’-নীতিতে সব ‘ডটেড-লাইন’ যে বিশেষ বিন্দুটিতে মিশতে চাইছে সেটাই বর্তমানে বিলীয়মান-বিন্দু। গরুড়াবসোকনে দেখার জন্য এখন দৃষ্টিতল উপরে উঠে এসেছে, তাই বিলীয়মান-বিন্দুও উন্নত হয়েছে।



চিত্র-11.15 তাজমহলের এলিভেশান বা বাস্তুশাস্ত্রসম্মত সম্মুখদৃশ্য।

পরিপ্রেক্ষিত বিজ্ঞান অনুসারে বর্তমানে P-বিন্দু হচ্ছে বিলীয়মান-বিন্দু বা vanishing point।

এবার দৃষ্টিকোণ বদলে নিন, দাঁড়ান গিয়ে সম্মুখস্থ প্রবেশ-তোরণের ম্বেতলের কালকনির কেন্দ্রস্থলে। কী দেখছেন? (চিত্র-11.17) :

(ক) সৌধের উচ্চতা আরও কমে গেছে। কম্পিত বৃত্তটা এখন ধাতবকলসের শীর্ষস্থান ছুঁয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্রবিন্দু আরও নেমে এসেছে।

(খ) একতলা ও দোতলার মাপ এখনও প্রায় সমান মনে হচ্ছে।

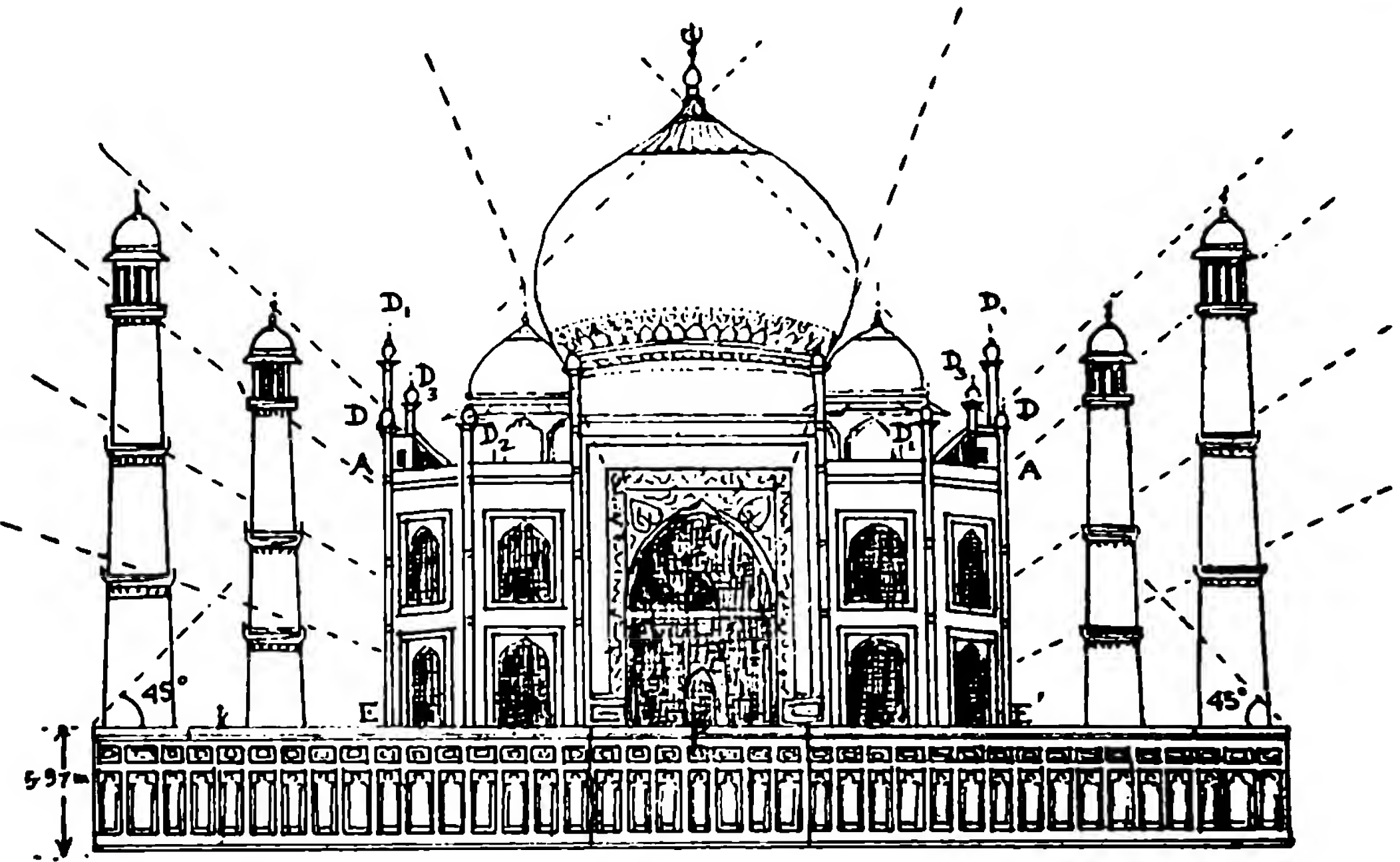
এতক্ষণ যা বলেছি তা নিতান্ত জ্যামিতিক কচ্-কচি। আপনারা বলতে পারেন, বেশ তো, সবই মানছি, কিন্তু তাতে কোন চতুর্বর্গ লাভ হল?

জবাবে বলব, তাতেই তাজ মহিমময় হয়ে উঠল!

মানছি, সিমেন্টিকাল ইমারতে মধ্যবিন্দুর সামনে দাঁড়িয়ে দর্শক ইমারতের দৃ-পাশের যাবতীয় তেড়ছা সমান্তরাল রেখাকে একটিমাত্র বিন্দুতে মিশতে দেখবে। পার্সপেক্টিভ প্রযুক্তি-বিজ্ঞান বলে, সেই বিশেষ বিন্দুটি হচ্ছে বিলীয়মান-বিন্দু বা vanishing point। দর্শক যদি গরুড়াবসোকনে দেখে তখন বিলীয়মান-বিন্দু

উপরে উঠবে। ফলে, তাজে গা দেখাচ্ছে, তা কেনও ভৌতিক নয়; অকেশান্ত মতে এটাই হবার কথা। কিন্তু এ তথ্যটা তো সব জাতের ভারসাম্যমূলক ইমারতের ক্ষেত্রেই সত্য। ইমায়ুন-মক্‌বারায়, ইমদুদ্দৌলায় এবং ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে। কিন্তু অন্য কোথাও তো দর্শক এ ছন্দটা অনুভব করেন না—উদয়ভানুর ঐ রবিরশ্মিরেখার মতো বিচিত্র নকশাটো! এলিভেশান দেখে কি আন্দাজ করা যায় যে, বাস্তবে অমন একটি সুন্দর প্যাটার্ন রচিত হবে? অপটিক্স-বিজ্ঞানে কতখানি অধিকার থাকলে এ সত্যটা অনুভব করা যায়, তা আপনি-আমি বুঝব না, বুঝবেন যারা ঐ প্রযুক্তি-

সম্বন্ধ-মূল্যের মান্দানিক ছন্দ; ভার্মিতিক হিসাব-নিকাশ নগ্নক জটিলসারে লক্ষ্য করে না। করে না আল্পনার নক্সায়, কাম্বীরী গালিচায়, কোরসী-শাড়ির আঁচলে কিম্বা নবমুদ্র চন্দন-চাঁচিট লগাটে। কিন্তু ঐ স্‌সম বর্ণকান্তাপর ছন্দই মান্দানিক অন-ভূতির জগতে রসজাহ্নবী-ভগীরথের লক্ষ্মিনির্ধোষ! গম্বুজটা এলিভেশানে আসৌ নয়নাভিরাম নয়, সফ-দরজঙ অথবা বিবিকা-মক্‌বারার মতো। অথচ পরি-প্রেক্ষিতে একটু চ্যাপ্টা হয়ে বাবার পর তা তাজের সুপরিচিত সুসমার্মিত। ইবান-প্যারাপেটের উচ্চতা



চিত্র-11.16 তাজমহলের পার্সপেক্টিভ, দৃষ্টিভঙ্গ 5.97 মি।

বিদ্যা নিয়ে হাতে-কলমে কাজ করেন—এঞ্জিনিয়ার, আর্কিটেক্ট, ড্রাফটস্‌ম্যান এবং যারা শব্দ বিমর্ষিত নয়, প্রতীচ্য-শৈলীতে ছবি আঁকেন।

নকশা দেখে অজাত ইমারতের বাস্তব-স্বরূপটা কল্পনা করতে পারা স্থপতির অন্যতম প্রধান গুণ। অপটিক্স-বিজ্ঞান, পরিপ্রেক্ষিত এবং আরও কয়েকটি প্রয়োগবিদ্যার উপর প্রগাঢ় অধিকার থাকলেই ধ্যাননেত্রে সেটা দেখা সম্ভবপর। তাজ-পারিকল্পনাকারের এই জ্ঞানটি ছিল আকাশচুম্বী।

এই মানসচক্ষে প্রাগ্‌দর্শনের ক্ষমতার দিক থেকে তাজমহল—একমাত্র ইলোরার বিশ্বকর্মা-কৈলাস মন্দির ব্যতিরেকে ভারত-ভূখণ্ডে সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

ঠিক কতখানি হলে সেটা এই ছন্দে তালে-তাল দেবে, তা কি পরিপ্রেক্ষিত-চিত্রে বোঝা যাচ্ছিল? মিনারিকার বিভিন্ন তলের উচ্চতা কেন কম-বেশি করা হয়েছে—যে তত্ত্বটা অনুধাবন করতে পারেননি আলফুন্স হাঙ্কলে—তা এখন পরিষ্কার বোঝা গেল। তাজের প্রতিটি প্রত্যঙ্গের মাপজোখ একটি বিশেষ ছন্দে গড়া, যাতে তারা ঐ উদয়ভানুর রশ্মিছটার প্যাটার্নটা ফুটিয়ে তুলতে পারে।

কিন্তু কেন ঐ প্যাটার্ন? শব্দই কি একটা নয়নাভিরাম আকৃতি দান করতে? বোধকার নয়। হয়তো তাজের প্রতিটি অঙ্গের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতা নির্ধা-

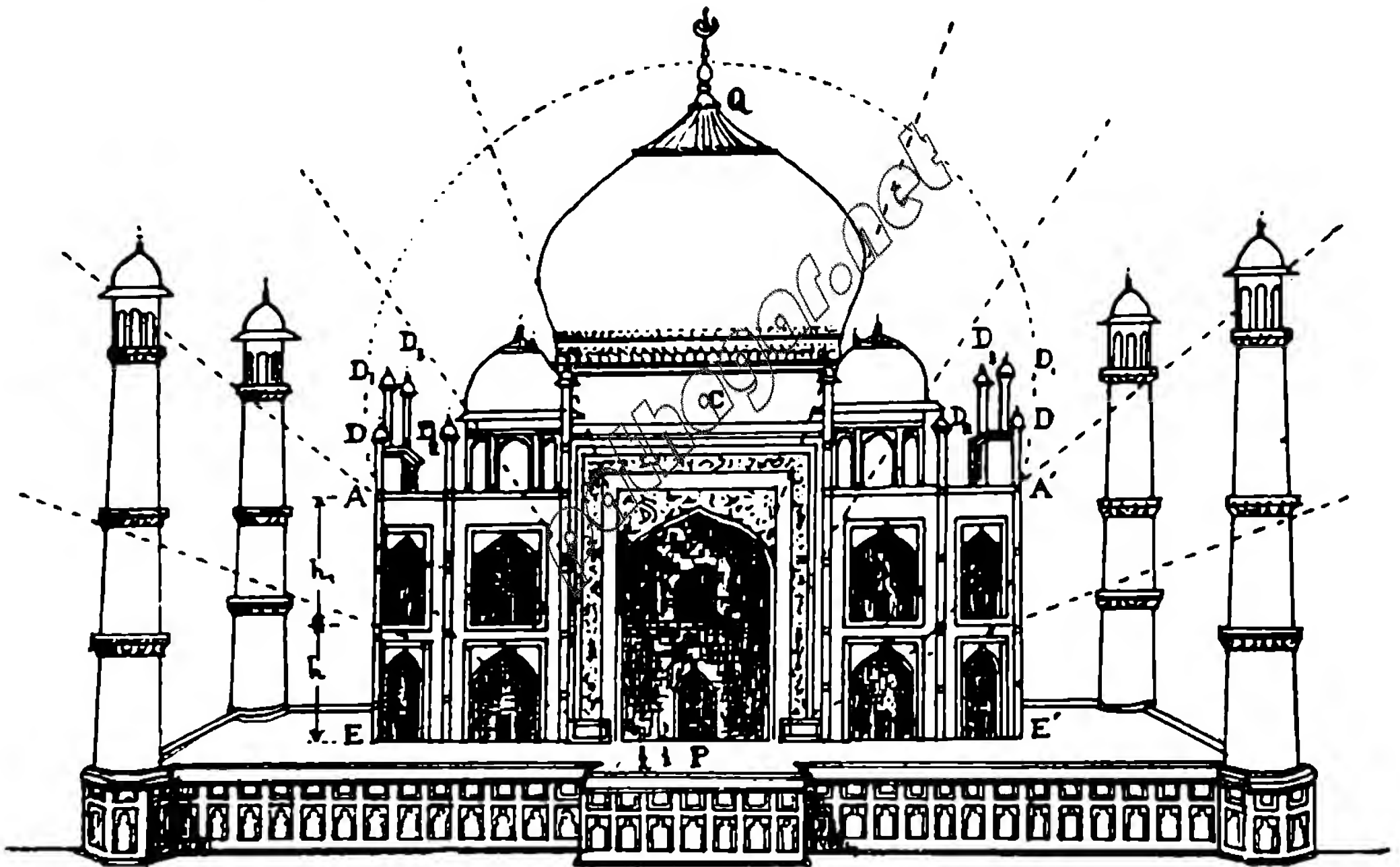
রূপের মধ্যে দিয়ে অমন একটি বিচিত্র প্যাটার্ন গড়ে তোলার পিছনে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। সেটা যেন বিশেষ কিছু একটা কথা বলতে চায়, আভাসে-ইঙ্গিতে, অন্তর্গত বাজনায়ে! একটা 'সিম্বলিজম', একটা প্রতীকী! কী তা? আমার যা অনুমান তা পরবর্তী অনুচ্ছেদে নিবেদন করেছি।

তাজে হিন্দু শিল্পশাস্ত্রের প্রভাব : আমার মৌল বক্তব্য—অজ্ঞাত পরিকল্পনাকার আকবরী স্থাপত্যদর্শনে বিশ্বাসী ; সম্ভবতঃ শাহজাহাঁর অজ্ঞাতসারে।

হিন্দু ও মুসলমান—এ মহান উপলব্ধির দুই প্রধান প্রতিবেশীর মাঝখানে একটা সেতু রচনা করতে

ঐদের চাঁদের আড়ালে লুকানো মহাপন্থ-ঘন্টা-কসসে! সবই গোপনে। কারণ তাঁকে এবার 'ট্র্যাবিয়েটে'-শাহ-জাদার সঙ্গে 'আকুয়েটে'-হিন্দুকুমারীর বিবাহ দিতে হয়েছে অত্যন্ত গোপনে ; গোড়া সন্ন্যাস-মুসলমান শাহ-জাহাঁর চক্ষুর অন্তরালে। শিল্পীর এই আন্তর-স্বন্দরটাকে অভ্যুপগম হিসাবে স্বীকার করে নিয়েই আমি বিচার করছি। সেই 'হাইপথেসিস'টা যদি ভুল হয়, তাহলে আমার এ তাজ-মূল্যায়ন বহুলাংশেই ব্যর্থ হবে।

হিন্দু শিল্পশাস্ত্র মতে শিল্পের ষড়-অঙ্গ! এ নিয়ে আমার পূর্ব-প্রকাশিত গ্রন্থ 'অজ্ঞাত-অপরূপা'-তে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে সংক্ষেপে তত্ত্বটা আবার পেশ করতে হচ্ছে, কারণ তাজ-পরিকল্পনা-



চিত্র-11.17 তাজমহলের পার্সপেক্টিভ, দৃষ্টিভল প্রবেশভোরণের মিতল বারান্দা।

চেয়েছিলেন জালালউদ্দীন, তাঁর স্থাপত্যের মাধ্যমে। তারপর অর্ধশতাব্দী অতিক্রান্ত। সেই আকবরী চিন্তাটা নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামায়নি। এ পঞ্চাশ বছরে—ইতমদ্উদ্দৌলা, জাহাঙ্গীরী মক্‌বরা, আগ্রা-কিল্লার সম্প্রসারণে সেই অনুভাবনাটি তিল তিল করে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যেতে কসেছিল। তাজ-পরিকল্পনাকার—তিনি বেই হোন, সেই মহান দার্শনিক-ভক্তের স্থাপত্যপ্রয়োগের চেষ্টা একবার শেষবারের মতো করতে চাইলেন! তাজের প্রতিটি অঙ্গে সেই বে-দাগ মিলনচিহ্ন। পঞ্চরত্ন-দেউল ছন্দে, তাজোরী গম্বুজে,

কার যদি গোপনে এই 'আজীব-ই-খারিব'-এ হিন্দু শিল্পচিন্তার জাহ্নবীতে অবগাহন করে থাকেন তাহলে ঐ ষড়অঙ্গ নিয়ে তিনি নিশ্চয় বিচার করেছেন! ভাষান্তরে, হ্যাভেল যে-কথা বলেছেন—"The Taj belongs to India, not to Islam", তা কোন সমাপতন নয়, পরিকল্পনাকারের সজ্ঞান প্রয়োগেই তা সম্ভব। সংক্ষেপে শিল্পের 'ষড়-অঙ্গ' সম্বন্ধে তাজশিল্পী সচেতন কিনা যাচাই হওয়া প্রয়োজন।

বাৎসর্যায়ন-প্রণীত 'কামসূত্রে'র টীকায় যশোধর একটি শ্লোক (পৃঃ 136) উদ্ধার করে বলেছিলেন, শিল্পের

ছয়টি আৱশ্যিক অঙ্গ : ৰূপভেদ, প্ৰমাণ, ভাব, আবণ্য-যোজনা, সাদৃশ্য ও বৰ্ণিকাভঙ্গ।

তাজেৰ ক্ষেত্ৰে 'ৰূপভেদ' ও 'প্ৰমাণ' সম্বন্ধে সন্দেহেৰ কোন অবকাশ নেই। দৰ্শক সহজেই বুঝতে পাবেন তাজ এফটি মক্কাৰা, মেপে দেখতে পাবেন তাতে 'প্ৰমাণ', বা মাপজোখৰ হিচাবে কোথাও কোন গল্টি নেই।

তৃতীয় অঙ্গটি : ভাব। নয়নেন্দ্ৰিয়-গ্ৰাহ্য শিল্পেৰ মধ্য চিত্ৰ ও ভাস্কৰ্যেৰ ক্ষেত্ৰেই এ অঙ্গটি প্ৰত্যাশিত, স্থাপত্যো নয়। কোনো এফটি ইট-পাথৰে গড়া ইমানে 'ভাব' পৰিস্ফুট হ'বাব অবকাশ কোথায়? ধৰ্মনি সাজিয়ে সাজিয়ে বিটোফেন থেকে ৰবিশঙ্কৰ 'ভাব' সৃজন কৰতে পাবেন, কথা সাজিয়ে সাজিয়ে তা কৰেছেন কালিদাস থেকে ৰবীন্দ্ৰনাথ, তুলিৰ টানে ভাবৰূপ মূৰ্ত কৰেছেন অজন্তা-শিল্পী থেকে অবনঠাকুৰ। এমনি পাথৰ খোদাই কৰে ভাবেৰ দোলায় দৰ্শককে দুলিয়েছেন মহাবলীপুৰমেৰ ভাস্কৰ থেকে মিকেলাঞ্জেলো। কিন্তু স্থাপত্য? ওজন-পাটা-কৰ্ণিক-বাঁশুলী দিয়ে চুন-সুৰ-কিৰ গাথনিতে 'ভাবৰূপ' মূৰ্ত কৰাৰ কথা কে কবে শূনেছে? ওটা যে হ'বাব নয়। কেন নয়? কাৰণ ভাব হ'ছে শিল্পেৰ অন্তৰংগেৰ সম্পদ, বহিৰংগেৰ নয়। ইমানে যে বহিৰংগ-সৰ্বস্ব।

তাজ-পৰিকল্পনাকাৰ একমাত্ৰ ব্যতিক্ৰম! অপৰিসীম দাৰ্ঢ্য তিনি ঘোষণা কৰলেন, না! সেতাৰেৰ তায়, কবিৰ কলম, শিল্পীৰ তুলি যদি ভাবৰাজ্যেৰ মনোজগতে দৰ্শককে উধাও হওয়াৰ পাথেয় যোগাতে পাৰে, তবে মাকৰানা মাৰ্বেলও তা পাৰবে!

দিনেৰ এক-এক সময়ে তাজেৰ এক-এক ভাবৰূপ, বছৰেৰ এক-এক ঋতুতে তাৰ এক-এক আবেদন। উষাৰ প্ৰথম আলোকস্পৰ্শ-জেকে-ওঠা বালকৰাগৰাজিত তাজ কিশোৰী কুমাৰীৰ অবাকস্বপ্নেৰ মত অপাপবিন্ধ; নিদাঘ-মধ্যাহ্নে তাৰ হীৰকদ্যুতিৰ জৌলুৰে চোখ ধাঁধিয়ে যায়; আবাৰ বিষন্ন প্ৰদোষে যখন বিদায়ী-সূৰ্যেৰ শেষ সিন্দূৰবিপ্লব সীমন্ত থেকে মূছে ফেলে শূন্যবসনা বিধবাৰ মতো দিগন্তে দৃষ্টি মেলে সে উদাসীন বসে থাকে, তখন হৃদয় বেদনায় আত্মত হুয়ে যায়। পূৰ্ণিমা রাতে তাজকে দেখেছ? যেন অতীন্দ্রিয় অনুভূতি-দিয়ে-গড়া স্বপ্নচাৰিণী এক অবগদনবতী। যেন কান পাতিলে শোনা যায় কোন বিদেহী আত্মাৰ আৰ্তি : 'হাজাৰো সালসে নাগিস আপনা বে-নুৰী-পৰ রোতি হয়।' শূনেছি ঘোৰ অমাবস্যা রাতে বিশ-ত্ৰিশ বছৰ আগেও তাজেৰ আৰ এক ভাবমূৰ্তি ফুটে উঠে। তাজেৰ সে গোপনৰূপ দেখতে হলে ৰীতিমতো সাধ-

নাৰ প্ৰয়োজন - অনেকখন অপেক্ষা কৰাৰ পৰা ধনকৃষ্ণ আকাশপটে তাৰাৰ আলোৰ ধীৰে ধীৰে ফুটে উঠে ওৰ বাহিৰংগৰেখা। অন্ধ-নিবৃত্ত আলোকৰূপেৰ ওপাৰ থেকে আৰ্তি ক্ষীণ আলোকৰাশিৰ চুম্বনে ব্ৰাহ্মকন্যা জেপে ওঠে! পুৰোপদাৰ নয়। আধাআধ! যেন মাটিৰ দুয়াৰ আধেক খুলিয়া আপন গোপন ঘৰ দেখায় বসুন্ধৰা। তাৰ স্বৰূপ তখন আভাসে-ইপ্পতে, অভাবে-ভাবে। সে তাজেৰ আবেদন নাৰ্কে-যাৰা দেখে-ছেন তাৰা বলেছেন : অনিৰ্বচনীয়! অধুনা আগ্ৰা শহৰেৰ বিজলীৰ রোশনাইয়ে সে তাজ চিত্ৰত্ৰে অবলুপ্ত।

শীতৰ কুয়াশায়-ঢাকা আধো-প্ৰস্ফুটিত তাজ, যমুনাৰ পৰপাৰে পূজীভূত বৰাৰ জলদসম্ভাৰেৰ ঘন-কৃষ্ণ-পশ্চাৎপটে 'খিৰাবজাল'ৰ মতো তাজ—এদেৰ ভাব-ৰূপ সম্পূৰ্ণ পৃথক। কখনও বেহাগ, কখনও ইমন, কখনও পূৰ্ববা!

আবাৰ একই ঋতুতে, একই সময়ে শূন্যমাত্ৰ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তাজেৰ ভিন্ন ভিন্ন আবেদন।

ভেবে দেখ, 'ভাব'-এৰ রাজ্যে এ প্ৰবেশ-ভোৰণ থেকে মোকাম-কুৰ্চি পৰ্বন্ত এগিয়ে আসতে আসতে তুমি মনে মনে তোমাৰ গোটা জীবনটা অতিক্ৰম কৰে এসেছ! হ্যাঁ, তোমাৰ আদ্যন্ত দাম্পত্যজীবনটা!

মনে কৰে দেখ, প্ৰবেশ-ভোৰণেৰ খিলান-ঘোমটাৰ ভিতৰ দিয়ে প্ৰথম তাজ-দৰ্শনেৰ সেই রোমাঞ্চশিহৰণ! যেন ছাঁদনা-তলায় প্ৰথম শূভদৃষ্টি! তখন মনে হ'লে-ছিল—ও কষ্টটুকুন! বন্ধি ওকে কোলপাজা কৰে তুলে নেওয়া যায়! এ চন্দনচৰ্চিত আনতমুখটি আলতো কৰে তুলে ধৰে ওৰ মূখচুম্বন কৰা যায়। তাৰপৰা দুই সান্ধি পাদপেৰ আদাবকে স্বিধাৰিতক কৰে সংসাৰী মানুহ তুমি পায়ে পায়ে কখন আনমনে এগিয়ে এসেছ কেন্দ্ৰীয় জলাধাৰে। যৌবনপ্ৰান্তে কৰ্মহীন কৰ্ণিক-অবকাশে একদিন ওৰ দিকে চোখ তুলে তুমি স্তম্ভিত হুয়ে গেলে! কী আশ্চৰ্য! এই কি শূভদৃষ্টিৰ ছাঁদনা-তলায়-দেখা সেই তৰুণী মেয়েটি? ভৱা যৌবনেৰ ভাৱে সে আজ স্তোকনম্ৰা, শ্ৰোণীভাৱাদলসগমনা। সন্তান-বতী ঘৰণী মহিমময় ৰূপ নিয়ে তোমাৰ সম্মুখে হাসি-মুখে দাঁড়িয়েছে!

তাৰও পৰে ক্ৰান্ত চৰণে শ্ৰেণী-তুমি এগিয়ে এলে, কাছে, কাছে, আৰও কাছে। অবসৰপ্ৰাপ্ত জীবনে মোকাম-কুৰ্চিৰ চৰণতলে এসে শ্ৰান্তপাখিক তুমি আবাৰ মূখ তুলে পতঙ্গদৃষ্টিতে দেখতে গেলে সেই আৰ্তি পৰিচিত জীবনসাঁপানীকে। বজ্জাহত হুয়ে গেলে এবাৰ! চিনতে পাৰলে না ওকে! গম্বুজ নেই। মিনাৰিকা নেই,

ছত্রী নেই! সেই হরিণ নয়ন, অপাঙ্গদৃষ্টি, যৌবনের
যুগ্মজন্মসুন্দর সবই হারিয়ে গেছে। আছে শুধু
আকাশজোড়া ইবানের, পরিণত প্রেমের একটি আন্তরিক
আহ্বান—একটা নিশ্চিত আশ্বাসের শান্ত প্রতিশ্রুতি।
পাকাচুলে-সিন্দূরপরা এই গৃহমুচ্যতে-কে দেখে
তোমার বিশ্বাস হতে চাইবে না—এক দিন একেই
পাঁজাকোলা করে নতুন-নীড়ের দেহলী অতিক্রম করার
স্বপ্ন দেখেছিলে!

একই সেতारे, একই লেখনীতে, একই তুলিতে
যদি হাজারো 'ভাব' মূর্ত হতে পারে, তবে একই ইমা-
রতেও তা হওয়া সম্ভব! তবু হাজারো ভাবের হরেক
আবেদনের মধ্যে ওর গানের মূল ধূয়ো একটাই :
'একবিন্দু নয়নের জল/কালের কপোলতলে শুভ্র
সমুদ্রবল/এ তাজমহল।'

শিল্পী শতকরা শতভাগ সার্থক : সিলিঙ-এ, সন্দোখ-
ঘেরা মর্মর প্রাচীরে, ড্যাডো-তে, সর্বত্র।

কিন্তু ষড়-অঙ্গের পঞ্চম-অঙ্গ? সাদৃশ্য?

এটি বিতর্কমূলক প্রশ্ন। কারণ এ অঙ্গটি শুধু-
মাত্র চিত্র-শিল্পেই প্রত্যাশিত। স্থাপত্য-ভাস্কর্যে নয়।
তবু বুলন্দ-দরওয়াজা সমালোচনা-কালে আমরা
দেখেছি—আকবর কী বিচিত্র কায়দায় এই 'সাদৃশ্য'
অনুভাবনাটি ব্যবহার করেছেন। তাহলে কি তা করা
হয়নি?

এই প্রশ্নেই উঠছে ঐ উদয়ভান্ডার বিচিত্র প্যাটার্ন-
টার যথার্থ্যের কথা।

শিল্পী কি ইমারতের মৌল-বস্তুবাটি একটি
সাদৃশ্যের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন?
মৌল বস্তুবাটা কী?



চিত্র-11.18 "আছে শুধু আকাশজোড়া ইবানের আন্তরিক আহ্বান"।

'লাবণ্যযোজনা'র অঙ্গটিও কানায় কানায় টলমল।
'লাবণ্য' প্রসঙ্গে শিল্পাচার্য অকীন্দ্রনাথ বলেছেন, নিটোল
একটি মস্তুর দানার সর্বাপেক্ষে যে চমকিত তরঙ্গিত আভা,
সেটি যদি শিল্পী রূপায়িত করিতে পারেন, তবেই
তাহার মস্ত-আঁকা সার্থক। ইহাই লাবণ্যযোজনা।'

গোটে পৃথিবীর স্থাপত্য-ইতিহাসে সত্যতার আদি-
যুগ থেকে আজ পর্যন্ত যদি কোনও একটিমাত্র ইমারৎ
ঐ মস্তাদানার চমকিত তরঙ্গিত আভাকে মস্তুর মধ্যে
ধরতে পেরে থাকে তবে তা : তাজমহল।

ষড়অঙ্গের শেষ অঙ্গ—বর্ণকল্প। এখানেও

এই সৌধের নিচে মৃগল-রাজবংশের পদ্রুপ-সিংহ
শায়িত।

কিন্তু মৃগল-রাজবংশের 'প্রতীক' কী হতে পারে?
মনে করে দেখুন—মৃগল নিশান-এর প্রতীকটি কী
ছিল? যাকে বলে, herald, standard?

: উদয়সূর্যের সম্মুখে নতজানু সিংহ।

গোটা ইমারতও তাই বলতে চাইছে!

তাহার বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উচ্চতা ও অন্যান্য
মাপজোখ এমনভাবে নির্ণীত হয়েছে, যাতে পরি-
প্রোক্ষিতে দৃষ্টিকোণ যেখানেই হোক—দেখতে পাওয়া

যাবে উদয়ভান্ডার ঐ রবিরশিগছটা। অবশ্য নতজান্দ সিংহকে দেখতে হবে মনশচক্ষে : মৃত্যুর গ্রহিণী কৃষ্ণ-তাজের কবরে শায়িত আল্লাতালার সম্মুখে নতজান্দ পদ্রুপ-সিংহ : শাহজাহাঁকে।

এখানে একটি সঙ্গত প্রতিপ্রশ্ন হতে পারে। যদি স্বীকারও করে নেওয়া যায় যে, এই বিচিত্র নকশার ছন্দে তাজ-শিল্পী মৃগলনিশানের প্রতীকটি ব্যবহার করে এ সৌধের মৌল আবেদনটা মূর্ত করেছেন, তবু সেটা যে 'সাদৃশ্য', এটা কেমন করে মেনে নেব? 'প্রতীকী' অলঙ্কার তো সব জাতের শিল্পেরই উপাদান, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের। এমন কি আধুনিক চলচ্চিত্রেও। আদি কবির আদিম শৈলীকে রাবণের প্রতীক ব্যাধ, রামসীতার প্রতীক ক্রৌঞ্চ-মিথুন। কালিদাস শকুন্ত-লার প্রথম দিকেই যখন লিখলেন : 'ভো ভো রাজন্ আশ্রমমগোহং ন হন্তব্যো ন হন্তব্যঃ' তখন মৃগ কে? শকুন্তলার প্রতীক নয় কি? এগুনি কি 'সাদৃশ্য'? অথবা আরও দূর দেশে যাওয়া যাক। মিকেলাঞ্জেলো তাঁর জীবনে প্রথম ভাস্কর্য গড়েছিলেন 'সিঁড়ির তলায় শিশুদ্বীপ' ক্রোড়ে মেরী ও পাশে পীতর। সেখানে যখন দেখি শিশু-পীতরের হাত এবং সিঁড়ির ব্যালাস্ট্রেড মিলে-মিশে একটি ক্রুশ-চিহ্ন রচনা করেছে, তখন বেশ বুঝতে পারি—যীসাস্-এর অন্তিম পরিণামটা কিশোর শিল্পী একটা তির্যক 'প্রতীকী'র মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। এ প্রতীক শতকরা শতভাগ অবনীন্দ্রনাথবর্ণিত 'সাদৃশ্য'। কিন্তু মিকেলাঞ্জেলো নিশ্চয় হিন্দু শাস্ত্রসঙ্গত 'সাদৃশ্য' রূপায়িত করেননি। সেভাবে গ্রহণ করলে তাজের ঐ নান্দনিক ছন্দটি—'উদয়ভান্ডার সম্মুখে নতজান্দ সিংহ' একটা প্রতীকী, symbolism ; 'সাদৃশ্য' নয়!

সম্মাধিকক্ষ : কক্ষটি অষ্টভুজাকৃতি। মমতাজের কবর কেন্দ্রীয়-রেখায়। শাহজাহাঁর কবর একটু পশ্চিম ঘেঁষে ; তাতে ভারসাম্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে। (চিত্র-11.21) সন্দোখ্ ঘিরে একটি অষ্টভুজাকৃতি শ্বেতপাথরের জালিকাজ-করা প্রাচীর। তার দুই-প্রান্তে দুটি প্রবেশদ্বার। ফাগুর্সনের²⁰ মতে এটি পরবর্তী সংযোজন। সম্ভবতঃ তাঁর অনুমান ঠিক ; কাবণ বানিয়ার ঐ অপূর্ব কাজ-করা প্রাচীরের উল্লেখ করেননি তাঁর পদুত্থানপদুত্থ-বর্ণনা দেওয়া ভ্রমণবৃত্তান্তে।²¹ ফাগুর্সন আরও বলেছেন, এই মর্মর আবেষ্টনীতে দুটি রৌপ্যানির্মিত দ্বার ছিল ; যা তাঁর করতে সে আমলে খরচ পড়েছিল সওয়া লক্ষ তুকা। সে দুটি জাঠ সৈন্যরা লুণ্ঠ করে নিয়ে যায় (1761)। এ-কক্ষে আলো

আসার ব্যবস্থা সূউছে স্থাপিত দুটি জালিকাজ-করা গলাক্ষ দিয়ে। সিলিং অপূর্ব নকশা (চিত্র- 11.20)। কবরের উপর একটি 'শ্যান্ডেলেরার', বা দাতব কোলানো বাতির ঝাড়। সেটি মৃগল-স্রগানার নয়, লর্ড কার্জনের শ্রদ্ধার্থী। মৃগল-শৈলীতে বানানো।

সম্মাধিকক্ষের প্রাচীরে 'ডাডো' পর্যন্ত অলটো-রিলিভো (অর্ধাংকীর্ণ) মার্বেলের নকশা। সাদার উপর সাদা। ফুল-লতা-পাতা। অনেক পরিচিত পুষ্প-সম্ভার। এখানে যে সংগ্রহ দেখানো হয়েছে তা জাত-শিল্পীর। দয়ালবাগে গেলে দেখতে পাবেন বাস্তবতার



চিত্র-11.19 সন্দোখ্-কক্ষের ভিতর। (ক্যামেরাবারী পূর্ব-প্রান্তে, সেজন্য সিমেন্ট অব্যাহত। সামনে কেন্দ্রস্থলে মমতাজ ও তার পিছনে শাহজাহাঁর সন্দোখ্। সূউছে শ্যান্ডেলেরারটি লর্ড কার্জনের শ্রদ্ধাঞ্জলি।)

হুমুদুন্দ করার প্রচেষ্টায় আঙ্গুরনতা ঠিক আলোর-লতার মতো হয়েছে : আম-আতা-আনারস হুবহু আম-আতা-আনারসই হয়েছে, কিন্তু শিল্প হয়নি। এখানে শিল্পী বাস্তবকে অস্বীকার করেননি : কিন্তু বাস্তবতার পারে দাসখণ্ড লিখে দেননি। নকশার যে সুন্দর সংগ্রহী বাস্তববর্ণনা গড়ে উঠেছে তা অপূর্ব। এর চেয়ে বর্ণিকাজপোর কেরাখতি হয়তো ইত্তমদ্-

উদ্যোগের বেশি : কিন্তু সৌন্দর্যসৃষ্টির প্রতি-
যোগিতায় তাই জিতেছে।

তৃতীয়তঃ, pietra dura-র কাজ অর্থাৎ মর্মর
খোদাই করে বিভিন্ন মণিমুদ্রা বসিয়ে পাটোর্ন তৈরী
করা। এ-কাজ লম্বুরিয়। মূল্যবান পাথরগুলি ক্রমা-
গত চুরি হওয়ার এই জাতের কাজের মূল্যারন আজ
আর সম্ভবপর নয়। চতুর্থতঃ, স্লেজড্-টোলির
স্টোক্-কো-কাজ। আলোক-প্রতিফলনের প্রয়োজনে অতি-
মসৃণ এই জাতের টোলি আকবরী-যুগেই চরম ঔৎকর্ষ-
লাভ করেছিল। তাই সেই ঐতিহ্য নিরবচ্ছিন্ন ধারায়
প্রবাহিত। পঞ্চমতঃ, শ্বেত পাথর খোদাই করে ভিন্ন
রঙের পাথর-বসানোর কাজ। ছোট-ছোট দামী পাথর
বসিয়ে pietra dura-র কাজ নয়, নকশা-মোতাবেক
সংরক্ষণী ভিন্ন রঙের মর্মর। যাকে বলে, opus sectile।

এই কাজের একটি বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি
আকর্ষণ করব : রঙ নির্বাচন। বহিরাঙ্গ শিল্পী এ-
কাজে মাত্র তিনটি রঙ ব্যবহার করেছেন—সাদা, কালো,
গেরূয়া। সাদা মার্বেল তো base, জমিন্ ; তার মানে
দৃষ্টি রঙ—কালো ও গেরূয়া। এই বর্ণ-নির্বাচনেও
শিল্পীর কবিত্বের পরিচয়। সাদা রঙটা হচ্ছে বেগম
মমতাজের প্রতীক, গজদন্তশূদ্র মহিষীর নিষ্পাপ প্রতি-
চ্ছবি : যার ‘জবাব’ শাহ-জাহাঁকে লাভ করার কথা
অসম্পূর্ণ ‘কুহ-তাজে’ কালো রঙ ব্যবহারের দৃষ্টি
উদ্দেশ্য। কালো হচ্ছে সাদা রঙের শ্রেষ্ঠ ‘জবাব’—
contrast ; এটি ব্যবহারিক দিক থেকে। কাব্যের দিক
থেকে কালো রঙ শোকের চিহ্ন। শূদ্র শ্রীমন্তন নয়,
মসঙ্গরানেরও। স্বামীর মৃত্যুতে মসঙ্গমান বিধবা
কালো রঙের বোরখা পরে। কিন্তু গেরূয়া ? ওটা
সম্ভবতঃ হিন্দুগীতি থেকে এসেছে : গেরূয়া বৈরাগ্যের
চিহ্ন। সংসারে বাঁচরাগের প্রতীকী। পরিকল্পনাকার
তাই মিনারিকা-চতুর্দিকে রাঙিয়েছেন কালো ও
গেরূয়া রঙে সাদা জমিনে। অথচ গেরূয়া রঙটা এত
পাচ নয় যে, চোখকে পীড়া দেবে।

প্রশ্ন হবে—সবুজ রঙ নেই কেন ? সবুজ রঙটাকে
তো ইসসানের প্রতীকী বলে আমরা ভাবি। তিনটি
বর্ণিত : এ ধারণাটা পরবর্তীকালের। তাছাড়া সবুজ
রঙ তারগের প্রতীক—এ মক্কারাতে সে-ভাবটা আম-
দানী করতে চাননি শিল্পী : ঠিক যে-কারণে সুলতান-
ঘারি মক্কারাতে নেই মিনারিকা, গজদন্ত বা ছটী।
তৃতীয়তঃ, প্রায়গণবিদ্যার ব্যবহারিক জ্ঞান বলে—সবুজ
রঙ বহিরাঙ্গ ব্যবহার না করাই ভালো, সেটা সূর্য-
লোকে ক্রমশঃ জ্বল বায়।

বনিয়াদ : প্রযুক্তিবিদ্যার এই বিশেষ শাখায় স্থপতি
কতটা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা মেপে দেখতে পারিনি
—ফলেন পরিচয় পেয়েছি শূদ্র। সাড়ে তিনশ
বছরে বনিয়াদ কোথায় একটুও বসেনি। হ্যাডেস-
সাহেব বলেছেন, ভূগর্ভে কবরটি নির্মাণের পূর্বে
কয়েকটি কূপ বনিয়াদ (well foundation) তৈরী করা
হয় : যার গভীরতা তদানীন্তন যমুনা ‘বেড’-এর নিচে।
ঠিক যেভাবে রেল-স্ট্রীজের খাম্বা বানানো হয়, সেভাবে
গোলাকার কূপ-প্রতিম বনিয়াদের উপর ‘স্ল্যাব’ পেতে
কবর দুটিকে বসানো হয়েছে। মূল ইমারতে বনিয়াদের
গভীরতা তদানীন্তন যমুনা-‘বেড’-এর নিচে পর্যন্ত
নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

গত তিন-সাড়ে তিনশ বছরে বনিয়াদ কোনও দিকে
তিলমাত্র বসেনি। প্রসঙ্গতঃ বর্তমান শতাব্দীতে
নির্মিত ভিক্টোরিয়া-মেমোরিয়ালে বনিয়াদ বেশ-কিছুটা
বসেছে ; কিন্তু সব দিকে সমানভাবে বসায় কোনও
ফাট দেখা দেয়নি। তাজের বনিয়াদের দৃঢ়তা দেখে
কলা যায়—এ সৌধ হাজার বছর টিকবে, যদি না ভূমি-
কম্প, বা কোনও বৈমানিকের অনবধানতায়, কিম্বা অন্য
কোনও অপ্রাকৃতিক কারণে তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ভূমিকম্পের বিরুদ্ধে স্থপতি কিছু ব্যবস্থা নিয়ে-
ছেন, সে-কথা আগেই বলেছি। এয়োরোপ্লেন বা
প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের অন্য কোনও অভিধাপের কথা তিনি
কল্পনাই করতে পারেননি। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করি,
গত দশকে জনৈক বৈমানিকের অনবধানতায় তাজ
মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে বসেছিল। প্রচণ্ড কুয়া-
শায় বিমানচালক সামনে কিছু আছে কি না দেখতে
পাচ্ছিল না, সহসা তাজের গম্বুজটা তার নজরে পড়ে।
শেষ মুহূর্তে সে পাশ কাটিয়ে নিজেকে এবং তাজকে
রক্ষা করে। ঘটনাটা রিডার্স ডাইজেস্টে পড়েছিলাম।
সঠিক সংখ্যাটা এখন খুঁজে বার করতে পারছি না।

তিন নম্বর আতঙ্ক : প্রযুক্তি-বিদ্যার অভিধাপ !
মথুরায় নাকি নতুন কংস সম্প্রতি জন্মগ্রহণ করেছেন !

সে বিষয়ে একটি পৃথক অনুচ্ছেদে আলোচনা করা
গেল।

তাজ ও মথুরা রিফাইনারি :²² গত দশকে তাজ
থেকে মাত্র 40 কিলোমিটার দূরে নির্মিত হয়েছে
মথুরা রিফাইনারি। তার চিম্নি দিয়ে প্রতি ঘণ্টায়
এক টন পরিমাণ ‘সালফার-ডায়োক্সাইড’ বাতাসে ছেড়ে
দেওয়া হচ্ছে। একদল বিশেষজ্ঞের মতে এতে তাজ
প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ সম্বন্ধে কাগজে ও
সাময়িক পত্রিকায় নানা আলোচনা হয়েছে। এখানে

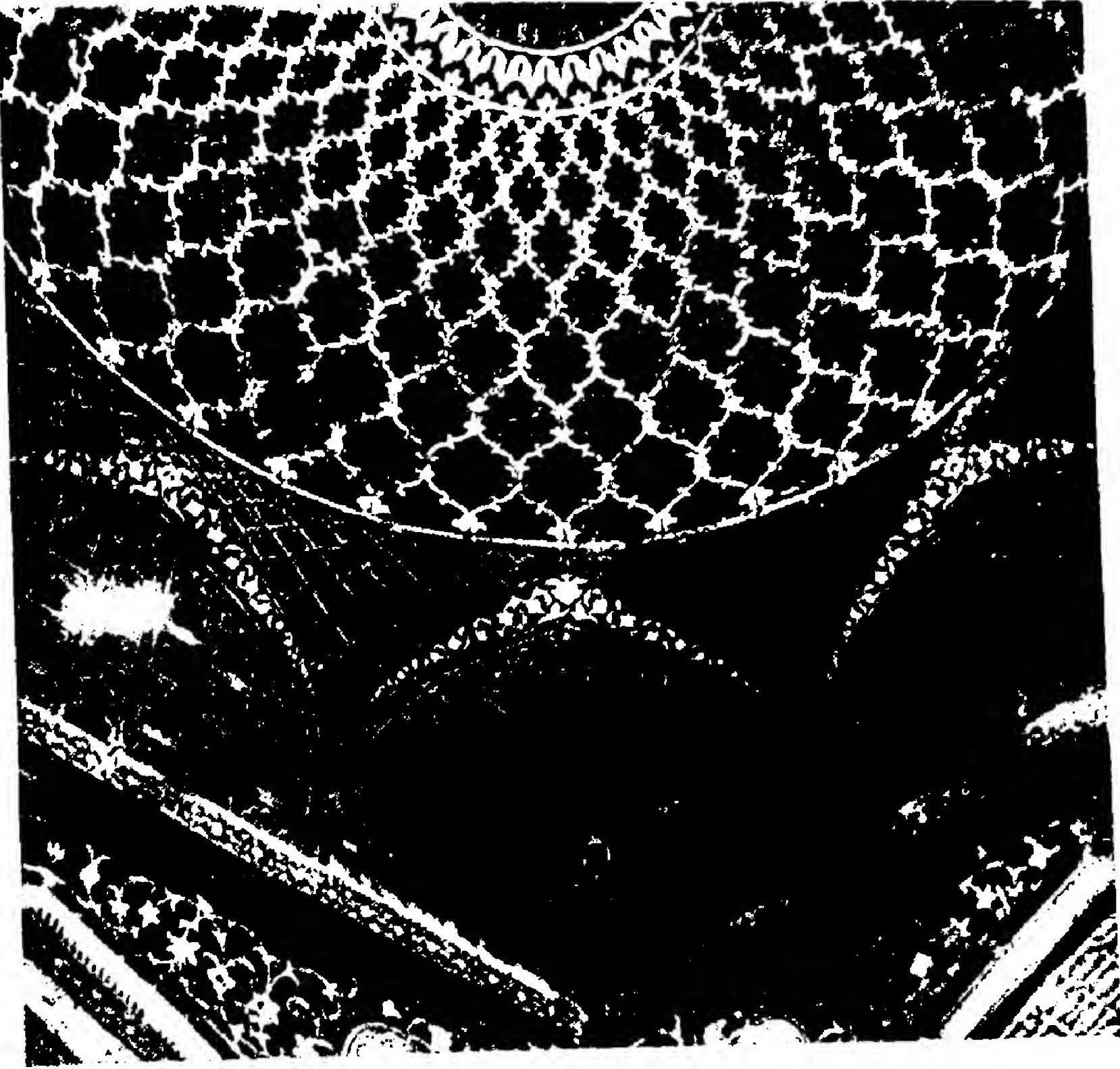
তার সংশ্লিষ্টতার সম্পর্কিত করা গেল :

বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও সংবাদ-পত্রের প্রতিবাদে পেট্রোলিয়াম ও রাসায়নিক মন্ত্রক 1974 সালে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিযুক্ত করে জানতে চাইলেন, মথুরা রিফাইনারির জন্য তাজমহলের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা কতটা আছে। কমিটি দুটি প্রতিষ্ঠানকে গবেষণা করবার জন্য নিযুক্ত করলেন। একটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠান : 'ইন্ডিয়ান মেরিটরিয়োলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট' ; দ্বিতীয়টি একটি ইতালিয়ান বিশেষজ্ঞ-প্রতিষ্ঠান TECNECO।

গবেষণায় জানা গেল, আগ্রার বায়ুমন্ডল দূষিত হওয়ার একাধিক হেতু : দুটি পুরাতন কয়লা-চালিত

মাইক্রোগ্রাম। দুটি প্রতিষ্ঠানই পৃথক পৃথক রিপোর্টে কললেন, চীফ্রিশ কি. মি. দূরে মথুরা রিফাইনারির জন্য তাজমহলের ক্ষতি ঐ বিষাক্ত সালফার ডায়োক্সাইডের পরিমাণ দুই-তিন মাইক্রোগ্রাম বর্ষে পেতে পারে মাত্র।

তবু আমরা জানি না, এজন্য তাজমহলের কোনও ক্ষতি হবার আশঙ্কা আছে কি না। আমাদের জীকিত-কালেই আমাদের অনেকের মনে হয়েছে গ্রিন-চীফ্রিশ বছর পূর্বেরকার দেখা তাজ কিছ, বেশী সাদা ছিল। তাজের উপর কি সত্যি কোনও প্রভাব (ফোটিং) পড়ছে? এজন্য তাজের এলাকা থেকে সংগৃহীত একটু ময়লা-হয়ে-যাওয়া একটুকরো মার্বেল পাঠিয়ে দেওয়া



চিত্র—11.20 তাজ-সিলিং-এ বর্ণিকাভঙ্গ। (কোণার গম্বুজ দেখে স্মৃতি-সমস্যার সমাধান করা হয়েছে, বাঁম পেতে নয়, চিত্র—3.12 তুলনীয়।)

কারখানা, রেলগাড়ির ধোঁওয়া, প্রায় আড়াই শ'টি ছোট-ছোট সোহার ফাউন্ড্রি। ওদের হিসাবমতো এজন্য আগ্রার আবহাওয়ায় বর্তমানে প্রতি ঘনমিটার বাতাসে গড়ে বছরে 20 মাইক্রোগ্রাম সালফার-ডায়োক্সাইড থাকে। সেটা এমন কিছ, বেশী নয়, যেমন তুলনামূলকভাবে বলা যায় পার্শ্ব-নগরীর বাতাসে তার পরিমাণ 114

হল রোম-নগরীর IRC প্রতিষ্ঠানে। তাঁরা এজাতীয় কাজে বিশেষজ্ঞ। পরীক্ষা করে জানালেন—ঐ ময়লার দাগ আগ্রা-এলাকায় বাতাসে সালফার ডায়োক্সাইড থাকার জন্য নয়, একজাতের 'এ্যাল্গি' বা 'ফাংগি'-র আক্রমণ। শ্যাওলা জাতীয় কোন কিছ।

সুতরাং আশা করা যায়, মথুরার যে নয়া-কংস-

রাজকে পরদা করা হয়, সে তাজমহলকে নিশ্চিহ্ন করতে পারবে না।

আশা করি সেই আনন্দে সরকার তাজমহলের কাছে-
পিঠে সারি-সারি কংস পরদা করে আগ্রার বাতাসকে
আরও বিষাক্ত করে তুলবেন না।

আনুষ্ঠানিক : তাজমহলে এ-ছাড়া যা দৃষ্টব্য তার
বিস্তারিত বর্ণনা থেকে বিবৃত থাকিছে। আপনাদের
অভিরুচিমতো সেগুলি খুঁজে নেবার জন্য কিছ্ ইঞ্জিত-
মাত্র রেখে যাওয়া যেতে পারে।

তাজের জলসরবরাহ ব্যবস্থাটি প্রয়োগবিদ্যার এক
উৎকৃষ্ট উদাহরণ। আপনি যদি 'ওয়াটার-সাপ্লাই'
ক্যাপারে উৎসাহী হন, তাহলে অভিজ্ঞ গাইডকে জিজ্ঞাসা
করবেন, সে দেখিয়ে দেবে, কী-ভাবে যমুনা থেকে জল
তোলা হত বলিবর্দ-নিয়োজিত 'পার্শিয়ান হুইল' বা
'পার্নিচার্ক'র সাহায্যে। সঞ্চিত হত জলাধারে ; এবং
ভূগর্ভস্থ পরঃপ্রণালীর মাধ্যমে নীত হত চাহুর বাগ-
এর বিভিন্ন প্রান্তে, কেন্দ্রীয় জলাধারে ; ছাড়িয়ে পড়ত
ফেরারার আকরে। পশ্চিমদিকের ভূগর্ভ থেকে সম্প্রতি
একটি পোড়ামাটির জলবাহী পাইপ খুঁড়ে বার করা
হয়েছে। 1980 সালেও সেটি ঐ তাজ এলাকাতে ছিল।
230 মিলিমিটার ব্যাস, সেটি মাটির গভীরে 152
মিটার নিচে থেকে পাওয়া যায়।

আপনার কোঁক যদি 'আরবোরিকালচারের' দিকে
হয়, তাহলে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন বাগিচার কোথায়
কোন জাতের গাছ রোপিত হয়েছিল। এদিক থেকে
পরিষ্কারপাওয়ার প্রকৃতিপ্রেমিক আবদুর-বাদ্-শাহ-র
উত্তরসূরী। সম্মুখস্থ পরঃপ্রণালীর দু-পাশে সার
দিয়ে যে 'সাইপ্রাস' গাছ লাগিয়েছেন তা স্থাপত্যের
সঙ্গে একসঙ্গে বাঁধা। সেগুলিকেও মাপমতো ছোট
দেওয়া হত যাতে উদ্যানের রশ্মিচ্ছটার প্যাটার্নে
জলাও সুরে সুর মেলাতে পারে। অর্থাৎ বিলীয়মান
কিন্দুর দিকে তারও অভিযাত্রী। সপ্তদশ শতাব্দীতে
আঁকা একটি চিত্রে ঐ কাউগাছগুলিকে সারিবদ্ধভাবে
দণ্ডায়মান দেব বাদছে—অর্থাৎ পাদপসম্ভার পরি-
কল্পনাটি লর্ড কার্জন সংস্কারের সময় আমদানী
করেননি।

অপরূপে আপনার কোঁকটা যদি চিত্রশিল্পের দিকে
হয়, তাহলে মসজিদ এবং তার 'জবাব', মেহমানখানার
খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন। টেম্পার-পার্শ্বভিতে দুটি
মাঠ রঙের ব্যবহারে প্রাচীন চিত্রগুলি রূপায়িত।
ইমতদউলদৌলার রঙ-বরঙ নয়, এই সমাধিসৌধের
গাম্ভীর্য জিহ্মাৎ ব্যাহত হয়নি। পর্শ্বাতিটি বৈশিষ্ট্য

দাবী করতে পারে। দেওয়ালের 'জমিন্' বা base গাঢ়
লাল রঙের। তার উপর অতি সূক্ষ্ম প্রায় হাঁসের
ডিমের খোলার মতো বেদ-এ একটি আস্তর করা।
লাইমপাটি বা পথের কাজ। সেটি শূন্যে ওঠার
পর হালকা-পেন্সিলে ছবির বহিরঙ্গাটা আঁকা হয়েছে।
শেষ কাজ—স্থানে স্থানে ঐ সাদা আস্তরটা নিপুণ-
ভাবে চেঁছে তুলে ফেলা হয়েছে। ফলে 'বাতিক'-এর
কাজে যেমন ঋণাত্মক প্রতিফলনে নকশাটা ফুটে ওঠে,
এখানেও তেমনি লাল-জমিতে সাদা নকশার আলিঙ্গন।
আপনারা যদি না মনে করেন যে, আমি ওক-গাছের মতো
'হিন্দু-অবসেশনে' ভুগছি, তাহলে 'আর্কিওলজিকাল
সার্ভে' অব ইন্ডিয়া'র প্রকাশিত 'অজন্তা ম্যুরাল্‌স্'
গ্রন্থের XXXIX-প্লেটটা এই প্রসঙ্গে দেখতে বলব।
একই রকম লাল-জমিতে সাদা ছবি ; ঋণাত্মক-পর্শ্বাতিতে
আঁকা (Cave I, Ajanta)।

আর গুরুত্বাক্ষ—'আদিরস রসনায়'-মন্ডে আপনার
কোঁকটা যদি হয় তাজ-চত্বরে বাতানুকূল করা আধু-
নিক রেস্টোরাশ্য মোগলাই-খানা খাওয়ার দিকে, তাহলে
আপনাকে একটা পরামর্শ দিতে পারি। তাজমহলে
পৌঁছে সহযাত্রীদের সঙ্গে একটা বাজী ধরে বসুন :
প্রশ্ন করুন : মূল গম্বুজের উপর ঐ ধাতবদণ্ডটা
কিস্তে কত বড়? বলতে পারেন—যাঁর উত্তর নির্ভুল
মাপের দশ-শতাংশের ভিতর হবে তাকে আপনি ঐ
রেস্টোরাশ্য মর্গ-মশল্লম খাওয়াবেন ; আর কারও
উত্তর যদি দশ-শতাংশের ভিতর না আসে তাহলে ওরা
সবাই মিলে আপনাকে তাই খাওয়াবে। এতে আপনার
লাভ বই লোকশান হবে না। ওঁদের জবাব পাঁচ-সাত-
দশ-পনের ফিট-এর মধ্যেই সীমিত হবে। বাস্তবে তা
ত্রিশ ফুট (9.14 মি)-এর কাছাকাছি, অর্থাৎ তিন-তলা
বাড়ির সমান। সহযাত্রীরা যখন প্রমাণ চাইবে তখন ঐ
পূর্বদিকস্থ মেহমানখানার বাহিরে চাতালটায় ওঁদের
নিয়ে যাবেন। দেখিয়ে দেবেন, লাল-পাথরের শাহনে
কালো কণ্ঠ পাথরে 'ফুলস্কেল'-এ নকশাটা সাড়ে তিনশ
বছর আগে খোদাই করা হয়েছে। মর্গ-মশল্লম খাওয়ার
সময় অধর্মের কথা স্মরণ করবেন। ট্রিপ্ল-টোটেটের
টিপসটা তো সেই দিচ্ছে, না কি বলেন?

নির্মাণ-ব্যয় ও যথার্থ্য : মার্কিন-মূলকে বাস্তু-
কারের একটা সংজ্ঞা প্রচলিত আছে : 'An engineer
is one who can do a thing for a dollar,
which any fool can do for two.' (এঞ্জিনিয়ার
তাকেই বলবে যে, এক ডলারে এমন একটা কিছ্ পয়দা
করতে পারে, যা যে-কোনো মূর্খ পারে দুই ডলারে)।

শুধু শাহজাহাঁ নয়, বিগতযুগের ভাবগজদন্তমিনার-বাসী ঐ সংস্কারটা মানতেন না। মানেননি মিশরের ফারাও, পারস্যের শাহ, চীন-সম্রাট, রাশিয়ার জার অথবা চতুর্দশ লুই। সুতরাং এজন্য শাহজাহাঁকে দোষারোপ করা অন্যায়। তবে বলতে পারেন, দোষী বা নির্দোষ কিনা নাই বা বিচার করলুম, আজকের দিনের বিচারে ফলাফলটা কি হচ্ছে জানতে দোষ কি?

তা যদি বলেন, তবে বলব : অহৈতুকী ব্যয়বৃদ্ধির অপরাধে তাজমহল নির্মাতা অপরাধী।

খরচ হয়েছিল সাড়ে আঠারো কোটি শাহজাহানী-তুকা।

কিন্তু তার অর্থ কী? অর্থনীতির মূল্যায়নে 'শাহজাহানী-তুকা'র ক্রয়-ক্ষমতা কত? এক তুকায় তখন কত মণ চাউল খরিদ করা যেত? একটি মেহনতী মানুষ কতদিন কোদাল চালিয়ে এক তুকা উপার্জন করতে পারত? তা জানি না। তবে একটি তুলনামূলক বিচারে 'তুকা'র বাজারদরটা আন্দাজ করা সম্ভব। বঙ্কুওয়ার খাঁ ছিলেন আলমগীরের আমলে একজন ঐতিহাসিক। তিনি পূর্ব-জমানায় সমাপ্ত লাল-কিল্লার খরচের একটা খতিয়ান রেখে গেছেন। সেটাই আমাদের দিগদর্শক হতে পারে :

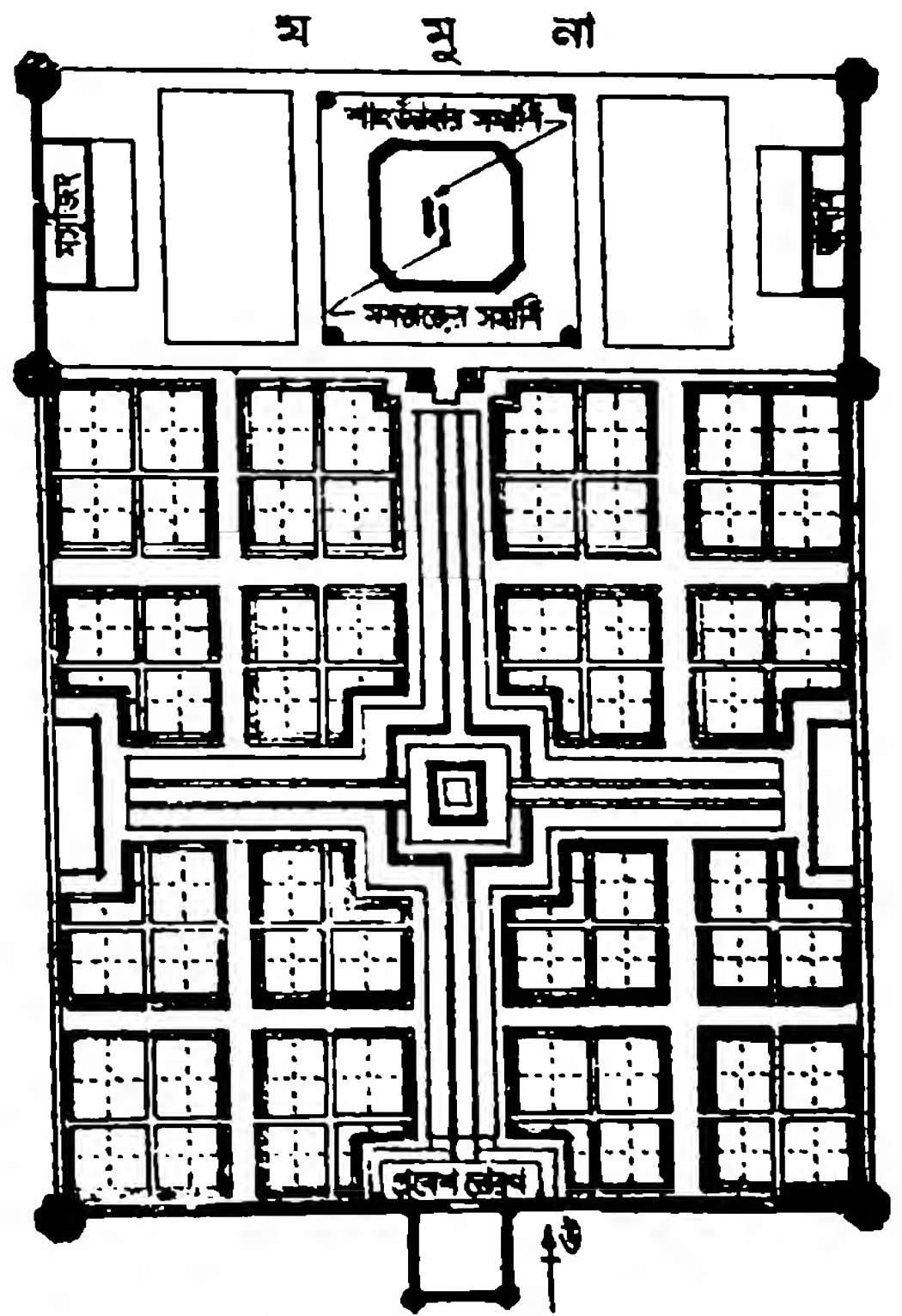
লাল-কিল্লার বিভিন্ন অঙ্গের নির্মাণ ব্যয়	লক্ষ তুকার হিসাবে
প্রাচীর, গড়-খাই, শাহবুর্জ ইত্যাদি	21
মীনাবাজার, কারখানা ও বহিঃস্থ মোকামগুনি	4
দেওয়ান-ই-খাশ্ (রৌপ্যমণ্ডিত সিলিঙ ও অলঙ্কার সহ)	14
রঙমহল, খোয়াবগাহ্ (আসবাবসহ)	5½
দেওয়ান-ই-আম (মহুর সিংহাসন বাদে)	2
সম্রাটের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য ইমারৎ ও আসবাব	28
হায়াৎবস্ত বাগিচা ও হামাম (জল সরবরাহ ব্যবস্থাসহ)	2
বেগম মহল ও সংলগ্ন বিলাসোপকরণ	7
	83½
অন্যান্য বিক্ষিপ্ত ইমারৎ ইত্যাদি	16½
	100

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যেখানে যাবতীয় কাশ্মীরী অলঙ্করণ, আসবাব ইত্যাদি সমেত গোটা লাল-কিল্লা নির্মাণে খরচ হল দশ কোটি তুকা, সেখানে তাজমহলের খরচ প্রায় তার দ্বিগুণ—18.5 কোটি!

শুধু তাই নয়, হিসাবের মধ্যে যেটা সবচেয়ে চমকপ্রদ সংবাদ তাই এখনও বলা হয়নি—জমির মূল্য, জল-সরবরাহ ব্যবস্থা ইত্যাদিসহ মূল তাজমহল, মসজিদ ও জবাবে সিবিলা এঞ্জিনিয়ারিং কাজে খরচ হয়েছিল মাত্র 50 লক্ষ তুকা! আজকে হ্যাঁ, মূল্যবাহী

প্রমাদ হয়নি এখানে, আমি বলছি—'পঞ্চাশ লক্ষ' তুকা! বাকি আঠারো কোটি খরচ হয়েছে দামী পাথরের অঙ্গ সংজ্ঞায়! ওখাটা আপাতদৃষ্টিতে অবিশ্বাস্য মনে হয়; অথচ তাই লেখা আছে ঐতিহাসিকের খতিয়ানে! তার মানে দাঁড়াচ্ছে : সম্রাট যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তার মাত্র 2.7 শতাংশ বর্তমানে পরিদৃশ্যমান; বাকি 97.3 শতাংশ নিশ্চিহ্ন! লুট হয়ে গেছে ইতিমধ্যে নাদিরশাহ, ছাট সৈন্য ও ইংরাজের হাতে।

বে-সরমকি বাতে! —এই সহজ সরল সত্যটা কেন প্রাধান্য করতে পারলেন না অতি বিচক্ষণ শাহ-ব্রেন-



চিত্র—11.21 পরিদৃশ্যমান তাজের ভূমি-নকশা।

শাহ শাহজাহাঁ? যে মাজমশলা দিয়ে, যে দৃঢ় বিনিয়াদের উপর তিনি এই 'কামাল-লতিফ-নাসাব-আজীব-ও-জারিব' নির্মাণ করিয়েছিলেন তাতে তিনি সম্পদ কারণেই আশা করেছিলেন এ ইমারৎ সহস্রাব্দিকাল অটুট থাকবে। কিন্তু তিনি কেমন করে আশা করলেন—তাজমহলের নিরাপত্তা-স্বচ্ছতা সেই দীর্ঘ-সময় ধরে অব্যাহত থাকবে? মঙ্গল-মৌরবরাবি সামরিক-অর্থও যে পশ্চিমে ঢলতে শুরু করেছে তার ইঙ্গিত

মহাকাল দিয়েছেন—কল্ক, বাদাকশান্, সমরকন্দ-
বিজয়ের জন্য বিরাট বাহিনী নিয়ে শাহজাহাঁ অগ্রসর
হয়েছিলেন এবং পরাজয়ের বেদনা বন্ধে নিয়ে ফিরে
এসেছিলেন ; দ্বিতীয়বার সে ভুল তিনি করেননি
জীবদ্দশায়। কিন্তু ইতিহাসের সে ইঙ্গিত সমকালে
দাঁড়িয়ে যদি শাহজাহাঁ না বুঝে থাকেন তবু এটুকু
কেন বুঝেন না—অনাগতকাল তাঁর প্রয়াত বেগমের
প্রতি প্রত্যাশতঃ ঐ মহাঘাৎ হীরা-মুজা-জহরৎ ওখানে
থাকতে দেবে না? মদগল-জমানা তাঁর দেহান্তে টিকে
থাকলেও? তিনি নিজেই কি আগ্রা-কিল্লায় তাঁর
পিতামহের ইমারৎগুলি ধ্বংস করে হাল-ফাসানের
মোকাম বানাননি? সফদরজঙ্ঘা যেভাবে আবদুর রহিম
খান-ই-খানান-এর মক্কারা থেকে মারবেল খুলে এনে
নিজের সমাধিসৌধ বানিয়েছেন, সেভাবে কেউ তাজ-
মহলের পাথর খুলে ফেলবে এ আশঙ্কা হয়তো তিনি
সঙ্গত কারণেই করেননি ; কিন্তু তাই বলে অরক্ষিত
সোনার পাত, হীরা-মুজা ওরা ওখানে থাকতে দেবে?
টুটেনখামেন-এর নামটা জানা না থাকলেও, সোমনাথ
মন্দিরের নামটোও কি তিনি শোনেননি?

তবু সেই বিচক্ষণ সম্রাট ভূ-ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত
থেকে অত্যন্ত মূল্যবান নানান পাথর এনে তাজমহলকে
অলঙ্কৃত করলেন। বাগদাদ থেকে এনেছিলেন 540টি
কর্নেলিয়ন, তিব্বত থেকে 670টি ফিরোজা, সিংহল
স্বীপ থেকে 242টি লাজবস্ত (লাপিস্ লাজুলি),
এ ছাড়া বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মূঞ্জ (প্রবাল), তিলাই
(সোনাপাথর), মস্যা (কৃষ্ণ-মর্মর), গুলাবী, নীলা,
মরকৎ (পাশা), আভী (রক্তমুখী নীলা), পোকরাজ,
য়াকুৎ (চুনি), শম্ভ, মদুজা, রুবম্, মায় সাঁচা-বাদখ-
শান (আসল হীরা!)।

কেন মহাঘাৎ মানেই মহাঘাৎ!

এই নিখুঁত হিসাব দাখিল করতে পারছি সেই
মীর মদগল-কেস-এর সরকারী নথী থেকে—সেই যে
ঐতিহাসিক ‘চুন-ইক্ নক্শা-পসন্দ আলিজা-হজরৎ’
লিখে পরের পংক্তিটি লিখতে কি-জানি-কেন ভুলে
গেয়েছিলেন!

তাছাড়া কয়বান্শি মানেই উন্নততর কাজ এটা কোন-
কোয়কুব মেনে নেবে? বনিয়াদের ভল্লায় একমুঠো হীরে
পড়ে রাখলে ইমারতের ‘কস্ট’ বাড়ে, ‘ভ্যালু’ বাড়ে না।
একটা উদাহরণ দিই : যে সিঁড়ি বেয়ে তাজের মোকাম-
কুর্সিতে উঠে এসে, লক্ষ্য করে দেখুন, তার ধাপগুলি
নিরেট মারবেল দিয়ে বানানো। বালি-পাথরের উপর
মারবেলের পাত নয়। অথচ প্রযুক্তি-বিদ্যার প্রচলিত
পদ্ধতি—সাধারণ বালি-পাথরের উপর দেড়-দুই ইঞ্চি

বেদ-এর মারবেল-স্ল্যাব বিছিয়ে দেওয়া। দুনিয়ার তাৎ-
মারবেল-মোকামে এ নীতি মানা হয়েছে ; তাজের বাস্তু-
কারেরা যে পদ্ধতিটা জানেন না, তাও নয় ; কারণ মূল
সৌধটি ঐ পদ্ধতিতেই নির্মিত। তাহলে? কিছতেই
ভুলতে পারি না—ঐ প্রতিটি ধাপের নিরেট নিখুঁত
মারবেলগুলি মিকেলান্জেলোর হাতে পড়লে ‘ডেভিড-
পীতা’ না হলেও এক-একখানা ‘ব্যাঙ্কাস্’ হতে পারত।

আপনি কলবেন, শাহ-য়েন-শাহ-র কাছে ঐ
ধাপের খান-পঞ্চাশ মারবেল খন্ডের কীই বা দাম? তা তো
বটেই—‘কত ধন যায় রাজমহিষীর এক প্রহরের প্রমোদে।’
কিন্তু কেমন করে ভুলি : পাঞ্জাবের সেই খালকাটার
কাজটার নকশা তৈরী হয়ে পড়ে ছিল, অর্থাভাবে তাতে
হাত দেওয়া যায়নি। আর সত্যি কথা বলতে তাজের
নির্মাণ-ব্যয় শাহজাহাঁর তোষাখানা থেকে মেটানো
হয়নি আদৌ। সম্রাট এজন্য ত্রিশটি মৌজা চিহ্নিত
করে দেন। ঐ ত্রিশটি মৌজা থেকে রাজ কর্মচারীরা
খাজনা আদায় করে আনত, তা সরাসরি জমা পড়ত
তাজের তহবিলে।

সেই নাম-হারিয়ে-যাওয়া গ্রামের নিরন্ন প্রজার দল
কী-ভাবে খাজনা দিত তা কি আন্দাজ করতে পারছেন
না? বেগম প্রয়াত, কিন্তু ‘কর্তার ভূত’ মরে না। ওরা
বাইশ বছর ধরে তাজের তহবিলে খাজনা জমা দিয়ে
গেছে : ‘আরু দিয়ে, ইজ্জত দিয়ে, ইমান দিয়ে, বৃকের
রক্ত দিয়ে’!²³

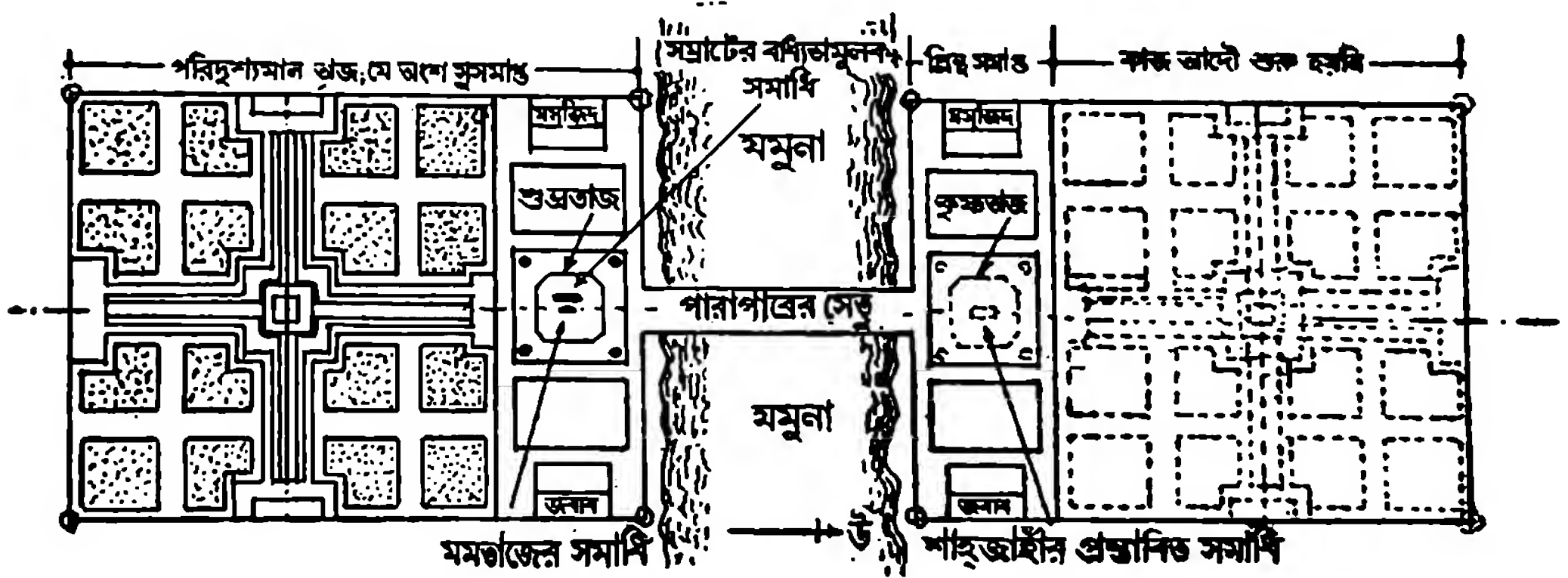
তাজের সামূহিক ভূমি-নকশা : ভুল, ভুল, আদ্যন্ত
ভুল বকে চলেছি এতক্ষণ! গম্বুজ নয়, মিনারিকা নয়,
প্রয়োগ-বিজ্ঞানের হন্দমুন্দ নয়—অজ্ঞাত পরিকল্পনাকার
তাঁর চরমতম মৌলিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন তাজের
সামূহিক বিন্যাসছন্দে!

‘আর্কিটেক্টনিক এ্যাপীল’ এবং ‘ইস্‌থেটিক্
ডিলাইট’-এর মহাসঙ্গম সেই সামূহিক ভূমি-নকশার
মূল সূত্রটি পাওয়া যাবে : বাবুর-বাদশাহ-র ‘চাহর
বাগী’ ছন্দে, যা মদগল-বিন্যাসের কেন্দ্রীয় ভাবনা। কিন্তু
এ পর্যন্ত কোথাও—কী ভারতবর্ষে, কী বহির্ভারতে,
সেই চাহর বাগ্ এমন অপূর্ব মহিমময় হয়ে ওঠেনি।

‘চার’ সংখ্যাটি ‘চাহর বাগ্’ পরিকল্পনার মূল কথা
—ইসলামী ঐতিহ্যেও নানা কারণে ঐ ‘চার’ সংখ্যাটি
গুরুত্বপূর্ণ। এখানেও ভূমি-নকশায় (চিত্র—11.21)
উদ্যানকে প্রথমে চার খন্ডে এবং পরে আবার চার খন্ডে
এবং তারপর আবার চার খন্ডে ভাগ করা হয়েছে।
কিন্তু তাজমহল ঐ চারমাঠার বোলে সমের মাথায় নেই।
তা কেন্দ্রাতিগ বেগে সরে গেছে একপাশে। কেন?

ইতিপূর্বে যাবতীয় মঙ্গল-ইমারতে বাগিচার কেন্দ্র-বিন্দুতে চিরকাল মূল ইমারতকে গড়ে উঠতে দেখেছি : বাবুর, হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর এবং ইতমদ-উদ্দৌলার মক্‌বারায়। এই প্রথম সেই 'ট্র্যাডিশন'কে অস্বীকার করা হল। প্রধান সৌধটিকে তার দুই সখী-সমেত সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল বাগিচার এক প্রান্তে, উত্তরসীমান্তে। সম্মুখস্থ বর্গক্ষেত্র-আকারের কেন্দ্রবিন্দুতে রইল একটি কৃত্রিম মর্মর জলাধার। তার আকার, আয়তন ও সংস্থাপনচাতুর্যে সে তাজমহলকে প্রতিফলিত করার অধিকার পেয়েছে।

শিল্পী কি কোনও দার্শনিক তত্ত্বের ইঙ্গিত দিতে তাজকে এমন অন্তর্বাসী করেছেন? তিনি কি বলতে চান : এই মরণশীল দুনিয়ায় মক্‌বারাও জলবিশ্বের মতো অলীক? তিনি কি বলতে চান : পাথরে খুঁজতে যেও না সেই অমর প্রেমকে, হয়তো পেলেও পেতে পার তার অলীক প্রতিবিশ্ব! বাস্তবে তা মায়া, কল্পনায় শাস্বত?



চিত্র-11.22 তাজের মৌলিক ভূমি-নকশা।

অজ্ঞাত পরিকল্পনাকার বিস্মৃতির অমর্ত্যালোক থেকে ম্লান হেসে বলেন, তাই যদি হবে, তাহলে এই মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমের প্রতীককে কি আমি বাঁধতে চাইতুম বন্ধ জলাশয়ে? —যা অপ্রাকৃত, অ-বহমান, যা চিরকাল ধম্কে থেমে আছে?

—তাহলে?

—জী নেহি বাবুজী! মায়নে গল্‌তি নেহি কী! ইয়ে স্নেফ তক্‌দিরকি খেল!

বুঝিয়ে বলেন, আমার চিন্তাধারা বন্ধ জলাশয়ে আবদ্ধ হবার নয়! প্রকৃতিপ্রেমিক বাবুর-বাদশাহ্ যে ব্যবস্থায় সবচেয়ে খুঁশি হতেন তাই করতে চেয়েছিলাম আমি। পরিকল্পনার মধ্যবিন্দুতে আমি তাকেই রাখতে

চেয়েছিলাম যাকে পরদা করার হিম্মৎ শাহ-য়েন-শাহ্ শাহ্‌জাহাঁ ভো ভুচ্ছ, নেই আমাম্ ইনসানিয়াতের! মানুষ যা পারে না, যা আত্মাতার অসীম করুণাধারা! —কী তা?

—আপনাদের রাধা আর কুকের মাঝে যা চিরকাল প্রবাহিত! সেই বিরহের নীল যমুনা!

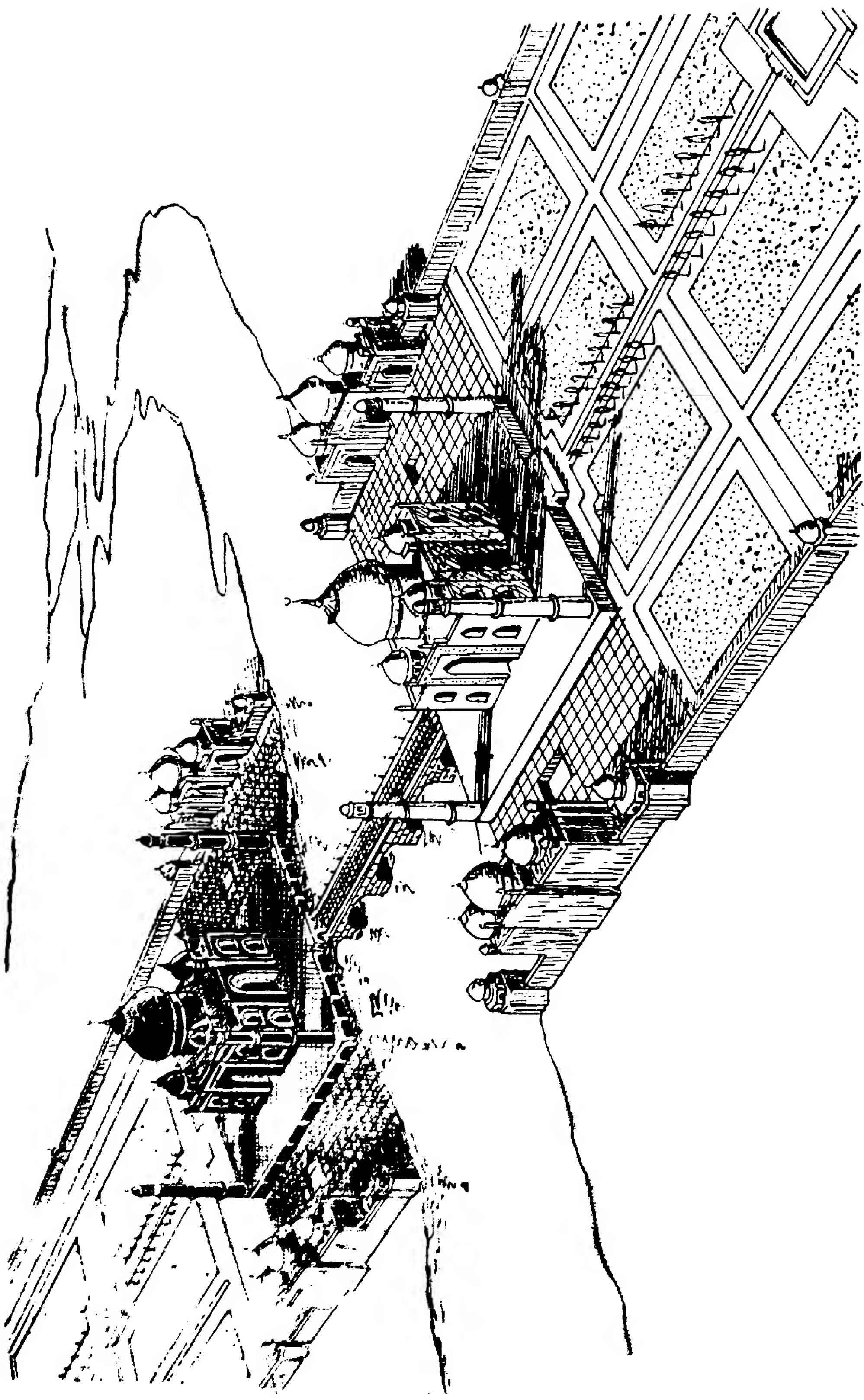
আমাদের অবাধ হবার হক্ আছে! যমুনা? সে তো গোটা পরিকল্পনার বাহিরে! উত্তরসীমানার ওপারে!

তা হোক! বে-হক্ বাৎ বলেননি বে-হাদিশ্ বাস্ত্ব-কার! সামূহিক পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে যমুনা-ই!

তাজ-পরিকল্পনার শব্দ আধখানাই বাস্তবায়িত। প্রস্তাব ছিল, যমুনার পরপারে নির্মিত হবে আদ্যন্ত নিকষকালো কণ্ঠিপাথরে : কৃষ্ণতাজ। শূন্য-তাজের প্রতিবিশ্ব—'লিওচুর্ডনাল এ্যান্সিসে' তাজের : জবাব। বেগমের সমাধি থাকবে এপারে, শূন্যতাজে; বাদশাহ্-র

সমাধি থাকবে ওপারে, কৃষ্ণতাজে। দুইটিই কেন্দ্রীয় অক্ষরেখায়। আর লায়লা-মজনু-র মাক্‌ধান দিগ্রে অনন্তকাল ধরে প্রবাহিত হবে বিরহের নীল-যমুনা। সেই চিরবিরহের বাধা অতিক্রমণের একটা বাধাপ্রসঙ্গের প্রতীক হিসাবে নির্মিত হবে একটি মর্মর সাঁকো। তার আধখানা সাদা, আধখানা কালো। যেন দু'দিক থেকে দু'টি হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ওরা। বুঝাই (চিত্র-11.22)।

শাহ্‌জাহাঁ বন্দী হওয়ার পূর্বে যমুনার পরপারে কৃষ্ণতাজের মোকাম-কুর্সি পর্যন্ত গাধা শেষ হয়েছিল। আমি 1965 সালে সেটি স্বচক্ষে দেখে এসেছিলাম। এ বছর (1980) তার চিহ্নমাত্র দেখতে পেলাম না। শূন্য-লাম, যমুনার সাম্প্রতিক বন্যায় পলিমাটি ও বাজির



চিত্র-11.23 ঈশা-আফগিনের ধ্যানে তাজের সামূহিক রূপ।
(গরুড়াবেলোকে কাল্পনিক চিত্র।)

তলায় তা চাপা পড়েছে। একান্তভাবে আশা করব, পুরাতত্ত্ববিভাগ সেই ভিতটুকু খুঁড়ে বার করবেন। ওটাই যে তাজ পরিকল্পনাকারের 'লাস্ট-লাফ'!

—অনুবাদে : আর্থেরি আস্!

ঔরঙ্গজীবের হাতে শাহজাহাঁ বন্দী হবার পর দিল্লী থেকে এল বাদশাহী হুকুমৎ : 'বন্দ করে দাও কৃষ্ণতাজের নির্মাণকার্য'।

মর্মাহত হলেন সেই পরিচয়হীন উস্তাদো-কি-উস্তাদ ; বন্ধলেন বাইশ বছর ধরে যে নিখুঁত ভার-সাম্যমূলক অনবদ্য ইমারৎটি বানাচ্ছেন এবার তা ভার-সাম্যচ্যুত হল। কেন্দ্রীয় অক্ষের দু-পাশে—পূবে আর পশ্চিমে আদ্যন্ত 'সিমেন্টিক্যাল ডিজাইন'-এ ঐ একটিই ছন্দপতন, যার নিয়ামক স্থপতি নয়, বাস্তুকার নয়—ইতিহাস ! কেন্দ্রীয় অক্ষরেখায় মমতাজ-মহলের সন্দোখ ; কারণ কথা ছিল, তাঁর স্বামীর মরদেহ শায়িত হবে একই অক্ষরেখায় যমুনার পরপারে কৃষ্ণতাজে (চিত্র—11.22)। যে-হেতু কৃষ্ণতাজ পরিত্যক্ত তাই শাহজাহাঁর মরদেহ এখন শুইয়ে দেওয়া হল মমতাজের পাশটিতে। নিয়তির কী নিষ্ঠুর পরিহাস ! তামাম জিন্দগি যিনি ছিলেন বেগমের দিকে ফিরে, এবার শাস্বতকালের জন্য তাঁকে শূতে হল তাঁর দিকে পিছন ফিরে ! মক্কার দিকে ফিরে ! মমতাজের কবর-সন্দোখ যে হাত-দুই পূবে সরিয়ে ভারসাম্য বজায় রাখবেন তারও উপায় নেই—সাহী শরিয়তী তাঁরকে কবরে ঘুমন্ত মানুষকে সরানো-নড়ানো বারণ !

ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে তাজ-পরিকল্পনাকারের নামের শেষচিহ্নটুকু বে-হাদিশ্ মূছে ফেলে জাহাঁপনা বোধকরি নির্জন খোয়াবগাহে অটুহাস্যে ফেটে পড়েছিলেন : নেই, নেই, কোথাও নেই সেই বেতনভুক নফরটার নাম-ধাম-পরিচয় ! টোটাল এ্যান্‌হিলিয়েশান !

তামাম হিন্দুস্থানের মালিক শাহ-য়েন-শাহ বাদশাহ্‌র যেমন ছিল সীমাহীন রাজশক্তি, তেমনি তাঁর মখসূর প্রতিদ্বন্দ্বীর ছিল অপারিসীম প্রতিভা ! শ্বৈরখ-সমরে তিনি মাথা নিচু করেননি। অসীম শক্তিশালী

মালিকের ইন্‌ভিজাজের বিরুদ্ধে নীরব জেহাদ ঘোষণা করলেন। সড়াই ফতে করলেন তাঁর একটিমাত্র একাধারী দিয়ে—সে অস্ত তাঁর শিল্পপ্রতিভা ! একইভাবে তাজ-মহল-স্থাপত্য থেকে শাহজাহাঁকে বে-হাদিশ্ মূছে ফেলে ! টোটাল এ্যান্‌হিলিয়েশান !

শেষ-হাসি হাসবার সন্ধ্যাগ শাহজাহাঁ পাননি ! আর পাননি যে, তা জানতেও পারেননি ! সেদিন সে-কথা কেউই বোঝেনি ! শাহজাহাঁ তো ছাড়, ফাগুদসনের মতো বিদগ্ধ স্থাপত্য-পন্ডিত পর্যন্ত সেটা বুঝতে পারেননি। কিন্তু তাতে কি ? শিল্পী জানেন : কাল নিরবধি, পৃথবী বিপদলা ! জানেন : 'বড়ি মদশ্‌কিল-সে হোতি হার চাগন-মে দিদাবর পরদা' ! কিন্তু নাগি-সের হাজার বছরের প্রতীক্ষা তো বিফলে যাবার নয় ! তাই দিদাবর হ্যাভেলকে একদিন বলতে হয়েছে—তাজ শাহজাহাঁর নয়, ইস্‌লামের নয় : The Taj belongs to India !

: 'আর্থেরি-হাস্'-এর হক্‌দার কে ?

আর্থেরি-হাস্‌ হাসে জমিন্, যখন বে-অকুফ্ পস্ত-নিদার বলে : এ জমি আমার ! আর্থেরি-হাস্‌ হাসে অসতী ঔরৎ, যখন বে-অকুফ্ মরদ বিবিকে বশিত করে তার বাচ্চাকে ওয়ারিশ্ বানিয়ে যায় ! আর আর্থেরি-হাস্‌ হাসে উস্তাদো-কি-উস্তাদ আলিম শিল্পী, যখন বে-অকুফ্ মালিক ইনাম দিয়ে ইমানকে খরিদ করতে চায় ! —একমুঠো আসরুফির বিনিময়ে শিল্পের ষোলো-আনা হিসাদার বনতে চায় !

মালিক-শ্রমিকের সেই শ্বৈরখ সমরে বিজয়ী হয়েও এ-ক্ষেত্রে নাম-গোত্র-হীন উস্তাদো-কি-উস্তাদ মীর মুহম্মদ গাজী মিঞা 'এ্যানন্' সেই 'আর্থেরি-হাস্' হাসতে পারেননি !

অসমাপ্ত 'কৃষ্ণতাজের' পরিত্যক্ত মোকাম-কুর্সি'র দিকে তাকিয়ে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলেছিলেন !

আর্থেরি আস্ !

শাহজাহাঁর মৃত্যুতে নয় ! তাজের ভারসাম্য-চূড়ান্তে ! □

॥ তামাম্ শূদ ॥

॥ ইতি গ্রী 'লা-জবাব-দেহলী-অপরূপা আগ্রা' গ্রন্থঃ সমাপ্তম ॥

॥ টীকা ও উৎস-নির্দেশিকা ॥

[প্রথম সংখ্যাটি ত্রিমক, দ্বিতীয়টি পৃষ্ঠায়, তৃতীয়টি সূত্রের এবং চতুর্থটি পরিশিষ্ট।]

প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্য

- 1.3.1.19 চতুর্ভুজ, মজ্জতবা আলী, প্রকাশ ভবন, চতুর্থ বর্ষ, পৃ: 90.
2.5.1.8 দৃষ্টিপাত, যাবাবর, পৃ: 42.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ বাহ্যিকভাবে ইসলামী স্থাপত্যের বিবর্তন

- 1.13.2.4 Ibn Khaldun & Timurlane. by W. J. Fishoel. P. 40.
2.13.2.9 An Outline of Islamic Architecture. by R. A. Jairazbhoy, Asia Publishing House 1972, P. 41.
3.13.2.13 Ibid, P. 41.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥ দাস-বংশ

- 1.23.2.33 "The Arab settlers lived side by side with their Hindu fellow-citizens for many years on terms of amity and peace",—An Advanced History of India, by R. C. Mazumdar, Macmillan & Co., 1946, P. 275.
2.25.2.17 "Never has a sovereign, so vigorous, kind-hearted and reverent towards the learned and divines, sat upon the throne".—Minhaz Uddin.
3.26.2.22 Raverty, Vol. I, P. 642.
4.26.2.24 Ibid, P. 642.
5.29.1.18 "Gen. Cunningham found an inscription on the walls recording that twenty seven temples of the Hindus have been pulled down to provide materials for the mosque". Arch. Report, Cunningham, Vol. I P. 176.
6.29.2.23 'ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্য', বিশ্বকোষ, শ্রীদীপক রঞ্জন দাস, ৮ম বর্ষ, পৃ: 109.
7.30.2.42 'Taju-L-Ma-asir', by Hasan Nizanni, History of India, Elliot, Vol. II
8.31.1.29 'The World's Last Mysteries', Reader's Digest, 1st Edn. 1977, P. 304.
9.31.1.31 History of Indian & Eastern Architecture, by J. Fergusson. Vol. I, P. 208.
10.32.1.4 'China Pictorial', II, 1979, P. 35.
11.32.1.5 চতুর্ভুজ, মজ্জতবা আলী, পৃ: 96.
12.32.1.41 'The Qutb Minar : Was there Afgan Influence?' by Dr. R. Sengupta, The Times of India, Sunday, July 30, 1978.
13.32.2.28 Quotation from Juzjani, Ibid.
14.32.2.30 History of Ind. & Eas. Architecture, by Fergusson, Vol. I.
15.33.1.34 চতুর্ভুজ, মজ্জতবা আলী, পৃ: 98.
16.34.1.2 চতুর্ভুজ, মজ্জতবা আলী, পৃ: 99.
17.38.1.34 D. O. letter no. 13(8)79C dated 26.5.80, from Dr. R. Sengupta, Director of Conservation, Archaeological Dept., Govt. of India, N. Delhi, to the author.
18.37.2.18 শ্রীরামচন্দ্রের মন্দিরটি আমি দেখিনি। তথ্যটি নিম্নলিখিত সূত্র থেকে সংকলিত : 'How Qutb Minar Was Designed', by Dr. R. Sengupta, The Hindusthan Times, Aug. 13, 1978.
19.37.2.20 Indian Architecture, Hindu Period, Percy Brown, 6th reprint 75, P. 14.
20.38.2.1 চতুর্ভুজ, মজ্জতবা আলী, পৃ: 97.
21.38.2.19 দৃষ্টিপাত, যাবাবর, পৃ: 112.
22.42.1.2 Palestine Pilgrims Text Society, IV, 1897, P. 17 & An Outline of Islamic Architecture by Jairazbhoy, Asia Publishing House, 1972, P. 291.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥ খিলজী-বংশ

- 1.44.1.43 'Tarik-i-Firuzshah', Zia-ud-din Barani, (Trans Elliot).
2.45.1.24 'An Advanced History of India', by R. C. Mazumdar, Macmillan & Co., 1946, P. 300.
3.48.1.17 'Tarik-i-Alaishahi', by Amir Khasrau.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : তুঘলক-সাম্রাজ্য

- 1.51.1.43 বৃষ্টিপাত, বামাবয়, পৃ. 37.
 2.52.2.27 "Tarik-i-Firuzshah" Biblioth. Indica P. 452.
 3.52.2.33 'History of Medieval India from 637 A.D. to Mughal Conquest', by Iswari Prasad, Allahabad, 1933, P. 293.
 4.52.2.33 'Translation of Barauni', by Elliot, Vol. III, P. 235.
 5.52.2.40 'An Advanced History of India' by R. C. Mazumdar, P. 315.
 6.53.1.5 'Ibn Batuta', Paris Edn. III, P.p. 212-13.
 7.53.1.20 Ibid, P. 214.
 8.53.2.21 Iswari Prasad, Allahabad, 1933, P. 294, Bib. Ind. P. 214.
 9.53.1.7 'Indian Architecture, Islamic Period', Percy Brown, (1956) Sixth reprint. '75, P. 21.
 10.57.2.9 'Fatuh-i-Firozshah', tr. Elliot, Vol. III, P. 382.
 11.59.1.36 'Sham-i-Siraj', Elliot, History of India, Vol. III, P. 350.
 12.62.2.36 'History of Medieval India.', by Iswari Prasad, 1933, P. 355.
 13.63.1.5 'Sham-i-Siraj', Alf; 'Tarik-i-Firozshah' P. 361.
 14.63.2.28 'Narrative of the Embassy of Clavijo to the Court of Timurlane', by Markham (Haklyal. Soc. 1859).

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : সৈয়দ ও লোদী

- 1.69.1.29 পার্সি ব্রাউন তাঁর কালজয়ী গ্রন্থে (Ind. Arch. Islamic Period) সৈয়দ ও লোদীযুগের মক্কারাগুলিকে বিবরণীয় বিভক্ত করেছেন। তৃতীয় জাতের সক্রিয়গণের মক্কারার উল্লেখ করেননি। গ্রন্থকারের মতে ঐ যুগের সমাধিসৌধ দ্বিধারায় বিভক্ত করা উচিত।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : বাবর ও হুমায়ুন

- 1.74.2.1 'তেজুলে ফুল', শ্যামলী, রবীন্দ্রনাথ।
 2.75.2.11 "History of India", Dr. Kalikinkar Dutta.
 3.76.1.31 'The Story of Babur's Death', Calcutta Review, Sept., 1936, by Ram Sharma.
 4.76.2.15 'Memoirs of Babur', by Leyden & Erskine, 1826.
 5.76.2.17 'Memoirs of Babur', by Mrs. A. S. Beveridge.
 6.78.2.29 'Life & Memoirs of Gulbadan Begam', Tr. by Beveridge.
 7.78.2.39 'Tawarik of Sayyid Maghbar Ali' (a minister of Babur).
 8.79.2.14 'An Advanced History of India', by R. C. Mazumdar, P. 601.
 9.80.1.2 Ibid. P. 600.
 10.80.1.31 যুগে যুগে ভারতশিল্প, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, 1961, পৃ. 148.
 11.81.1.7 যুগে যুগে ভারতশিল্প, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, পৃ. 151.
 12.81.2.4 যুগে যুগে ভারতশিল্প, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, পৃ. 152.

অষ্টম পরিচ্ছেদ : শেরশাহ্ বুর

- 1.83.1.25 শেরশাহ্-র প্রামাণিক জীবনীকার ডঃ কান্দনগোর মতে ফরিদের জন্ম 1486; কিন্তু গ্রীপরিমাণা সীরণ এ মত অস্বীকার করে প্রমাণ করেছেন [The Date & Place of Sher Shah's Birth. J. B. O. R. S., 1934, P. 106.] যে, ফরিদের জন্ম 1472 খ্রীষ্টাব্দে। রমেশচন্দ্র পরবর্তীকালে এ মত মেনে নেন।
 2.83.2.20 'Advanced History of India', by R. C. Mazumdar, P. 435.
 3.83.2.23 Ibid. P. 436.
 4.87.1.38 'History of India', Elliot Vol. III, P.p. 375-76.

নবম পরিচ্ছেদ : আকবর

- 1.97.1.15 আকবরনামা, ইং অনুবাদ, Vol. I. P. 375.
 2.99.1.11 আইন-ই-আকবরী, ইং অনুবাদ, Vol. I. P.p. 253-268.
 3.99.1.21 আইন-ই-আকবরী, ইং অনুবাদ, Vol. I. P.p. 484-485.
 4.99.2.36 'Akbar the Great', by Dr. Srivastava, 1st Edn. Vol. I. P. 41.
 5.100.2.30 'Muntakhab-ut-Tawarikh', by Abdul Quadir, Badayuni. (Tr.) Vol. III, P.p. 47-48.
 6.102.1.28 "When the expecting Khan removed the veil from her face he found her dead", Firista. (Tr.) Vol. II, P. 274.
 7.102.2.36 আইন-ই-আকবরী, ইং অনুবাদ, Vol. II, P.p. 159-60.
 8.104.2.28 'Delhi & Its Neighbourhood', by Y. D. Sharma, Archaeological Survey of India Publication, New Delhi, P. 119.

- 0.105.1.3 'Akbarnama', Freer Gallery of Art, Smithsonian Institute, Washington, D. C., Exhibit No. 3957.
- 10.107.1.0 আকবরনামা, ইং অনুবাদ, Vol. II, P. 243.
- 11.108.2.2 'Akbar the Great', by Dr. Srivastava, Vol. I, P. 98.
- 12.109.1.5 'Indian Architecture, Islamic Pd', Percy Brown, P. 92.
- 13.110.1.29 'Agra & Its Monumental Glory', by R. Hatha, Taraporevala, Bombay, 1977, P. 24.
- 14.110.1.35 Indian Arch., Islamic Pd., Percy Brown, P. 92.
- 15.117.1.6 অজস্তা অপরাধ, নারায়ণ সান্যাল, মার্চ, 1980 সংস্করণ, পৃ: 66.
- 16.121.1.40 'Fatehpur Sikri', Sd. A. A. Rizvi, Arch. Soc. of India, 1922, P. 37.
- 17.121.2.7 Ibid, P.p. 34-35.
- 18.126.1.34 'Akbar the Great', by Dr. Srivastava, P. 316.
- 19.128.2.38 বাদশাহী আমল, বিনয় ঘোষ, পৃ: 148.
- 20.129.2.12 আকবরনামা, ইং অনুবাদ, Vol. III, P. 81.
- 21.131.2.2 'Fatehpur Sikri', Saiyad A. A. Rizvi, Arch. Survey of India, P. 61.
- 22.135.2.22 'ভারতগিল্পে ষড়ঙ্গ', অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্ববিদ্যালয়গ্রন্থ, পৃ: 40.
- 24.140.2.7 আকবরনামা, ইং অনুবাদ, Vol. III, P. 576.

দশম পরিচ্ছেদ II জাহাঙ্গীর

- 1.149.1.35 History of Indian & Eastern Architecture, Fergusson.
- 2.150.1.1 Indian Architecture, Islamic Period, Percy Brown, P. 99.

একাদশ পরিচ্ছেদ II শাহজাহান

- 1.158.1.16 "The Emperor Jahangir, in an hour of drunkenness, handed over to Khurram the Prisoner (Khusrav) with the intention of transferring him from the ditch of prison to the plains of non-existence."—Salil, Amal, Vol. I, P. 137.
- 2.158.2.11 'History of Shahjahan', B. P. Saxena, P. 63.
- 3.158.2.29 Ibid P. 9.
- 4.158.2.36 'The Tazuk-i-Jahangir', Rogers & Beveridge, Vol. I, P. 115.
- 5 (Fig. 11.1) Copied from a Mughal Miniature now in British Museum, London.
- 6.166.2.6 'Agra & Its Monumental Glory', by R. Rath, Taraporevala, 1977.
- 7.167.1.33 History of Eastern Architecture, J. Fergusson, Vol. I, P. 308.
- 8.175.1.27 'The Taj Mahal', by David Carrol, Newsweek, New York, 1972, P.p. 16-17.
- 9.177.1.42 Ibid P. 14.
- 10.177.2.40 'নুরজাহান', সুকন্যা, করুণা প্রকাশনী, পৃ: 148.
- 11.179.1.13 'Anecdotes of Aurangzeb & Historical Essays', Sri J. N. Sarkar, 1912, P. 148.
- 12.179.1.20 'The Taj Mahal', D. Carrol, P. 56.
- 13.180.12.42 'বিশ্বাসঘাতক', নারায়ণ সান্যাল, দে'জ, প্রথম সংস্করণ, পৃ: 105.
- 14.184.1.4 'Indian Architecture. E. B. Havel, 1913, P. 71.
- 15.185.2.6 Ibid. P. 15.
- 16.187.1.4 'Jesting Pilate', Aldous Huxley, 1926.
[Vide 'The Taj Mahal', by David Carrol, P. 159.]
- 17.187.2.18 'Brave New World', Aldous Huxley, Penguin Edn., 1972, P. 39.
- 18.187.2.19 Ibid, P. 50.
- 19.188.1.21 'The Taj Mahal', David Carrol. P. 98.
- 20.195.1.35 'History of Eastern Architecture', J. Fergusson, Vol. II, P. 313.
- 21.195.1.38 'Travels of Bernier', Constable's Edn. P. 298.
- 22.196.2.36 এ অনুচ্ছেদের তথ্যসমূহ 'Reader's Digest', Oct. 1979, পৃ: 68-71 থেকে সংগৃহীত।
- 23.200.2.24 'কর্তার ভূত'—রবীন্দ্রনাথ।

॥ নিবন্ধ ॥

অগলান, আজেম—২০, ২৪
 অগলান, ইশক—২০
 অজন্তা—১, ২, ৩, ৪০, ১০৫, ১৯৮
 অটোমান তুর্ক—১১, ১৭
 অনুপভাষা—১১৬-১১৮, ১২২
 অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—১১২, ১০৫, ১৬৫, ১৯৩, ১৯৪
 অমরসিং গোট—১০৯, ১১০
 অরুণরতন—(ভট্টাচার্য্য দ্রঃ)
 অল্ ওয়ালিদ—১০, ১৩
 অষ্টভুজ মকবারা—৬৫, ৮৫, ১০৪
 অশোক স্তম্ভ—২১, ৫৯, ৬০, ৬৩

আইন-ই-আকবরী—৭৯, ১১১
 আইনস্টাইন—৫৬, ১৭০, ১৮০
 আইবক কুৎবউদ্দীন—৬, ৭, ১৮, ২২, ২৪, ২৯, ৩১, ৫৯, ৬৪, ৭৭
 আইয়ুব, আবু সৈয়দ—৪০
 আউলিয়া—(নিজামুদ্দীন দ্রঃ)
 আকবর, সম্রাট—৭, ১০, ১৭, ৬৬, ৬৮, ৭১, ৮৩, ৯৪, ৯৬-১৪৮, ১৫০, ১৬২
 আকবরনামা—৭৯, ৮০
 আকবরী মহল—১১০, ১১৪
 আগ্রা—৩, ৪, ৭, ৫৯, ১১৫, ১৪০, ১৯৭
 আগ্রা কিল্লা—১, ৭, ১৮, ৯৬, ১০৮, ১১০, ১১৪, ১২৯, ১৩৫, ১৪২, ১৪৩, ১৬৪, ১৬৭
 আজেম, অগলান—(অগলান দ্রঃ)
 আড়াই-দিন-কা ঝোপড়া—২২
 আংকা খান—১৯, ৯৮, ১০৪, ১০৫
 আদিলাবাদ—২১, ৫৬
 আদম খান—২১, ৬৬, ৬৮, ৯৬, ৯৮, ১০০-১০২, ১৩০
 আনন্দবাজার—৩৫
 আনারকলি—১৪২, ১৪৬
 আফকন শের—(শের আফকন দ্রঃ)
 আবদল মালেক—১০, ১৩
 আবদারখানা—১১৭, ১২২
 আবু মশার—২৩
 আবুল ফজল—৭১, ৭৬, ৭৯, ৯৬, ১০৪, ১০৮, ১২৭, ১৪১, ১৭২
 আবদুস সামাদ—৭৯
 আবদুর রহিম খান-ই-খানান—১২৭, ১৩৯, ২০০
 আবদুল লাহোরী—(লাহোরী দ্রঃ)
 আব্বাসীদ বংশ—১৪, ১৫, ১৬
 আমীর-ই-আখর—২৫
 আমীর খসরৌ—(খসরৌ দ্রঃ)
 আমল/বী—৫, ৮, ১০, ১৩, ১৫, ২৩

আরিস্তো—৪৫
 আকুয়েট—২৯, ৩৪, ৪৭, ১১১
 আর্কেমিডিস—১৫
 আজর্দবান্দ বেগম—(মমতাজ দ্রঃ)
 আলতুনিয়া—২৬, ২৭
 আলমগীর—১৭, ৭০, ৮১, ১৭২, ১৯৯
 আলাই দরওয়াজা—১৯, ২৭, ৪৬, ১৮৫
 আলাই মিনার—২৭, ৪৬, ৬৪
 আলাউদ্দীন—(খিলজী দ্রঃ)
 আলিওয়াল—৮২-৯৫
 আল্লাহ—১১-১৪, ৫৭, ১২৪, ১৪২, ১৪৫, ১৯৫
 আসফ খাঁ—১৪৬, ১৬০, ১৮৫
 আহমেদ, মধুপতি—১৬৮, ১৬৯, ১৮৫
 আহিওল—৬, ৩৬, ৩৭

ইউক্রিড—১৫
 ইতমদউদ্দৌলা—২, ৫, ১৫, ৩৭, ১০১, ১৪৬, ১৫১-৬, ১৬২, ১৮২
 ইবন কতুতা—৫২-৫৫
 ইবান—৬, ১১, ৩০, ৪১, ১০৪, ১০৫, ১৫০
 ইবাদখানা—১৬, ১১৭-২৪
 ইমারৎ—৪, ১৩
 ইরাক—১১, ১৪, ৬৭
 ইরান—১১, ৬৭
 ইলতুৎমিস্—৩, ১৫, ২২, ২৫, ২৯, ৪১
 „ সমাধি—৩৯, ৪০-৪২, ৪৭
 ইলিয়ট—৫২
 ইশক অগলান—(অগলান ইশক দ্রঃ)
 ইশার তোরণ—১০৩
 ইস্তাম্বুল—৮, ১৭, ১০৩

ঈশা আফান্দ—১৬৪, ১৭৮-৮২, ২০১-০৩
 ঈশা খাঁ—৬৬, ৬৮
 ঈশোপনিষদ্—১৪৫
 ঈশ্বরীপ্রসাদ—৫২

উমর ইবন আবি রাবেয়া—১৩
 উলুঘ খান—৪৪

ওক, পি. এন.—৩৫, ৩৬
 ওমর খৈয়াম—১২৯
 ওমর মসজিদ—(ডোম অফ দ্য রক দ্রঃ)
 ওয়াল্লিদ বংশ—১২, ১৪-১৬, ২০, ৬৬
 ওল্ড টেম্পেল—১২৯

উলুগজীব—২, ১৫৯, ১৬০, ১৭২, ২০৩
 (এবং আলমগীর দ্রঃ)

ককর—৫৭
 কমলাদেবী—৪৫, ৪৮
 কলিঙ্গ—১০, ৩৬-৭
 কাইরোয়া—১০, ১৪
 কাফুর, মালিক—৮৮-৯
 কাবা—৬, ১, ১১, ৪০
 কার্জন, লর্ড—৩৮, ১০৭, ১৯৫, ১৯৮
 কার্দোভা—৮, ১০, ১৪
 কালান মসজিদ—৬০
 কাসেম, মহম্মদ বিন—২২-৩
 কার্ণিড—১৫
 কিপলিঙ, রাইডার—১৮, ১৭০
 কিব্লা—৬, ১১, ১০, ১৬৬
 কিল্লা-ই-খুনাহ—৯২
 কুওত্তুল মসজিদ—২১, ২২, ২৪-৩০, ৩৯-৪১, ৪৬, ৫৯, ৯২
 কুৎবউদ্দীন আইবক—(আইবক দ্রঃ)
 কুৎব মিনার—৪, ৭, ২১, ২২, ২৪, ৩২-৩৬, ৭৭, ১০৩
 কুৎব, মেরামতি—৪৮
 কুফি লিপি—৪০
 কুমারস্বামী, আনন্দ—১৭০
 কুরাণ—১১, ৩০, ৩৪
 কুর্সি—৫৫, ১২৩
 কুর্সি-গম্বুজ—(গম্বুজ-কুর্সি দ্রঃ)
 কোণিক কোষ—৩৭, ৩৮, ১০৬
 ক্যানিংহ্যাম—৩১
 ক্যালিগ্রাফি—১৪৬

কলিফা, অল ওয়ালিদ—১৩
 „ আবদল মালিক—১২
 „ মনসুর—১৪
 „ মোরাইরা—১০
 খসরৌ (জাহাঙ্গীর পুত্র)—৭১, ১০৯, ১৪৬, ১৪৭, ১৭৭-৭৯
 খসরৌ নাসিরুদ্দীন—৫০
 খাজুরাহো—৬, ১০, ১৬, ৩৬, ৩৭
 খান-ই-জাহান ডিলাঙ্গানী—২৯, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৬
 খানমহল—৫৯, ১৬৫, ১৭১
 খিলজী, আলাউদ্দীন—৭, ১৬, ২৯, ৪০-৪৬, ৫০
 খিলজী জামাউদ্দীন—৪০-৪৬
 খিলান—৩, ৬, ৩০, ৪৭, ৬৮, ১৩৪, ১৬৩, ১৬৬
 খিলান মসজিদ—৬০
 খুররম—৭১, ১৩৯, ১৪৬, ১৪৭, ১৫৮ (এবং শাহজাহা দ্রঃ)
 খোরাবগাহ—১২২, ১৩৫, ১৫০, ১৬০, ১৬৭-৭০, ২০৩

খজনী মিনার—৩৩, ৩৭

গজনারি ঘাম্ব—৩
গজমুতা, হস্তী—১০৭-৩৮
গম্বুজ—০, ৬, ১৪, ১৫, ৪০, ৪১,
৪৭, ৬১, ৬৭, ১০৬, ১১০,
১৪১, ১১০
গম্বুজ-কুর্সি (বা মোকানকুর্সি)—৬৬,
৬৭, ৬৮, ১০৫, ১৮৬, ২০১
গাজী খালিক—(তুগলক গিরাস্ প্রঃ)
গাজী শাহনা—(শাহনা প্রঃ)
গালিব—৪০, ৬২
গিরাস্ তুগলক—(তুগলক প্রঃ)
গিরাস্ কলবন—(কলবন প্রঃ)
গুলামহল—১২১, ১২২, ১৪৪
গুস্তব্দ—৫, ৫৯
গুলদস্তা—০, ৬, ৬৮, ১০৫, ১১৫
গুলকন বেগম—৭৮, ৭৯, ৯৭, ১৬১
গ্যালেন—১৫
গ্যালিলেও—০৪, ৫৬
গ্র্যান্ড ট্রান্স রোড—১২, ১৫
গ্যাভিয়েটোর—২০

ঘারী, সুলতান—২১, ২২, ৪০-৪২, ১১৬
ঘোরী মহম্মদ—২৪

জুবতী পূর্বচন্দ্র—৮১, ৮২
চুস্তাই তুর্কি—৭৬, ৭৭
চাপিস খান—১৫, ১৬, ৭৪, ৭৫

জম্বা—৪৭, ৬২, ১২৪, ১২৫, ১৫১,
১৫৩, ১৬৬
জহী—০, ৬, ৫৯-৬১, ৬৭, ১০৫,
১৪১, ১৫০, ১৫১, ১৫৩, ১৬৬,
১১৬
জোতা খান-কা-গম্বুজ—৬৯

জবাব—৬, ১১৬, ২০১
জাম-ই-মসজিদ—২৪, ৬০, ১১৭, ১০০-
০০
.. দিল্লী—২১, ১৫৭, ১৬০, ১৭২
জালালুদ্দীন—(খিজুরী প্রঃ)
জাহাঙ্গীর—৭, ১৭, ১৮, ৭৯, ৮০,
১৪৬-৫৬, ১৫৮
.. মক্কাস—১৫৪-১৫৬
জাহাঙ্গীরী মহল—৪৭, ১১০-১৪,
১৫১
জাহান-আরা—৭৯, ৮০, ১৬১
জাহান-পনাহ—৫৬, ৬০
জাহান, মালিকা—৪০-৪৫
জিগ্গুরা—১৫
জিজিয়া কর—১৬
জিয়া বারানি—(বারানি জিয়া প্রঃ)
জুড়িরা—১০
জেনিসানি—২০
জেরভাঙ্গসা—৭৯, ৮০
জেরসালেম—৮, ১০, ১৬, ৬৬

উমাস রো, স্যার—৮১
উয়ের্নাই—২২, ৭০
উল্গামি—১৫

টেম্পারা—১৫
টোডরম—১৬, ১৪০
ট্রাবিয়েটে পম্পতি—২৯, ৬১, ১০৯-১১,
১১৬, ১২৭, ১০৬

ডেকার্টে—১২০
ডোম অব দা রক—১২, ১০, ৬৬, ১৮৫

ডাকমহল—১, ০, ৬, ০০, ০৭, ৬১, ৯২,
৯৪, ১২২, ১০১, ১০৯, ১৪৯,
১৫৯, ১৬৫, ১৬৬, ১৭২-২০০

.. কালিগ্রাফি—১৮৮-৮৯

.. গম্বুজ—১৮৪-৮৬

.. জল সরবরাহ ব্যবস্থা—১১৮

.. নির্মাণ ব্যয়—১১৮-২০০

.. পরিকল্পনাকার—১৭৮-৮২ (এবং
ঈশা আফান্দি প্রঃ)

.. 'ল্যানের বৈশিষ্ট্য—১৮২-৮৪,
২০১-২০০

.. মধ্যরা রিফাইনারির প্রভাব—
১১৬-১১৮

.. মিনারিকা—১৮৬-৮৮

.. সম্মুখ দৃশ্য—১৮৮-৯২

.. হিসাবের খাতা—১৮৪

.. হিন্দু স্থাপত্যের প্রভাব—১৯২

তানসেন—১১৫, ১২২, ১২৭, ১৪০,
১৪৩, ১৫৩

তুগলক বাগ—৫০, ১০৬

.. গিরাসউদ্দীন—৭, ২১, ৪৭, ৫০-
৫৬

.. মহম্মদ বরিন—৭, ৫১-৫৬

তুরস্ক—৩, ১০, ১৪

তুর্কি সুলতানা কুটির—১২৫

তৈমুরলঙ—৬০-৬৬, ৭০, ৭৪

দরওয়াজা, আগ্রা—(আগ্রা দরওয়াজা প্রঃ)

দাদী-কা-গম্বুজ—৬৯

দারাদকো—১৪৬

দামাস্কাস—১০-১৫

দাসপ্রথা—২২-২৪

দাস কংশ—৭, ২৪, ৪০

দিল্লী—১, ৪, ২০, ২৪, ৩৫, ৫৯,
৬০-৬৮, ৭৬, ১০৫, ১০৯, ১৭০

দিল্লী দরওয়াজা—২১, ১১০, ১১০,
১৬৭-৬৯

দীন ইলাহী—১৮, ৯৬, ১১৯, ১০১,
১৪৫

দীনাপনাহ—১০৭

'দৃষ্টিপাট'—৫, ৫১-৫০

সেওয়ান-ই-আম—৬, ৫৯, ১১৭, ১১৮,
১০৪, ১৬০, ১৬৬-৭১

সেওয়ান-ই-খাশ—৬, ৫৯, ১১৭, ১২০,
১৬০, ১৬৫, ১৬৭-৭১

সেবাসেবী—৪৮, ৪৯

সৌলখানা—১১৭, ১২০

প্রাচীর স্থাপত্য—০৭

নজরোজ বাজার—১২৮

নজরখানা—১৬৭-৭০

নবরঙ্গ ঘন্দির—৫৯, ৬০

নাই-কা-কোট—২১, ৫৬

নাগর স্থাপত্য—০৭, ১৬০

নাগনা মসজিদ—১৬৬-৭০

নাথ, শ্রী আর—১৬৬

নালন্দা—১০, ৫৭

নাশখ্ লিপি—৪০

নাসিরউদ্দীন—২৫, ৪০

নিজামউদ্দীন আউলিয়া—২১, ৪৯, ৫৫,
১০৪

.. হজরৎ শেখ—৫১-৫০

নুরজাহাঁ—১৭, ৭৯, ৮০, ১২৯, ১৪৬,
১৪৯, ১৫১, ১৫২, ১৬১

নেব্কাডনেজার—১০০

পাচিশী কোর্ট—১২২

পল্লব দেউল—১৮০

পয়গম্বর—(হজরৎ মহম্মদ প্রঃ)

পাকিস্তান—১৮

পাচমহল—১২৪

পানিপথ—৭০, ৭৭, ৯৬

পার্সি টাউন—(টাউন প্রঃ)

পাল, সুনীল—২

পাড় দেউল—১৬০-৬৪

পীর গালিব—৬০

পীসা, হেলানো-মিনার—০৫

পৃথ্বীরাজ চৌহান—২৪, ৩৪, ৩৯

পেয়াজী গম্বুজ—১৪৯, ১৮৪-৮৬

'প্রমাণ'—০, ১৯০

শ্লেটো—১৫

ফতেপুর-সিদ্ধি—৪, ৭, ১৫, ১৭, ৯৭,
১০৬, ১১৪, ১১৫-৪৫, ১৫০,
১৬২

ফরিদ—৮২

ফাগুসন—০১, ০২, ৪০, ৪১, ১৪৯,
১৬৭, ১৭০, ১৮৫, ২০০

ফারুখ বেগ—৭৯

ফিরোজ শাহ কোটলা—২১, ৫৬, ৫৮,
১৬৮

ফিরোজ শাহ—(তুগলক প্রঃ)

ফিরোজাবাদ—৭

ফেরেসতা—২৬

ফেজি—৭৯, ৯৬

ফেন্সিকা—১৫

বড়াখান-কি-গম্বুজ—২১, ৬৯, ৭৮

বঙ্গবন, গিরাসউদ্দীন—২১, ২৮, ৪৭

বাগদাদ—৮, ১০, ১৪, ১৬

বাজবাহাদুর—১০০-১০২

বাদগীর—১২৪

বাদাউন—২৫

বাদামি—৫, ৩৬

বাবুর—৭, ৬৮, ৭০, ৭০-৮১, ১৪৮

.. শিল্পযোধ্য—৭৬-৭৯

.. চাহারবাগ—৬৬, ১৬৮, ২০০

বারানি, জিয়া—৪৪, ৫২, ৫৩, ৭৯

বারান-সার—১৬১

বাহ-রাম—২৭

বাহাদুর-৬৬

বীরবল-১৬, ১১৭, ১১৮, ১২৫-২৮, ১৬৩

বালন্দ দরওয়াজা-৪, ৯৪, ১১১, ১১৭, ১০০-০৬, ১৫০, ১৬৪ ১১৪

.., বীররস-১০৪

.., ডয়ানক রস-১০৪

.., শান্ত রস-১০৬

বেগমপুরী মসজিদ-৬০

বেগা বেগম-৯৭, ১০৮

বেসর স্থাপত্য-০৭

বোর্দো অস্টিন-১৭১, ১৮০-৮১

বাস্টিয়ান-৫৪, ৬১, ১৪৯, ১৫০, ১৫৩

ব্রাউন, পার্সি-৪১, ৪৭, ৫৫, ৬০, ৬৫, ১০৯, ১১০, ১৪৯, ১৮০, ১৮৪

ভট্টাচার্য, অরুণগুণ-০৫-০৬

ভসন্তেয়ার-৫৬, ১২০

ভসৌর-০০, ৪৭

ভাদুড়ী শিশির-১৭০

‘ভাব’-১১০

ভারমোর-২০

ভার্সাই প্রাসাদ-১৫৯

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল-২, ০০, ১১৬

ভুবনেশ্বর-৫

ভুলি-ভাটিয়ারী-২১, ৬২

ভেলাস্কেথ-৮০

ভ্যান গথ-৫৬

মকবারা-৬, ৫৫, ৬১, ৬৫-৬৯, ১০৭, ১৪৯

.. অষ্টভূজ-৬৫, ৬৯, ৭০

.. চতুষ্কোণ-৬৮-৭০

.. সংক্রামণ ধর্মী-৬৫, ৬৯

মক্কা-৮-১২, ৪২, ৯৯

মদিনা-৮, ১১, ১২

মতি-মসজিদ-১৬৬, ১৭২

মজুমদার, রমেশচন্দ্র-৪৫, ৫২, ১১৫

মমতাজমহল-১৭, ৭৭, ৮০, ১৬১, ১৬২, ১৭৪-৭৮, ১৯৬

মম্বুর সিংহাসন-১৬১

মরিয়ম জমাদানী-৯৭, ১৬১

মরিয়ম মকানী-১০৫, ১৪০

মসজিদ-৫, ৬, ১২, ১৩, ১৫, ৬৭

মহম্মদ কাসেম-(কাসেম প্রঃ)

মহম্মদ বিন-(তুগলক প্রঃ)

মহম্মদ হজরৎ-১০-১৩, ১৭, ১৪৫

মহাবলীপুরম-১০

মাক্-সু-২৯, ৬৭

মাদ্রাসা-১৬, ১৭, ৬১

মানবাই-১৪৬

মানমতী-১৪৬

মানসিংহ-১৩০, ১৩৭-৮, ১৮১

মাক্-স-১৮০

মালচা মহল-৬২

মালিক কাফুর-(কাফুর প্রঃ)

মাহম্মদ, সুলতান-২৪

মিকোসাফেলো-২, ১৫২, ১৫৭, ১৬৪, ১৯০, ২০০

মিনার/মিনারিকা-৪, ৬, ১০, ১৫, ১৬, ০২, ০০, ৪২, ৬০, ১১০, ১০০, ১৫০, ১৫০, ১৯০

মিজা গিয়াস-১০৭, ১০৮, ১৪৭

মিশর-১০, ১১, ১৭, ২০, ১৯৯

মিহরাব-৬, ১১, ১৫, ৫৪, ১১৬

মীর সৈয়দ আলি-৭৯, ৮০

মুগল-এ-আজম-৭, ৬৮

মুজতবা আলী-০, ০২-০৪, ০৮, ৬৯, ৭৬, ১৬৪, ১৮৬

মুবারক শাহ সৈয়দ-(সৈয়দ প্রঃ)

মুসল্লি মিনার-৬১

মুসল্লি বর্জ-১৬৫

মুহম্মদাবাদ-৫৬

মেট্রোপোলিটান মিউজিয়াম-৭১

মেসোপটেমিয়া-১০, ১৪, ২০

মেহেরউল্লাহ-১২৯, ১৪৬, ১৪৭

মেহেরুলী-২০, ২১, ৪০, ৪৭

মোর্যুগ-৫

ম্যানারিজম-১৫৯

মাদ্রাস-১১

‘মাদ্রাস’-৫, ০৮, ৫১-৫০

মাদ্রাস-১১, ১০, ৫৬, ১৪৬

মাকুং-২৬, ২৭

রকম-ই-হিন্দ-২০

রঙমহল-১৬৮-৭১

রথ, ডঃ-১১০

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-৬১, ১৫৭, ১৭০, ১৭৯, ১৯৪

রমেশচন্দ্র-(মজুমদার প্রঃ)

রামেসিস-০৫

রায় পিথোরা-৫৬

রায়ী-১৫

রাহজেন্স-১৫

রিজভী-১২৮

রুথিয়া বেগম-১৭, ১২৮

রুজভেন্ট, মিসেস-১৭০

রুপভেন্স-০, ১৯০

রুপমতী-৯৬, ৯৯-১০২

রেন দেউল-১৬০-৬৪

রোজিয়া সুলতানা-২২, ২৬-২৮

রোদা-১০০

লাডলী বেগম-১৫৫-৫৬

লালকিল্লা-৭, ২০, ২১, ৫৯, ১১২, ১২৯, ১৫৭, ১৬৭-৭০

লাবণাবোজনা-১৯০, ১৯৪

লাহোর-৭, ৮, ২৪, ১৪০, ১৫৪-৫৬

লাহোরী, আবদুল-১৭৭

লিয়ান-০০, ৪১, ১০৫, ১০৯

লেনিন-১৮০

লোদী-৭, ৭০, ৭৫, ১০৬

.. বংশ-৬৫-৭০

.. সিকান্দার-৩৪, ৬৫-৬৮

লৌচেন্দ্র, কুং-০১

লক্ষ্মণচন্দ্র-৬, ১৪৫

লক্ষ্মণচন্দ্র, শেখ মজিদ-৫১-৫০

লক্ষ্মণচন্দ্র সেনগুপ্ত-(সেনগুপ্ত প্রঃ)

লক্ষ্মণ-১১

লাহোরী-৭, ১৭, ৪৭, ৭৯, ৮১, ৯৪, ১১২-১৪, ১২৮, ১৪৬, ১৫২, ১৫৭

.. মৈনামিন জীবন-১৬০-৬০

.. স্থাপত্য মূল্যায়ন-১৬০-৬৪

লাহোরাবাদ-৭

লাহানা, মালিক গাজী (মালিক)-৬০

লাহোর-১৬৪

শেখ, সৌদি চিফ-২, ১১৫, ১০০-০২, ১৮২

শের শাহ-২, ১৭, ৬৬, ৬৮, ৭০, ৭৭, ৭৯, ৮২-৯৫, ৯৯, ১৫২

.. স্থাপত্য মূল্যায়ন-৭৪, ৮৭, ৮৯, ৯৪, ৯৫

শের আম্বান-১৪৬-৪৭

শেহান-৬, ১১, ১০০, ১০০

শ্রীকান্ত-১২৪-৮

সন্দো-৬, ৫৫, ১৫৫, ১৯৫, ২০০

সকদরজ-২, ২১, ৪২, ২০০

সবুজগীন-২২, ২৪

সমরকন্দ-১৬, ৬০, ৮৮, ২০০

সলোমন-১০

‘সাদা’-১০৫, ১৫১, ১৯০-৯৬

সামান্না-৮, ১৫, ১৬

সালিয়া বেগম-১৭, ১৬১

সালিয়া সুলতানা-১৭

সিকান্দার জোদী-(জোদী প্রঃ)

সিরি-২১, ৪৬

সিরিয়া-৫, ১১, ১০

সিস্টিন চ্যাপেল-২, ১৫২, ১৮৮

সুন্‌হারা মকান-১২৪, ১২৭

সুন্‌স পাল-(পাল প্রঃ)

সুলতান হারী-(হারী প্রঃ)

সুলতানা বেগম-১৮

সুলতানা রেজিয়া-(রেজিয়া প্রঃ)

সেকুলার-৬

সেকেন্দার শাহ-৪৫

সেকেন্দার মক্‌সুদ-৭, ৪২, ১০৫, ১৪২, ১৪৭-৫১

সেনগুপ্ত, ডঃ জগ-০২

সেনগুপ্ত, লক্ষ্মণ-২

সেনোচ-৬

সেলজুক ডুক-১৬, ১৭

সেলিম-১১৪, ১১৫, ১২৮, ১০৪, ১৪০, ১৪২, ১৪৪, ১৪৬

(জাহাঙ্গীর প্রঃ)

সৈয়দ বংশ-৭, ৬৫-৭০, ৭০, ১০৬

সৈয়দ মুবারক শাহ-৬৫-৬৮

.. মুহম্মদ শাহ-৫৫-৬৮, ১৮৫

সুইজ-১৫, ৪০, ৪৭, ১০১, ১২৭

স্টোলেক্টাইট-০৪, ০৮, ১১১, ১৮৪

স্মিথসোনিয়ান ইন্স-১০৫

হক, আবদুল (ম্বপতি)—৬০
 হুজাত—২০
 হুজিহাট/খাটী—১০৭-৩৮
 হুজবেন—৮০
 হুজলে, আলফুস—১৭০, ১৮০-৮৪
 হুজী বেগম—৯৬, ৯৭, ১০৭, ১০৮
 হুজানামা—৮০
 হুমায়—৬, ১৪, ১১৬, ১২২, ১৬৫-৭২

হামিদ, (ম্বপতি)—১৬৮
 হামিদা বান, বেগম—৯৬-৯৮, ১০৮,
 ১৪০-৪৪
 হারাম-সারা—১২৪
 হারেম—১৬১-২
 হাসান শাহ শুর—৬১, ৮২-৯৫
 হিজিরা—১১
 হিরণ মিনার—১১৬, ১০৬-৩৯, ১৬৪

হুনাইন, ইবন ইশাখ—(ইশাখ পঃ)
 হুমায়ুন—৭, ৬৮, ৭৩-৮২, ৯৬, ৯৯
 " , ম্বপতি—৭৮
 " , মক্কারা—২, ৩, ৫, ২০, ২১,
 ৩৩, ৪২, ১০৫, ১১০, ১৩৯,
 ১৪৯, ১৫০, ১৮০, ১৮৫
 হোস-ই-খাশ—২০, ২১, ৬১
 হাভেল—৪১, ১৪৯, ১৭০, ১৮০,
 ১৮৫, ২০৩

॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥

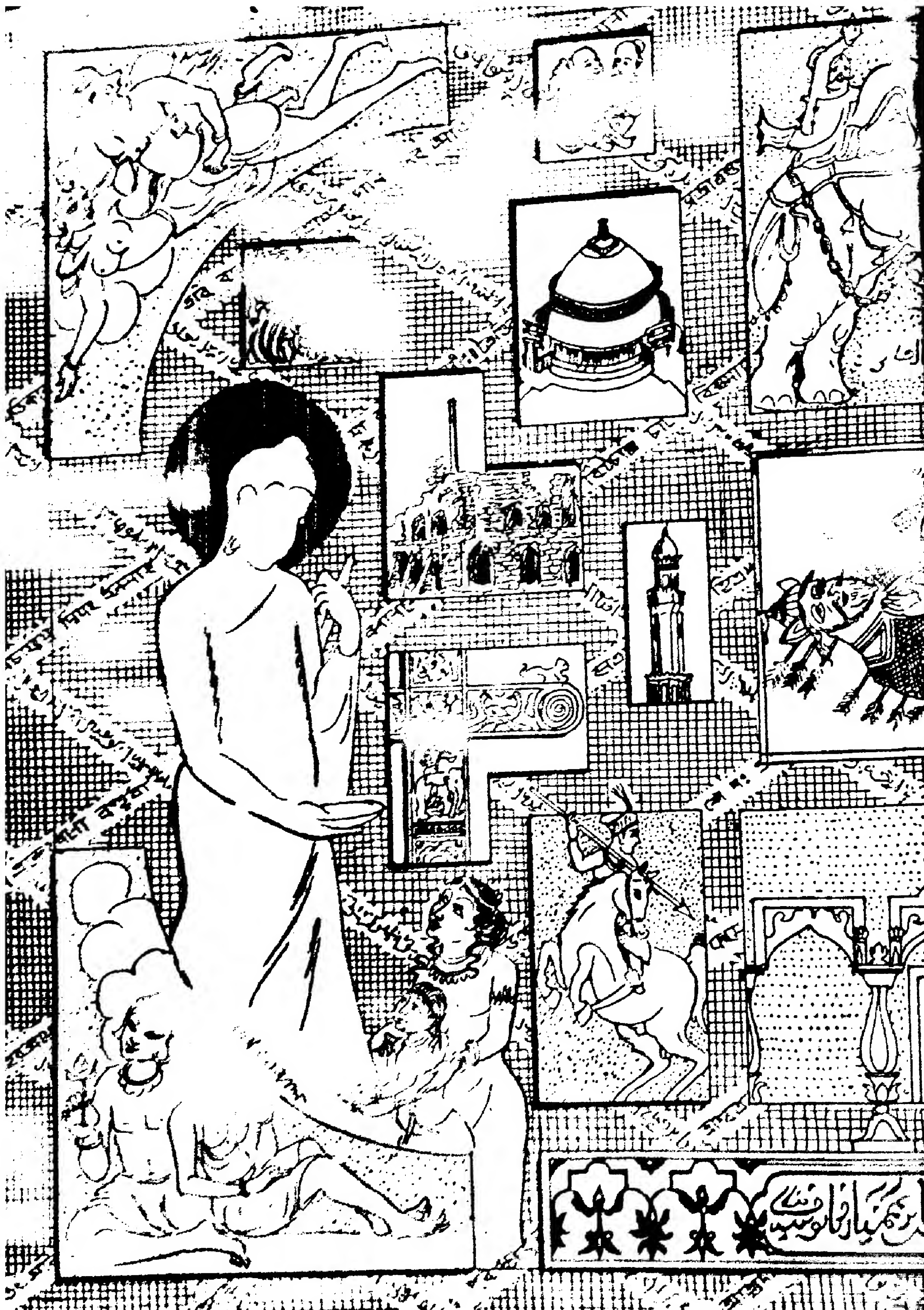
[লেখকের উপাধির ক্রমানুসারে সজ্জিত]

আব, লক্কন : 'আইন-ই-আকবরী'—
 ১০০ এ ; 'আকবরনামা'—৯৮,
 ১০৬, ১০৮, ১০০, ১৪১
 আলি, মজ্জতবা : 'চতুরঙ্গ'—০, ১১,
 ১৫, ১৬, ২০
 কান্দনগো, ডঃ ; 'শেরশাহ'—৮৪
 ঘোষ, বিনয় ; 'বঙ্গশাহী আমল'—১০০
 চক্রবর্তী, পূর্ণচন্দ্র ; 'ষ্মে ষ্মে ভারত
 শিল্প'—৮১, ৮২
 ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ; 'ভারত শিল্পে
 ষড়ঙ্গ'—১০৮
 ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ; 'রচনাবলী'—৭৫,
 ৯৬, ২০২
 দাস, দীপকরঞ্জন ; 'বিশ্বকোষ'—০০
 দাশরথী ; 'দৃষ্টিগাত'—৫, ২১, ৫১
 সান্যাল, নারায়ণ ; 'অজ্ঞতা অপহৃপা'—
 ১১৬
 এ ; 'বিশ্বাসঘাতক'—১৮২
 সীরাণ, পরমাস্তা ; 'J.B.O.R.S.'—
 ৮৪
 স্কন্দনা ; 'নৃরাজাহান'—১৭১

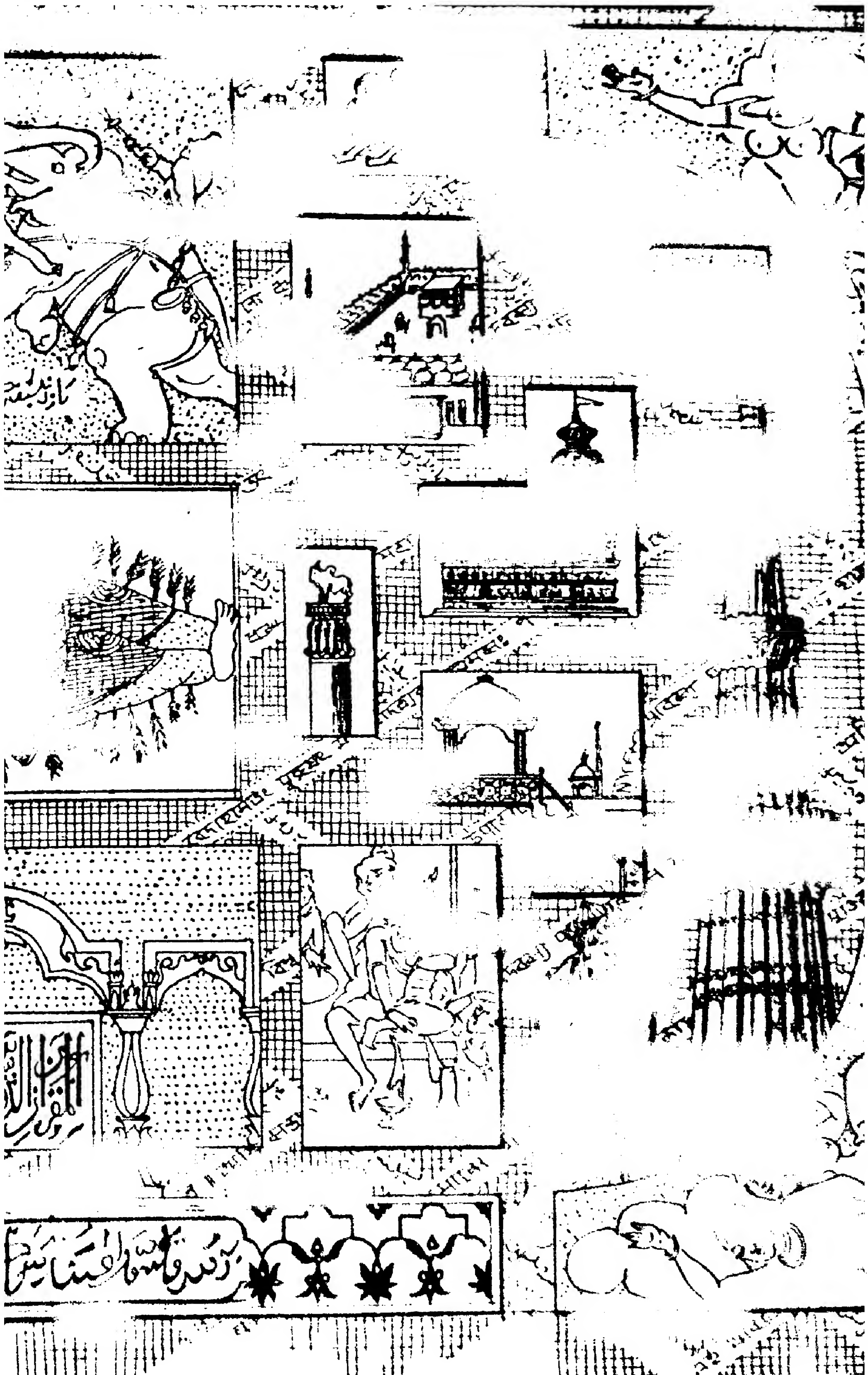
Ali, Maghbar ; 'Tawarik of
 Sayyid M. Ali'—৭১
 Badayuni (tr. Abdul
 Quadir)—১০১
 Barani, Zia-uddin ; 'Tarik-
 i-Firuzshah'—৪৪, ৫২
 Beveridge, Mrs. A. S. ;
 'Memoirs of Babar'—
 ৭৭, ১৬০
 Bernier ; 'Travels of'—১১৬
 Brown, Percy ; 'Indian
 Architecture'—০৬, ৫৫,
 ১১০, ১১১, ১৫১

China Pictorial, ১৯৭৯—১৭
 Cunningham ; 'Architectu-
 ral Reports'—২৯
 Digest, Reader's ; 'The
 World's Last Mysteries'
 —৩১
 Dutta, Kalikinkar ; 'His-
 tory of India'—৭৬
 Elliot ; 'Historical Works'—
 ৫২, ৫৭, ৫৯, ৮৮
 Erskine ; 'Memoirs of
 Babur'—৭৭
 Fergusson, J ; 'History of
 Indian & Eastern Archi-
 tecture'—৩১, ৩৩, ১৫১,
 ১৬৮, ১৯৬
 Fishoel ; 'Ibn Khaldun &
 Timurlane'—১০
 Havell, E. B ; 'Indian
 Architecture'—১৮৫, ১৮৭
 Huxley, Aldus ; 'Jestine
 Pilate'—১৮৮
 Do ; 'Brave New World'
 —১৮৯
 Ibn Batuta ; 'Travels of'—
 ৫০
 Iswariprasad ; 'History of
 Medieval India'—৫২,
 ৫০, ৬০
 Khasrau, Amir ; 'Tarik-i-
 Alai-Shahi'—৪৮
 Markham ; 'Narratives of
 the Embassy of Clavijo
 to the Court of Timur-
 lane'—৬৪

Mazumdar, R. C. ; 'An
 Advanced History of
 India'—২৩, ৪৫, ৫২, ৮০,
 ৮১, ৮৪
 Minhaz Uddin ; 'History of
 India'—২৫
 Nizanni, Hasan ; 'Taju-el-
 Ma-asir'—৩১
 Ratha, R ; 'Agra & It's
 Monumental 'Glory'—
 ১১১, ১৬৮
 Rizvi, Sd. A. A. ; 'Fatehpur
 Sikri'—১২২, ১০০
 Salil, A ; 'History of the
 Mughals'—১৬০
 Sarkar, Jadunath ; 'Anec-
 dotes of Aurangzeb &
 Historical Essays'—১৮০
 Saxena, B. P. ; 'History of
 Shahjahan'—১৬০
 Sengupta, R. ; 'The Qutb
 Minar', The Times of
 India, (৩০-৭-৭৮)—৩২
 Do ; 'How Qutb Minar was
 Designed', Hindusthan
 Times (৩-৮-৭৮)—৩৭
 Sharma, Ram ; 'Story of
 Babur's Death, 'Cal.
 Review (Sept. '36)—৭৭
 Sharma, Y. D. ; 'Delhi &
 It's Neighbourhood'—
 ১০৫
 Srivastava, Dr. ; 'Akbar
 the Great'—১০০, ১০৯,
 ১২৭



در کتابخانه و کتابخانه



زند و استراحت

“স্বাক্ষর পেশার বাস্তবকার, নেশার শিল্পপরিসিক। উপরন্তু অন্ধনাশিল্পী। সুতরাং তাঁর রচনায় শব্দ, অলোচ্য শিল্পকীর্তির বাহিরঙ্গণের পরিচয়ই পাওয়া যাবে না, সেখানে অন্তর্নিহিত শিল্প-রসের সঙ্গোপ তিনি পাঠকের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন—এটা প্রত্যাশিত। এই প্রত্যাশা পূরণ করেছেন লেখক।...নব্যরূপ সান্যালের সব চাহতেই তিনি সফল। আগা কৃতিত্ব এই যে, বাংলাভাষার পাঠক-পাঠিকাদের কাছে তিনি পরিবেশন করেছেন হুদা-মুসাভিষ শ্বাপত্যকীর্তি সম্পর্কে এমন একটি তথ্যসমৃদ্ধ-গ্রন্থ বা ইতিপূর্বে শব্দ রচিত নয়, বোধহয় অন্তর্নিহিতও হয়নি। যা এতদিন শব্দ, ভ্রমণবিলাসীদের কাছে দু-দুন্ডুর আগ্রহের বিষয় ছিল তা ইতিহাস এবং শিল্প-কলা সম্পর্কে অনুরাগী মানবের কাছে অপরিহার্য, সুখপাঠ্য এবং নির্ভরযোগ্য সূত্র হিসাবে গণ্য হবে।”

অধ্যাপক শ্রীনিধীধরজ্ঞান রায়

তারিখ, 18.12.82

“আমাদের ভাষায় এ হেন গভীর তথ্য ও ভাবনা-সমৃদ্ধ বই আছে বলে আমার জানা ছিল না। আপনার বইয়ের নকশা ও বিশ্লেষণ, অভ্যন্তর মূল্যবান। ইংরাজীতেও এই বইয়ের বিষয় ও লিখন-শৈলীর সমতুল্য সুখদায়ক বই আমি পড়িনি—not even Havell and Percy Brown. আমি দীর্ঘ পনের বৎসরকাল আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগের কর্তা ছিলাম, এ অঞ্চলের Islamic Architecture সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ নই।...উচ্ছ্বাসের বশে হঠাৎ একথা লিখছি না।”

অধ্যাপক শ্রীঅমলেন্দু বসু

10.10.82

“বইখানি অতি সুন্দর হয়েছে। পড়ে যেমন আনন্দ পেলাম, তেমনি অনেক কিছু নতুন করে জানলামও। পড়া শেষ হতেই প্রবল বাসনা জাগল তোমাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাতে—আই এই চিঠি। একদিন এস, বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছা আছে।”

শ্রীউমাপ্রসাদ মুনোপাধ্যায়

20.9.82

“বইটি পড়ে বিশেষ আনন্দলাভ করেছি। আপনার বইয়ে ইতিহাস, শিল্পবিদ্যা ও সাহিত্য-রসের সুন্দর মিলন ঘটেছে। প্রত্যেক অঙ্গসম্পন্ন আপনার সুকুমার শিল্পীমনের পরিচয়। আপনি অজস্র নতুন আগ্রহের বিকাশ ঘটান গিয়ে বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন রীতির প্রবর্তন করেছেন।...এই বই শুধু একই প্রত্নতাত্ত্বিক, শিল্পী ও লেখকের সমন্বয় ছাড়া সমৃদ্ধ নয়।”

শ্রীচিন্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিজয়া দশমী, ১০৮৯

“নব্যরূপ সান্যাল নিজে একজন শ্বাপত্য-শিল্পী। এই বোধহয় তিনি একটি বিশেষ দৃষ্টি নিয়ে এই-সব শ্বাপত্যকে দেখেছেন এবং সেই অপরূপ দর্শনের আনন্দ অনুভূতিকে অকৃপণ হৃদয়ে ‘বাংলায়’ ‘দেখ’ করেছেন পাঠকের কাছে।”

গ্রন্থবর্তী বিভাগ II যুগান্তর

24.2.83